ক্রিস্টোফার ইশারউড

অনুবাদ
রবিশেখর সেনগুপ্ত

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
দো[illegible]১৩৫৯

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৮৮৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪

ব্লক
মডার্ন প্রসেস
১৩ কলেজ রো
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদমুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯

সূচী

১

গল্পারম্ভ

এ কাহিনী এক 'প্রত্যক্ষ চেতনা'র কাহিনী।

শুধুমাত্র এটুকু বলেই আমি আরম্ভ করবো তাঁর কথা। গোড়াতেই তাঁকে মহাত্মা বলবো না, মিস্টিক না, ঋষি বা অবতার না—উচ্ছ্বাসপ্রবণ এমন কোনো বিশেষণ আমি ব্যবহার করবো না যার মিশ্র পরিমণ্ডল কাউকে আকৃষ্ট করবে, কাউকে-বা দূরে ঠেলে দেবে।

যা বিস্ময়কর প্রায়শই তা অসামান্য, রহস্যঘন। তাঁকে বোঝার যোগ্যতা যাঁদের ছিল তাঁদের কাছে রামকৃষ্ণ ছিলেন তেমনি বিস্ময়কর এক বাস্তব সত্তা। আর আমিও ঠিক তেমনভাবেই তাঁর কাছাকাছি পৌঁছবার চেষ্টা করবো।

প্রচারসর্বস্ব আধুনিকতা আমাদের মূল্যবোধকে ফাঁপিয়ে তাকে প্রায় অকেজো করে দিয়েছে। মানুষ বস্তু যাই বলুন প্রচারের দোহাই দিয়ে সবাই শ্রেষ্ঠ। তাই কোনোরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে যাব না। দরকারই বা কিসের! অপেক্ষাকৃত অধিকভাবে এ-যুগের ব'লে রামকৃষ্ণের জীবনের পুরো ঘটনাই সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ আছে। সেদিক থেকে তাঁর জীবন পূর্ববর্তী অন্য কোনো জীবন বা ঘটনার চেয়ে আমাদের আরও নিকট। এটুকু আমাদের কাছে এক বাড়তি সুযোগ। সুতরাং কোনো কীটদষ্ট পুঁথি, অনিশ্চিত সাক্ষ্য-প্রমাণ, কল্পিত কাহিনী বা কিংবদন্তীর আশ্রয় নিয়ে ইতিহাসের ফাঁক ভরাবার দরকার হবে না। রামকৃষ্ণ কি ছিলেন বা কি ছিলেন না, পাঠক নিজেই তাঁর মূল্যায়ন করবেন; অন্তত রামকৃষ্ণের বাণী ও কর্মের উপর নির্ভর করে পাঠকের বিচারবোধ গড়ে উঠতে পারবে।

গ্রন্থশেষে এক বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জী দিয়েছি। কিন্তু স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে, মাত্র দুটি উল্লেখযোগ্য বই আকরগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করেছি। আমার এই প্রয়াস উল্লিখিত বই দুটির পরিচিতিকরণ করেছে মাত্র; সুতরাং যথেচ্ছভাবে বইদুটি থেকে উদ্ধৃত করবো কিংবা ভিন্নভাবে প্রকাশ করবো। বইদুটির একটি হলো শ্রীম রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, অন্যটি সারদানন্দ রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ। শ্রীম অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত পেশায় শিক্ষক ছিলেন। কলকাতার কোনো এক হাইইস্কুলের এই প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৮২ সালে। প্রথম সাক্ষাতের পরে আর মাত্র চারবছর মর্ত্যে ছিলেন রামকৃষ্ণ। এই স্বল্পকালের মধ্যে শ্রীম ও রামকৃষ্ণের মধ্যে নিয়মিত সাক্ষাৎ হয়েছে। প্রতিটি সাক্ষাতের পরেই শ্রীম যা দেখতেন, শুনতেন সে সম্বন্ধে অথবা রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতপ্রার্থী অন্তরঙ্গদের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ দিনলিপি লিখতেন। চার বছরের নিয়মিত সান্নিধ্যের ফলশ্রুতিই হলো পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। সারদানন্দ যখন রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব নেন তখন তাঁর বয়স উনিশ পূর্ণ হয় নি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ নামে এই জীবনীগ্রন্থ রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন রচনার সংকলন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অল্প

দিনের মধ্যে প্রবন্ধগুলি লেখা শুরু হয় এবং শেষ ক'টি মাসের ঘটনাপঞ্জী ছাড়া রামকৃষ্ণের জীবনেতিহাসের প্রায় সবদিকের আলোচনা এই অন্তরঙ্গ জীবনীগ্রন্থে আছে। রামকৃষ্ণের দেহাবসানের দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে লেখা শুরু করলেও এই গ্রন্থে প্রামাণিকতার অভাব নেই। তাঁকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন জানতেন তাঁদের অনেকেই তখনো জীবিত। অসামান্য এই মহাপুরুষ সম্পর্কে অন্যান্যের স্মৃতিনির্ভর অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজের স্মৃতি মিলিয়ে এই প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছে। কাজটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন সারদানন্দ। আর এক দিক থেকেও বইখানি মূল্যবান। রচয়িতা সারদানন্দ হলেন রামকৃষ্ণের একজন সন্ন্যাসীভক্ত। অনন্যসাধারণ যেসব অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলি তাঁর প্রত্যক্ষানুভূতি। পরে কোনো এক প্রশ্নকারীকে সারদা-নন্দ বলেছিলেন, 'অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার বাইরে অন্য কোনো অভিজ্ঞতার কথা এই বইতে আমি নিবেদন করি নি'। আপাতসতর্ক এই উক্তির মধ্য দিয়ে বিস্ময়করভাবে যে দৃঢ়তা তিনি প্রকাশ করেছেন তা যেন আমাদের সব সংশয় স্তব্ধ করে দেয়। এই উক্তি যে অহংকার নয়, সারদানন্দের মতন সদাচারী সন্ন্যাসীর কাছে আমরা তা আশা করতে পারি।

নিজের সম্পর্কেও কপটাচার হবে যদি নিজেকে নিরপেক্ষ জীবনীলেখক বলে উল্লেখ করি। ব্যক্তিগতভাবে আমি রামকৃষ্ণের একজন অনুগত ভক্ত। অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আমি বিশ্বাস করি, যে ভক্তেরা তাঁকে যে-চোখে দেখেছেন তিনি তা-ই ; দেহায়িত ঈশ্বর। এই গ্রন্থ আমি বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসীদের জন্যে লিখি নি। আমি লিখেছি তাঁদের জন্যে যাঁরা বিস্ময়কে, তা সে যেখানেই থাকুন না কেন, সবসময়েই খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

আমি শুধু আপনাদের বলবো যে সেই খোলা মনের কৌতূহল নিয়ে রামকৃষ্ণকেও বিচার করুন যা দিয়ে একজন জুলিয়াস সীজার, বা সিয়্যানা ক্যাথরীন বা লিওনার্দো দ্য ভিন্সি কিংবা আর্থার র‍্যাবো-র মতন অসাধারণ মানুষের চরিত্রবিচার করেছেন। যতখানি পারা যায়—মন থেকে ছেঁটে ফেলুন ধর্ম-অধর্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, শুচি-অশুচি, সৎ-অসৎ, অস্তি-নাস্তির সব সংশয়। পড়তে পড়তে নিজেকে শুধু বলুন, মানুষের পক্ষে এও সম্ভব। তারপর যদি ইচ্ছে করেন তবে অবশিষ্ট মানবগোষ্ঠীর জন্যে এই সম্ভাবনাকে ছড়িয়ে দিন।

বিমানযোগে কলকাতা থেকে রোম নগরী পেঁছাতে সময় লাগে একদিন। সকালবেলা কলকাতা বিমানবন্দর থেকে পশ্চিমগামী কোনো বিমানে চড়লে রাতের খানাপিনার আগেই রোমে পেঁছানো যায়। মোটরগাড়ি চড়ে রামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরে যেতে সময় লাগে একবেলা। সকালে যাত্রা করলে ম্যাধ্যাহ্নিক ভোজের আগেই সেখানে পেঁছানো যায়। প্রথম যাত্রার ক্ষেত্রে আপনাকে পরিভ্রমণ করতে হবে হাজার চারেক মাইলের কিছু বেশি পথ—অথচ দ্বিতীয় যাত্রায় সত্তর মাইলের মধ্যেই আপনি গন্তব্যস্থানে পেঁছে যাবেন। তবুও একদিক থেকে ওই স্বল্পযাত্রার পথটিই তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ ; কারণ সময় সেখানে থেমে গেছে—পিঠ ফিরিয়ে পিছু হঠেছে। বিগত একশো বছরে বাংলাদেশের আর পাঁচখানা সাধারণ গ্রামের বহিরঙ্গের বদল হয়েছে সামান্যই। অবশ্য কামারপুকুর ব্যতিক্রম। সামান্য হলেও আধুনিকতার ছোঁয়া সেখানে লেগেছে। যেটুকু হয়েছে তা রাম-কৃষ্ণের স্মৃতিজড়িত মন্দির ঘিরেই। এটি আজ এক আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র। তাই স্বভাবতই বলা যায়, যেটুকু আধুনিকতা কামারপুকুর পেয়েছে তা অতীতের এক অসাধারণ

ঘটনার জন্যে ; আগামী দিনগুলির উন্নয়ন-সম্ভাবনা নিয়ে কামারপুকুর আদৌ উৎকণ্ঠিত নয়।

এহেন গ্রামের ঘরবাড়ির অধিকাংশেরই খড়ের চাল ; মাটি গেঁথে তৈরি হয় ঘরের দেওয়াল। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই, বৈদ্যুতিক আলো বা গ্যাস নেই। পানীয় জল ব'য়ে আনতে হয় কাছাকাছি পুকুর থেকে। সেই পুকুরের জলেই স্নান করা কাপড়কাচার কাজও সারতে হয়। প্রখর গ্রীষ্মে জলাধার বা পুকুর শুকিয়ে যায়, বর্ষায় আবার সেগুলি টলটলে জলে ভরাট হয়ে ওঠে। পুকুরের জল পরিশুদ্ধ করে মাছের পোনা। বেশিরভাগ গ্রামবাসী তাদের পূর্বপুরুষদের মতই কৃষিজীবী ; প্রধান কৃষিজাত পণ্য ধান। চাষ বা মালবহনের কাজে ব্যবহার হয় ষাঁড় বা মহিষ। প্যান্ট-জাতীয় শহুরে পরিধেয় গ্রামগঞ্জে অচল। অবশ্য ইদানিং গ্রাম-যুবকরা সস্তা বলে লুঙ্গি ব্যবহার করে। আর এক আধুনিকতা দেখা যাচ্ছে। বয়স্কা মেয়েদের মধ্যে অপরিচিত পুরুষের সামনে ঘোমটা টানার প্রচলন উঠে গেছে বললেই হয়।

শ্রীপুর কামারপুকুর আর মুকুন্দপুর জড়িয়ে বর্তমান কামারপুকুর। তুলনায় আশ-পাশের গ্রাম থেকে আয়তনে কিছু বড় হলেও ভারতবর্ষের সাধারণ মানচিত্রে তার স্থান চিহ্নিত নেই। কলকাতা থেকে উত্তরপশ্চিমে বর্ধমান, সেখানে পৌঁছে আপনি যদি মাইল তিরিশ দক্ষিণে একটা ছোট্ট বিন্দু আঁকেন তাহলে সেটাই হবে কামারপুকুরের সন্নিহিত অবস্থান। জেলার গ্রামগুলি ছড়িয়ে আছে সামান্য উঁচু নিচু ভূমিখণ্ডের উপরে। গ্রামসীমানার প্রহরায় আছে বট, সুপারি আর আমগাছের সারি। শরৎকালে যখন ধানের শিষ নবীন থাকে তখন গ্রামটিকে উদ্ভিদসমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট এক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দ্বীপের মতন দেখায়। শীতের সময় আবার অন্য রূপ। ধান কাটা হয়ে গেছে—গোড়াগুলি শুকনো শক্ত। লাল-ধুলোয় ছেয়ে গেছে ক্ষয়ে-যাওয়া ভূপৃষ্ঠ। তখন যেন প্রায় মরুভূমির মতন গ্রামের চেহারা। ছায়াঘেরা সুন্দরকান্তি কামারপুকুরকে দেখে তখন মনে হয়, যেন পেরিয়ে এলেম অন্ত-বিহীন পথ।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যদি আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে গ্রাম-বাংলার যথার্থ রূপটি আপনার মানসলোকে ঠিকমতন ফুটে উঠবে না। অথচ কাহিনীর প্রথম পর্বের গতি বুঝতে হলে চোখের সামনে সেই ছবিটি থাকা বাঞ্ছনীয়। ধরা যাক একজন মার্কিনীর কথা। পুরোনো ধাঁচের গ্রাম বলতে তার কল্পলোকে যা ফুটে উঠবে তা হলো ইংল্যাণ্ডের কোনো প্রত্যন্ত গ্রামের ছবি। একটি গির্জা, তাকে ঘিরে ইঁট পাথর দিয়ে তৈরী কতকগুলি কুটীর, খানিকটা ঘন সবুজ প্রান্তর, একটা ছোট্ট সরাইখানা। অর্থাৎ বাজার, খেলার মাঠ, উপাসনামন্দির এবং এসব বেষ্টন করে থাকা গৃহস্থ মানুষের ঘরবাড়ি—এই নিয়ে এক সুবিন্যস্ত সমাবেশ।

এই বিন্যাস গ্রাম-বাংলার চেহারায় বাহ্যত অনুপস্থিত। বাংলার গ্রামে অনেক মন্দির, অনেক ছোট-ছোট পূজাঙ্গন ; কিন্তু তারা গির্জার ভূমিকা পালন করে না। দেখাসাক্ষাৎ বা আলাপ-সালাপের জায়গা মন্দির বা পূজাঙ্গন নয়। মনে রাখতে হবে, হিন্দুধর্ম মুখ্যত গৃহধর্ম। নিত্যপূজার ব্যাপারটি এখানে ব্যক্তিগত। বাংলার গ্রামে সর্বজনীন ভোজনখানা নেই, কারণ জাতিপ্রথা সব সম্প্রদায়ের মানুষকে পঙ্‌ক্তিভোজে উৎসাহিত করে না। সাধারণের ব্যবহারার্থ খোলা সবুজ মাঠ বা বাগান নেই। পুকুরঘাট, কুয়াতলা কিংবা মন্দির-চাতাল

ছাড়া পরস্পর মেলামেশার জায়গা বাংলার গ্রামে নেই। তবুও বিন্যাস আছে। নিজস্ব সমাজরীতি মেনে চলার প্রবণতা থেকেই এই বিন্যাস এসেছে। বিন্যাসে জটিলতা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাগরেখাটি স্পষ্ট। জাতিপ্রথাই এই বিন্যাসের বুনিয়াদ। সব জাতি সব বর্ণের মানুষই গ্রামটিকে ভাগাভাগি করে বাস করে, পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দেয়—জাতপাঁত মেনে নিয়েও একে অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে বাস করে।

বাংলাদেশের গ্রামে বেড়াতে এসে কোনো পশ্চিমী আগন্তুকের চোখে যা অত্যন্ত পীড়াদায়ক ঠেকে তা হলো গ্রামের হতশ্রী চেহারা আর তার আদিম অভ্যাস। হয়ত কোনো পশ্চিমীর শোভন মন প্রত্যাখ্যান করেনা কিন্তু বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়। পথের ধারে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে আবর্জনা ফেলার যে ভারতীয় রীতি, তা চোখে পড়লে বিদেশী মন সংকুচিত হবেই। সে ক্ষুণ্ণ হবে যখন দেখবে খানকয়েক কাঁথা, একটা তক্তপোষ, টিনের একটা তোরঙ্গ এবং তার মধ্যে রাখা যৎসামান্য মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে এখানকার মানুষের বাহুল্য-বর্জিত ঘরকন্না। সে রীতিমত বিরক্ত বোধ করবে যখন দেখবে, নিয়ম করে পাকঘরের মেঝে গোময় লিপ্ত করে নিকানো হচ্ছে।

পাশ্চাত্য মানুষের এই যে প্রতিক্রিয়া তা কিন্তু গ্রাম-বাংলার মানুষ বোঝে না। সে জানে ঘরের জঞ্জাল রাস্তাতেই ফেলতে হয় এবং ঘরের মধ্যে আবর্জনা স্তূপ করে রাখার চেয়ে এই প্রথা অনেক স্বাস্থ্যসম্মত। হয়ত আতঙ্কে সে শিউরে উঠতো যদি ঘরের মধ্যে আবর্জনা জমানোর পাশ্চাত্য প্রথা তার চোখে পড়তো—হয়তো বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে উঠতো যদি সে জানতো যে, পশ্চিমী গ্রামের মানুষরা সপ্তাহান্তে একবারই স্নান করে ও পরিধেয় বদল করে। একথা ঠিক যে, গ্রাম-বাংলার মানুষের ঘর-গেরস্থালীতে বাহুল্য নেই। সেও ভাল। তবুও ওদেশের জীবনযাত্রায় এই কলরব, ঘরে-ঘরে জড়াজড়ি করে রাখা আসবাব, দরজায়-দরজায় ঝোলানো ধূলিমলিন পরদা, তাকে আকর্ষণ করে না। যেন সব আছে অথচ পুজার নিভৃতি নেই। গোময়লিপ্ত পরিশুদ্ধ গৃহতল যে বীজাণুনিবারক এবং পাশ্চাত্য মানুষ যাচাই করে প্রথাটি গ্রহণ করলে যে, লাভবানই হবেন এই নিবেদনটুকু হয়ত কোনো একদিন এদেশের মানুষ ওদের কাছে রাখতে পারেন।

যা বললাম তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, আজকের গ্রাম-বাংলা বহুযুগ আগেকার গ্রাম-বাংলার অবশিষ্ট হয়েই পড়ে আছে, কোনো বদলের কাজই কোথাও হয় নি। বাহ্যত না হলেও বদলের কাজ হয়েছে, গভীরে। নগরজীবনের সঙ্গে গ্রামের ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। ভারত স্বাধীন হয়েছে। সাথে সাথে চিত্তের দীপ্তি আর বুদ্ধি-মুক্তির স্বাদ পেয়েছে গ্রামবাসী। নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, অবরুদ্ধ কল্পনা ছাড়া পেয়ে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। আগের মতন পারিবারিক বন্ধন আর তেমন দৃঢ় নেই। জাতপাঁতের দোহাই পেড়ে পঙক্তিভোজে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার বিধি তত কঠোরভাবে পালনীয় হয় না। গণতন্ত্রের অভ্যুদয় মানুষকে নতুন করে অধিকারবোধে সচেতন করেছে। যারা অত্যন্ত গোঁড়া তাদের মধ্যেও এর প্রভাব পড়েছে খুব স্পষ্ট ভাবে। অবশ্য এই প্রভাব যতখানি গভীর হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি, কারণ অন্তরতম প্রদেশে গ্রাম-বাংলার মানুষ আজও তার আজন্মলালিত সংস্কারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

এসব হলো আজকের কথা। কিন্তু আমার আলোচনার বিষয় ১৮৩৬ সালের কামারপুকুর, যে বাঞ্ছিত বছরটিতে রামকৃষ্ণ জন্মালেন। সেই সময় অর্থাৎ ১৮৩৬ সালে কামারপুকুর ঠিক

কেমনটি ছিল ?

কয়েক বিষয়ে অন্তত আজকের চেয়ে সেদিনের কামারপুকুর অনেক উন্নত ছিল। জনসংখ্যা বাড়লেও খাদ্য ছিল পর্যাপ্ত ; গোলায়-গোলায় ধান ছিল, তাই গ্রামের মানুষ খেয়ে-পরে বাঁচতো। শেষ যে মহামারী হয় তার ষাট বছর পেরিয়ে গেছে। এই মহামারীতেই বাংলা-দেশের জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশ মানুষ সেদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সাধারণভাবে স্বাস্থ্যবান হলেও ১৮৬৭ সালের ম্যালেরিয়া মহামারীর পর থেকেই গ্রামবাসীদের ব্যাপক স্বাস্থ্যহানি ঘটতে থাকে।

চাষের কাজ ছাড়াও ছোট-ছোট হাতের কাজ, যেমন মিষ্টান্ন পাক, আবলুস কাঠের হুঁকার নল তৈরির কাজ, এসবও জানতো। ঘরে-ঘরে তাঁত ছিল। সেখানে হাতে-বোনা ধুতি গামছা বিক্রির জন্যে চালান যেতো সুদূর কলকাতায়। গ্রামের গা ঘেঁষে একটা রাস্তা চলে গেছে পুরী জগন্নাথধাম পর্যন্ত। রেল যোগাযোগের আগে কলকাতা থেকে জগন্নাথধাম যাবার এটিই ছিল একমাত্র সড়কপথ। এই পথের তীর্থযাত্রী ভক্তেরাই সেদিন কামারপুকুর বাজারের সম্ভাব্য ক্রেতা ছিল।

শুধু গোলায়-গোলায় ধান নয় গ্রামের মানুষের গলায়-গলায় গানও ছিল ; মোটামুটি সুখী ছিল তাদের জীবন। দারিদ্র্য ছিল, তবে এই আপেক্ষিক দুষ্ট ব্যাধির দায় সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ ভাগ করে নিয়েছিল। ফলে সকলের মিলিত সাহায্যে দারিদ্র্য বহু-ব্যাপক হয়ে উঠতে পারে নি। এইভাবে কামারপুকুরের সমাজ আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা মিটিয়েছিল। জাতি কাঠামোয় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের একটা নির্দিষ্ট ঠাঁই ছিল। কেউ অবহেলিত বোধ করে নি। দূর হ'ক নিকট হ'ক, সব আত্মীয়ই গোটা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বয়োজ্যেষ্ঠরা গণ্যমান্য ছিলেন। মহিলারা ছিলেন সম্মানিত। শিশুরা ছিল সকলের কাছেই সমান আদরণীয়। ব্যক্তিত্ব বিচারের সময় আমরা রামকৃষ্ণের মধ্যেও সরল নিষ্পাপ গ্রাম্য শিশুভাবের এক পরমানন্দ প্রকাশ পরবর্তীকালে দেখবো। অপার মাতৃস্নেহ-নির্ভর এই শিশু তার জীবনের শুরু থেকেই নিশ্চিতভাবে সকলের ভালবাসা পেয়ে এসেছে। বাল্যাবস্থা থেকে কোনো ব্যর্থতার গ্লানিই তাঁকে কখনও স্পর্শ করে নি। তাই কোনো পরস্পর বিরোধিতা কিংবা অসুস্থ মানসিকতার উদয় তাঁর চরিত্রে কখনও হয় নি। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণের জীবনের মনস্তাত্ত্বিক দিকের আলোচনার সময় আমাদের এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

যদি বলি যে, জাতিপ্রথা মেনে নিয়ে সেদিন গ্রামবাসীর অধিকারবোধ সুদৃঢ় হয়েছিল, তাহলে আমার উক্তি আপনাদের কাছে অসঙ্গতি দোষ-দুষ্ট বলে মনে হতে পারে। কারণ, জাতিপ্রথা মেনে নেবার অর্থই হলো—শ্রেণীবিশেষকে জাতি-কাঠামোর বাইরে রাখার ঝোঁক। কিন্তু জাতিপ্রথা বর্জনকর প্রথা নয় ; বরং বলা যায়, এ প্রথার উদ্দেশ্য হলো পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল থাকা। শ্রমের বিন্যাস, বৃত্তি অনুসারে শ্রেণীর বিভাজন করাই হলো এ প্রথার মূল ভিত্তি। সে যুগে তাই এক জাতি বা বর্ণ অপর জাতি বা বর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে বেঁচে থাকতে পারতো না।

মূল চাতুর্বর্ণ হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। মুখ্য অথবা মৌলিক ক্রিয়াকর্মভেদে তারা যথাক্রমে পুরোহিত, সৈনিক, বণিক ও দাস—এই চারিবর্ণে বিভক্ত ছিল। কয়েক হাজার

বছর আগে ভারতবর্ষে আর্য-অনুপ্রবেশের সময় আর্যরা এদেশে প্রথম বর্ণাশ্রম প্রথা চালু করেন। তখন প্রায়ক্ষেত্রে জীবিকাকে কেন্দ্র করেই জাতি নির্ধারণ হতো ; কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতিপ্রথা হয়ে দাঁড়ায় উত্তরাধিকারগত প্রথা, আর সেইভাবেই সমাজে উচ্চবর্ণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। অধিকার পাকাপোক্ত করতে এবং বিবাহ ইত্যাদি থেকে মিশ্রজাতি অনুপ্রবেশ এড়াতে তাঁরা নানাভাবে শাসন অনুশাসনের বেড়া দিয়ে নিজেদের আলাদা করে রাখতেন। টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত কোনো কিছুর বিনিময়েই উচ্চতর জাতির মধ্যে নিজেকে কেউ অন্তর্ভুক্ত করতে পারতো না। ক্রমে মূল জাতির আরও বিভাজন হলো। জীবিকা ও বৃত্তিভিত্তিক উপজাতি শ্রেণীর সৃষ্টি হলো। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে আধুনিকতার দাবি মেনে নিয়ে এইসব ছোট-ছোট বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণী কাঠামো ভেঙে পড়লো। সুতরাং আজকের দিনে একজন কামারের ছেলের কাছে কর্মকার-বৃত্তি গ্রহণের প্রত্যাশা টিঁকে রইলো না। যারা তথাকথিত অচ্ছুৎ তাদেরও কখনও-কখনও জাতি বলে আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু তাদের স্থান চিরকালই কাঠামোর বাইরে নির্দিষ্ট ছিল। স্থায়ীভাবে এদেশে বাস করতে এসে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গেই আর্যদের মিশতে হয়েছিল। এদের মধ্যে কিছু শ্রেণী ছিল যারা আর্যদের অনুগত, বাকিরা ছিল স্থানীয় আদিবাসী। যেহেতু ধর্মবিশ্বাস, যৌন-অভ্যাস ও খাদ্যাখাদ্য বিচারে এই শ্রেণীর মানুষরা ছিল অন্ত্যজ, সেইহেতু জাতি-কাঠামোর একেবারে তলার ধাপেও তারা ঠাই পেত না। ক্রমে ক্রমে কাঠামো থেকে এই বহিষ্করণ হয়ে দাঁড়ায় বংশগত। খ্রীস্টান মিশনারীরা এদেশে এসে অনেক অচ্ছুৎদের ধর্মান্তরিত করেছিল, তাদের চোখে শিক্ষার আলো জ্বেলে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করেছিল, শর্ত ছিল—এইসব ধর্মান্তরিত অচ্ছুৎরা ঠাই বদল করে মৌন অতীত নিয়ে চলে যাবে অন্যত্র। তাদের পরিচয় থাকবে গোপন। এই কারণে কলকাতার মতন বড়-বড় শহুরে সমাজেই এইসব ধর্মান্তরিত অচ্ছুৎরা বাস করতে আসতো। অবশ্য ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার তুলনায় বাংলাদেশে এইসব অচ্ছুৎদের সংখ্যা চিরকালই নগণ্য। সম্ভবত সেই কারণেই সেকালের কামারপুকুরে এমন ধর্মান্তরিত অচ্ছুৎ একজনও ছিলেন না।

আজকের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে মানুষে-মানুষে ভেদ সৃষ্টিকারী এই জাতিপ্রথা হীন এবং অবমাননাকর বলে নিন্দিত হবে। এ বিষয়ে সরকারী হুঁশিয়ারি যুগধর্মকেই স্বীকার করে নিয়েছে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু সমাজসংস্কারক কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেছে। পরবর্তী কোনো অধ্যায়ে এই হিন্দু সংস্কারক কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথাই আমায় বলতে হবে। মোটকথা, বর্তমান সরকারী নীতি হলো গণ-অনুমোদন সাপেক্ষে ধাপে-ধাপে এই জাতিপ্রথা বিলুপ্ত করা। সমানীকরণের এই চেষ্টা শহরবাসীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই অনেকখানি এগিয়ে গেছে, ত্বরান্বিত করেছে শিল্পোদ্যম। সুতরাং আজকের দিনে ঘটা করে প্রগতিবিরোধী, উপহাসাস্পদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল এই প্রথাটি সমর্থনের লজ্জাকর ভূমিকা নিতে কেউ এগিয়ে আসবে না। কারণ, আজকের পৃথিবীতে এই প্রথার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। অবশ্য আমাদের দেখতে হবে, রামকৃষ্ণ এবং সমকালীন চিন্তাবিদরা এ সম্পর্কে কি ভাবতেন ; তখন অনিবার্যভাবেই প্রথাটির উৎকর্ষের বিচারও আমরা করবো। বলাবাহুল্য দোষ যেটুকু সে তো আছেই, সুতরাং নতুন করে দোষত্রুটির আলোচনা বিশেষ কারো মনোযোগ আকর্ষণ করবে না বলেই সে আলোচনায় যাচ্ছি না।

বর্ণাশ্রমপ্রথা কোনো এক নিয়মবন্ধ প্রথা নয় ; এটি ভাবের বিষয়। ঠিকমত বুঝতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে সেই খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে যখন থেকে শ্রীমদ্‌ভগবদ গীতার উল্লেখ পাই। সেই সুদূর অতীত থেকে আজও প্রতি হিন্দুর ঘরে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে এই ধর্মসাহিত্য পঠিত হয়ে আসছে। গীতার আঠারো অধ্যায়ে চাতুর্বর্ণ প্রথাকে স্বাভাবিক অভ্যাস বা অবস্থা-রূপে বোঝানো হয়েছে। গুণকর্মবিভাগ থেকেই চাতুর্বর্ণ ব্যবস্থার উদ্ভব। জাতিবিশেষের অধিকার বা দাবির উল্লেখ সেখানে নেই। বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই কর্মক্ষম ও বিশেষগুণসম্পন্ন, এবং ব্যক্তিবিশেষের এই দক্ষতাই তার কর্তব্য স্থির করে। সংস্কৃত ভাষায় (যে ভাষায় গীতা রচিত হয়েছে) কর্মকেই বলা হয়েছে ব্যক্তি-বিশেষের ধর্ম ; অর্থাৎ এমন কোনো স্বভাব যা ব্যক্তিবিশেষকে ঐ কর্মের প্রতিপ্রেরণা জোগায় এবং যা পালন করলে ঐ ব্যক্তির জীবনবোধ গড়ে ওঠে। বলাবাহুল্য ব্যক্তিবিশেষের এই যে কর্ম তাই তার স্বধর্ম। গীতায় এই স্বধর্ম পালনের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে যাতে পরধর্ম পালনে কেউ উৎসাহিত না হন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে গীতার ব্যাখ্যায় প্রত্যেক বর্ণের নিয়ত কর্ম ছাড়াও আরও অধিক কিছু জানতে পারি।

পৌরোহিত্য ছাড়াও ব্রাহ্মণের আরও অধিক কিছু কর্তব্য আছে। তিনিই ব্রাহ্মণ যিনি দ্রষ্টা, ভবিষ্যদর্শী। অধ্যাত্মজীবনের সংগে যোগাযোগের তিনিই মিলনসেতু। আত্মজ্ঞান বা মানুষের অধ্যাত্মশক্তিকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে তিনি সাত্বিক। আত্মই মানুষের দিব্যভাব। এই আত্মকে জানার সাধনাই ভারতের সাধনা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই দিব্যভাবের সাধনা হয় এবং এই জানার সাধনায় কোনো হিন্দু পশ্চিমীদের মতন গির্জার মধ্যস্থতা স্বীকার করে নেয় নি। আত্মবিকাশের জন্যে ভারতবর্ষ গির্জা বা কোনো প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সে তাকিয়ে থাকে ব্যক্তির দিকে যিনি পূর্ণ আত্মজ্ঞানের অধিকারী। তাঁর নির্দেশিত পথেই তার সাধনার ব্যক্তিগত সংগ্রাম শুরু হয়। আত্মজ্ঞানের এই সাধনাই হলো হিন্দু অধ্যাত্মবাদের মর্মকথা। সাধনালব্ধ সত্য, তা সে যে-ধর্মে, যে-পথেই আসুক না কেন, হিন্দু তাকে গ্রহণ করেছে। এমন কি খ্রীস্টের বিভিন্ন মতবাদের বিরোধিতা করার জন্য যে সব সাধক ধর্মভ্রষ্ট বলে চিহ্নিত হয়েছেন তাঁদের উপলব্ধ সত্যও হিন্দু গ্রহণ করেছে।

আত্মজ্ঞান কি করে হয় ? উত্তরে বলতে হয় যে, কঠোর আত্মসংযম ও নিবিড় অনুধ্যান দ্বারাই আত্মজ্ঞান যথার্থ হয়, প্রজ্ঞার উন্মীলন হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে হতে হবে শুদ্ধ, সংযমী, ন্যায়-নিষ্ঠ, সরল এবং সমস্ত প্রাণীজগতের প্রতি ক্ষমাশীল। শম, দম, তপ, পবিত্রতা, শান্তি, আর্জব—এই হলো ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া নয়, বই পড়তে শেখা নয়, শাস্ত্রব্যাখ্যা করা নয়, অপরের অভিজ্ঞতা মেনে নেওয়া নয়, চাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া ব্রাহ্মণের আত্মজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না।

এই দৃষ্টিতে দেখলে ক্ষাত্রিয় শুধু সৈনিক নয়, বৈশ্য বণিক নয়, শূদ্র ক্রীতদাস নয়। গীতাভাষ্যে ক্ষত্রিয়কে বলা হয়েছে শৌর্য ও তেজস্বিতার প্রতীক। সে দক্ষ বীর, সে অকুতোভয়, যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থাতেই সে সুজনের রক্ষক, দুর্জনের অরি। সে শাসনক্ষম। বৈশ্য বণিক নয় ; আপনাকে ধনাঢ্য করাই বৈশ্যের বিহিত কর্ম নয়। তার বিহিত কর্ম কৃষিকাজ, পশুপালন, গোরক্ষা। এইভাবেই সে সমাজের প্রতিপালন করে। যে সঙ্কীর্ণ আধুনিক অর্থে বৈশ্য অপরকে শোষণ করে ও নিজেকে ধনাঢ্য করে, গীতাভাষ্যে সে অর্থ

নিন্দার্হ।

তেমনি শূদ্র কুণ্ঠিত ক্রীতদাস নয়; মানবসেবাই তার আচরিত কর্ম। সমাজদেহে সে অপরিহার্য এবং এই অপরিহার্যতাই তার পুরস্কার। কারণ শূদ্রের সেবা ব্যতিরেকে অন্য তিন জাতি বেঁচে থাকতে পারে না।

কর্তব্যকর্মের ব্যাখ্যা ছাড়াও গীতায় বলা হয়েছে যে, 'সিদ্ধিলাভের জন্যেই মানুষ জন্মায় এবং স্বধর্মানুসারে প্রাপ্ত কর্ম দ্বারাই সে লক্ষ্যে পেঁছাতে পারে।' অন্যত্র আরও বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শুধু কর্ম করলেই হবে না—কর্ম করতে হবে নিষ্কামভাবে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত করছি, 'কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—কর্ম করার অধিকার তোমার, ফল পাওয়া বা না-পাওয়ার অধিকার তোমার নয়। ঈশ্বরকে হৃদয়ে রেখে তোমার কাজ সম্পন্ন করো। যাঁরা সাধু, প্রাজ্ঞ তাঁরা ঈশ্বরকেই কর্মের ফল নিবেদন করেন ও সত্যবস্তুতে উপনীত হন।

ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্ম করার অর্থ হলো, ভয় বা বাসনাশূন্য হয়ে কর্ম করা। ফল-প্রাপ্তির আশা থাকলেই বাসনা জন্মায়, প্রাপ্তি না হলেই ভয়, তখন সম্ভবত অশুভ পরিণতি মেনে নিয়েই কাজ করে যেতে হয়। সুতরাং নিয়মবিধি মেনেই কাজ করে যাওয়া দরকার। মনে করতে হবে, কর্মের শুভ অশুভ নেই। এই নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মবিধি মেনেই আমরা কর্ম করবো। ফলের কথা ভেবে মনকে অযথা উদ্বিগ্ন করবো না; তাহলেই কর্মের ফল দুঃখ-বিরহিত পদে নিবেদন করতে পারবো।

গীতার মূল বাণী যে ত্যাগ, রামকৃষ্ণ সেকথা বারংবার বলতে ভালবাসতেন। বলতেন, গীতা গীতা বললেই সেটি ত্যাগী ত্যাগী হয়ে যায়। তিনিই ত্যাগী, ঈশ্বরের উদ্দেশে যিনি সব ত্যাগ করেছেন।

অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম প্রথা কোনো বাধাই হয় না যদি এই ভাবাদর্শটি মনে থাকে। দক্ষিণ ভারতের সাতজন ধর্মাত্মাই তো অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণ নিজে ব্রাহ্মণ হলেও তাঁর শিষ্যাদি ছড়িয়ে ছিলেন চারিজাতির মধ্যেই। সার কথা হলো, যিনি সন্ন্যাসী তাঁর কাছে ভেদ অভেদ নেই—সব মানুষই সমান।

জাতিপ্রথা অর্থহীন এবং অবাঞ্ছিত হয়ে দাঁড়ায় যদি অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে তাকে যুক্ত না করা যায়। কয়েক শতাব্দী ধরে এই প্রথা একটা মুখ্য শক্তি বা প্রেরণার মতন ভারতীয় সমাজে কাজ করে গেছে। তখন উচ্চ নীচ সব বর্ণের মানুষই মনে-মনে বিশ্বাস করতো যে, এক স্বাভাবিক নিয়মের পরিণতি থেকেই এই প্রথার প্রবর্তন এবং ঈশ্বরেচ্ছাতেই তা সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং জাতিধর্ম মেনে জীবনযাপন করলেই ঈশ্বরজ্ঞান সম্যক হবে। অধ্যাত্মসাধনা পূর্ণতর হলে মৃত্যুর পরে দ্বিতীয়বার জন্মাতেও হবে না এবং সেই নৈর্ব্যক্তিক চৈতন্যস্বরূপের মধ্যে আপনি লীন হয়ে যাবেন। অথবা যদি জন্মান্তর ঘটেও তাহলে সৎকর্মের প্রভাবে কোনো উচ্চাদর্শ ব্রাহ্মণ পরিবারের অনুকূল পরিবেশে জন্মলাভ করে মোক্ষলাভের পথে এক ধাপ এগিয়ে যাবেন। অপকর্মের ভার বেড়ে উঠলে হীনজন্মের আশঙ্কা থাকে। কিন্তু উত্তরণের পথ চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যায় না এবং মানুষও তার অপকর্মের জন্যে চিরকাল রৌরবগামী থাকে না। অবিচার বা সুবিচারের আশঙ্কা এখানে অমূলক; কারণ এক্ষেত্রে কোনো বিচারকই, এমন কি ন্যায়াধীশ ঈশ্বরও তাঁর রায়ের শেষ কথাটি বলে যাবার অধিকারী নন। শাস্তি, পুরস্কার যাই বলুন, সবই আশ্রিত হয়ে

আছে সৎ বা অসৎ কর্মের উপরে। অর্থাৎ নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই আপনার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের জন্যে আপনি দায়ী করতে পারেন না।

ইংরেজ রাজশক্তির কাছে হিন্দুর এই ধর্মবিশ্বাস সেদিন অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং অন্ত্যজ ব'লে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। কুৎসা, নিন্দা সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা চাইলে ইংরেজ হয়ত হিন্দুর বহু দেবোপাসনা নিয়ে ব্যঙ্গ করতো। অথচ দৃষ্টিভঙ্গির এই অনুদারতা যে ইংরেজেরই কুসংস্কার—একথা তারা স্বীকার করে না। যাহোক, এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছে রইল। উপস্থিত হিন্দুর বহু দেবোপাসনা নিয়ে কিছু আলোচনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ইংরেজের ঈশ্বরবিশ্বাসে পিতা, পুত্র ও ঐশীশক্তি (ফাদার,, সান এবং হোলী ঘোস্ট) এই ত্রয়ী রূপের কল্পনা আছে। ঈশ্বরের এই ঐশীত্রয়ীরূপের কল্পনা যে বহু দেবোপাসনা, এ কথা ইংরেজ অস্বীকার করে। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে উত্তেজিত হয়ে বলবে যে, এক ঈশ্বরেই এই তিন সত্তা নিমগ্ন। তাহলে প্রায় সমতুল কারণে হিন্দুও বহু দেবোপাসনার অভিযোগ অস্বীকার করতে পারে। হিন্দু বলবে যে, ব্রহ্মচেতনার মধ্যেই তার বহুমূর্তিক ঈশ্বর বিশ্বাস বিলীন হয়, নিমগ্ন হয়। ব্রহ্ম নির্গুণ, সব গুণের অতীত। ব্রহ্ম নিরাকার, নিষ্ক্রিয় তাঁর আকার নেই; সর্ব কর্মের মূল তিনি। (কত চতুরানন মরি মরি যাওত/ন তুয়া আদি। অবসানা) সেই ব্রহ্ম যখন কোনো জীবদেহে বিরাজ করেন তখন তিনিই আত্মা। ব্রহ্ম ও আত্মা সমার্থক।

খ্রীস্টানের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমবা নাজারেথের অধিবাসী খ্রীস্টের ধর্মবিশ্বাস এক করে নিয়েছি, কারণ খ্রীস্টধর্মে বিকল্পে বিশ্বাসের স্থান নেই। কিন্তু হিন্দুধর্মে বাছাই করার মতন একাধিক বিশ্বাস আছে। শিবের বদলে শক্তি, রামের বদলে কৃষ্ণের ভজনা করার স্বাধীনতা হিন্দুর আছে। আবার বহুমূর্তিক আরাধনার বদলে পরম ব্রহ্মোপাসক হতেও তার বাধা নেই। যেহেতু ব্রহ্মের স্বরূপ অসীম অনন্ত, তাই অন্য ধর্মের ঈশ্বরবিশ্বাসে হিন্দুর অনাগ্রহ নেই। প্রথম খ্রীস্টান ধর্মযাজকরা এদেশে এসে এখানকার ধর্মান্তরিত মানুষদের আচরণ দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা দেখলেন যে, এদেশের মানুষ খ্রীস্টকে অবতার বললেও তাঁকেই একমাত্র অবতার বলে মানছেন না। এমন কি অখ্রীস্টান অন্যান্য দেবদেবীর ভজনা থেকেও নিবৃত্ত হচ্ছেন না।

রামকৃষ্ণের সমকালে এদেশের সাধারণ চাষাভুষো ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝতো না। এমন কি সাজিয়ে-গুছিয়ে তাদের বিশ্বাসের কথাও তারা বলতে পারতো না। কিন্তু ধর্মের প্রতি তাদের অনুরাগ ছিল গভীর ও অকপট। সে কালে কামারপুকুরে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির, পূজাঙ্গন ছিল এবং সব মানুষই কোনো না কোনো ঠাকুরের ভক্ত ছিল। বারমাস্যা দোল-দুর্গোৎসব পাঁচালি কথকতা যাত্রা পালাগান লেগেই থাকতো। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাচ্ছলে সন্ন্যাসী সেজে ঘুরে বেড়াত; ঠাকুর দেবতাদের লীলাকাহিনী থেকে অংশ-বিশেষ নিয়ে অভিনয় করতো। এরা কেউ বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল না; কিন্তু জীবনযাত্রার সঙ্গে ধর্মচেতনা এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, দুঃসময়ের দিনেও তাদের ধর্মভাব অটুট থাকতো। তারা ভগবানে বিশ্বাস রাখতো, ভবিষ্যৎ নিয়ে অকারণ ভীত হতো না। আজকের এই কপট ও কৃত্রিম মানসিকতার যুগে যা জটিল বলে মনে হচ্ছে সেদিন কামারপুকুরের মানুষের কাছে সেটি তেমন ছিল না।

আমার লেখা পড়ে পাছে সত্যের চেয়েও মধুর কিছু ভেবে বসেন তাই বলি যে, সেদিন গ্রাম-বাংলার সমাজজীবনে কখনও-কখনও অত্যন্ত লজ্জাকর রকমের অত্যাচার ছিল। বিশেষ করে ছোট চাষীর উপর ধনী জমিদারের অত্যাচারের বহর দেখে আঁতকে উঠতে হতো। এইসব প্রজাপীড়করা যেমন ছিল দজ্জাল তেমনি নিষ্ঠুর। আইন ও শাসন যাদের হাতে থাকতো সেইসব দারোগা পুলিশরা ছিল জমিদারবাবুদের হাতের পুতুল। খুন করলেও জমিদারবাবুরা বেকসুর ছাড়া পেত। এইরকমই একজন নীচ, প্রজাহন্তক, নৃশংস প্রতিহিংসাপরায়ণ জমিদার ছিল রামানন্দ রায়। কামারপুকুর থেকে মাত্র দুমাইল পশ্চিমে ছোট্ট গ্রাম দেরেপুর—অত্যাচারী রামানন্দ ছিল সেই দেরেপুর গ্রামের জমিদার।

সেটা ১৮১৪ সাল। একজন অবাধ্য প্রজাকে শায়েস্তা করতে—বাস্তু থেকে তাকে উচ্ছেদের মিথ্যে মামলা সাজালো রামানন্দ। কিন্তু সাক্ষী চাই নইলে মামলা ফেঁসে যাবে। আবার যেমন-তেমন সাক্ষী হলেও চলবে না। চাই এমন একজন মানুষকে যাকে আশপাশের পাঁচটা গ্রামের লোক সৎ ব'লে মানে-গণে। রামানন্দ খুঁজে পেতে হাতের কাছে ক্ষুদিরাম চাটুজ্জেকে পেল এবং তার কাছেই সাক্ষী কবুল করাতে হাজির হলো।

তৎকালীন এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে ক্ষুদিরাম জন্মেছিলেন। অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রায় পঞ্চাশ বিঘের মতন ধেনো-জমি তাঁর অধিকারে ছিল। তিনি আর ব্রাহ্মণী চন্দ্রা দুজনেই ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের অনুগত ভক্ত।

ক্ষুদিরাম ভাল করেই জানতেন যে, মিথ্যে সাক্ষী কবুল করতে অস্বীকার করলে তাঁর সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা আছে। কিন্তু তাঁর মতন মানুষ তা ব'লে সত্যের অপলাপ করতে পারেন না। সুতরাং মিথ্যে সাক্ষী দিতে তিনি অস্বীকার করলেন; এবং প্রতিহিংসা নিতে রামানন্দও তৎপর হয়ে উঠলো। অল্পদিনের মধ্যেই সত্যের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নানারকম অভিযোগের এক লম্বা ফিরিস্তি সাজিয়ে ফেললো রামানন্দ। সাক্ষীসাবুদ সব একপায়ে খাড়া। মামলায় হেরে গেলেন ক্ষুদিরাম। পরিণামে যথাসর্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখারি হলেন তিনি।

তবে সাধারণত এসব ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটে তেমন দুঃখজনক পরিণতি ঘটতে পেল না। রেহাই পেয়ে গেলেন ক্ষুদিরাম। কামারপুকুরের সুখলাল গোস্বামী বন্ধু ক্ষুদিরামের দিকে সাহায্যের হাতটি বাড়িয়ে দিলেন। একদিকে গভীর সমবেদনা অন্যদিকে রামানন্দের প্রতি তীব্র ঘৃণা আর ক্রোধ নিয়ে ক্ষুদিরামের জীবনের সব ঘটনা শুনলেন সুখলাল। তারপর কামারপুকুরের অন্তর্গত তাঁর নিজস্ব আবাদি জমি থেকে আট বিঘার মতন ধেনো-জমি আর গুটিকয়েক বাস্তু-চালা হস্তান্তর করে ক্ষুদিরামের নামে শর্তহীন দাখিলা লিখে দিলেন। বন্ধুর সঙ্গে সুখলাল প্রতারণা করেন নি। যে জমিটুকুর দাখিলা লিখে দিয়েছিলেন তা ছিল যথার্থই উর্বর। গ্রামের মানুষ জমির নাম দিয়েছিল 'লক্ষ্মীর জলা' অর্থাৎ সৌভাগ্য দেবীর চারণভূমি। তাই সাময়িক ভাবে ভাগ্য বিমুখ হলেও সৌভাগ্য ক্ষুদিরামকে একেবারে বঞ্চিত করে নি। দেরেপুর থেকে বাস্তু তুলে কামারপুকুর গ্রামে নতুন করে গেরস্থালী পাতলেন সস্ত্রীক ক্ষুদিরাম, তাঁদের দুই শিশুপুত্র নিয়ে।

খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে দুই বিপরীত মেরুর মানুষের সান্নিধ্যে আসবার অভিজ্ঞতা হয়েছিল ক্ষুদিরামের। একদিকে নীচস্য নীচ রামানন্দ, অন্যদিকে মহানুভব সুখলাল। এর ফলে এক আশ্চর্য মিশ্র প্রতিক্রিয়া তাঁর জীবনে ঘটলো। কিছুতেই যেমন সুখলালের

মহানুভবতার প্রতি উদাসীন হতে পারলেন না, তেমনি পারলেন না রামানন্দকে অবিমিশ্র ঘৃণা করতে। বরং এই দুই বৈপরীত্য থেকে নতুন এক উদাসী ভাবনার জন্ম হলো তাঁর মনে। বন্ধুবৎসল কিছু সজ্জন মানুষের সান্নিধ্যে এসে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ততার আশ্বাস পেলেও, জীবন সম্পর্কে কিছু মহার্ঘ শিক্ষা তাঁকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিল। আশাবাদের বিভ্রম তাঁকে মতিচ্ছন্ন করে নি। তিনি বুঝেছিলেন, জগৎ সংসারের যা কিছু সুখসামগ্রী, তা সবই ক্ষণিক, অনিশ্চিত। তাই যা শাশ্বত চিরায়ত তার দিকেই ক্রমে-ক্রমে নিজেকে নিয়োজিত করতে লাগলেন। শ্রীরামচন্দ্রের সেবা ও আরাধনাই তাঁর জীবনের মুখ্য প্রেরণা হয়ে উঠলো।

অন্যদিকে লোভী ও চক্রান্তকারী রামানন্দ মরলো নিঃসন্তান অবস্থায়। এমন কি, যে সম্পত্তি ও অর্থলোভের জন্যে তার এই অখ্যাতি, সেটুকুও হাত-ফেরতা হয়ে চলে গেল অজ্ঞাতকুলশীলদের হাতে। দেরেপুর গ্রামের নামটুকুও ভারতবর্ষের আর পাঁচটি নগণ্য গ্রামের মতন শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মনের মধ্যে বেঁচে রইলো।

২

রামকৃষ্ণের জন্ম

কামারপুকুরে আসবার পর প্রথমে ক্ষুদিরাম ও পরে চন্দ্রার জীবনে বেশ কিছু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাব সঞ্চয় হয়েছিল। নানা স্বাদ ও বিচিত্রতায় ভরা এইসব অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা বারে-বারে কাহিনীর মধ্যে এসে পড়বে ব'লে শুরুতেই তা আলোচনা করে নিতে চাই।

অভিজ্ঞতা শব্দটি যখন আমরা প্রাথমিক অর্থে ব্যবহার করি, তখন, 'ব্যক্তিগতভাবে কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করা, তার মুখোমুখি হওয়া কিংবা তার সঙ্গে জড়িত থাকা', বোঝাই। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার যেটুকু দাম তা ব্যক্তিগত হবার জন্যেই; লোকপ্রবাদ, জনরব কিংবা পুঁথি বা সংবাদপত্র থেকে আহৃত জ্ঞানের চেয়ে তুলনামূলকভাবে তা অনেক কার্যকর। ঘটনার গুরুত্ব ব্যক্তিবিশেষকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে তারই উপর অভিজ্ঞতার মূল্যমান স্থির হয়।

আমরা যখন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করতে বলি তখন সে অভিজ্ঞতা কত-খানি ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিবিশেষের উপর তাব কতটুকু প্রভাব—এই দুই উপাদানের আলোচনাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার কথা কেউ বলেন তখন তার সত্যমিথ্যাব যাচাই কবা যায়। কারণ তেমন অভিজ্ঞতা আমাব আপনার সবলেব জীবনেই ঘটতে পারে। কিন্তু অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার কথা যখন কেউ বলেন তখনই আমার মনে সংশয় দেখা দেয়, কাবণ তেমন অভিজ্ঞতা আমাব জীবনে ঘটেনি ব'লে তার বর্ণনার সঙ্গে আমারটা মিলাতে পাবি না। তাই যতক্ষণ না ব্যক্তিবিশেষের সততা সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ হচ্ছি, যতক্ষণ না ভাবতে পারছি আমার কাছে কেউ মিথ্যাভাষণ করছেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বর্ণিত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কোনো দাম আমাব কাছে নেই। আমার অনেক পাঠকই জানেন যে, ঐশী অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে-শুনে তে মানুষ কী তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সেইসব কাহিনী সত্য ব'লে মানতে চেয়েছে কিন্তু পারে নি কারণ প্রত্যক্ষদর্শীকে সে চিরকালই অসাধু প্রতারক বলে জেনে এসেছে। মানুষের স্বভাব হলো নিজেকে প্রচার করা, যা জানি তার চেয়ে বেশি জানার ভান করা। এই ছলনাটুকুর জন্যেই হায়, গুরুরা অতিরঞ্জন করছেন জেনেও ক'জন শিষ্যই বা মোহমুক্ত হন?

সুতরাং সাধুসন্তদের জীবনের পাহাড়প্রমাণ অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার চেয়ে আপনার নিজস্ব অভিজ্ঞতার সামান্য সঞ্চয় আপনার কাছে অনেক মূল্যবান। ব্যক্তিগত এই সামান্য সঞ্চয়টুকু না থাকলে আপনার পক্ষে সাধুসন্তদের জীবনের অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিস্তার অনুমান করা সম্ভব হবে না।

অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার যথাযথ মূল্যায়ন হয়—কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে ব্যক্তিবিশেষ তাকে গ্রহণ করেছেন তার উপর। অর্থাৎ দেখা হয় অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যক্তির মনে সত্যিই কোনো প্রভাব পড়লো কি না। কোন্ ঘটনার সংঘাত থেকে অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার জন্ম হলো, সে বিচার

মূল্যহীন। কারণ তেমন অবস্থাকে আধ্যাত্মিক অবস্থা বলাও চলে না। যেমন, শারীরিক অসুস্থতা কিংবা চেতনানাশক কোনো মাদক সেবন করে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা—ইত্যাদি বাহ্যিক কারণে যখন অবস্থান্তর হয় তখন ঐশী দর্শনের ব্যাপারটি 'ভ্রম' বা 'প্রমাদ' মনে হতে পারে; যেহেতু এই দর্শন কোনো অধ্যাত্ম দর্শন নয়। কিন্তু যখন কোনো বাহ্যিক কারণে আমার অবস্থান্তর ঘটে নি, অর্থাৎ যখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ তখন যে-অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা, তার প্রভাব আমার উপর পড়বেই, আমার জীবনের চলার পথে কোনো না কোনোভাবে তার নির্দেশ থাকবেই।

এখন দেখা যাক, আধ্যাত্মিক বা ঐশী অভিজ্ঞতা বলতে কি বুঝি। ভাব বা সমাধি, অলৌকিক স্বপ্নদর্শন, দৈব প্রত্যাদেশ ইত্যাদি অবস্থাগুলি নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে নানারকম ধাঁধা। কারণ, প্রচলিত যে-সংজ্ঞা দিয়ে এই অবস্থাগুলি বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে তা অত্যন্ত শিথিল, দুর্বল। [এমনকি রজেট (Roget) সাহেবের প্রামাণিক শব্দকোষ 'থেসাউরাস'—(Thesaurus) গ্রন্থেও ঐশী দর্শনের সঙ্গে প্রমাদ বা ভ্রম সমার্থক হয়ে গেছে]। মোট কথা সংজ্ঞাগুলি ভাসা-ভাসা হওয়ার দরুন সাধারণ পাঠক ক্রমশই জড়বস্তুরেই সার সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্য থেকে বহুদূরে ছলনার ছায়াময় জগতের পশ্চাৎ-প্রদেশে নির্বাসন দিয়েছে আত্মাকে (স্পিরিট)। অবশ্য আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীর মতে জড়বস্তুও অলীক। একটা টেবলকে আমরা যে-রূপে প্রত্যক্ষ করি তার আনুপাতিক সত্যরূপ ঠিক তেমনটি নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের এই সতর্কীকরণ সত্ত্বেও আত্মা সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের ধারণা এতটুকু বদলায় নি। কারণ যাজকগণ তাদের যেমনটি লিখিয়েছেন এবং তাদের মনের কুঠুরিতে সেগুলি যেভাবে সাজানো হয়েছে তার ফলে মনে হবে আত্মাই (স্পিরিট) ধর্ম।

বস্তু ও আত্মার (Matter & Spirit) মধ্যে স্থূল দাগ টেনে তাদের আলাদা করার চেষ্টা হাজার বছর আগের হিন্দু দার্শনিকরা কিন্তু করেন নি। বরং বিষয়টির উপর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা প্রয়োগ করে বস্তুকেই বলেছেন ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে কেন্দ্র করে পর্যায়ক্রমে যে স্তর তারই বহির্বিকাশ হলো নিখিল ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্ম হলো বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্তা যার কোনো বৈলক্ষণ্য ঘটে না। কিন্তু প্রতিটি স্তর প্রগতির এক একটি পৃথক ধাপ বা ক্রম, তাই বাহ্যবিশ্বাসে এক মনে হয় বহু।

একথা বলা হয় যে, ক্রমবিকাশের প্রেরণা হলেন ঈশ্বর। প্রচলিত মতে ঈশ্বর ও ভগবান এক। ভগবান, অর্থাৎ যিনি সর্বগুণের আকর। তিনি প্রেমময়, ক্ষমাসুন্দর ও ন্যায়নিষ্ঠ। ব্রহ্ম যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন তাই সেখানে কোনো আরোপণ চলে না। তিনি গুণ ও কর্মের অতীত। ব্রহ্মের অন্তর্নিহিত শক্তি হলো ঈশ্বর। এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ কর্মের শক্তি ঈশ্বরই। ঈশ্বরকে স্রষ্টা বললে ব্রহ্ম থেকে আলাদা সত্তা বোঝায় না। কারণ আগুন থেকে যেমন তাপকে আলাদা করা যায় না তেমনি ব্রহ্ম থেকেও ব্রহ্মের শক্তি ঈশ্বরকে আলাদা করা যায় না।

ব্রহ্মের শক্তির মূল ভিত্তি হলো মন ও বস্তু। ব্রহ্মশক্তিকেই 'প্রকৃতি' বা 'মায়া' বলা হয়। সাধারণ ধারণায় মায়া 'অলীক'। কিন্তু ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত শিথিল বলে এই অর্থ আমাদের বিভ্রান্ত করে। মায়া তখনই 'ভ্রম' যখন তা আপেক্ষিক। যেমন, যখন বলি, মায়াময় এই নিখিল বিশ্ব অনিত্য এবং ব্রহ্মসত্য থেকে পৃথক, তখন তা ভ্রম।

হিন্দুদর্শনে ক্রমবিকাশের ধারাটি এইরকম। প্রকৃতির অভিব্যক্তি 'মহৎ'। মেধার মূলে হলো 'মহৎ'। 'মহৎ' থেকেই 'বুদ্ধির' প্রকাশ। বুদ্ধি থেকেই মানুষের বস্তুচেতনা উদ্বুদ্ধ হয় —বস্তুর গুণানুসারে তাদের শ্রেণীভাগ করার দক্ষতাও দেয় 'বুদ্ধি'। আবার বুদ্ধি থেকেই অহঙ্কার, অহঙ্কারের সৃষ্টি! অহঙ্কার থেকেই বাহ্যবস্তু। স্থূল-সূক্ষ্ম এই দুই সত্তার অনুভবক্ষমতা মানুষের জন্মায়।

স্তরগুলি হলো অজ্ঞানতার এক একটি ধাপ, যা ব্রহ্মকে আড়াল করে রেখেছে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এই বস্তুজগৎ হলো অজ্ঞানতার স্থূল প্রকাশ কারণ সেই বস্তুজগৎ ব্রহ্মলাভের পথে কঠিনতম অন্তরায়।

বস্তু ও আত্মা বিচ্ছিন্ন নয় বরং তারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আত্মা থেকেই বস্তু উদ্ভূত, ব্যবধান যেটুকু তা মাত্রার। এই সত্য তখনই প্রকাশ পায় যখন ধ্যানমগ্ন মন অন্তর্মুখী ব্যাকুলতায় ব্রহ্মসত্যে পৌঁছানোর সাধনা করে। ঐহিক জগতের স্থূল উপাদানের গভীরেই আছে আর এক আধিদৈবিক (সাইকিক্) জগৎ। এখানেই অন্তর্ভূত হয়ে আছে বস্তুর আত্মা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে বস্তুজগৎ, সেই জগতেই আরোপিত হয়ে আছে আধিদৈবিক জগৎ। তবে সচরাচর এই জগৎ আমাদের সামনে প্রতীয়মান হয় না ; এমনকি আমাদের কাজকর্ম চিন্তাধারাতেও এই আধিদৈবিক জগতের কোনো প্রভাব পড়ে না। আধুনিক পরিভাষার আশ্রয় নিয়ে বলা যায় এই জগতের অস্তিত্ব ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন শব্দ তরঙ্গে।

যতক্ষণ আমরা জেগে থাকি ততক্ষণই আমরা বস্তুজগতের স্বাদ পাই। আধিদৈবিক যে জগৎ তার স্বাদও আমরা জাগ্রত অবস্থায় বা স্বপ্নের ঘোরে পেতে পারি যদি তেমন অবস্থা সৃষ্টি করি। অর্থাৎ কৃচ্ছ্রসাধন, তীব্র মনঃসংযোগ কিংবা মাদক সেবনের দ্বারা চেতনাকে আচ্ছন্ন করাই হলো তেমন অবস্থা সৃষ্টি করা। জড়বাদী ও আধিদৈবিক জগতের পারে অধ্যাত্ম জগতের অস্তিত্ব। মন যখন সে জগতে প্রবেশ করে তখন সে অন্য অনুভূতি। অধ্যাত্ম এই অনুভূতির এক চিরায়ত মহিমা আছে। এ স্বাদ যে পেয়েছে সেই মজেছে। আধিদৈবিক দর্শন যত নিপুণ বা চমকপ্রদ হোক না কেন, মানুষের মনের বদল সে করতে পারে না। ভাব বা সমাধিমগ্ন সাধক যা দর্শন করেন সেই দৃশ্যবস্তুতে কোনো বিরোধ থাকে না, তার কোনো বদলও হয় না। যেমন ধরুন, আপনার কল্পনায় যীশুর যে-মূর্তিই আঁকুন না কেন আর পাঁচজন ভক্তের কাছে তিনি যে মূর্তিতে দর্শন দিয়েছেন আপনার কাছেও তিনি সেই মূর্তিতেই আবির্ভূত হবেন। আধিদৈবিক দর্শন কোনো তন্ময় ভাবময়তায় আপনার মন আপ্লুত করবে না। বরং তখন সেই অভিজ্ঞতা আপনাকে ভীত বা নিরাশ করতে পারে। কিন্তু অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা থাকে এক তীব্র আনন্দানুভূতি। আধিদৈবিক স্বপ্নদর্শনের সময় মানুষ তার জড়বাদী অস্তিত্ব ও পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে ; ফলে সেই অবস্থায় যদি কোনো প্রেতচ্ছায়া মানুষ বা প্রাণীর বাহ্যমূর্তিতে চোখের উপর ভেসে ওঠে তাহলে প্রথম দর্শনে তাকে মানুষ বা প্রাণী বলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

সংস্কৃত ভাষায় যাকে সমাধি বলে, চেতনার সেই অত্যুচ্চ মার্গেই নিবিড়তম অধ্যাত্মঅভিজ্ঞতার আস্বাদন হয়। সমাধি এমন এক অবস্থা যা জেগে থাকা নয়, আবার নিদ্রামগ্ন হওয়া বা স্বপ্নঘোরের মধ্যে পতিত হওয়াও নয়। একে বলা হয়েছে বাহ্যজ্ঞানসম্পন্ন এক অতিচেতন অবস্থা। সমাধিমগ্ন অবস্থায় মানুষ পরম আত্মার সংগে একাত্ম হয়ে যায়—জানতে পারে

তার প্রকৃত সত্তাকে।

ক্ষুদিরামের জীবনে প্রথম যে-অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা বা জ্যোতিদর্শন হয় তা অনেকটা এই রকম :

একদিন কাছাকাছি এক গ্রাম থেকে ফেরার পথে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ক্ষুদিরাম। ডালপালা ছড়ানো ছায়াঘেরা এক গাছের নিচে বিশ্রাম নিতে বসেছেন। শান্ত পরিবেশ। ধীরে-ধীরে বাতাস বইছে। মুহূর্তেই অবসন্ন দেহমন জুড়িয়ে গেল। গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

নিদ্রিত অবস্থায় যখন কোনো দৃশ্যদর্শন হয় তখন তাকে সাধারণ স্বপ্নদর্শন বলা যায় না। কারণ জাগ্রত অবস্থায় কোনো ঘটনার চেয়েও সে দৃশ্যবস্তু আরও প্রত্যক্ষ বলে সেটি জীবনের এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। স্বপ্নে ক্ষুদিরাম তাঁর উপাস্য দেবতা শ্রীরামচন্দ্রকে এক দিব্যভাবসমৃদ্ধ বালকবেশে দেখতে পেলেন। কচি দূর্বা ঘাসের শিষের মতন তাঁর গায়ের বর্ণ। হাত দিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে কিশোর রঘুবীর বললেন, 'কত-দিন হয়ে গেল ওখানে পড়ে আছি ; কেউ খেতে দেয় না, যত্ন করে না। আমায় তোমার ঘরে নিয়ে যাও ; তোমার হাতের সেবা নিতে আমার বড্ড লোভ।'

ক্ষুদিরাম তটস্থ। বারবার গড় করছেন আর বলছেন, 'আমি যে বড় গরিব ঠাকুর! আমার ভক্তি যে বড় কম ! কি দিয়ে তোমার সেবা করবো ? যদি বিফল হই, তোমার করুণা থেকে বঞ্চিত হই, তখন তুমি যে মুখ ফিরিয়ে নেবে ঠাকুর ! কেন তবে এমন করে আমার কাছে আসতে চাইছ ?'

কিন্তু বালকবেশী রঘুবীর আশ্বস্ত করলেন ক্ষুদিরামকে। বললেন, 'ভয় কি ! যেমন পারবে তেমনি করেই সেবা করবে। দোষ প্রত্যবায় কিছু দেখবো না। শুধু এখান থেকে আমায় তুলে নিয়ে যাও।' ধড়মড় করে উঠে বসলেন ক্ষুদিরাম। তাঁর দুচোখ বেয়ে তখন আনন্দাশ্রু বইছিল।

একবার দেখেই চিনতে পারলেন জায়গাটা। পাশেই পড়ে আছে একখণ্ড শালগ্রামশিলা। আর ফণা উঁচিয়ে প্রহরারত হয়ে বসে আছে ভীষণদর্শন এক গোখরো সাপ। (মাপে ও গড়নে শালগ্রামশিলা দেখতে অনেকটা কুল ফলের মতন। নুড়ির গায়ে এক বা একাধিক ছিদ্র আর এমন কিছু পরিচয় চিহ্ন থাকে যা দেখে শিলাখণ্ড চিনতে হয়। নুড়ির যে গঠন-বৈশিষ্ট্য তা প্রাকৃতিক নিয়মেই সৃষ্টি হয়। গঙ্গার উপনদী গণ্ডকী-গর্ভে সাধারণত এই শিলাখণ্ড পাওয়া যায়। ক্ষুদিরাম ধানখেতের মধ্যে যে এই শালগ্রামশিলা কুড়িয়ে পেয়ে-ছিলেন তার জন্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ যে কোনো ভক্তপথিক বিষ্ণুমূর্তি জ্ঞানে এই কীটছিদ্রিত গণ্ডকীশিলা পূজার জন্যে সেখানে ব'য়ে আনতে পারতেন।)

জ্যোতিদর্শনের আলো তখনও লেগে ছিল ক্ষুদিরামের চোখে। তাই ভীষণ-দর্শন গোখরো সাপ দেখেও ভয়-ত্রাস তাঁর কিছুই হলো না। হাত বাড়িয়ে দিলেন শালগ্রাম শিলাখণ্ডটির দিকে। সাপটিও ফণা নামিয়ে একটা গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিল। পবিত্র শিলাখণ্ড বুকে তুলে নিলেন ক্ষুদিরাম, তারপর ঘরে এনে পূর্ণ মর্যাদায় তাঁকে প্রতিষ্ঠা করলেন। এমনি করেই স্বপ্নের বালক রঘুবীর তাঁর ঘরের অতিথি হলেন।

সেবা ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে ভেবে যে আশঙ্কা ক্ষুদিরামের হয়েছিল তার মধ্যে কোনো

অত্যুক্তি ছিল না। তখন চরম টানাটানির মধ্যে তাঁর সংসার চলছে। এমন দিনও গেছে যেদিন নিজেদেরই খাবার জোটে নি, রঘুবীরের সেবা কি দিয়ে করবেন! চন্দ্রার তো মাথায় হাত। ব্রাহ্মণীকে ক্ষুদিরামই বোঝালেন, 'ভাবছো কেন! নারায়ণ নিজেই যদি উপোসী থাকতে চান তো আমরাও তাঁর সঙ্গে উপোস করবো?' অবশ্য এই আর্থিক দৈন্য বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। সুখলালের প্রদত্ত জমিটুকুর কল্যাণে অচিরেই আর্থিক সুরাহা হলো। জমিটুকু সত্যিই খুবই উৎকৃষ্ট মানের ছিল। তাই দেখাশোনা যত্ন-আত্তির অভাব সত্ত্বেও সেটি ফলপ্রসূ হ'য়ে রইল। আর সংসার-অনভিজ্ঞ ক্ষুদিরামের সময়ই বা কোথায় যে, দেখাশোনা করেন! দেবপ্রতিম এই মানুষটিকে গ্রামের সবাই সত্যিই বড় ভক্তিশ্রদ্ধা করতো। পুকুরের যে-ঘাটে তিনি স্নান করতে যেতেন, গ্রামের মানুষ সে ঘাট তাঁর ব্যবহারের জন্যেই ছেড়ে দিত। ক্ষুদিরামকে তারা যেমন শ্রদ্ধাভক্তি করতো চন্দ্রাকে তেমনি তারা ভালবাসতো। তাদের সব আপদবিপদে পাশে এসে দাঁড়াতেন চন্দ্রা। শুধু সহানুভূতি নয়, সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়েই তিনি আসতেন। বেশ কয়েকবছর পরে পূজ্যপাদ জনকজননী সম্পর্কে রামকৃষ্ণ বলেছেন: 'আমার মা ছিলেন যথার্থই পুণ্যবতী; মনটি ছিল সরল নিষ্পাপ। সংসারের ঘোরপ্যাঁচ একেবারেই বুঝতেন না। ছলনার আশ্রয় নিয়ে মনের কথা ঢাকতে জানতেন না। যা মনে আসতো নিঃসঙ্কোচে বলে ফেলতেন। বাবা ছিলেন সত্যিকার ভক্ত। সারাবেলা পুজোআচ্চা নিয়ে কাটাতেন। চোখ বুজে যখন ধ্যান করতেন, নামজপ করতেন, তখন ফুলে-ফুলে উঠতো তাঁর বুক, এক দিব্য আভায় তা ঝলমল করতো। দুচোখ বেয়ে অঝোরে জল ঝরতো। অবসর সময়ে যখন পুজোআচ্চা থাকতো না তখন ঠাকুরের জন্যে মালা গাঁথতেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ তাঁকে মুনিঋষির মতন ভক্তি করতো।'

আগেই বলেছি যে, ক্ষুদিরাম আর চন্দ্রা যখন কামারপুকুরে এলেন তখন তাঁদের দুই সন্তান। বড়টি পুত্র, রামকুমার, জন্ম ১৮০৫ সাল; আর ছোটটি কন্যা কাত্যায়নী, জন্ম ১৮১০ সাল। কামারপুকুরে আসবার বারো বছর পরে আর এক পুত্রের জননী হলেন চন্দ্রা। ছেলের নাম রাখা হলো রামেশ্বর। তারপর দ্বিতীয় কন্যা সর্বমঙ্গলার জন্ম হলো ১৮৩৯ সালে। এই চার ভাইবোনই রামকৃষ্ণের অগ্রজ। অবশ্য রামকৃষ্ণের পরবর্তী জীবনে জ্যেষ্ঠ রামকুমারের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাই পাঠকদের মনে রাখার সুবিধার জন্যে আমি তাঁর প্রসঙ্গই উল্লেখ করবো।

রামকৃষ্ণ ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর; তাই তাঁর নিকটতম সব আত্মীয়দের মধ্যেই আধ্যাত্মিক উচ্চভাবের লক্ষণ দেখা যায়। এঁদের মধ্যে রামকুমার ছিলেন বিশিষ্ট। পিতৃদেবের গভীর অধ্যাত্মবিশ্বাসের সংগে যুক্ত হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত পার্থিব বিষয়ের জ্ঞান; তাই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সকলের ভরণপোষণের ভার তাঁকেই নিতে হয়। তিনি ছিলেন সত্যিকারের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা এত নিপুণ ছিল যে, অনেকের ধর্মবিষয়ক নানা সমস্যার সমাধান করেও তিনি রুজিরোজগার করতেন। আর এক গূঢ় বিদ্যায় রামকুমার পারদর্শী ছিলেন। শান্তি স্বস্ত্যয়নের মাধ্যমে তিনি অনেক মানুষের দুর্ভাগ্য ও আধিব্যাধির উপশম করে দিতে পারতেন। অধ্যাত্মজীবনের কঠোর নিয়মবিধি ও সংযম পালন করে রামকুমার এই অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। এই ক্ষমতা প্রয়োগে অদৃষ্টপূর্ব অনেক ঘটনা কিংবা আপাতসুস্থ মানুষের অনেক অলক্ষ্য ব্যাধির কথা পূর্বাহ্নেই তিনি বলে দিতে পারতেন। বলতে গেলে, এমন অনেক ঘটনার কথা পূর্বাহ্নে জানিয়ে রাম-

কুমার চমকসৃষ্টি করেছেন বহুবার।
এমনি এক ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি। একবার কর্মব্যপদেশে রামকুমারকে কলকাতায় আসতে হয়েছিল। একদিন গঙ্গার ঘাটে এসেছেন স্নান করতে। একজন ধনীও এসেছেন সস্ত্রীক। হিন্দুর কাছে গঙ্গাস্নান এক পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রশ্নটি এখানে গৌণ। তাই বাড়ির মধ্যে স্নানাগারের সব আয়োজন থাকলেও পুণ্যার্জন করতে হিন্দু গঙ্গাস্নান করে। যাহোক, পারিবারিক আবরু বজায় রাখতে ধনী মহিলা ডুলির মধ্যে বসে ছিলেন। একসময় বাহকরা ডুলিখানি গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়ে দিল। ডুলির মধ্যে বসেই মহিলা স্নান সারতে লাগলেন। রামকুমার একে বালক তায় গ্রামের ছেলে। অকারণ লজ্জা পাবার অবকাশ গ্রামের খোলামেলা জীবনযাত্রায় নেই। তাই সমস্ত ব্যাপারটাই তাঁর কাছে অদ্ভুত এবং বিচিত্র মনে হয়েছিল। অবাক হয়েই তিনি শিবিকার দিকে তাকিয়েছিলেন। তখন চকিতেই মহিলার সুন্দর মুখখানি তাঁর নজরে পড়ল। এক ঝলক দেখেই হায় হায় করে উঠল তাঁর মন। অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে, পরদিনই মহিলাটির জীবনান্ত হতে চলেছে। দুঃখে বেদনায় রামকুমার এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, আপন মনে নিজেকে শোনাতেই যেন বলে উঠলেন ; 'যে দেহখানি সকলের চোখের আড়ালে রাখতে আজ এত চেষ্টা, কাল তো সেটিই শববাহিত অবস্থায় সকলের চোখের সামনে দিয়েই এখানে এসে পৌঁছবে !'
রামকুমারের আত্মকথন মহিলার স্বামী শুনতে পেলেন। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন তিনি। মনে মনে ঠিক করলেন যে গণনা মিথ্যে হ'লে নবীন গণৎকারকে উচিত শিক্ষা দেবেন। তাই অনেক অনুরোধ উপরোধ করে রামকুমারকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু রামকুমারের গণনা মিথ্যে হয় নি। সেই রাত্তিরেই সুস্থ স্বাস্থ্যবতী মহিলার জীবনান্ত হলো।
প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েই যে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হবে, এ কথাও রামকুমার আগে থেকে জেনেছিলেন। তবে তাঁর পত্নীর দীর্ঘদিন কোনো সন্তানসম্ভাবনা হয় নি ব'লে এ ব্যাপারে তিনি একটু নিশ্চিন্ত ছিলেন। এক্ষেত্রেও গণনা মিথ্যে হয় নি। ১৮৪৯ সালে, স্ত্রীর বয়স যখন মাত্র পঁয়ত্রিশ তখন পুত্র অক্ষয়কে জন্ম দিয়েই মায়ের মৃত্যু হয়। ঘটনাটি অনেক পরের এবং তাই এ কাহিনীর শেষ দিকে আমরা অক্ষয়ের সঙ্গে পরিচিত হবো।
তীর্থভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা সব হিন্দুরই হয়, ক্ষুদিরামেরও হয়েছিল। ১৮২৪ সালে প্রায় এক বছর ধরে সারা দক্ষিণ ভারতের সব তীর্থ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। সব শেষে এলেন গয়াধাম। ১৮৩৫ সাল, তখন তাঁর বয়স ষাট। চেহারাখানা রোগা হলেও শারীরিক অসুস্থতা ছিল না। সুতরাং পায়ে হেঁটে তীর্থ ভ্রমণের ধকল তিনি সইতে পেরেছিলেন।
গয়াধাম যুগল তীর্থ। শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম ধারণ করে এই ধাম মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। ঈশ্বরের ত্রয়ী রূপের বিকাশ হয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কল্পনায়। মহাতীর্থ গয়াধাম হলো সেই ত্রয়ী রূপের দ্বিতীয় দেবতা শ্রীবিষ্ণুর ক্ষেত্র। এ হলো একদিক। অন্য বিচারেও গয়াধাম মহাতীর্থ, কারণ গয়াধামের কয়েক মাইল দূরেই আছে সেই বোধিবৃক্ষ যার তলায় ধ্যানে বসে বুদ্ধত্ব অর্জন করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ।
ক্ষুদিরাম প্রায় এক মাসকাল গয়াতীর্থে ছিলেন। সেই সময় চারধারের পাহাড় আর

সমতলের বিভিন্ন মন্দির দেবালয় দর্শন শেষ করে এলেন সেই বিষ্ণু মন্দিরে যেখানে শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম সযত্নে ধারণ করা আছে। এই বিষ্ণু মন্দিরেই পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে যথাশাস্ত্র পিণ্ডদান-কাজ সম্পন্ন করলেন ক্ষুদিরাম।

যেদিন পিণ্ডদান করলেন সেই রাত্তিরেই ক্ষুদিরাম এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। যেন বিষ্ণু মন্দিরে তিনি পিণ্ডদান করছেন আর পূর্বপুরুষরা হৃষ্ট মনে সে দান গ্রহণ ক'রে তাঁকে আশীর্বাদ করছেন। এরপর তাঁরা সসম্ভ্রমে সিংহাসনে সুখাসীন শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা শুরু করলেন। সেই পরম জ্যোতির্ময়পুরুষ তখন প্রসন্ন দৃষ্টিতে ক্ষুদিরামের দিকে তাকালেন। ইঙ্গিতে তাঁকে কাছে ডেকে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন : "ক্ষুদিরাম, তোমার ভক্তিতে পরম প্রীত হয়েছি। পৃথিবীতে আবির্ভাবের সময় আমার এসে গেছে। তোমার ঘরে তোমার ছেলে হ'য়ে আমি জন্ম নেবো।'

ক্ষুদিরাম কুণ্ঠিত, অপ্রস্তুত। এ যেন আশাতিরিক্ত কৃপা। কিন্তু অতি দীন তিনি। এতবড় কৃপা গ্রহণ করার যোগ্যতা তাঁর কি হবে? সুতরাং বিষ্ণু যেন তাঁকে ক্ষমা করেন। প্রসন্ন হেসে বিষ্ণু বললেন, 'ভয় পেও না ক্ষুদিরাম। ক্ষুদ-কুঁড়ো যা পাবে তাই দিয়েই আমার সেবা ক'রো। তাতেই আমি খুশি হবো।' ঘুম ভেঙে গেল ক্ষুদিরামের। তিনি নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে, এই দৈব প্রত্যাদেশ তাঁর জীবনের এক পরম প্রাপ্তির ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যিনি নিয়ন্তা তিনিই জন্মগ্রহণ করতে আসছেন তাঁর কুটীরে। বলাবাহুল্য দৈব স্বপ্নের এই ঘটনাটি কাউকে জানালেন না ক্ষুদিরাম। কয়েকদিন পরেই গয়াধাম থেকে যাত্রা করে সোজা গিয়ে পেঁছিলেন কামারপুকুর। সময়টা তখন এপ্রিলের শেষ। কামার-পুকুরে ফিরে এসে চন্দ্রাকে এক অনন্য মাতৃমূর্তিতে আবিষ্কার করলেন ক্ষুদিরাম।

করুণাময়ী চন্দ্রার মন সকলের জন্যেই কাতর। কে কোথায় অভুক্ত, কে কোথায় মাতৃস্নেহ বঞ্চিত—সকলের জন্যেই তাঁর সমান উৎকণ্ঠা। প্রিয় অপ্রিয় ভেদ নেই, আপন-পর বিচার নেই, সকলের কাছেই তিনি মমতাময়ী মাতৃরূপিণী। তাঁর কাছে কেউ অনধিকারী নয়।

ক্ষুদিরাম যখন গয়াধাম তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন, তখন চন্দ্রার জীবনেও কিছু আশ্চর্য অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছিল। স্বামীর কাছে একদিন সেইসব কথাই বলছিলেন চন্দ্রা। 'দেখ, তুমি যখন গয়া গিয়েছিলে তখন একদিন রাত্তিরে ভারি অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলুম। মনে হলো, তুমি এসে আমায় জড়িয়ে ধরে আদর করছো। আমার তখন খুব আনন্দ হচ্ছিল। কিন্তু মুখখানার দিকে তাকিয়ে মনে হলো এ তো তোমার মুখ নয়! কোনো মানুষেরই মুখ নয় তো। সে মুখ ভগবানের মুখের মতন আলো ঝলমল। আমি তখন চীৎকার ক'রে উঠলুম, প্রাণপণে তোমার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলুম। তখনই ঘুম ভেঙে গেল। দেখলুম ঘরে আমি একা। ভয়ে তখন থরথর করে কাঁপছি। বারবার ভাববার চেষ্টা করতে লাগলুম, সে কে যে আমায় জড়িয়ে ধরেছিল? মানুষ না হ'লে মানুষের বেশে সে কি ভগবান? আবার মনে হলো ভগবান কি এমন ক'রে মানুষের চেহারা নিয়ে কখনও দেখা দেন? তবে বুঝি কোনো দুষ্ট লোক মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে আমার ঘরে ঢুকেছিল। ধড়মড় করে উঠে প্রদীপ জ্বাললুম। কোথায় কে? ঘরের দরজা তো ভেতর থেকেই হুড়কো দেওয়া! আতঙ্কে বাকি রাতটুকু জেগেই কাটিয়ে দিলুম। ভোর হতেই ধনী কামারণী আর প্রসন্নকে ডেকে পাঠালুম। সব কথা খুলে বললুম, তারপর জিজ্ঞেস করলুম, 'হ্যাঁরে!

সত্যি কি কেউ আমার ঘরে ঢুকেছিল ? কিন্তু আমার সঙ্গে তো কারুর ঝগড়া নেই ?' ওরা শুনে হাসতে লাগল তারপর ধমক দিয়ে বললো, "মর্ মাগী, বুড়োবয়সে কি তুই পাগল হলি যে, স্বপ্ন দেখে এমন চলাচ্ছিস ? লোকের কাছে এমন ক'রে বলিস নি, তোর নামে নিন্দে রটবে।" তা ওদের কথা শুনে আমি ভাবলুম, বুঝি-বা সেদিন স্বপ্নই দেখেছিলুম। মনে মনে ঠিক করলুম, এসব কথা আর কাউকে বলবো না, শুধু তুমি ফিরে এলে তোমায় বলবো।'

স্বপ্ন দেখার ঘটনার বেশ কয়েকদিন পরের কথা। সকালবেলা ;—শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ধনীর সঙ্গে গল্প করছিলেন চন্দ্রা। গম্বুজাকৃতি এই ছোট্ট দেবস্থানটিকে ঠিক মন্দির বলা যায় না। গর্ভঘরটি এত ছোট যে একসঙ্গে ছ'জনের বেশি ভক্তের স্থান সঙ্কুলান সেখানে হয় না। (ক্ষুদিরামেব কুটীরেব উল্টোদিকের এই মন্দিরটি আজও দাঁড়িয়ে আছে)।

ঘটনার কথাটা স্বামীর কাছে এইভাবেই বলেছিলেন চন্দ্রা। 'হঠাৎ দেখলুম মহাদেবের শ্রীঅঙ্গে যেন প্রাণসঞ্চাব হলো। তারপর শ্রীঅঙ্গ থেকে ঢেউয়ের মতন দিব্যজ্যোতি বার হতে লাগলো। প্রথমে খুব মৃদু তারপর অত্যন্ত দ্রুত সেই জ্যোতি ছেয়ে ফেললো সারা মন্দির। ক্রমে বন্যার মতন সেই জ্যোতি মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে গ্রাস করলো। আমার শরীবের ভেতরে বাইরে তখন সেই আলোর বন্যা, তার মধ্যেই যেন হারিয়ে গেলুম আমি। কথাটা ধনীকে বলবো ভাবছি, কি যেন হলো আমার, মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললুম। জ্ঞান ফিরলে ধনীকে সব কথা বলেছিলুম। কিন্তু বিশ্বাস করেনি সে। বরং বলেছিল, আমার নাকি বায়ুরোগ হয়েছে। কিন্তু মোটেই তা না। সেই থেকে আমি দিব্যি ভাল আছি, মনের আনন্দে আছি। শুধু বুঝতে পারি শরীরের মধ্যে সেই জ্যোতিটা এখনও রয়েছে। বুঝতে পারি পেটে আমার ছেলে আসছে।'

ক্ষুদিরামও তখন চন্দ্রাকে গয়াধামে দেখা স্বপ্নের কথা শোনালেন। তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, এসব দৈবদর্শন কোনো স্থূল খেয়ালখুশির ফল নয়। নিশ্চয়ই এ এক পরম-প্রাপ্তির পুণ্যযোগ, যা ঘটতে চলেছে তাঁদের জীবনে। ক্রমে, কয়েক মাসের মধ্যেই কামারপুকুরের সবাই জানলো যে চন্দ্রা অন্তর্বত্নী হয়েছেন ; তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ। গর্ভধারণ করে অনুপম দেহসুষমা আর রূপলাবণ্যে অপরূপা হয়ে উঠলেন চন্দ্রা। হাঁ করে সবাই চেয়ে দেখতো সেই স্বর্গীয় রূপ। আবার মনে মনে অনেকে শঙ্কিত হয়ে ভাবতো, এ সব দুর্লক্ষণ নয় তো ! প্রসবান্তে চন্দ্রার মৃত্যু হবে না তো !

চন্দ্রার জীবনে তখন দিব্যদর্শনের জোয়ার লেগেছে। ঘনঘন স্বপ্নদর্শনের মধ্যে জ্যোতির্ময় পুরুষ আবির্ভূত হচ্ছেন। প্রায় নিত্যই ঘটছে এই লীলা। শুধু দেখা নয়, কখনও কানে লাগছে তাঁদের মধুর দৈববাণী। কখনও আঘ্রাণ পাচ্ছেন তাঁদের শ্রীঅঙ্গনিঃসৃত সুবাস। কখনও বা দেবদেবীর ছন্দোময় নূপুরনিক্কণ ভরিয়ে দিচ্ছে তাঁর শ্রুতি। তিনি বেশ বুঝতে পার-ছিলেন যে, ধীরে ধীরে একটা বড় রকমের বদলের কাজ ঘটে যাচ্ছে তাঁর জীবনে। দেবসন্দর্শনের সেই ভয় ব্যাকুলতা আর নেই। বরং দেবদেবীদের প্রতি মাতৃস্নেহের এক অপূর্ব সুধারস আশ্রিত হয়েছে তাঁর অন্তরে। সে স্নেহধারা ক্ষরিত হচ্ছে অপত্যনির্বিশেষে ; গর্ভের সন্তানদের চেয়েও এইসব দেবদেবীরা এখন তাঁর কাছে প্রিয়তম। স্বামীকে মাঝে মাঝেই দিব্যদর্শনের কথা শোনাতেন। বলতেন, 'জানো, আজ দেখি হাঁসে চড়ে এক ঠাকুর আমার দিকে উড়ে

আসছেন। চমকে উঠেছিলুম প্রথমে। পরে ভালো করে ঠাহর করে দেখি যে, রোদের তাপে বাছার মুখখানি রক্তবর্ণ হয়ে গেছে। হাত নেড়ে তাকে ডাকলুম, বললুম, "আয়। রোদে ঘুরে ঘুরে হা ক্লান্ত হয়ে গেচিস। ঘরে চাট্টি আমানি পান্তা আছে। কাল রেঁধেছিলুম। বেড়ে দি, খা। শরীরটা জুড়োক।" তা বাছা ম্লান মুখখানি তুলে আমার কথা শুনে একটু হাসলো, তারপর কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। পরে তাকে দেখতে পেলুম না।'

স্বপ্নদর্শনের এইসব অপ্রাকৃত প্রত্যাশার ব্যাপারগুলি পাশ্চাত্যের জড়বাদী মানুষ, এমন কি যাঁরা রামকৃষ্ণের পরম ভক্ত তাঁরাও অবিশ্বাস্য বলে মনে করেন। রোঁমা রোঁলা তো সমস্ত ব্যাপারটিকেই ইচ্ছাপূরণের গল্পকথা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ম্যাক্স ম্যুলারের মন্তব্য আরও তির্যক ; তিনি বললেন, এর উৎপত্তি হয়েছে 'গুণমুগ্ধ ভক্তদের মধ্যে রামকৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতা প্রতিপন্ন করার অদম্য ঝোঁক থেকে ; পরে ভক্তদের মুখে মুখে কথাচ্ছলে এটির প্রচার হয়ে যায়।

অলৌকিক কাহিনীর আবেদন অনেক ব্যাপক ব'লে মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি স্বাভাবিক ভাবেই এইসব কাহিনীর মধ্যেই প্রকাশ পায়। বুদ্ধের জীবনেতিহাসের সঙ্গে জুড়ে আছে এমন অজস্র অপ্রাকৃত লোককাহিনী, কিন্তু তার জন্যে আমাদের শ্রদ্ধার আসনে বুদ্ধের স্থান এতটুকু খাটো হয়নি। ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রার ঘটনাটি অবশ্য অন্যরকম ; সেইভাবেই তার আলোচনা হওয়া উচিত।

কিংবদন্তী গড়ে উঠতে সময় নেয় এবং বংশপরম্পরায় জমে ওঠা এইসব লোককাহিনী একসময় ইতিহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। তখন একজন সচেতন ঐতিহাসিককেও এইসব কাহিনী মেনে নিতে হয়—তিনি নিজেও কিছু সংযোজন করেন কাহিনীর সঙ্গে। কিন্তু কিংবদন্তীর কাহিনী নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি না। কাহিনী কতটুকু সত্য আর কতটুকুই বা কল্পিত সেটুকুই আমরা দেখবো। মিথ্যা বা কল্পিত কিছু থাকলে বলবো সেদিন যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁরাই অসৎ-উদ্দেশে এগুলি প্রচার করেছিলেন। অনৃতভাষণ যে আধ্যাত্মিক সাধনার পরিপন্থী এবং হীন পাপাচার তা জেনেও এই বিষ সেদিন তাঁরা পান করেছিলেন।

খুব স্পষ্ট না হলেও পরোক্ষভাবে রামকৃষ্ণের জীবনাবসানের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ইতিহাস বিকৃত করার দায় বিবেকানন্দসহ রামকৃষ্ণের প্রথমসারির ভক্তের দলের কাঁধেই চাপিয়ে দেন ম্যাক্সম্যুলার। অথচ বিবেকানন্দকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। এখন প্রশ্ন হলো ভক্তবৃন্দ এমন কাজ করলেন কেন ? ধরে নিচ্ছি তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আয়োজনের ঘনঘটায় রামকৃষ্ণকেও নাজারেথের অধিবাসী যীশুর মতন অতিমানব বা স্বয়ং ঈশ্বর বলে প্রমাণ করা। এই কাহিনীর শেষ দিকে বিবেকানন্দকে আমরা জড়বাদী শিক্ষায় শিক্ষিত কলকাতার কলেজে-পড়া একজন নাস্তিক যুবকরূপে দেখেছি। অপ্রাকৃত বা অলীক কিছু মেনে নেবার আগে তিনি মাথাকুটে তার সত্যতা যাচাই করতেন। এমন কি পরবর্তীকালে যখন তিনি রামকৃষ্ণের একজন পরম ভক্ত, অবিশ্বাসের ব্যাপারগুলো যখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ধাক্কায় নড়বড়ে শিথিল হয়ে এসেছে, তখনও অন্ধভাবে কোনো বিশ্বাসকে মেনে নিতে তিনি সকলকে নিরুৎসাহ করেছেন। জনে জনে বলে বেড়িয়েছেন সত্যকে গ্রহণ করার আগে যেন তাকে যাচাই করে নেওয়া হয়। বার বার দৃঢ়ভাবে যা বলে গেছেন তাতে রামকৃষ্ণ অবতার হলেন কি হলেন না কিছু যায়

আসে না। তেমন মানুষকে কি সত্যের অপলাপকারী ব'লে অভিযুক্ত করতে পারি?

ধর্মীয় প্রথানুযায়ী হিন্দুর আঁতুড়ঘর দশদিন পর্যন্ত অশুচি থাকে, সেইসময় কোনো মানুষ আঁতুড়ঘরে ঢুকলেও বাইরে এসে স্নান ক'রে তাকে শুদ্ধ হতে হয়। আঁতুড়ঘর দুষ্প্রবেশ্য রাখার একটি ব্যবহারিক কারণ আছে। নবজাতককে কোনোরকম দূষণ বা সংক্রমণ থেকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য।

গৃহস্থবাড়ির চৌহদ্দির বাইরেই আঁতুড়ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। ক্ষুদিরামের দখলে চারখানি মাত্র চালাঘর—একটি তাঁর নিজস্ব, একটিতে থাকতেন রামকুমার আর একটি ছিল কুলবিগ্রহ রঘুবীরের। বিপরীত দিকে খড়ের ছাউনি আর কঞ্চির দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটি পাকশালা। পাকাশালার ঠিক সমকোণে খড়ের ছাউনি দেওয়া আর একটি চালাঘর ছিল। এই ঘরটিই প্রসবঘর করা হর্যেছিল।

(চালাঘরগুলি এখন আর নেই। আঁতুড়ঘরটিকে স্মৃতিমন্দির করে রাখা হয়েছে। যে কুঁড়েতে ক্ষুদিরাম বাস করতেন সেটিও কোনক্রমে টিঁকে আছে।)

আঁতুড়ঘরটি আসলে ছিল ঢেঁকিঘর। ধান কোটার জন্যে একটা ঢেঁকি আর সিদ্ধ করার জন্যে একটা উনান ছিল এই ঘরের মধ্যে। সিদ্ধ করা ধানের খোসা ছাড়িয়ে ধান মাড়াই করা হ'ত এই আদিমতম ধানমাড়াই যন্ত্রে। ঢেঁকি চালাতে দুজন মানুষের দরকার হয়। একজন ঢেঁকির পাট পাড়ে, অন্যজন আকাঁড়া ধান গর্তের মুখে ঠেলে দেয়। পরবর্তীকালে গৃহস্থ সংসারীকে অভ্যাসযোগের শিক্ষা দিতে ঢেঁকির উল্লেখ করেছেন রামকৃষ্ণ। বলেছেন, 'গেরস্তর বউটা কত দিক সামলে কাজ করে, শোনো। ঢেঁকির পাট পাড়ছে, এক হাতে ধানগুলো ঠেলে দিচ্ছে আর এক হাতে ছেলেকে কোলে করে মাই দিচ্ছে। আর খদ্দের এসেছে, তার সঙ্গে দরা-দরিও করছে। দেখো, ছেলেকে মাই দেওয়া, ধান ঠেলে দেওয়া, কাঁড়া ধান তোলা আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলা, সব একসঙ্গে করছে। এরই নাম অভ্যাসযোগ। কিন্তু পনর আনা মন ঢেঁকির পাটের দিকে রয়েছে, পাছে হাত পড়ে যায়। তেমনি যারা সংসাবে আছে তাদের পনর আনা মন ভগবানে দেওয়া উচিত। না দিলে সর্বনাশ—কালের হাতে পড়তে হবে।'

১৮৩৬ সাল; ফেব্রুয়ারী মাসের আঠারো তারিখ। ভোরের একটু আগেই চন্দ্রার প্রসবপীড়া উঠল। ধনীর হাত ধরে কোনরকমে ঢেঁকিশালে পৌঁছেই প্রসব করলেন; ভূমিষ্ঠ হলো পুত্র-সন্তান।

পরে একসময় ঘটনাটির এক আশ্চর্য বর্ণনা দিয়েছিল ধনী। তাড়াতাড়ি পোয়াতির ব্যবস্থা করে ছেলের দিকে তাকিয়েই ধনী থ; মাগো! রক্তের ডেলা তখন গড়িয়ে গড়িয়ে উনুনের ছাইয়ের গাদায়—গা-ময় ভস্ম, 'বিভূতিভূষিতাঙ্গ'। কিন্তু মুখে রা কাড়ে নি। তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিল ধনী। ধোয়ালো মোছালো, তারপর হাঁ করে তাকিয়ে রইলো সদ্যো-জাত শিশুর বড়সড় ঝলমলে চেহারাখানার দিকে। কে বলবে ছ'মাসের বাচ্চা নয়!

বিষ্ণুমন্দির দর্শনের পর গয়াধামে যে দিব্যদর্শন হয়েছিল সে কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রেখেছিলেন ক্ষুদিরাম। তাই তিনি ঠিক করলেন যে, তৃতীয় পুত্রের নাম রাখবেন গদাধর। আর শ্রীবিষ্ণু নিজেও তো গদাধারী। তাই বয়ঃসন্ধির কাল পর্যন্ত গদাধর নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে এসেই তাঁর প্রথম রামকৃষ্ণ নামকরণ হয়। তখন তাঁর যুবক বয়স। সেই থেকে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে রামকৃষ্ণ নামেই তিনি চেনা হয়ে রইলেন।

৩

রামকৃষ্ণের ছেলেবেলা

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে ফলিত জ্যোতিষচর্চা চলে আসছে এবং আজ অব্দি সে চর্চায় ছেদ পড়ে নি। নবজাতকের জন্মলগ্নেই তার জন্মকুণ্ডলী তৈরি হয়ে যায়। ক্ষুদিরাম নিজে জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাই গদাধরের জন্মপত্রিকা তিনি নির্ভুল ভাবেই তৈরি করেন। তাঁর গণনা যে সর্বতোভাবে নির্ভুল ছিল পরবর্তীকালের জ্যোতিষিরাও সে কথা মেনে নিয়েছেন।

গদাধরের কোষ্ঠী ছিল অসাধারণ শুভলক্ষণযুক্ত। কোষ্ঠী বিচার করতে গিয়ে ক্ষুদিরাম দেখলেন যে তাঁর এই ছেলেটি অজস্র শিষ্য এবং অনুরাগী ভক্ত পরিবৃত হয়ে মন্দিরে বাস করবে, ধর্মস্থাপন ও প্রচারের জন্যে প্রতিষ্ঠান গড়বে। যুগযুগ ধরে মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি ও সমাদরের শীর্ষদেশে থাকবে তার নাম। ক্ষুদিরাম বুঝেছিলেন যে দৈব-প্রত্যাদেশ ফলতে চলেছে। স্বপ্নে যে বাণী তাঁরা শুনেছিলেন তা যেন প্রত্যয়-দৃঢ়, তাঁদের মন থেকে সব সংশয় কাটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভক্ত হলেও তাঁরাও বাপ-মা। আর পাঁচটি বাপ-মার মতন তাঁদেরও প্রাণ সন্তানের জন্যে ব্যাকুল হয়। তাই শেষ সন্তানটির ভরণ পোষণের কথা ভেবে তাঁরাও ব্যাকুল হয়েছিলেন।

কিন্তু সকলের সব দুশ্চিন্তাই অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল ; কারণ নবজাতককে একদিনের জন্যেও ক্ষুধিত থাকতে হয় নি। নিজের ব্যবস্থা নিজেই ক'রে সে পৃথিবীতে এসেছিল। ক্ষুদিরামের এক ভাগ্নে থাকতো মেদিনীপুর শহরে। নাম রামচাঁদ। কামারপুকুর থেকে মেদিনীপুরের দূরত্বও সামান্য। রামচাঁদ মানুষটি ছিলেন উদার স্বভাবের এবং ধনী। গদাধরের জন্মের কথা শুনে তিনি কামারপুকুরে মামার কাছে এক দুধেলা গাই পাঠিয়ে দিলেন। আর কিছু না হোক, নিত্যদিন শিশু গদাধরের দুধের ব্যবস্থাটি পাকা হলো। এমনি করে ঠিকসময়ে সব সাহায্যই ঠিকমতন আসতে লাগলো—সাহায্য করবার মানুষেরও অভাব কখনো হলো না। সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো অন্নপ্রাশনের সময়। হিন্দুর ঘরে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান এক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। এইদিনই শিশুর মুখে প্রসাদী ভাত ছুঁইয়ে দেওয়া হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে ছয় বা আট মাসে আর মেয়েদের বেলায় পাঁচ বা সাত মাস বয়সে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেদিনই শিশুর নামকরণ করে তার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। শিশুকে নতুন জামাকাপড়ে সাজিয়ে গুছিয়ে পাল্কিতে চড়িয়ে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে বাজনা বাদ্যিসহ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। মন্দিরের বিগ্রহের সামনে শিশুকে গড় করতে শেখানো হয়। সবশেষে আলপনা আঁকা পিঁড়ির উপর শিশুকে বসিয়ে নতুন থালায় অন্নব্যঞ্জন সাজিয়ে শিশুকে খাওয়ানো হয়।

খুব ধুমধামের সঙ্গেই এমন সুন্দর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। কিন্তু ক্ষুদিরাম বিত্তহীন। তাই যথাসাধ্য কম খরচে তিনি অনুষ্ঠানটুকু সারতে চেয়েছিলেন।

ক্ষুদিরাম মনে মনে সঙ্কল্প করলেন যে রীতি অনুসারে কুলবিগ্রহ রঘুবীরের কাছে নিবেদন করা প্রসাদী ভাত ছেলের মুখে ছুঁইয়ে অনুষ্ঠান শেষ করবেন। মাধ্যাহ্নিক ভোজে নেমন্তন্ন করলেন খুবই নিকটতম গুটিকয় আত্মীয়কে।

ধর্মদাস লাহা নামে ক্ষুদিরামের এক ধনী বন্ধু ছিল। মনে মনে সে স্থির করেছিল যে গদাধরের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যাবতীয় ব্যয় সে নিজেই বহন করবে। কিন্তু ক্ষুদিরামকে সে কথা ধর্মদাস জানায় নি। সরল মানুষটিকে নিয়ে একটু রঙ্গ করার জন্যেই ব্যাপারটি সে গোপন রেখেছিল। এ ছাড়া আর এক চাতুরীর আশ্রয় নিল ধর্মদাস। গ্রামের তাবৎ ব্রাহ্মণদের বাড়ি গিয়ে নারদের নেমন্তন্ন করে এল। সবাইকে বলে এল তারা যেন গদাধরের অন্নপ্রাশনের সময় ক্ষুদিরামের অতিথি হয়ে দুটি অন্নসেবা করে আসেন। উৎসবের দিন একে একে সবাই এসে হাজির। ক্ষুদিরামের এদিকে সসেমিরে অবস্থা। না পারেন তাদের ফেরাতে, না পারেন তাদের সেবার ব্যবস্থা করতে। অতিথি নারায়ণ, ফেরাবেনই বা কেমন ক'রে! সুতরাং ভালোমানুষ ক্ষুদিরামের একটি পথই খোলা ছিল—তা হলো ধার দেনা করে অতিথি নারায়ণের সেবার আয়োজন করা। বলতে গেলে সারা প্রাচ্যদেশেরই রীতি হলো সর্বস্বান্ত হয়েও অতিথি সেবার পুণ্যার্জন করা। অনন্যোপায় ক্ষুদিরাম তাই শেষ পর্যন্ত ধর্মদাসের দ্বারস্থ হলেন। ধর্মদাসও তাই চাইছিলেন। যাহোক, ক্ষুদিরামকে আশ্বস্ত ক'রে সব ব্যয়ভার নিজে নেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেদিন শিশু গদাধরের অন্নপ্রাশন উৎসব বিরাট ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কামারপুকুরের ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে পথের ভিখারি অব্দি সবাই আকণ্ঠ ভোজন ক'রে পরিতৃপ্তির উদ্গার তুলতে তুলতে ফিরে গিয়েছিল।

ইদানিং চন্দ্রা আর স্বপ্ন দেখেন না, দৈব প্রত্যাদেশও পান না। শিশুর হাসি কান্না সুখ-অসুখ নিয়েই তাঁর পার্থিব মন ব্যস্ত থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনা ঘটতো যা মোটেই স্বাভাবিক নয়। এক দিনের ঘটনা বলছি: সকালবেলা। গদাধর তখন মাস সাতে-কের শিশু। ছেলেকে মশারির মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে সংসারের কাজ করতে গেছেন চন্দ্রা। হঠাৎ মায়ের সহজাত ভাল-মন্দ বোধ থেকেই ছেলেকে ঘরে দেখতে এলেন। ঘরে ঢুকেই অবাক। কোথায় ছেলে? তার বদলে অস্বাভাবিক রকমের লম্বা বড়সড় একজন মানুষ মশারির মধ্যে শুয়ে। মানুষটিকে আগে কখনও দেখেন নি। চেহারাখানাও কেমন যেন অলক্ষুণে; সারা বিছানা জুড়ে সে শুয়ে। স্বামীকে ডাকতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন চন্দ্রা। কিন্তু ফিরে এসে দুজনেই অবাক। ওমা! কোথায় কে? মশারির মধ্যে নিজের বিছানায় শুয়ে ছেলে তখন দিব্যি ঘুমুচ্ছে।

গদাধর বড় হলো। বেশ সবল স্বাস্থ্যবান ছেলে। রোগ বালাই নেই। স্বভাবটিও মধুর। সব্বাই ভালবাসে, আপনার করে নিতে চায়। একটু একরোখা, তেজী। বারণ মানে না। মেধাবী বলে অনেক কিছু মনে রাখতে পারে। কিন্তু মুশকিল হলো আঁক কষা নিয়ে। কড়াগণ্ডার হিসাব কিছুতেই মনে রাখবে না। নিষিদ্ধ কাজে খুব উৎসাহ, তবে লুকোছাপা নেই। যা করে তা বলে। স্বভাবটি একটু ছটফটে। হয়ত পড়তে বসেছে, কিন্তু যেমনি খেলার কথা মনে হলো ওমনি দে ছুট! ক্ষুদিরাম মন দিয়েই ছেলের প্রকৃতিটি লক্ষ্য কর-তেন, নিরাশ হতেন না। তাঁর কেবলই মনে হতো বুঝিয়ে বললে গদাধর নিশ্চয়ই কথা শুনবে, নিষেধ মানবে।

হালদার পুকুরের ঘটনাটাই ধরা যাক। পুকুরের দুটো ঘাট। একটি পুরুষদের অন্যটি মেয়েদের। গদাধর তার সমবয়সী বালক বন্ধুদের নিয়ে মেয়েদের ঘাটে গিয়ে তাদের গায়ে জল ছিটিয়ে উৎপাত করতো। একদিন বর্ষীয়সী এক মহিলা গদাধরের উৎপাতে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ব্যাটাছেলে হ'য়ে এখানে কেন আসিস রে ছোঁড়া? ছেলেদের ঘাটে যেতে পারিস না?'

'কেন?'

এই কেন-র কোনো স্পষ্ট জবাব গদাধর পেল না। তবে আভাষে ইঙ্গিতে মহিলা জানালেন যে স্নানরতা অবস্থায় মেয়েদের দেখলে শাস্তি পেতে হয়। বলাবাহুল্য এমন ভাসাভাসা জবাব পেয়ে গদাধরের কৌতূহল মিটলো না। পরপর তিনদিন একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে গদাধর মেয়েদের স্নান করা দেখলো। তারপর ভর্ৎসনাকারী মুখরা মহিলা-টিকে খুঁজে এনে বললো, 'আমি তো দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েদের চান করা দেখলুম—পরশু দেখেছি চারজন, কাল ছ'জন আর আজ আটজনকে চান করতে দেখলুম। কই! আমার তো কোনো শাস্তি হলো না?'

গদাধরের কথা শুনে মহিলা হাসলো কিন্তু ব্যাপারটা উড়িয়ে দিল না। চন্দ্রার কাছে সবিস্তারে ঘটনাটি শুনিয়ে দিল। ছেলেকে তখনই কিছু বললেন না চন্দ্রা। তারপর সুযোগ সুবিধে ক'রে একদিন গদাধরকে কাছে ডেকে আদর করতে করতে বললেন, 'ছি বাবা! এমন কাজ করো না যাতে মনে কেউ কষ্ট পায়। মেয়েরা না চাইলে তাদের চান করা দেখতে নেই। তার মানে এ নয় যে তাদের চান করা দেখলে তোমার পাপ হবে। তবে এ কাজ করলে মেয়েদের অপমান করা হয়। আর আমিও তো মেয়ে! তাদের অপমান মানে আমারও অপমান। নিশ্চয় তুমি এমন কিছু করবে না যাতে আমার অপমান হয়! করবে কি?'

গদাধর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলো এমন কাজ সে কখনও করবে না।

গদাধরের বিদ্যারম্ভ হলো পাঁচ বছর বয়সে। পাঠশালা বসতো গ্রামের নাটমণ্ডপে। মাটি থেকে সামান্য উঁচু মঞ্চ, যাত্রা-গানের আসরও সেখানেই বসতো। নাটমণ্ডপের চারপাশ খোলা, মাথায় ছাত। দ্বিপ্রহরের খাড়া রোদের সময়টুকু বাদ দিয়ে পাঠশালা বসতো সকালে আর বিকালে। আঁক কষা নিয়ে তার বড্ড অমনোযোগ। পাঠশালে শুভংকরী ধাঁধাঁ লাগতো। তবে নতুন নতুন আরো নানাবিদ্যায় তার উৎসাহ খুব। আঁকার হাত ছিল ভারি পরিচ্ছন্ন, আর তেমনি সুরেলা ছিল গানের গলা। কাদামাটি দিয়ে আপন মনে পুতুল গড়তো, আবার কখনও যাত্রাপালা থেকে গান তুলে নিজের খেয়ালে গাইতো। আর একটি মজার বিদ্যা পরি-পাটি করে গদাধর শিখেছিল। সেটি তার অননুকরণীয় অনুকরণ ক্ষমতা। যা দেখতো শুনতো অনায়াসে এবং হুবহু তার নকল করতো। তার এই নকুলে স্বভাবের জন্যে সবার কাছে খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল গদাধর। বিদ্বেষহীন এই অনুকরণে সবাই খুব আমোদ পেত। সমবয়সী ছাড়া বয়স্করাও গদাধরকে কাছে ডেকে এই সব শুনতে চাইত। তা ছাড়া নতুন নতুন নানা খেলার উদ্ভাবন করেও সমবয়সীদের মধ্যে গদাধর প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

সাধারণত ছোটছোট ছেলেমেয়েরা অপ্রাকৃত ব্যাপারে একটু ভয়কাতর হয়। গদাধরের সে-সব বালাই ছিল না। অন্ধকার অকুস্থল যা কিনা ভূতপ্রেত দত্যি-দানোর উৎপাত-ক্ষেত্র,

ছেলেটা অকুতোভয়ে সেখানেও চলে যেত। ক্ষুদিরামের এক সহোদরা ছিল, রামশীলা। মাঝে মাঝে সে বড় বিচিত্র ব্যবহার করতো। লোকে বলতো 'ভর' হয়েছে; 'ভর' হলে বাড়ির লোক কাছে যেতে সাহস পেত না। ভয় ভক্তিতে দূরে দূরে থাকতো। গদাধরের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই ভারি কৌতুককর মনে হতো। খুব কাছে থেকে সে পিসিকে নিরীক্ষণ করতো আর মনে মনে ভাবতো, 'এখন পিসিকে ছেড়ে আমার ওপর 'ভর' হলে বেশ হয়।'

গদাধরের শরীরটি ছিল বেশ শক্ত সবল। শরীরের যত্নআত্তি নিয়ে অকারণ উদ্বেগ তার ছিল না। দেহপট সাজিয়ে গুছিয়ে যত্ন করতে মানুষ যত তৎপর হয়, ততই তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ বাড়ে। এ ব্যাপাবে আশ্চর্য রকমের উদাসীন ছিল গদাধর; তাই তার শবীর আপন নিয়মেই গড়েছে, সবল হয়েছে, দৃঢ় হয়েছে।

মনের নিভৃতে একা এবং নিঃসঙ্গ না হলে গদাধর নিশ্চয়ই সমবয়সীদের সাহচর্যের উপর নির্ভর করতো না। গ্রামেব বনপথ আলবাল গাছগাছালির মধ্যে একা একা সে ঘুরে বেড়াত। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধেব মধ্যে হারিয়ে যাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল তার। তাই যেদিন তার প্রথম ভাবসমাধি হলো, তখন কতই বা তার বয়স, ছয় বা সাত বছর, সেদিন এমনি করেই কার তীব্র টানে নিজেকে গদাধর হারিয়ে ফেলেছিল। পরবর্তী জীবনে রামকৃষ্ণ নিজেই সে ঘটনা ব্যক্ত করেছেন।

'সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে হবে; আমার তখন ছয় কি সাত বছর বয়স। একদিন সকালবেলা টেকোয় (চুবড়ি) মুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে খেতে খেতে চলেছি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে—তাই দেখছি ও খাচ্ছি। দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে, এমন সময় সাদা দুধের মতন বক ঐ কালো মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো। সে এমন এক বাহার হলো!—দেখতে দেখতে অপূর্ব ভাবে তন্ময় এমন এক অবস্থা হলো যে, আর হুঁশ রইলো না! পড়ে গেলুম—মুড়িগুলো আলের ধারে ছড়িয়ে গেল; কতক্ষণ ঐভাবে পড়ে ছিলুম বলতে পারি না, লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে এসেছিল।' হুঁশ ফিরে এলে গদাধর একেবারে অন্য মানুষের মতন স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাপ-মার প্রাণ এত সহজে সব কিছু মেনে নিতে পারলো না। মৃগী না তড়কা ঠিক কি হয়েছিল তাব হদিশ নেই, আর হদিশ দেবেই বা কে! গদাধর তখন এতই বাচ্চা যে গুছিয়ে বলতেই পারে না তার কি হয়েছিল। তবে বাইরে বেহুঁশ হলেও অন্তঃপুরের চেতনা ষোল আনা জাগ্রত ছিল। এক অপরিসীম আনন্দময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল তার অন্তর্লোক। যাহোক গদাধরের কোনো শারীরিক অসুস্থতা হলো না দেখে ক্ষুদিরাম সাময়িকভাবে খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মনে হলো ছেলের ওপর নিশ্চয়ই কারও কু-নজর পড়েছে। কথাটা মনে হতেই পাঠশালা থেকে নাম কাটিয়ে ছেলেকে ঘরে নিয়ে এলেন। গদাধরও ভারি খুশি। বেশ মজা এখন তার—কেবল খেলা, খেলা আর খেলা।

•

দেখতে দেখতে শরৎকাল এসে গেল। সেটি ১৮৪২ সাল। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উৎসব, দুর্গোৎসব এই সময়েই অনুষ্ঠিত হয়। মা দুর্গা ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপিণী। মানুষকে তিনি অভয় দেন, তার বিপদ নাশ করেন।

প্রতি বছর দুর্গোৎসবের সময় তার সেলামপুরের বাড়িতে ক্ষুদিরামকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যায় রামচাঁদ। ক্ষুদিরামও আনন্দ করে পুজোর কটা দিন সেলামপুরে কাটিয়ে আসেন। দিন আষ্টেক ধরে বেশ ধুমধামের সঙ্গে রামচাঁদের বাড়িতে উৎসব চলে।

সেবার তেমন গা করছিলেন না ক্ষুদিরাম। দিনদিন শরীর অপটু হয়ে আসছে। হজম-শক্তি কমে এসেছে, নিত্যি নানা উপসর্গ। তাই প্রায় স্থিরই করে ফেলেছিলেন যে, এবছরটি আর কামারপুকুর ছেড়ে কোথাও যাবেন না। শেষপর্যন্ত অবশ্য সেলামপুরে যাওয়াই স্থির করলেন। গদাধরকে সঙ্গে নেবার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু ইদানিং গদাধরকে নিয়ে তার মায়ের বড় ভাবনা। কিছুদিন আগে সেই বেহুঁশ হবার ঘটনার পর থেকেই অতিরিক্ত সাবধানী হয়ে গেছেন চন্দ্রা। চট করে ছেলেকে চোখের আড়াল করতে চান না। অগত্যা বড় ছেলে রামকুমারকে সঙ্গে নিয়েই সেলামপুরের উদ্দেশে রওনা হলেন ক্ষুদিরাম।

সেবার গদাধরকে সঙ্গে না নেবার সিদ্ধান্ত খুবই উচিত কাজ হয়েছিল। কারণ, পুজো শেষ হবার মুখেই ক্ষুদিরাম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ক্রমশ অবস্থা এমন হলো যে, শয্যা ছেড়ে উঠতেই পারেন না। মামার চিকিৎসায় কার্পণ্য করে নি রামচাঁদ। কিন্তু একটার পর একটা উপসর্গ জুটে ক্ষুদিরামকে প্রায় অস্থির করে তুললো। অসুস্থ দেহমন এত দুর্বল যে কথা বলতেও কষ্ট হতো। বিজয়া দশমীর বিকেল নাগাদ রামচাঁদ আর রামকুমার তাঁকে বিছানার ওপর একবার বসিয়ে দিয়েছিল। সেই অবস্থাতেই কুলবিগ্রহ রঘুবীরকে তিনবার স্মরণ করলেন ক্ষুদিরাম, তারপর বড় ছেলের গায়ের ওপর ঢলে পড়লেন। এপারের মায়া কাটিয়ে কেমন অনায়াসে যেন চলে গেলেন ক্ষুদিরাম।

আকস্মিক এ বিয়োগব্যথা সেদিন নির্মম আঘাতের মতন চন্দ্রার জীবনে বেজেছিল। শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আর পাঁচজন সাধ্বী নারীর মতন চন্দ্রাও ছিলেন যথার্থ পতি অনুরাগিণী। তবে শুধু তো অনুরাগ আর শ্রদ্ধা নয়! তাঁর সারাজীবনের আধ্যাত্মিক গুরু ঋষিপ্রতিম স্বামীকে হারিয়ে জগৎ-সংসার শূন্য দেখতে লাগলেন তিনি। সংসারে মন টিঁকতে চায় না, দেহও আর বয় না। কবে ওপারে তাঁর সঙ্গে মিলন হবে সেই-টুকুর জন্যেই অপেক্ষা। এদিকে সংসারের সব দায়িত্ব তখন মাথায় তুলে নিয়েছেন জ্যেষ্ঠ রামকুমার।

ক্ষুদিরামের হঠাৎ মৃত্যু আর একজনকেও বড় অসহায় করে দিয়েছিল, সে গদাধর। হঠাৎ এ আঘাত পেয়ে তার কিশোর মন অন্তর্মুখী হয়ে উঠলো। নিজেকে ইদানিং বড় একা লাগে—থেকে থেকে কিসের খেয়ালে, কার লাগি মনপ্রাণ আকুল হয়। মায়ের শুভাশুভের কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে মন। মনের যখন এইরকম অবস্থা তখন একটি ঘটনা ঘটলো। কামারপুকুর গ্রামের সীমান্তে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্যে একটিপান্থনিবাস ছিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ধাম দর্শনে যেতে বা দর্শন সেরে ফিরতে সাধুযাত্রীরা দুদণ্ড বিশ্রামের জন্যে পান্থনিবাসে যাত্রা স্থগিত করতো। চটিতে বিশ্রামরত সাধুদের সঙ্গে গদাধর মেলামেশা শুরু করলো। তাদের সেবার জন্যে বাড়ি থেকে খাবারদাবার বয়ে আনতো। তারা যা করতো যা বলতো মন দিয়ে শুনতো। সাধুরা ধ্যানে বসলে সেও ধ্যানে বসতো। কিশোর মনের সরলতা দিয়ে বুঝতে পারতো কে প্রকৃত সাধু আর কে ভণ্ড। বস্তুত, সাধুবেশী মানুষের ভণ্ডামী আর কপটাচারের ব্যাপারটি তাঁর কাছে সারা জীবনের পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কখনো-সখনো সারা গায়ে ভস্ম মেখে বালক গদাধর সাধুর বেশে ঘরে ফিরতো। একদিন বেশ মজা হলো ; পরণের ধুতিখানি ছিঁড়ে তিনটুকরা করে সাধুদের মতন কৌপীন আর বহির্বাস সম্বল করে সে ঘরে ফিরলো। সারা গা ভস্মমাখা, পরণে কৌপীন-সার—চন্দ্রা-দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে গদাধর চেঁচিয়ে বললো—'মা ! এই দ্যাখো, আমি সাধু হয়েছি।' ওমনি মায়ের প্রাণ ভয়ে উড়ে গেল। তিনি তো জানেন, সাধু সন্ন্যাসীর ভেক নিয়ে কত রকম মানুষই না পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় ! তাদের কাজই হলো দুঃসাহসিক পথযাত্রার লোভ দেখিয়ে বাচ্চা ছেলেদের মন থেকে ঘরের মায়া কাটানো। গদাধর অবশ্য মায়ের মন থেকে এই অকারণ উদ্বেগ অচিরেই কাটিয়ে দিয়েছিল। মায়ের কোল ঘেঁসে বসে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে মা-কে ছেড়ে সে কখনও কোথাও যাবে না। চন্দ্রার আশংকার কথা সাধুরাও জেনেছিল। একদিন তারাও এসে চন্দ্রাকে আশ্বস্ত করে গেল।

এইরকম সময় নাগাদ গদাধরের জীবনে দ্বিতীয়বার ভাবসমাধি হয়। ঘটনাটি বলি। কামারপুকুরের মাইল দুই উত্তরে আনুড় গ্রাম। গ্রামের বাইরে দেবী বিশালাক্ষীর থান। বিশাললোচনা দেবী মাঠের মধ্যে একা থাকেন—তাঁর ঘরদোর নেই, মন্দির দেবালয় নেই। সব মানুষের জন্যেই তিনি অবারিত। বিশেষ যারা গরিবগুরবো, ভবঘুরে তাদেরই তিনি আরাধ্যা। পথে যেতে আসতে ধনী ভক্তেরা তাঁর দোরে দুএক পয়সা প্রণামি আর মিষ্টান্ন রেখে যায়। তাতেই দেবীর সেবা হয়। মাঠে গরু চরাতে আসে ছোট ছোট রাখাল ছেলে। দেবীর থান থেকে তারা পয়সা আর মিঠাই তুলে নেয়। দেবী কিন্তু কুপিতা হন না। খুশি হন। কথিত আছে কোনো এক ধনী মহাজন এই অস্বৈরণ ব্যাপার দেখে দেবীর জন্যে পাকা ভিতের মন্দির বানিয়ে দিয়েছিল। তখন জমাপড়া প্রণামির পয়সা আর মণ্ডা-মিঠাই মন্দিরের মধ্যে বন্ধ ক'রে রাখা হতো। রাখাল ছেলেরা ছুঁতে পারতো না। কিন্তু দেবী বিশালাক্ষী অপ্রসন্না হলেন। একদিন দেখা গেল মন্দিরের এক দিকের দেয়াল ফেটে চৌচির। দেবী আবার সকলেব জন্যে অবারিত হয়ে গেলেন। শোনা যায় এরপরেও মন্দির সংস্কারের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু স্বপ্নে দেবী নিষেধ করে দেন। অমঙ্গলের আশংকায় ভবিষ্যতে আর কেউ মন্দির সংস্কারে আগ্রহী হয় নি।

এই দেবীর থানেই পুজো দিতে সেবার মেয়েদের এক দল চলেছে কামারপুকুর থেকে। গদাধরের জেদ সেও যাবে। মেয়েরা তো শুনে অবাক ! এতখানি পথ, রোদ তাপ আছে, পথ হাঁটার ধকল আছে, সইতে পারবে তো এতটুকু ছেলে ? কিন্তু গদাধরের ধনুর্ভাঙা পণ, সঙ্গে সেও যাবে। অগত্যা মেয়েরা রাজী হলো, তাছাড়া ছেলেটা সঙ্গে থাকলে তাদের পথ-চলার ক্লান্তি থাকবে না। অনেক গুণ গদাধরের। মজার মজার গল্প বলতে পারে, রঙ্গ করতে, গান গাইতে পারে, ভারি মিষ্টি তার গানের গলা। যে তার একবার গান শুনেছে সেই সেকথা জানে। একজন তো আক্ষেপ করে বলেই ফেলেছিল, 'গদাইয়ের গান শুনেই কানের মাথা খেয়েছি। পোড়া কান দিয়ে আর যেন কিছু ঢুকতেই চায় না।'

গানে গল্পে মাতোয়ারা হয়ে তারা চলেছে। গদাইয়ের গান শুনে সবাই বিভোর। আচম্বিতে কি যেন হয়ে গেল। গাইতে গাইতেই থম্ মেরে গেল গদাধর। গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না। শক্ত হয়ে গেছে শরীর আর দুচোখ দিয়ে দরদর করে জল ঝরে পড়ছে। দেখেশুনে মেয়েরা

ভয়ে বিহ্বল, তাই তো ! দিব্যি হাসছিল, গাইছিল, এখন এ কি হলো ? ঝা ঠা ঠা রোদ ! গরম লেগে গেল না তো ? কয়েকজন ছুটে গিয়ে কাছাকাছি একটা পুকুর থেকে আঁজলা করে জল এনে গদাধরের মুখে চোখে ছিটিয়ে দিল কিন্তু ফল হলো না। ছেলে যেমন নেতিয়ে ছিল তেমনি নেতিয়েই রইলো।

দলের মধ্যে প্রসন্নও ছিল। ধর্মদাস লাহার বিধবা এই সহোদরাটি ছিল ভারি পুণ্য-স্বভাবা। এক দিব্য অন্তর্দৃষ্টি তার ছিল। মানুষ চিনতে পারতো সে। গদাধরকে সে ঠিক চিনেছিল। সে যে সাধারণ মানুষ নয় তা যেন মেয়েটি জানতো। পরবর্তীকালে প্রসন্ন প্রায়ই গদাধরকে বলতো—'তুমি যাই বলো না কেন—তুমি বাপু সাধারণ মানুষ নও।' গদাধর শুনতো আর মিটি মিটি হাসতো। হয় জবাব দিত না নাহয় আলোচনা অন্য বিষয়ে নিয়ে যেত।

প্রসন্নেরই হঠাৎ যেন দিব্যজ্ঞান হলো। তার মনে হলো দেবী বিশালাক্ষী বালক গদাধরের ওপর 'ভর' করেছেন। তাই এই ভাবমূর্চ্ছা; তার উপলব্ধির কথা সবাইকে বললো সে। তখন সকলে মিলে গদাধরকে উপলক্ষ করে দেবী বিশালাক্ষীর স্তব বন্দনা শুরু করল। 'মা ! না জেনে যদি কোনো অন্যায় করে থাকি তবে ক্ষমা করো, তোমার রোষ থেকে আমাদের রক্ষা করো মা !' অচিরেই আগের মানুষ হয়ে গেল গদাধর। দিব্যি হাসিখুশি, সদানন্দ—যেমনটি আগে ছিল। কে বলবে খানিক আগে এই ছেলেরই বাহ্যজ্ঞান ছিল না। তার জন্যে এতটুকু ক্লান্তি নেই শরীরে, এতটুকু দুর্বলতা নেই। গদাধর স্বাভাবিক হলে মেয়েরাও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। নিশ্চিন্তমনে তীর্থভ্রমণ শেষ করলো।

ন'বছর বয়সে গদাধরের উপনয়ন হয়। হিন্দুর উপনয়ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে খ্রীস্টান বা ইহুদীর দীক্ষান্ত অনুষ্ঠানের মোটামুটি এক মিল আছে। তবে হিন্দুর উপনয়ন অনুষ্ঠানের তাৎপর্য খুব গভীর। যেদিন ব্রাহ্মণের ছেলের গলায় যজ্ঞসূত্রধারণ করিয়ে তাকে বেদের গায়ত্রী মন্ত্র শিখিয়ে দেওয়া হয়, সেদিন থেকেই হিন্দুর ধর্মবোধের সঙ্গে সে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশে উপবীত ধারণের অধিকার শুধু ব্রাহ্মণের। যতদিন পর্যন্ত কোনো ব্রাহ্মণ সন্তান উপবীত ধারণ না করে ততদিন অব্দি সে শূদ্র। উপবীত ধারণের দিন থেকেই পূজা ও আনুষঙ্গিক ধর্মানুষ্ঠানে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তার আধ্যাত্মিক নবজন্ম হয়, সে হয় দ্বিজ। জীবনযাপনে যথাযথ শুচিতা, সদাচার আর আহার্য বিষয়ে বাছবিচার মেনে চলার অঙ্গীকার তখন থেকে তাকে মেনে চলতে হয়।

উপনয়নের সময় তিনদিন সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতে হয়। সন্ন্যাসী অবস্থায় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করার এক প্রথা আছে। প্রথানুসারে যিনি প্রথম ভিক্ষাদানের অধিকারী তিনিই এই অনুষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি বলে বিবেচিত হন। কামারকন্যা ধনী, বালক গদাধরের কাছে প্রথম ভিক্ষাদানের মর্যাদা পেতে চেয়েছিল। জন্মাবধি এই দরিদ্রা রমণীর অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসার স্বাদ সে পেয়েছে, তাই সামান্য এই আকাঙ্ক্ষাটুকু পূরণ করতে গদাধর সম্মত হয়।

কিন্তু রামকুমার মোটেই রাজী নন। তা কেমন করে সম্ভব ? বংশমর্যাদা, আভিজাত্য, কুলগৌরব—কোনো কিছুর বিচারেই কামারকন্যা ধনীর ভিক্ষা-মা হবার অধিকার নেই। কিন্তু গদাধরের জেদ, অঙ্গীকার সে রাখবেই ; নইলে সে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হবে এবং

সেক্ষেত্রে যজ্ঞসূত্র ধারণের অধিকারও তার থাকবে না। আয়োজন পণ্ড হবার উপক্রম ; শেষ পর্যন্তধর্মদাস লাহার স্বারস্থ হলেন সকলে। সব কথা শুনে গদাধরের পক্ষেই রায় দিলেন ধর্মদাস। অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় ধনীও খুশি হলো।

এইসময় নাগাদ জমিদার লাহাবাবুদের কোনো শ্রাদ্ধবাসরে এক পণ্ডিতসভার আয়োজন হয়। সারা দেশ থেকে বাছাই করা পণ্ডিতরা আলোচনাসভায় যোগ দিতে আসেন। একটি কূট বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় পণ্ডিতরা বাদানুবাদের পর্যায়ে পেঁাছে যান। ধর্মবিষয়ক প্রশ্নটি ছিল জটিল। ফলে কোনো সুমীমাংসায় তাঁরা পেঁাছাতে পারছিলেন না। দেশটি ভারতবর্ষ এবং আলোচনার বিষয়টি ছিল ধর্ম। সুতরাং আলোচনা শোনবার আগ্রহে সারা গ্রামের মানুষ ভেঙে পড়েছিল সে সভায়। সমবয়স্ক বন্ধুদের সঙ্গে গদাধরও সেখানে উপস্থিত ছিল। বাদানুবাদের সময় পণ্ডিতদের উত্তেজিত হতে দেখে বালকেরা যখন হাসাহাসি করছিল তখন গদাধর মনোযোগের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা শুনছিল। শুনতে শুনতে একসময় পাশে বসে থাকা একজন পণ্ডিতের দিকে চেয়ে গদাধর বললো, 'আচ্ছা! ওঁরা যে উত্তরটি খুঁজছেন সেটি এইরকম না?' পণ্ডিত তো স্তম্ভিত। শুধু তাই নয় ; কোথায় কোন পর্যায়ে আলোচনার অসঙ্গতি এবং কেমন ক'রে তা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় সেই মীমাংসার কথাও বালক গদাধর তাদের বলে দিল। অবাক এবং স্তম্ভিত হয়ে সে কথা সবাই শুনলেন। কেউ কেউ আবার কোলে বসিয়ে গদাধরকে আশীর্বাদ করলেন।

ঘটনাটি ইতিহাস সমর্থিত এবং বাহুল্য বর্জিত। বেশ কয়েক বছর পরে স্বামী সারদানন্দের কাছে রামকৃষ্ণ নিজেই ঘটনাটি বলেছিলেন। এমনকি সেদিন কামারপুকুরের সেই পণ্ডিতসভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও সবিস্তারে ঘটনাটি সারদানন্দের কাছে ব্যক্ত করেন। তবুও ম্যাক্সমূলার নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। 'সুসমাচারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধু লিউক বর্ণিত যীশুর জীবনীতেও এইরকম এক বৃত্তান্ত নথিভুক্ত আছে। দুটি ঘটনা প্রায় সদৃশ ব'লে সম্ভবত ম্যাক্সমূলারের এই দ্বিধা। নথিভুক্ত বৃত্তান্তটি এইরকম :

যীশুর পিতামাতা নিস্তারপর্ব উৎসব পালন করতে প্রত্যেক বছর পর্বের দিন জেরুজালেম যেতেন। যীশু যখন বার বছর বয়স তখন তাঁরা যীশুকে নিয়ে এই পর্ব উপলক্ষে জেরু-জালেম গেলেন। পর্বের উপাসনা শেষ হলে যীশুর পিতামাতা বাড়ির দিকে রওনা হলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদের আত্মীয়স্বজন সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে যীশু আগে আগে যাচ্ছেন। কিন্তু একদিনের পথ এসে তাঁরা দেখলেন সঙ্গে যীশু নেই। তাই আবার জেরুজালেম তাঁরা ফিরে গেলেন। সেখানে দিনতিনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁরা যীশুকে মন্দিরে দেখতে পেলেন। মন্দিরের মধ্যে পণ্ডিতদের সঙ্গে যীশু আলাপ করছিলেন। তাঁদের প্রশ্ন করছিলেন। প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। পিতামাতা এসব দেখেশুনে ভারি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। মরিয়ম যীশুকে বললেন—'কেন তুমি আমাদের এমন করে কাঁদালে? তোমার বাবা আর আমি দুজনে মিলে তোমায় অনেক খুঁজেছি, না পেয়ে কেঁদেছি।' যীশু বললো—'মা, কেন তোমরা আমায় এমন ক'রে খুঁজলে? তোমরা কি জানতে না আমাকে আমার বাবার ঘরে পাওয়া যাবে?' যীশুর পিতামাতা কিন্তু যীশুর কথার অর্থ ঠিকমতন বুঝতে পারলেন না।

বিবরণটি পড়ার পর প্রথমেই যা মনে হবে তা হলো বালক যীশু ও বালক গদাধরের মধ্যে চরিত্রগত অসঙ্গতি। গদাধর কখনও এমনভাবে তার পিতামাতার কাছে আপনাকে ব্যক্ত করে

নি। ছেলেবেলা থেকে শুরু করে যৌবনেব আরম্ভকাল পর্যন্ত গদাধর নিজেকে অপ্রকাশিত রেখেছিল। কখনও একদিনের জন্যেও জানতে দেয়নি সে কে, কী তার ব্রত ; এমনকি যারা তাকে সেদিন বুঝেছিল তাদের কাছেও সে কখনও স্বরূপ প্রকাশ করে নি। এমন দুজন মানুষ হলো প্রসন্ন আর বৃদ্ধ শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাসই সেই মানুষ যে বালক গদাধরকে ঠিকমতন চিনেছিল। তাই একদিন তাকে গাছগাছালিব নিভৃতে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর যেমনভাবে উপাস্য দেবতার গলায় মালা পরিযে নিবেদনের ভঙ্গিতে প্রণত হতে হয় তেমনভাবে গদাধবের পুজো করেছিল।

যদি মানতেই হয় যে ঘটনাদুটিতে মিল আছে তাহলে বলবো ঘটনার এমন মিল কৃষ্ণ, শংকর ও চৈতন্যের জীবনেও অনেক দেখতে পাওয়া যায়। খ্রীস্টধর্মের অনেক আগে বৈষ্ণবধর্ম ঋদ্ধ ছিল। সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি, অন্তত ম্যাক্সমূলার যেমন অনুমান কবেছেন, যে কৃষ্ণচরিত্রের নানা অসামান্য দিকেব প্রেবণা নিয়েই পরবর্তী যুগে যীশু, শংকর বা চৈতন্যের জীবনী লিখিত হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি কৃষ্ণের জীবনচরিত থেকে অন্তত আধডজনেব মতন উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাছাই কবে খ্রীস্টেব জীবনীব সঙ্গে জুড়ে প্রামাণিক ব'লে তাদের চালিয়ে দেওয়া যায়।

শিবরাত্তিরের ব্রত পালনের কথা ভাবা হচ্ছে। গ্রামেব শিবরাত্তিব এক বড় উৎসব। ঠিক হলো পাশের গ্রামের ছেলেরা যাত্রাদল নিয়ে কামারপুকুবে এসে শিবেব পালা যাত্রা নামাবে। ছেলেবুড়ো সবাই সারা রাত ধরে সে পালা দেখবে, আবার রাতও জাগবে।

উৎসবেব দিন সন্ধ্যে নাগাদ এক দুর্ঘটনা ঘটলো। যে ছেলেটি শিবেব অভিনয় করবে বলে ঠিক ছিল সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। এমন কেউ হাতের কাছে নেই যাকে দিয়ে কোন রকমে অভিনয়টি চালিয়ে নেওয়া যায়। সবারই আশঙ্কা হলো বুঝি বা যাত্রানুষ্ঠান বন্ধই করে দিতে হয়। তখন গ্রামের প্রাচীন মানুষবা পবামর্শ করে স্থিব কবলো যে শিবের ভূমিকায় গদাধর অভিনয় করুক। ছেলেটির চোখ দুটি বড় ভাবপূর্ণ। তাছাড়া পালার অনেকগুলি গানই সে জানে। গদাধরের যথেষ্ট অনিচ্ছা ছিল। সে ভেবেছিল ঘরে বসে নিভৃতে শিবপুজো করবে। তবে সকলের অনুরোধ সে এড়িয়ে যেতে পারলো না। বন্ধুরা বললো শিবমহিমা প্রচাবের জন্যেই এই যাত্রাগানের আয়োজন—এই পালায় অভিনয় করা শিবপূজারই নামান্তর মাত্র। ঈশ্বরে মনোনিবেশ না করলে শিবচরিত্রে অভিনয় সার্থক হবে না।

গদাধরকে শিববেশে সাজিয়ে দেওয়া হলো। বিভূতিভূষিতাঙ্গ জটাজুটধারী রুদ্রাক্ষ শোভিত শিববেশী গদাধর ধীরে ধীরে মঞ্চের উপব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। ওহো! সে কি গভীর নিমগ্ন রূপ! ভয়, বিস্ময় সম্ভ্রমের মিশ্র আবেগ নিয়ে দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে সেই ভাব বিহ্বল শিবরূপী গদাধরের দিকে। মিটিমিটি একটু হাসি লেগে আছে গদাধরের ঠোঁটে—দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে প্রগাঢ় ধ্যানময়তা। যারা দেখছিল তাদেরও যেন সে মহিমা স্পর্শ করলো। ভাবাবেশে নিজের অজান্তেই তারা ভগবানের নাম স্মরণ করলো। কেউ বললো, আহা! কী রূপ! এ কি আমাদের গদাই, শিবঠাকুরটি নয়?

গদাধর তখনো তেমনি স্তব্ধ, মৌন। একটু পরে তার দুচোখ দিয়ে ভাবাশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। সবাই অবাক, কেউ বা বিচলিত। কাছে গিয়ে দেখলো গদাধরের বাহ্যজ্ঞান নেই।

সে ভাবাবিষ্ট। কেউ বললো, চোখেমুখে জল দাও, বাতাস করো, কেউ বললো শিবঠাকুরকে স্মরণ করো। আবার কেউ বা রীতিমত বিরক্ত—ইস্! এমন জমাটি পালাটা ছোঁড়া পণ্ড করে দিলে গা!

সবাই তখন প্রায় চলে গেছে। গদাইকে কোলে তুলে বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। তখনও অজ্ঞান অচৈতন্য, এমনকি পরদিন সকাল পর্যন্ত সেই বিভোর অবস্থা রইলো। কোনো কোনো বৃত্তান্তকার বলেছেন যে গদাধরের এই অজ্ঞান অচেতন অবস্থা তিনদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

ধর্মবিষয়ক যাত্রাগানের আসরে বসে উল্লাসে মূর্ছিত হবার ঘটনা গদাধরের সারা জীবনে বহুবার ঘটেছে। আনন্দ আস্বাদনের আরও নানা উপকরণ গদাধরের জানা ছিল। আগেই বলেছি, তার স্বভাবটি ছিল আমোদপ্রিয়, নকুলে। কৌতুকের জন্যে অপরকে নকল করা কিংবা তামাসা করে লোক হাসানো তার চরিত্রের এক বিশিষ্ট দিক। একবার কৌতুককর এক ঘটনা ঘটলো। গদাধরের বয়স সবে উনিশ, ঘটনাটি সেই সময়কার। বণিকপল্লীর দুর্গাদাস পাইন লোকের কাছে জাঁক করে বলে বেড়াত যে তার বাড়ির মেয়েরা অসূর্যম্পশ্যা। সেখান-কার অবরোধপ্রথা এত কঠোর যে বাইরের পুরুষের কাছে মেয়েদের মুখ দেখানো নিষেধ। গদাধরকে সবাই ভালোবাসতো, এমনকি অন্তঃপুরের মেয়েরাও তার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মিশতো। দুর্গাদাসের অহঙ্কারের কথা শুনে গদাধরের ইচ্ছে হলো এই অহঙ্কারটুকু ভাঙবে। সে বললো, 'ইচ্ছে করলে আপনার অন্তঃপুরে ঢুকে সকলের সঙ্গে কথা বলে আসতে পারি।' বলাবাহুল্য, গদাধরের কথা বিশ্বাস করে নি দুর্গাদাস।

দিন কয়েক পরের কথা। একদিন বিকেল নাগাদ এক তাঁতি মেয়ের ছদ্মবেশে হাটের দিক থেকে দুর্গাদাসের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল গদাধর। পরণে তার মোটা শাড়ি, শাড়িটি বেশ ময়লা। গায়ে রূপোর গয়না, কাঁখে চুবড়ি; মুখখানি ঘোমটা ঢাকা। বয়স্যদের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে দুর্গাদাস তখন গল্পগুজব করছিল। রমণী বেশধারী গদাধর তার দিকে চেয়ে জানালো যে, হাটে সুতো বেচতে এসে সে হারিয়ে গেছে। সঙ্গিনীরা তাকে ফেলে চলে যাওয়ায় সে এখন ভারি বিপন্ন। সুতরাং রাতটুকুর জন্যে তার নিরাপদ একটু আশ্রয় দরকার। দুর্গাদাস তাকে দু একটি প্রশ্ন করলো কিন্তু তার চাতুরী ধরতে পারলো না। বরং মেয়েটি যে সত্যিই বিপন্না তা বুঝতে পেরে বললো, 'ঠিক আছে বাছা, ভেতরে গিয়ে তুমি দ্যাখো মেয়েরা তোমায় এক রাত্তিরের জন্যে কোনো আশ্রয় দিতে পারে কিনা।' গদাধরও তাই চায়। ফলে অন্দরমহলে গিয়ে সকলের সঙ্গে সে এমনভাবে মিশে গেল যে কখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়েছে কেউ বুঝতে পারে নি। এদিকে রাত হচ্ছে অথচ গদাধর ফিরছে না দেখে রামেশ্বরকে তার সন্ধানে পাঠালেন চন্দ্রা। বণিকপল্লীর সব পরিবারেই গদাধরের যাতায়াত ছিল ব'লে রামেশ্বর প্রথমেই সেখানে গেল। তারপর গদাধরের নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করলো। দাদার গলা শুনে দুর্গাদাসের অন্তঃপুর থেকে গদাধর হাঁক পেড়ে বললো—দাদা, যাচ্ছি গো! তারপর তাঁতি মেয়ের পোশাকেই রামেশ্বরের সামনে এসে দাঁড়ালো। সে দৃশ্য দেখে দুর্গাদাস নিজেও না হেসে থাকতে পারে নি।

পুরোনো সেসব দিনগুলি ছিল পরিপূর্ণ আনন্দ কৌতুক আর রঙ্গতামাসার দিন। তবে

আমোদ প্রমোদের এইসব বাহ্যিক উপকরণ থাকলেও আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি আর ঈশ্বরানুরাগ ক্রমেই গভীরভাবে গদাধরের মনে স্থিত হচ্ছিল। এক একটা সময় আসতো যখন তাকে দেখে মনে হতো সবচেয়ে চপল, সবচেয়ে প্রগলভ; কিন্তু পরমুহূর্তেই সে হয়ত অন্যরকম—গভীর এবং প্রগাঢ়। রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'তখন মেয়েরা আমার জন্যে খাবারদাবার রেখে দিত, কেউ সন্দেহ করতো না; সবাই ভাবতো বুঝি বা আমি তাদেরই পরিবারের একজন। কিন্তু আমি ছিলুম সুখের পায়রা—যেখানে সুখ, যেখানে আনন্দ আমিও সেখানে, দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য দেখলে ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে আসতুম।'

কিন্তু সেই দুঃখের দিনই সংসারে আবার ফিরে এল এবং পরোক্ষভাবে এই ঘটনাটিই একদিন তাঁর জীবনের মোড় অন্যদিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

প্রসবকালে পত্নী বিয়োগের যে ভবিষ্যৎবাণী রামকুমার করেছিলেন তা যে নিষ্ঠুরভাবে ফলে গিয়েছিল সে কথা আগেই বলেছি। সংসারে এই দুর্ঘটনাটি যখন ঘটে তখন গদাধরের বয়স মাত্র তেরো বছর।

প্রিয়তমা পত্নীর এমন আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ রামকুমার বেশ কিছুকাল মনমরা হয়ে কাটালেন। পুরোনো দিনের কত মহার্ঘ স্মৃতি বারে বারেই চোখের উপর ভেসে উঠত যেন। তখন মনে বড় কষ্ট হতো। তিনি বুঝতে পারলেন এমনভাবে স্মৃতিভারে আচ্ছন্ন হয়ে কামারপুকুরে বেশী দিন তিনি পড়ে থাকতে পারবেন না। তাছাড়া ঘরেও তাঁর নিত্যি অভাব। আয়পত্তর প্রায় নেই। মেজো রামেশ্বব সবে বিয়ে করেছে। সে যা আয় করে তা যৎকিঞ্চিৎ। মা চন্দ্রা বুড়োমানুষ, খাটবার শক্তি কমে গেছে তাঁর। আর আছে গদাধর; কিন্তু সে তো ছেলেমানুষ! এই টানাটানির মধ্যে নতুন এক খাবার মুখ জুটেছে—অক্ষয়। রামকুমারের মা-মরা ছেলে। এদিকে রামকুমার নিজেও ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। তাই স্থির করলেন ক'লকাতায় গিয়ে এক চতুষ্পাঠী খুলে বসবেন। বিদ্যাবিক্রয় ক'রে অন্তত কিছু আয় তো হবেই, তখন সংসারকেও সাহায্য করতে পারবেন।

ক'লকাতায় গিয়ে বছরে একবার করে কামারপুকুরে আসতেন রামকুমার। আসতেন সংসার দেখতে। সব থেকে দুর্ভাবনা ছিল গদাধরকে নিয়ে। মায়ের কোলমোছা ছেলে—তাই চন্দ্রার নয়নমণি ছিল গদাধর। শিশু অক্ষয়ও কাকা বলতে অজ্ঞান। সরল, নিষ্পাপ মিষ্টিস্বভাবেব গদাধরকে সবাই ভালোবাসতো। ভারি গুণের ছেলে গদাধর—ছবি আঁকা বলো, ঠাকুরের পট বানানো বলো, গান গাওয়া এ্যাক্টো করা, সবেতেই সে ওস্তাদ। বন্ধুর দল নিয়ে ইতি-মধ্যেই যাত্রাদল খুলে ফেলেছে সে। দলে সে-ই সর্বেসর্বা। পালা বাছাই করা, অভিনয় শেখানো সব ব্যাপারেই তার উৎসাহ খুব। সবাই ভেবে রেখেছিল যে শেষ পর্যন্ত যাত্রাদলে এ্যাক্টো করেই গদাধর তার জীবিকা নির্বাহ করবে।

রামকুমারের অবশ্য এসব পছন্দ নয়। নিজে শিক্ষক ব'লে তাঁর কেবলই মনে হতো যৌবনের অমূল্য দিনগুলি এমনভাবে নয় ছয় ক'রে নষ্ট করা ঠিক নয়। লেখাপড়া শিখে উপার্জক্ষম হতে হবে, বিয়ে থা ক'রে সংসারী হতে হবে, তবে না মানুষ! রামকুমার তাই পরামর্শ দিলেন গদাধর তাঁর সঙ্গে ক'লকাতায় চলুক। সেখানে টোলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শিখুক আর যেমনটি পারে তাঁকে সাহায্য করুক।

কিন্তু গদাধরেব ঝোঁক যে অন্যরকম ! টোলে পড়ে যে শিক্ষা হয় সে শিক্ষা মানুষকে অধিকার-সচেতন করে। পার্থিব ভোগের বস্তু সংগ্রহ করে স্তূপ করার আকাঙ্ক্ষা বাড়ায়। বাড়ায় যশোলিপ্সা। সুতরাং যে পাঠে হৃদয় শূন্য হয়-তেমন বিভ্রান্ত পাঠ নিয়ে কি হবে !

তবুও রামকুমারের অনুজ্ঞা মেনে নিল গদাধর। প্রিয়পরিজন সবাইকে ছেড়ে মানুষ-কীট পরিবৃত সেই কোলাহলমুখর ক'লকাতার ইস্কুলেই পাঠ নিতে চলেছে গ্রামের ছেলে গদাধর। কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের পথে এ কি কোনো পদক্ষেপ ? অবশ্য দৃষ্টির আড়ালে থেকে যিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, সেই অ-চক্ষু অ-কর্ণ সত্তার উপর গদাধবের অগাধ ভরসা। তাছাড়া পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভাই রামকুমারের কাজে সে নিজেকে নিয়োজিত করবে, এই ভেবেও মনে মনে সে ভারি খুশি।

দুভাই ক'লকাতার উদ্দেশে রওনা হলো। গদাধরের বয়স তখন ষোলো। গদাধরের ভবিষ্যৎ নিয়ে রামকুমারের অন্যরকম ভাবনা ছিল। তিনি জানতেনও না ভবিষ্যতের গর্ভে অদৃষ্ট তার জন্যে কি লুকিয়ে রেখেছে। তবে একথা ঠিক যে ক'লকাতায় এনে গদাধরকে যেন হাত ধরে তার ভাগ্যের কাছেই তিনি সমর্পণ করেছিলেন।

৪

রামকৃষ্ণ কিভাবে দক্ষিণেশ্বরে এলেন

সেকালের ক'লকাতা ছিল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পীঠস্থান ; কলকাতা বন্দর ছিল পশ্চিমী চিন্তাভাবনা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রবেশপথ। ভাল বা মন্দ, বদল যেমনই হোক না কেন, তার সূচনা হয়েছে এই শহর থেকেই। সুতরাং কামারপুকুর থেকে কলকাতা আসতে সেদিন গদাধরকে গ্রামজীবনের অফুরন্ত সময়ভাণ্ডার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল সমকালীন ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে।

যে বছরটিতে গদাধর কলকাতায় এলেন সেটি ১৮৫২ সাল ; ঠিক পাঁচ বছর পরেই ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে ইঙ্গ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি যুগের অবসান ঘটে। ১৮৫৭ ছিল ইতিহাসের সেই বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের বছর। (আধুনিক সরকারী পরিভাষায় এই বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমি অবশ্য প্রাচীন রীতিতে 'বিদ্রোহ' শব্দটি অবমাননাকর জেনেও ব্যবহার করবো, কারণ আমার অধিকাংশ পাঠক ১৮৫৭ সালের ঘটনাটি বিদ্রোহ বলেই জানেন। যাহোক, আমার অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্যে পাঠকদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।) এই ঘটনার ঠিক পরের বছরেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আনুষ্ঠানিক অবলুপ্তি হয়, ব্রিটিশ রাজশক্তির হাতে ভারত সরকারের পরিচালন-ক্ষমতা প্রত্যর্পিত হয় এবং ভারতবর্ষের সবরকম দায়দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অধীনে বর্তায়। সেই থেকেই ধীরে ধীরে ঘটনা-সংঘাত দীর্ঘ এবং রক্তাক্ত পথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন অংশে প্রাক্ বিদ্রোহকালীন অনেক রক্তক্ষয় ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। রাজশক্তিও নির্দয় বলপ্রয়োগের মাধ্যমে লোভের হাত বাড়িয়ে আত্মসাৎ করেছে ভূখণ্ডের পর ভূখণ্ড। ১৮৫২ সালের এমনি এক ঘটনা হলো ব্রহ্মদেশের সঙ্গে দ্বিতীয়বারের মতন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া এবং জোর ক'রে সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি প্রদেশ কেড়ে নেওয়া। কিন্তু আলোড়ন যত তীব্রই হোক না কেন ক'লকাতার আপাত নিস্তরঙ্গ জীবনে তার বিশেষ কোনো প্রভাবই পড়ে নি। সত্তর বছর ধরে ব্রিটিশ রাজশক্তি কলকাতা শহরকে গড়ে-পিটে 'শান্তির নীড়' করে তুলেছিল। কলকাতা ছিল এক জমকাল য়ুরোপীয় কলোনী, এক প্রাসাদনগরী। কলকাতার স্থাপত্য ছিল প্রাচীন গ্রীকো-রোমক স্থাপত্যের এক নয়া সংস্করণ। বিশাল বিশাল হর্ম্য, চাঁদনীযুক্ত প্রবেশদ্বার, নিরঙ্কুশ আলোবাতাসবাহী বড় বড় বাতায়ন এবং উষ্ণতারোধের জন্যে নামমাত্র আসবাবে সজ্জিত সুবিশাল কক্ষশ্রেণী। সমাজজীবন ছিল স্থির। জীবন-যাপনে কোনো অসংযম ছিল না—আচরণ ছিল অত্যন্ত কেতা-দুরস্ত ও মাপা। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা সঙ্গে ভৃত্য নিয়ে ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে শহর বেড়াতেন। সান্ধ্য মজলিসে এসে পৌঁছানো মাত্র ভৃত্যকুল জ্বলন্ত মশাল হাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত। রাজপুরুষদের পরিবারের লোকেরা চার্চে যেত উপাসনা করতে, অপেরাতে যেত অবসর বিনোদনের জন্যে।

মহিলারা গাড়ি চড়ে এস্‌প্ল্যানেডে বেড়াতে যেত, আলাপ-সালাপ করত অন্য মহিলাদের সঙ্গে, ছেলেরা ক্রিকেট খেলতো। শহরের আবহাওয়া যেমনই হোক না কেন ইংরেজদের বাস এখানে যাতে নিরাপদ হয়, আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবেশটি যাতে 'হোম' পরিবেশের অনুকূল থাকে তার জন্যে ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি ছিল না। দাস পরিচয় ছাড়া আর অন্য কোনো পরিচয়ে স্থানীয় বাঙালীর পক্ষে রাজহর্ম্যের অন্তঃপুরে প্রবেশের আদেশ ছিল না। এমনকি ধনী ও অভিজাত কোনো বাঙালী এ জাতীয় উৎসবে আমন্ত্রিত হলেও অভ্যর্থনার ব্যাপারটি হতো নেহাতই বাহ্যিক—বন্ধুর সমাদর তারা পেতো না। অবশ্য তৎকালীন কলকাতার ব্রিটিশ সমাজকে একবার বিতর্কের আবর্তে পড়তে হয়; গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড পঁয়তাল্লিশজন বাঙালী কলেজ ছাত্রদের পাদুকা পরিহিত অবস্থায় তাঁর সামনে উপস্থিত হবার অনুমতি দিয়েছিলেন ব'লে। সে যাহোক, দিন যত এগোতে থাকে এই জাতীয় বাধা-নিষেধগুলিও ততই ভাঙতে শুরু করে।

তৎকালীন ইংরাজ চরিত্রের যে বৈসাদৃশ্য, যে স্ববিরোধ তার কিছু কিছু নমুনা যে কোনো নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের কাছেই ধরা পড়বে। তারা ছিল অসৎ, ছিল নীতিবোধশূন্য সাম্রাজ্য-বাদী। তারা রাস্তা বানিয়েছে, সেতু গড়েছে, হাসপাতাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে আবার অবিরাম চেষ্টায় ধীরে ধীরে দেশটিকে গ্রাসও করেছে। ভারতীয়রা তাদের চায় নি; কিন্তু ঈশ্বরাদেশ মনে করে তারা এদেশের মানুষদের সেবা করেছে—অকালে বুড়ো হয়ে মলিন পাংশু মুখে; লাঠিতে ভর দিয়ে জীবনটাকে কোনোক্রমে সাগরপারের দেশ অব্দি টেনে নিয়ে গেছে—বোধহয় মরতে। দুশো বছর ধরে এ দেশটিকে ভোগদখলে রাখতে কত শত সহস্র প্রাণ অকালে ঝরে মাটির তলায় সমাধিস্থ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এরা কেউ সমাজকর্মী, কেউ দুঃসাহসী কেউ বা নিছক ঈশ্বরভক্ত। এদের একমাত্র সান্ত্বনা যে, ঈশ্বরানুগ্রহে এই অসভ্য বর্বর দেশের প্রতিকূল পরিবেশে অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষের সেবায় এরা স্বেচ্ছাধীন নির্বাসন নিয়েছে। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার এরা কেউ এই দেশটির যথার্থ অধ্যাত্ম পরিচয় জানতে চায় নি। জানতে চায় নি যে, একদা যে দেশের মাটিতে তারা দাঁড়িয়ে ছিল সেই দেশটি পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে ধর্মনিষ্ঠ; জানতে চায় নি, একদা যে সুসংহত মহান্ অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে তারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বাস করে গেছে তার সামনে তাদের সংকীর্ণ দেশাচার কেন প্রাদেশিকতা বলে উপহসিত হয়েছিল। এমন কি স্যার হেনরী লরেন্সের পত্নী শ্রীমতি লরেন্সের মতন পুণ্যপ্রাণা নিবেদিত-প্রাণ ইংরাজ মহিলাও পরম উদাসীনের মতন বলেছিলেন, 'সব থেকে দুর্ভারি তখনই মনে হয় যখন ভাবি যে, আমার একপাশে ছড়িয়ে আছে এক মূঢ় অর্বাচীন হিন্দু পৌত্তলিকতা আর অন্যপাশে ঐশ্লামিক ধর্মান্ধতা। যখন দেখি এই ধর্মনীতি গভীরভাবে এদেশের মানুষের মন অধিকার করে আছে, তখন আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যে, এদেশের মানুষের কখনও মুক্তি হতে পারে!'

এইসব বিদেশী শাসকদের সঙ্গে গদাধরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না বললেই হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে যেসব বাঙালী তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই কম-বেশি পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এমনকি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ইংরেজ পরিচালিত ইস্কুলে পড়াশোনাও করেছেন। ইংরেজদের সম্পর্কে গদাধরের মনে কোনো

বিরূপ ভাবনা ছিল না ; তবে পরিহাসপ্রিয়তার অভ্যাসে ইংরেজের চরিত্র নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে রঙ্গ করতেন। যেমন, আত্মপ্রচার সম্বন্ধে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, 'রোগা লোকও যদি বুট জুতো পরে সে ওমনি শিস দিতে আরম্ভ করে, সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় সাহেবদের মতন লাফিয়ে উঠতে থাকে।' তাঁর যে সব বন্ধু পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ছিল তাদের সম্বন্ধে পরিহাস করে বলতেন, 'দ্যাখো দ্যাখো সায়েবমানুষ হয়ে কত কষ্ট করে আমার এখানে এসেছে। তার মানে আমি যেগুলি প্রত্যক্ষ করেছি সেগুলি ওরা গাঁজাখুরি বলে মানে না।' পার্কের মধ্যে সায়েবদের একছেলেকে বালক কৃষ্ণের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তাঁর ভাবসমাধি হয়েছিল। শ্রীমতী লরেন্স এর কী ব্যাখ্যা করবেন জানি না। তবে শুধু বিধর্মী আর পৌত্তলিক বলেই রামকৃষ্ণ কি অবজ্ঞাত হবেন!

একথা ঠিক নয় যে দাসত্ব ছাড়া বাঙালী জীবনের অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যের দিক ইংরেজের চোখে সেদিন পড়ে নি। সেদিন এমন অনেক বাঙালী ছিলেন যাঁরা ভয়ডরহীন মনে রাজশক্তির কর্তৃত্ব আর রক্তচক্ষুর শাসন উপেক্ষা করেছেন এবং রাজশক্তির সামনে নিজেদের সম্মানের আসনটি উঁচুতে তুলেছেন।

এমনি একজন প্রত্যয়দৃপ্ত মহিলা হলেন রাণী রাসমণি। (রাসমণি রাজমহিষী নন। ডাকনাম রাণী—সেই নামেই গুরুজনরা ডাকতো। মেয়ে বড় হলেও সাধারণ মানুষ ওই নামটিকেই বীজমন্ত্র করে নেয়। শুধু যে নেত্রীসুলভ তেজস্বিতা তা নয় ; রাসমণি ছিলেন দয়ার প্রতিমূর্তি। তাই রাণীর মতই সবাই তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করতো।) রাণী বিধবা হয়েছিলেন চুয়াল্লিশ বছর বয়সে। স্বামী রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যুর পর তাঁর বিপুল ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হলেন রাসমণি। কলকাতার জানবাজার অঞ্চলে তাঁর বিশাল প্রাসাদ-ভবন। সেখানেই তিনি বাস করেন। তাঁর দানধ্যান, দেবদ্বিজে ভক্তি আর তেজস্বিতার কথা তখন কলকাতার মানুষদের মুখে মুখে ফিরতো। এমন একজন অসাধারণ মহিলা, যিনি ধনে মানে মর্যাদায় অভিজাত, জন্মসূত্রে তিনি কিন্তু একজন শূদ্রা রমণী মাত্র ছিলেন। ভারতবর্ষে অবশ্য এই অসঙ্গতির ঘটনা মোটেও বিরল নয়।

এই প্রসঙ্গে একটি শোনা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। ইংরেজ সরকার হুগলী নদীর মোহানার কাছে মাছধরা জেলেদের উপর এক নতুন কর বসালেন। জেলেরা এমনিতেই দরিদ্র, তায় নতুন করের উৎপাত। সুতরাং রাণীর খাস জমিতে বসবাসকারী সব জেলেই এল নালিশ জানাতে। রাণী তাদের ভরসা তো দিলেনই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিব্যবস্থাও নিলেন। অনেক মূল্যের বিনিময়ে তিনি প্রথমেই সরকারের কাছ থেকে নদীর অংশটুকু ইজারা নেবার প্রস্তাব দিলেন। সরকার ভাবল রাণী বুঝি বা গেছো ভেড়ি তৈরি করবেন তাই এই মেয়াদী ব্যবস্থা। সরকার এই শর্ত সাপেক্ষে সম্মত হলো যে রাণী নিজেই সরকারকে কর দেবার দায়িত্ব নেবেন এবং সকলের কাছ থেকে কর সংগ্রহের দায় থেকে সরকার রেহাই পাবে। ইজারা পেয়েই রাণী নদীর অনেকখানি অঞ্চল লোহার শিকল দিয়ে এমনভাবে আলাদা করে দিলেন যে জাহাজ পারাপারের পথ থাকলো না। সরকার বাহাদুর প্রতিবাদ জানালে রাণী বললেন, 'অনেক দাম দিয়ে অধিকারটুকু কিনেছি, এখন যদি ওই অঞ্চল দিয়ে জাহাজ পারাপার করতে দিই তাহলে জলে আলোড়ন হবে এবং মাছেরা ভয় পেয়ে অন্যত্র চলে যাবে। আমি তখন

অনেক টাকার লোকসানে পড়ে যাব। অবশ্য সরকার যদি ধার্য কর তুলে নিতে সম্মত থাকেন তাহলে আমিও অধিকার ছেড়ে দেব। অন্যথায় সরকারের নামে ক্ষতিপূরণের মামলা আনতে আমি বাধ্য হবো।' বলাবাহুল্য ইংরেজ সরকার সেদিন মর্মে মর্মে এই বীরাঙ্গনার মধ্যে তাদের যোগ্য সমকক্ষ খুঁজে পেয়েছিল। এই ঘটনার পর নতুন ধার্য কর প্রত্যাহৃত হয়ে যায়।

রাণী ছিলেন দেবী কালিকার ভক্ত। ১৮৪৮ সাল। রাণী মনস্থ করেছেন দেবভূমি কাশীধাম তীর্থভ্রমণে যাবেন। সব আয়োজন প্রস্তুত। কিন্তু যাত্রার ঠিক আগের রাতে রাণী এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন। জগন্মাতা যেন তাঁকে বলছেন, 'কাশী গিয়ে কি হবে! তার চেয়ে গঙ্গার ধারে একটা মন্দির বানিয়ে আমায় সেখানে প্রতিষ্ঠা কর্! নিত্যপূজা ভোগ আরতির ব্যবস্থা কর্! ওই বিগ্রহের মধ্যেই আমি স্বরূপে প্রকাশিত হবো—তোর পূজা আমি নেব।'

রাণীর ধর্মবিশ্বাস এত গভীর ছিল যে স্বপ্নাদেশ পাবার পরদিনই তীর্থভ্রমণের অভিলাষ তিনি ছেড়ে দিলেন। সেদিনই মিঃ হেস্টী নামে একজন অ্যাটর্নির কাছে লোক পাঠালেন, তারপর কলকাতা থেকে মাত্র চাব মাইল উত্তরে গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে বিশ বিঘা জমি কেনার উদ্যোগ সম্পূর্ণ করলেন। জমি কেনা হলো। জামাতা মথুরামোহনেব তদারকিতে গঙ্গার ধারে এক উদ্যানের মধ্যে অনেকগুলি মন্দির তৈরির এক ব্যয়বহুল পরিকল্পনা নিলেন রাসমণি। গদাধর যখন কলকাতায় এলেন তখন সেই মন্দিরের নির্মাণ কাজ সবে শুরু হয়েছে।

রামকুমাবেব টোলটি ছিল ঝামাপুকুব অঞ্চলে। গদাধর সেখানেই স্থিতু হয়ে দাদাকে সাহায্য করতে লাগলেন। মামুলিভাবে বাঁচবার জন্যে রামকুমাবকে অনেক কাজই করতে হতো। সুতরাং একজন সহকারীর বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেই সময় সংস্কৃত টোলে বিদ্যা বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ছাত্ররা দান হিসাবে কিছু দিতে চাইলে শিক্ষকরা অবশ্য তা গ্রহণ করতেন। তবে সে দান অনিশ্চিত ব'লে প্রধানত সরকারী খয়রাতের উপব তাঁরা নির্ভর করতেন। উত্তীর্ণ প্রতিটি ছাত্রের মেধাগত যোগ্যতার বিচারে সরকাবের খয়রাতি সাহায্যের পরিমাণ স্থির হতো। নিয়মটিকে একেবারে ত্রুটিহীন বা নিবপেক্ষ বলা চলে না। কাবণ ভাগ্যবান ছাড়া কোনো শিক্ষকের কপালে সহজে মেধাবী ছাত্র জুটতো না। তাছাড়া পরীক্ষায় ফলাফলের ব্যাপারটি অনিশ্চিত বলে শিক্ষকদের এ ব্যাপাবে দায়ীও করা যেত না।

রামকুমারের অবশ্য দ্বিতীয় একটি জীবিকা ছিল। তা হলো যজমানি। পূজা দিতে অব্রাহ্মণের অধিকার নেই। তাই ধনী অব্রাহ্মণ গৃহস্থ গৃহদেবতার নৈমিত্তিক পূজার জন্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত করতেন। তাঁরা দুবেলা এসে গৃহদেবতার পুজো করে দিয়ে যেত। কিন্তু পূজাদি কাজে অনেক সময় ব্যয় হয় এবং শিক্ষকতার ফাঁকে বাকি সময়টি এইভাবে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হওয়ায় যজমানির কাজগুলি গদাধরের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন রামকুমার।

একাজে গদাধর খুবই উপযুক্ত ছিলেন। পূজার আচরণ-বিধি ভাল করে জানা তো ছিলই উপরন্তু ঐ কাজে তাঁর আনন্দও হতো। অধিকাংশ পেশাদার পুরোহিত দায়সারা ভাবে যে কাজ করতো গদাধর সেটি সম্পন্ন করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে এবং ভক্তিযুক্ত মনে। এমন কি পূজানুষ্ঠান শেষ হলেও গদাধর বিদায় নিতেন না। পরিবারের সকলের সঙ্গে আলাপ-

সালাপ করতেন, গান গেয়ে শোনাতেন। অন্তঃপুরের পরদা প্রথার নিষেধ অমান্য করেই পরিবারের মেয়েরা অসঙ্কোচে যুবক গদাধরের সঙ্গে মেলামেশা করতো। গদাধরের অকপট নিষ্কলঙ্ক আচরণ আর তার বালক স্বভাবের জন্যে সবাই তাঁকে আপনজন মনে করতো। ফলে কামারপুকুরের মতন এখানেও অতি অল্প কালের ব্যবধানেই সকলের গদাধর প্রিয়তম হয়ে উঠলেন।

রামকুমার সবই দেখতেন। তাঁর মনেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া হতো। যে উদ্দেশে গদাধরকে ক'লকাতায় এনেছেন তা তিনি ভুলতে পারেন না। একথা ঠিক যে তাঁর প্রয়োজনেই গদাধরকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন ; কিন্তু বড় ভাই হিসাবে তাঁর কর্তব্য বা দায়িত্ব তিনি এড়িয়ে যান নি। এ ব্যাপারে গদাধরের সঙ্গে তাঁর অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। পড়াশোনা চালিয়ে যেতে মিনতি করেছেন, আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু গদাধরের এক গোঁ। মৃদু অথচ অটল জেদ তার—যে বিদ্যায় চালকলা বাঁধা পুরোহিত তৈরি হয় তেমন বিদ্যায় তাঁর আগ্রহ নেই। ভাইকে প্রাণাধিক স্নেহ করতেন রামকুমার। ফলে জোর ক'রে নিজের মত চাপিয়ে দিতে তাঁর মন চায় নি। সুতরাং সর্বদিক বিবেচনা করে অযথা হস্তক্ষেপের প্রলোভন ত্যাগ করলেন রামকুমার। বরং, গদাধর যাতে স্বমতে চলতে পারে সেই ব্যবস্থাই করলেন। যতটা পারলেন জীবন সংগ্রামের যোয়াল নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন। রামকুমারের স্থির বিশ্বাস ছিল যে অচিরেই তাঁরা দুভাই পথের সন্ধান পাবেন।

এমনি করে বছর তিনেক কেটে গেল। রাণী রাসমণি সেই জাতের মহিলা যাঁরা সুবিধা-অসুবিধার কথা ভেবে অকারণ উদ্বিগ্ন না হয়ে সোজাসুজি কাজের মধ্যে সাহসের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। কিন্তু মন্দির নির্মাণ কাজের সমাপ্তির দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল ততই যেন একটা কঠিন বাস্তব-সমস্যা তাঁকে বিচলিত করতে লাগল। এটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন—মন্দিরের কাজের দায়িত্ব নেবার উত্তেজনায় এই সমস্যার কথাটি ভাবতে ভুলে গিয়েছিলেন রাসমণি। তিনি জানতে পারলেন যে মা-কে অন্নভোগ দেবার মনোগত বাসনা তাঁর পূরণ হবে না। অথচ এতকাল এই অভিলাষটুকুই মনে মনে পোষণ করে এসেছেন তিনি। অন্তরায় হলো তাঁর জাতি ও সামাজিক পদমর্যাদা। এ বিষয়ে শাস্ত্রশাসন অমোঘ। শাস্ত্র অন্নভোগ দেবার অধিকার দিয়েছে শুধু ব্রাহ্মণকে। যিনি শূদ্র, বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় তিনি নৈবেদ্যরূপে শুধু অপক্ক খাদ্যবস্তু নিবেদন করার অধিকারী। এমন কি শূদ্র কর্তৃক নির্মিত মন্দিরে দেব সেবার অধিকারও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের নেই। মায়ের কাছে নিবেদিত অন্নভোগের প্রসাদকণাও তিনি গ্রহণ করতে পারেন না। গ্রহণ করলে শাস্ত্রবিচারে তিনি অশুচি হবেন, পতিত হবেন।

ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছিলেন রাণী। এতদিন ধরে যে শ্রম যে অর্থ ব্যয় করেছেন তা বোধহয় বিফল হতে চলেছে। মরিয়া হয়ে তৎকালীন সব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে তিনি ব্যাখ্যাসহ বিধান চেয়ে পাঠালেন। কিন্তু কেউ তাঁকে উৎসাহিত করতে পারলো না। বরং একমত হয়ে সবাই জানালো যে রাণীর বাসনা কোনোদিনই চরিতার্থ হবে না।

প্রত্যাখ্যাতা হয়ে রাণী এবার রামকুমারের শরণাগত হলেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে

রামকুমার ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন। নীতিগত বিচারে অন্য পণ্ডিত-দের সঙ্গে তাঁর বিরোধ না থাকলেও উৎসাহিত হবার মতন একটা ব্যাখ্যা তিনি দিলেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন : 'মন্দির প্রতিষ্ঠার ঠিক আগে রাণী যেন মন্দির সম্পত্তি কোনো ব্রাহ্মণকে দান করেন। সেই ব্রাহ্মণই যেন দেবী প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন, অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন। এমন ব্যবস্থায় শাস্ত্রনিয়ম রক্ষিত হবে—তখন ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ প্রসাদ গ্রহণ করলেও দোষভাগী বা পতিত হবেন না।'

রামকুমারের ব্যবস্থা পেয়ে ভারি খুশি হলেন রাণী। কালবিলম্ব না করে নিজ গুরুর নামে দেবালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প করলেন। মনে মনে স্থির করলেন, দানের পর গুরুর অনুমতিক্রমে দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী হয়ে তিনি থাকবেন।

মন্দির-নির্মাণ কাজ তখনও কিছুটা অসমাপ্ত ছিল। তাহলেও মহাসমারোহে দেবী প্রতিষ্ঠার দিন ধার্য করলেন ১৮৫৫ সালের ৩১শে মে। প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এত ব্যস্ততার একটা কারণ ছিল। ইতিমধ্যে রাণী এক স্বপ্নাদেশ পান। মূর্তি-আশ্রয়ে দেবী বাক্সবন্দী অবস্থায় রাখা ছিলেন। রাণী স্বপ্নাদেশ পেলেন এমনভাবে বন্ধ হয়ে থাকতে তাঁর বড় কষ্ট হচ্ছে। যেন শীঘ্র তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। শোনা যায়, বাক্সবন্দী থাকার ফলে মূর্তিটি গরমে আর্দ্র হয়ে যায় ; অনেকের আশংকা আবদ্ধ অবস্থায় মূর্তি ঘর্মসিক্ত হয়েছিল।

অপরাপর পণ্ডিতরা রামকুমারের বিধান নিয়ে একটু সোরগোল তুলেছিল। তাদের মতে ব্যবস্থাটির মধ্যে উদারতা ও সৌজন্যবোধের মাত্রা কিঞ্চিৎ বেশী ছিল। গুরুর নামে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি প্রধানত আইনগত কারসাজি। কাজটি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধ এবং গর্হিত। কোনো সজ্জন ব্রাহ্মণের পক্ষেই এই মন্দিরের প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত হবে না। অবশ্য রাণীর অসন্তোষ বা রোষের কথা ভেবে প্রকাশ্যে এ-জাতীয় মতামত তারা প্রকাশ করতে সাহস পেত না। কিন্তু তবুও রাণীর পক্ষে মন্দিরের পূজক পদে কোনো সদাচারী ব্রাহ্মণ পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠতে লাগলো।

এই সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে রাণীকে দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করলো মহেশ নামে এক যুবক ব্রাহ্মণ। রাণীর সেরেস্তায় কাজ করতো মহেশ। সে ব'লে ক'য়ে তার বড় ভাই ক্ষেত্র-নাথকে রাধাগোবিন্দের পূজক হতে রাজী করাল। অন্য ব্রাহ্মণরা যেই সে কথা জানতে পারল অমনি রাণীর কাছে সহকারী পূজারী বা পাচক হবার আবেদন পেশ করলো।

রাধাগোবিন্দের পূজারী পাওয়া গেলেও কালিকাদেবীর মন্দিরের সুযোগ্য পূজারী কিছুতেই পাওয়া গেল না। এ ব্যাপারে রাণীরও যথেষ্ট বাছবিচার। এই পদে যিনি নির্বাচিত হবেন তিনি সবদিক থেকেই সুযোগ্য হবেন। শাস্ত্রজ্ঞ তো বটেই, উপরন্তু সদাচারী এবং ভক্ত হতে হবে তাঁকে। রামকুমারের দিকে রাণীর নজর ছিল। মনে মনে তাঁকেই নির্বাচিত করে রেখেছিলেন। সুতরাং মহেশের হাত দিয়ে রামকুমারের নামে রাণী এক অনুরোধপত্র পাঠালেন। রামকুমারকে ঘনিষ্ঠভাবেই জানতো মহেশ। তার জন্মভূমির গ্রাম কামারপুকুরের কাছাকাছি হওয়ায় এই পরিবারটিকে মহেশ জানতো। মহেশের দৌত্যকর্ম অসফল হলো না। নানাভাবে বুঝিয়ে সুযোগ্য পূজারী না পাওয়া পর্যন্ত পূজারী পদে ব্রতী হতে রামকুমারকে সে রাজী করাল।

মহাসমারোহে পূর্ব-নির্দিষ্ট দিনেই দেবী কালিকা নতুন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা হলেন।

উৎসব আয়োজনের এতটুকু কার্পণ্য ছিল না। অকুণ্ঠিত অর্থব্যয়ে উপলক্ষটিকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছিল। দূরদূরান্তর থেকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা এসেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে একখানি রেশমী উত্তরীয় এবং একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দান করা হয়েছিল। অসংখ্য দীপমালায় সজ্জিত প্রতিটি মন্দির এবং আলোকোজ্জ্বল দেবালয়অঙ্গন হয়ে উঠেছিল দিনের মতন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। অষ্টপ্রহরব্যাপী চলেছিল স্তোস্ত্রপাঠ, নামগান। হাজার হাজার ভক্ত প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়েছিল।

সেদিন গদাধরও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু অন্নভোগ গ্রহণ করেন নি। বাজার থেকে কিনে আনা মুড়ি দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করে ঝামাপুকুর ফিরে গিয়েছিলেন। পরদিন আবার যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন তখন গদাধরকে দক্ষিণেশ্বরেই থেকে যেতে বললেন রামকুমার। রাজী না হয়ে আবার ঝামাপুকুরেই ফিবে গেলেন গদাধর। এরপর দিন সাতেক তিনি আর দক্ষিণেশ্বরে গেলেন না। এদিকে রামকুমার না থাকায় ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী প্রায় বিকল। প্রতিমুহূর্তেই রামকুমারকে আশা করছেন গদাধব। কিন্তু সপ্তাহ অতীত হলেও রামকুমার যখন ফিরলেন না, তখন নিজেই একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পেঁছিলেন গদাধর। সেখানে রামকুমারের মুখ থেকে শুনলেন যে রাণীর খুব আগ্রহ যে রামকুমারই পাকাপাকিভাবে দেবী কালিকার পূজারীপদে ব্রতী হোন। রাণীর অনুরোধ মেনে নিয়েছেন রামকুমার। তিনি রাজী হয়েছেন ; শুধু তাই নয়, ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীটিও তুলে দিতে মনস্থির করেছেন।

গদাধর স্তম্ভিত; তাঁর মনে হলো অগ্রজের এই সিদ্ধান্ত অন্যায় এবং অবিবেচনা প্রসূত। নির্ভীকভাবে রামকুমারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করলেন গদাধর। স্বর্গত পিতৃদেব ক্ষুদিরামের উপদেশের কথা মনে করিয়ে দিলেন অগ্রজকে। বললেন, শূদ্রাণীর স্বার্থের অনুকূলে পূজারী হতে সম্মত হওয়া বা তার অনুগ্রহ গ্রহণ করা, উভয় কার্যই অব্রাহ্মণোচিত বলে ক্ষুদিরাম মনে করতেন। কিন্তু রামকুমার অসাধু নন—তর্কাতীত তাঁর সাধুতা। আপন সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা। সুতরাং নিঃসংকোচে গদাধরের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন রামকুমার। কিন্তু একজনও অপরকে স্বমতে আনতে পারলেন না। অগত্যা সুমীমাংসার জন্যে 'ধর্মপত্রের' গ্রাম্য পদ্ধতির উপরেই দুভাইকে নির্ভর করতে হলো। এই মীমাংসা-পদ্ধতিকে নিরপেক্ষ বলেই গ্রামের মানুষ মনে করতেন। টুকরো কিছু কাগজ বা বেলপাতার উপর 'হাঁ' অথবা 'না' লিখে সেগুলি একটি ঘটের মধ্যে রাখা হতো ; তারপর যে কোনো শিশু ঘটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে হাঁ অথবা না লেখা পত্রগুলি তুলতো। পত্রে 'হাঁ' থাকলে ধরে নেওয়া হতো যে কাজটি অনুষ্ঠিত হোক। বলা বাহুল্য 'না' থাকলে অভিপ্রায় হতো বিপরীত। এক্ষেত্রে মীমাংসা হলো যে রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে পূজারী হয়েই থাকবেন। গদাধর সে মীমাংসা মেনে নিলেন বটে, কিন্তু ঠাকুরবাড়ির অন্নভোগ সেদিন গ্রহণ করলেন না। রামকুমার তখন রঙ্গ করে বললেন, 'তাহলে এক কাজ কর্। মন্দিরের ভাঁড়ার থেকে সিধে নিয়ে গঙ্গার জলে স্বপাক করে খা ! গঙ্গার জলের ছোঁয়া পেলে কিছুই অশুচি থাকে না, একথা তো মানবি !'

গদাধর একথা কিন্তু পরিহাস মনে করেন নি। তাঁর গভীর গঙ্গাভক্তির কথা অনেকেই জানেন। আজীবন এই পূতবারিরূপ গঙ্গার ধারেই তিনি বাস করে গেছেন। তিনি বিশ্বাস

করতেন যে ব্রহ্মবারিগঙ্গার ধীর বাতাস যতদূর প্রবাহিত হয় ততদূর পর্যন্ত ভূমিখণ্ড পবিত্র হয়ে ওঠে। এই গঙ্গাভক্তির জন্যেই তিনি শেষ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে থেকে যেতে রাজী হয়েছিলেন। অবশ্য সেখানে বাস করলেও বহুদিন অব্দি তিনি স্বপাক ভোজন করেছেন।

মন্দিরের অন্নভোগ গ্রহণে গদাধরের অনাগ্রহের কারণটি নিয়ে সারদানন্দ কিছু আলোচনা করেছেন। একথা যথার্থ যে কোনো অহিন্দু পাঠকের কাছে আহার্য নিয়ে এই বাছবিচারের গোঁড়ামি স্পষ্টতই বাড়াবাড়ি, কারণ ঘটনাটির মধ্যে একটুও যুক্তিগ্রাহ্যতা নেই। তাহলে গদাধর এমন আচরণ করেছিলেন কেন? তিনি কি ন্যায়নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাতে ব্যগ্র হয়েছিলেন? অথবা নিষ্ঠা বিচারে তিনি যে অগ্রজের চেয়েও উগ্র সে কথা কি স্থূল চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন? সারদানন্দ অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, না তা নয়। শুধু বলা নয়, একজন সাধারণ মানুষের ধর্মান্ধ আচরণের সঙ্গে গদাধরের ন্যায়াচারের তফাৎ যে কোথায়, দাগ টেনে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। একজন ধর্মান্ধ মানুষ অহংবোধের অভিপ্রায় দ্বারা পরিচালিত হয়। তার বিবেকবোধ অহংকার দিয়ে ঢাকা আচ্ছন্ন-সংস্কার ছাড়া কিছু নয়। এই সংস্কার নিয়েই তার গর্ব, ফলে ভেঙে ভেঙে সে নিজেকে গড়তে শেখে নি। কিন্তু গদাধরের আচরণের মূলভিত্তি ছিল বিশ্বাস আর সত্যপরায়ণতা। শাস্ত্রকাররা যা বলেছেন, মহাজ্ঞানী মহাজন ব্যক্তিরা যা শিখিয়েছেন শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের তিনি জীবনে যুক্ত করেছেন। স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে শাস্ত্র-বচনের বিকৃত ব্যাখ্যা করেন নি বা কোনো জায়গায় আপোষ করে কিছু পেতে চান নি। সত্যের প্রতি এই অবিচলিত শ্রদ্ধা প্রথম প্রথম গোঁড়ামি ব'লে ভুল হতে পারে; কিন্তু ধীরে ধীরে শ্রদ্ধার স্বরূপটি প্রকাশ পেতে বাধ্য। কোনো মহৎ প্রাণ যখন পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম আলোয় ঝলমল করে তখন শাস্ত্র শাসনের স্থূল নির্দেশ মানার দরকার হয় না। নিয়ম-শাসনের খুঁটিগুলি তখন অক্ষম অবলম্বনের মতন খসে পড়ে। আমরা দেখবো জাতিপ্রথার সমস্ত নিয়ম শাসন বারবার ভেঙে আপনাকে সংস্কৃত করেছেন রামকৃষ্ণ। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে শাস্ত্রশাসনের কঠোরতা তিনি অস্বীকার করেছিলেন।

৫

দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দিকের দিনগুলি

মন্দির নির্মাণের সেই দিন থেকে একশ' বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে; কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির বিশেষ কোনো বদল হয় নি। গঙ্গার ধারে অবস্থিত এই মন্দির প্রাঙ্গণ আজও আমাদের মনোহরণ করে। (এই রকম আরেকটি দৃষ্টিনন্দন মন্দির হলো বেলুড় মঠ, যেটি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয়) দক্ষিণদিক থেকে নদীব উজানে তাকালে দক্ষিণেশ্বরের সম্পূর্ণ দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। সেখানে দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করছে এপার ওপাব জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক বিশাল সেতু। অবশ্য রামকৃষ্ণভক্তের কাছে এইটুকুই সান্ত্বনা যে একদা, অন্যতম শেষ ভাইসরয় লর্ড উইলিংডনের নামাঙ্কিত এই সেতু বর্তমানে শ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দের পুণ্য-স্মৃতিতে নিবেদিত।

আমরা ঠিক যেমনটি আশা করি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-অঙ্গন তেমনটি পরিচ্ছন্ন নয়। টালি বসানো উঠানটির অনেক অংশই হয় ভাঙা নয়ত এবড়োখেবড়ো। আজকাল বাগানটিরও তেমন পরিচর্যা হয় না। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ার দরুণ কিছু কিছু বাড়ির দেয়াল নোনাধরা। পবিত্র মন্দির অঙ্গনের প্রবেশ পথের কাছেই ছেলেব দল ভিড় করে জটলা করে; হয় বই ফেরি করে নয়ত ভক্তের ছেড়ে রাখা জুতা আগলায়। অবশ্য এগুলি খুবই তুচ্ছ অসুবিধা। তবে একালের দর্শকরা অন্তত এইটুকুর জন্যে কৃতজ্ঞ হবেন যে রামকৃষ্ণের পরিণত জীবনের অনেক অভিজ্ঞান চিহ্নই এখানে আজও অক্ষত হয়ে আছে।

মন্দিব সংলগ্ন যে জমিটুকু রাণী কিনেছিলেন তার খানিকটা ছিল মুসলমানদের কবর-স্থান; এক গাজীসাহেবের পীরের থান। স্থানটির আকার কাছিমের পিঠের মতন কুব্জ। শাস্ত্রে বলে যে এমন কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি স্থানই শক্তিপ্রতিষ্ঠা ও শক্তিসাধনার জন্য প্রশস্ত। উত্তরদিকে মন্দির-সন্নিহিত জমিখণ্ডের বেশ খানিকটা অংশ রামকৃষ্ণের মর্ত্যবাসকালেই ইংরেজ সরকারের গোলাবারুদের সামরিক ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছিল।

নদীবক্ষ থেকে তাকালে গম্বুজাকার ভবনগুলির সম্মুখভাগের অঙ্গসৌষ্ঠবে টেরাকোটার কাজ দেখতে পাওয়া যায়। সামনের সারিতে গঙ্গাতটের ঠিক উপরিভাগে স্নানঘাটের দুধারে দ্বাদশটি শিবমন্দির। নৌকা থেকে নেমেই স্নানের ঘাট। তারপর বিস্তীর্ণ সোপানাবলী। সোপানের পরে প্রশস্ত চাঁদনী। চাঁদনীর পরে পাকা উঠান। নদীবক্ষ থেকে দ্বাদশ শিবমন্দির ছাড়া অন্য দেবালয়ভবন চোখে পড়ে না। ব্যতিক্রম শুধু মধ্যের সুউচ্চ কালীমন্দির, যেটি সকলের মধ্যে মহান হয়ে বিরাজ করছে।

ছোট ছোট দ্বাদশটি শিবমন্দিরের ছাত চূড়াকৃতি। প্রতিটি মন্দিরের উপরিভাগের স্থাপত্য গ্রাম বাংলার খড়ো ঘরের অনুকরণে গাঁথা। পূজাস্থানের ভিতর আর বহির্ভাগের গঠন

একই রকম। গর্ভগৃহে পাথরের লিঙ্গমূর্তি ছাড়া অন্য কোনো বিগ্রহ নেই। আকারে মূর্তিগুলি সাধারণত বিভিন্ন মাপের হয়। দক্ষিণেশ্বরের লিঙ্গমূর্তিগুলি উচ্চতায় সাড়ে তিনফুটের মতন। পূজাবিধি খুবই সাদাসিধা। শিবস্তোত্র পাঠের সময় চাল, বেলপাতা, দুধ এবং মধু দিয়ে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। লিঙ্গমূর্তির তলদেশে এক গোলাকার আধার—নৈবেদ্যগুলি সেখানেই পড়ে এবং পরে নিঃসরণপথে নির্গত হয়।

বিদেশী গবেষকরা মনে করেন যে লিঙ্গমূর্তি এবং তলদেশের গোলাকার আধারটি যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রীর যৌন অঙ্গের প্রতীক চিহ্ন। হ্যাঁ, যুক্তিটি একদিক থেকে যথার্থ। কারণ, যে কোনো বস্তুই কোনো না কোনো বস্তুর প্রতীকরূপে গণ্য হতে পারে। এমন মানুষও আছেন যাঁরা খ্রীস্টধর্মে দীক্ষাদানের জন্যে ব্যবহৃত জলাধার ও সূক্ষ্ম দণ্ডটিকে প্রতীক অর্থে যৌন চিহ্ন বলে মনে করেন। কিন্তু কোনো খ্রীশ্চানই এমন ব্যাখ্যা নিঃশব্দে মেনে নেবেন না; এমনকি খ্রীষ্টধর্মের যাঁরা উগ্র বিরুদ্ধাচারী তাঁরাও কোনো রকম ছল করে বলতে পারবেন না যে এর মূলে আছে মানুষের যৌনবোধ। শিবপূজার ক্ষেত্রেও এই বিশ্বাসটুকু মেনে নেওয়া সমীচীন।

আদিতে কখনই লিঙ্গকে যৌনঅঙ্গের প্রতীকরূপে দেখা হতো না। সেকালে যাঁরা ধনী ভক্তবৃন্দ, হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই ধর্মেই, তাঁরা দেবতার উদ্দেশে মন্দির ও দেবালয় অর্ঘরূপে নিবেদন করতেন। ধনবান ভক্তদের অনুকরণে নির্ধন ভক্তরাও মন্দির ও দেবালয়ের ছাঁচে ছোট ছোট অনুকৃতি নিবেদন করতেন। সুতরাং সেইভাবেই ক্ষুদ্রাকার কোনো স্তম্ভের প্রতীকরূপে লিঙ্গকে দেখা উচিত।

অপরদিকে ধর্ম ও যৌনবিশ্বাসের মধ্যে মূল যে পার্থক্য সেটিও স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার। হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যেই স্ত্রী পুরুষের দ্বৈত সত্তা মূর্ত হয়ে আছে। (পাশ্চাত্য জড়বাদ হিন্দুর এই দ্বৈত বিশ্বাস যথার্থ বোঝে না বলেই বিভ্রান্তির কারণ ঘটে। ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ পাশ্চাত্য গবেষকরা ঈশ্বরের একটি সত্তাই স্বীকার করেন)। একথা আগেই বলেছি যে ঈশ্বরের সেই নারী সত্তাটি হলো শক্তি—অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি এবং পুরুষ সত্তা স্বয়ং ব্রহ্ম।

যেহেতু হিন্দুব ধর্মতত্ত্ব নানা নাম ও তাঁদের নানা সম্পর্কে জটিল এবং যেহেতু এই কাহিনী নিবেদনের সঙ্গে হিন্দু ধর্মতত্ত্বের আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবে এসে যাবে, তাই এই ব্যবহারিক অসুবিধার কারণগুলি দূর করতে এতক্ষণ যা আলোচনা করেছি, বিস্তৃতভাবে তার একটি সারসংক্ষেপ প্রদান করে চিত্রটি সম্পূর্ণ করতে চাই।

(১) প্রকৃত সত্তা বা ঈশ্বরকে বলা হয় ব্রহ্ম।

(২) ব্রহ্ম যখন জীবদেহে বা বস্তুতে অবস্থিত ব'লে মনে করা হয় তখন তিনি আত্মা বা পুরুষ।

(৩) ব্রহ্ম-আত্মা অকর্মক।

(৪) ব্রহ্মের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বলা হয় প্রকৃতি বা মায়া।

(৫) যখন আমরা ব্রহ্ম-প্রকৃতি বলি অর্থাৎ যখন ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তির মিলন হয় তখন তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর যখন নানা গুণপনার আধার হন তখন তিনি ভগবান—সর্ব কর্মের প্রেরণা।

(৬) খ্রীশ্চান ধর্মতত্ত্বে যিনি 'পিতা' হিন্দুর তিনিই 'ঈশ্বর।' এই নিখিলবিশ্ব তাঁরই সৃষ্টি, তিনিই এই বিশ্বের রাজা। আত্মা বিরাজ করেন মানুষের অন্তরে, সুতরাং নিজেকে নিবিড়ভাবে জানলেই আত্মজ্ঞান পূর্ণ হয়। কিন্তু মানব কখনও ঈশ্বর হতে পাবে না। (ভুল বোঝাবুঝির, আর একটি কারণ হলো এই মতটি। খ্রীশ্চানের 'গড' আর হিন্দুর 'ঈশ্বর' প্রায় কাছাকাছি সত্তা বলে খ্রীশ্চান মনে করে। কিন্তু হিন্দুর ভগবান ঈশ্বর নয়—ঈশ্বর বা ব্রহ্মের আত্মা। হিন্দু যখন 'আমিই ভগবান' বলে, তখন তার এই উক্তি অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যক্ষ সত্য ব'লে মেনে নিতে হয়। একজন খ্রীশ্চানের কাছে এই উক্তি অবশ্যই ঈশ্বরের অমর্যাদাকর, সুতরাং নিন্দনীয়। ঈশ্বরকে অবজ্ঞা ক'রে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করতে চেয়েছিল লুসিফার। এই উদ্ধত দম্ভের জন্যে তার পতন হয়। 'লুসিফারের পতন' কাহিনীতে আমরা তার সবিস্তার উল্লেখ পাই।)

(৭) ঈশ্বরের ত্রয়ী রূপের কল্পনা এই রকম। যখন স্রষ্টা তখন তিনি ব্রহ্মা, যখন পালক তখন তিনি বিষ্ণু, যখন ধ্বংসকারী তখন তিনি শিব। আপনার মধ্য থেকেই ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করছেন, কিছু সময় ধারণ-পালন করেছেন, পরে আপনার মধ্যেই সৃষ্টি লীন করেছেন। এই শাশ্বত কালচক্রেই আবর্তিত হচ্ছে সৃষ্টি, স্থিতি, বিলয়।

(৮) এঁদের প্রত্যেকের পরমা সত্তা বিদ্যমান—এঁকে বলা হয় শক্তি। যেমন ব্রহ্মার শক্তি সরস্বতী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, এবং শিবের পার্বতী অথবা দেবী। কালী ছাড়াও শক্তির অন্য মহিমার কল্পনা আছে। তবে কালীই এই কাহিনীব মুখ্য প্রেরণা। দুর্গার মতো কালীও দেবীর এক মহিমা। সুতরাং কালীও শিবের পরমা শক্তি।

(৯) বিষ্ণুকে মাঝে মাঝে মানবদেহ ধারণ করে মর্ত্যে অবতীর্ণ হতে হয়। তখন তিনি দেহায়িত ঈশ্বর বা অবতার। এমন প্রধান দুজন অবতার হলেন রাম এবং কৃষ্ণ। বুদ্ধ এবং নাজারেথের অধিবাসী যীশুও হিন্দুর কাছে অবতাররূপে পূজ্য। হিন্দু বিশ্বাস করে যে মর্ত্যধামে আগামী দিনে আরও অবতারের আবির্ভাব হবে। রামকৃষ্ণ অবতাররূপে পূজ্য হতে পারেন কিনা সে আলোচনায় পরে আসছি।

ঐশ্বরিক-সম্বন্ধ নির্ণয়ের ব্যাপারটি জটিল হবে মনে করেই একটি সরল সংক্ষিপ্তসার দিলাম। অন্যান্য গ্রন্থে পাঠক একই সত্তার বিভিন্ন উপাধির উল্লেখ পাবেন। জটিলতা এড়াবার জন্যে আমি অবশ্য একই সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি উপাধি উল্লেখ করবো; অবশ্য অপরিহার্য তত্ত্ব যাতে গোপন না হয় তা আমি দেখবো।

কালী মন্দিরটি বিশাল হলেও পূজাস্থানটি খুবই স্বল্পপরিসর এবং বিগ্রহ, পূজারী ও গুটিকয়েক ভক্ত ছাড়া সেখানে আর কারও স্থান সঙ্কুলান হয় না। বাকী ভক্তের দল ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে মর্মর প্রস্তরাবৃত দালান বা সোপানশ্রেণীর উপর। মন্দির এবং পূজা-স্থানের মধ্যে আকারের এই অসঙ্গতির এক সুস্পষ্ট কারণ আছে। হিন্দু মনে করে, এ মানবদেহ মন্দিরমাত্র। এই দেহমন্দিরের অভ্যন্তরে পবিত্র পূজাস্থানটি হলো হৃদয় এবং হৃদয়ই হলো মানবাত্মার আসনবেদী। হিন্দুশাস্ত্র আমাদের শিখিয়েছে যে সর্বত্রগামী ব্রহ্ম 'বিরাটের চেয়েও বিরাট' এবং ভক্তের ধ্যাননিমগ্নতার জন্যে অন্তরঙ্গ আত্মার আকার 'অঙ্গুষ্ঠ সদৃশ'। সুতরাং মন্দিরের অন্তর্গত ক্ষুদ্রায়তন পূজাস্থানের কল্পনা সঙ্গত বলেই মনে হয়।

মানবদেহকে মন্দির মনে করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে। ভারতবর্ষের কিছু প্রাচীন মন্দিরের (দক্ষিণেশ্বর নয়) বহির্গাত্রে প্রণয়াসক্ত নরনারীর মিথুন মূর্তি ক্ষোদিত আছে। মিথুন মূর্তিগুলি মানুষের বহির্গামী ইন্দ্রিয় কামনার স্বরূপ প্রদর্শন করে। পূজাস্থানে মানুষের অন্তর্মুখী ধ্যানপরায়ণতার যে ভাবটি প্রকাশিত হয় তাব ঠিক বিপরীত ভাবের এক উগ্র অভিব্যক্তি দেখি এইসব মিথুন মূর্তিগুলির মধ্যে। সুতরাং ভাবা যেতে পারে যে ইচ্ছাকৃত ভাবেই মূর্তিগুলি ক্ষোদাই করা হয়েছিল। এক্ষেত্রেও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকে গেছে কারণ পাশ্চাত্য পরিদর্শকদের মতে ব্যাপারটি ধর্মের নামে উৎকট অশ্লীলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

দক্ষিণেশ্বরের কালী মূর্তিটি আকারে খুবই ছোট মাপের। উচ্চতায় তিন ফুটেরও কম। বেদীর উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তার উপরে শিব। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেতপাথরের, শ্যামার প্রতিকৃতি কালো পাথরের। লাল চেলি পরিহিতা কালী নানা আভরণে অলংকৃতা। তাঁর কটিদেশে নরকরমালা, গলায় মুণ্ডমালা। এগুলি ক্ষোদাই করা পাথর দিয়ে গাঁথা। মা লোলজিহ্বা। কেউ বলেন মা গ্রাম্যবধূর মতো লজ্জাশীলা তাই এমন ভঙ্গী, আবার কারও মতে মা রক্তপানে অধীরা তাই লোলজিহ্বা। মায়েব চারটি হাত। বাম হস্তদ্বয়ে নৃমুণ্ড ও রক্তাক্ত অসি। ডান হস্তদ্বয়ের একটিতে আশীর্বাণী অন্যটি বুদ্ধদেবের মতো অভয়পাণি।

এই প্রতীকী চিত্রটি পশ্চিমের সেই সব বিরুদ্ধবাদীদের ক্ষুণ্ণ করবে যাঁরা মনে করেন, যা সুন্দর যা মনোরম তাই সত্য তাই বাস্তব। হিন্দুদর্শন কিন্তু বিপরীত মত ব্যক্ত করে। হিন্দুদর্শন বলে যে অসুন্দর এবং সুন্দর উভয় অবস্থাই সমান বাস্তব (অথবা অবাস্তব) সত্য এবং অভিজ্ঞতার এই দুটি তট একই সূত্রে গাঁথা। আমাদের দৃষ্টিতে কালী ব্রহ্মশক্তি-স্বরূপা ; তিনি সৃষ্টি করেন আবার ধ্বংসও করেন। সুতরাং তিনি আমাদের জগজ্জননী মা—জীবন মৃত্যু, সুখ দুঃখ, অভয় শাসন, আনন্দ বেদনা, সবেরই তিনি উৎসাহ। ভক্তেরা তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অবস্থাগুলি মাতৃইচ্ছা ব'লেই মনে করে। এবং একথা নিশ্চিত, অন্য যে ভাবেই মানুষের অবস্থার বিচার করি না কেন মূলত তা ভাবপ্রবণতা। সুতরাং চাই আর না চাই কালীকে আমাদের ভালবাসতে শিখতে হবে ; যখন তা করবো তখনই সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রুর অভিজ্ঞতাগুলি নিজের মধ্যে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারবো, তখনই ভয় এবং বিরাগ ও কামনাকে আমরা জয় করতে সক্ষম হবো।

ভূপাতিত শিবদেহের উপর দেবী কালিকার আরূঢ়া ভঙ্গী দেখে হয়ত অনেকে ভাবতে পারেন যে দেবীর হাতেই শিব পরাভূত হয়েছেন—বিনষ্ট হয়েছেন তিনি। কিন্তু ধারণাটি ভুল। রামকৃষ্ণ প্রায়ই শিবকালীর তত্ত্ব এইভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন। কালীর পায়ের তলায় নিশ্চল শবদেহের মতন পড়ে আছেন শিব। শিবের হৃদয়াসনেই কালী অবস্থিত। দেবীর স্থির দৃষ্টির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে শিবের দৃষ্টি। অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে শক্তির মিলন সাধিত হয়েছে। ব্রহ্ম অকর্মক, তাই ভূপাতিত শিব শবদেহের মতো নিশ্চল, অনড়। প্রকৃতি কালীর স্থির দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়ে আছে শিবের দৃষ্টির সঙ্গে—ব্রহ্মশক্তির সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারী ভাব ব্রহ্মের সামনেই অভিব্যক্ত ; ব্রহ্ম তা দেখছেন, মেনে নিচ্ছেন।

দেবী কালিকার মন্দিরটি দুই ভবনের মধ্যে অবস্থিত। দক্ষিণে বিস্তীর্ণ মনোরম নাটমণ্ডপ। নাটমণ্ডপের দুপাশে দুসারিতে স্তম্ভশ্রেণী ; স্থাপত্য শৈলীর বিচারে দক্ষিণেশ্বরের নাট-মণ্ডপ আর কামারপুকুরের নাটমঞ্চের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য। সাদামাটা এই নাটমঞ্চের উপর দাঁড়িয়েই শিবচরিত্র অভিনয়ের সময় গদাধরের সেদিন ভাবসমাধি হয়েছিল।

উত্তরে রাধাকান্তের মন্দির। কৃষ্ণ এবং রাধা যুগল প্রেমমূর্তি। এই প্রেমসম্পর্ক অপার্থিব, কামগন্ধহীন, ঈশ্বরে নিবেদিত। এমনি ক'রে সাধারণ মানব-মানবীর দেহজপ্রেমও ঈশ্বর প্রেমের অপার্থিব উচ্চভূমিতে পৌঁছে দেওয়া যায়। তখন দেবতা আর দেবতা থাকেন না। তিনি হয়ে ওঠেন কখনও পিতা, কখনও মাতা, কখনও শিশু, কখনও দয়িত, কখনও সখা, কখনও প্রভু। ঈশ্বরে পতিভাব আরোপ করার প্রথা খ্রীশ্চান ধর্মেও আছে। প্রত্যেক ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী নিজেকে ঈশ্বরের প্রেমানুরাগিণী বলে মনে করে।

ভারতবর্ষে তিন ভাবরূপে কৃষ্ণের আরাধনা হয়। এই তিন ভাবরূপ কৃষ্ণের জীবনের তিন কালের প্রতীক। যখন শিশুভাব তখন বালগোপাল মূর্তিতে তিনি আরাধ্য। যখন বালকভাব তখন রাখালরাজা গোবিন্দ ; যখন প্রাজ্ঞ তখন অর্জুনের গুরু। গুরুরূপে অর্জুনকে যে উপদেশ কৃষ্ণ দিয়েছিলেন সেই উপদেশাবলী সম্বলিত হয়ে আছে ভগবদগীতায়। রাধাকান্ত মন্দিরে কৃষ্ণের বালকভাবের বিগ্রহ। রাখালরাজা কৃষ্ণের সঙ্গে রাধিকা ও গোপিনীদের তখন গোষ্ঠ মিলনের কাল। রাখালরাজা গোবিন্দের মাথায় শিখী পাখা। হাতে মোহন মুরলী। বাঁশির সুরে ভক্তের মন আকুল হয়, থরথর কম্পিত হয় দেহ। কৃষ্ণ ও রাধিকার দুটি মূর্তিই মাপে ছোট। কৃষ্ণ বিগ্রহটি উচ্চতায় সাড়ে একুশ ইঞ্চি, রাধা বিগ্রহ ষোলো ইঞ্চি। বিগ্রহ দুটি পরস্পরের দিকে অনুরাগে হেলানো। কৃষ্ণ হলেন ইন্দ্রনীলকান্ত তনু, রাধা গৌরী। তাঁদের দুজনের মিলন ও ভাবসম্মিলনের অভিজ্ঞান স্বরূপ রাধা পরেন নীলপাথরের নোলক, কৃষ্ণ পরেন শ্বেতমুক্তা। রাধার বসন নীল, কৃষ্ণের ধড়া পীত।

চক্‌মিলান উঠানের পশ্চিমদিকে দ্বাদশ শিব মন্দির ; মধ্যে চাঁদনী। অপর তিনদিকে সারিসারি ঘর। ঘরগুলি যথাক্রমে খাজাঞ্চীর দপ্তরখানা, ভাঁড়ার, অতিথিশালা এবং পাকঘর। উঠানের ঠিক উত্তর পশ্চিম কোণে রামকৃষ্ণের শয়নঘর। ঘরের সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে পূতসলিলা গঙ্গা। এই ঘরেই জীবনের বেশী সময় কাটিয়ে গেছেন রামকৃষ্ণ। পুণ্যার্থী ভক্তেরা আজও তাই শ্রদ্ধা ও কৌতূহল নিয়ে ঘরটি দেখতে আসে। ঘরটি বৃহদাকার, স্নিগ্ধ এবং মনোরম। সবদিক থেকেই শ্রেষ্ঠ। একদিকে গঙ্গার মুখোমুখি অলিন্দ, অন্যদিকে প্রাঙ্গণের স্তম্ভশ্রেণী। সম্প্রতি ঘরটির সংস্কার হয়েছে। ভক্তবৃন্দ তাই ক্ষুব্ধ, কারণ রামকৃষ্ণের পদধূলি বাহিত পুরনো সেই গৃহতল আর নেই। রামকৃষ্ণের ব্যবহার করা দুটি পালঙ্কই পাশাপাশি রাখা। একটিতে দিনের বেলায় বসতেন অন্যটিতে শুতেন। ঘর থেকে দেখা দৃশ্যের সামান্যই বদল হয়েছে। উঠানের উত্তরে নহবৎখানা। আমাদের এ কাহিনীতে নহবৎখানার এক বিশেষ ভূমিকা আছে। পশ্চিমদিক দিয়ে বেগে ব'য়ে চলেছে পিঙ্গলবর্ণ গঙ্গা। গঙ্গার অপর পারে নাতিউচ্চ তাল-তমাল বৃক্ষশ্রেণী। ওপারের শহরের ক্রমবর্ধমান শিল্পোন্নয়নের চিত্রটি আড়াল করে রেখেছে এই বৃক্ষশ্রেণী। এখান ওখান থেকে উঁকি দিচ্ছে লম্বা ধূম-নির্গম চিম্‌নি। তবুও সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় আশ্চর্য সুন্দর ও রহস্যময় হয়ে ওঠে গঙ্গা ; সোনাগলা রঙে রাঙানো নদীতীর তখন আবছারক্তিম। সেকেলে আমলের উঁচু গলুইওলা নৌকাগুলি

ধীরে ধীরে অস্পষ্ট সন্ধ্যাছায়ায় ডুবে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে। সেই ছায়ান্ধকারের পটভূমিতে নৌকাগুলিকে যেন ভেনীশ শহরের গণ্ডোলার মতন মনে হয়। আর সেই সুবর্ণবর্ণ আলোআঁধারী সন্ধ্যালোকের পরিবেশ দেখে পাশ্চাত্য আগন্তুকদের মনে পড়ে যায় ভেনীশ শহরের ঝিলের পাড় থেকে দেখা সূর্যাস্তের কথা।

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীটি মোট সম্পত্তির মাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম অংশটুকু অধিকার করে আছে। বাকী অংশের খানিকটা পুষ্পোদ্যান, ফলবাগান আর খানিকটায় বনবাদাড়। সেকালে দক্ষিণেশ্বরে তিনটি পুকুর ও একটি কুঠি ছিল। রাণী এলে সদলবলে ওই কুঠিতেই থাকতেন। রামকৃষ্ণ নিজেও কিছুকাল এখানে থেকেছেন। এখনই এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলবো না। কারণ, কাহিনীর শেষ দিকে রামকৃষ্ণের জীবনের কোনো কোনো ঘটনা আলোচনা করার সময় এইরকমই দুটি একটি ভবন ও স্থান সম্বন্ধে আমায় বলতে হবে। পাঠকরা হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে ইতিমধ্যে, এই পরিচ্ছেদের শুরু থেকেই, গদাধরের বদলে রামকৃষ্ণ নামটি ব্যবহার করছি। বস্তুত আমার পূর্বসূরী জীবনী-লেখকদের প্রথামতোই এই নামবদলের পালা এখান থেকে শুরু করেছি। বলতে গেলে ঠিক কোন্ পর্যায় থেকে গদাধর নতুন নামে পরিচিত হলেন তার সঠিক তত্ত্ব জানা নেই। এ বিষয়ে আমরা তিনটি অনুমান সূত্রের উপর নির্ভর করি। প্রথমটি হলো যে, গদাধরের বাপ-মা তাঁদের কুলদেবতা শ্রীরাম-চন্দ্রের নামেই রামকৃষ্ণ নামকরণ করেছিলেন। সূত্রটি শুধুই অনুমান। কারণ ছেলেবেলা থেকে গদাধর নামেই লোকে তাঁকে জানতো এবং ক্বচিৎ রামকৃষ্ণ নামে তিনি তখন পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় মতে (সারদানন্দের কাছে এই সূত্র-মতটি যথেষ্ট আদৃত) সন্ন্যাসী তোতাপুরী দীক্ষাদানকালে রামকৃষ্ণ নামকরণ করেন। গদাধরের দীক্ষাগ্রহণের এই কাহিনী আমি দশম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। তৃতীয় সূত্র হলো (এই সূত্রটিই সকলের কাছে গ্রহণ-যোগ্য সূত্র) যে রাণী রাসমণির জামাতা মথুরামোহনই সর্বপ্রথম তাঁকে জগতের কাছে রামকৃষ্ণ নামে পরিচিত করেছিলেন।

মথুরের ধীশক্তি এবং মতামতের উপর রাণীর অগাধ আস্থা ছিল। রাণীর সমস্ত কর্মদ্যোগের পাশেই মথুর এসে দাঁড়াতেন—দুজনের মধ্যে স্বভাব ও প্রকৃতিতে এক সুন্দর বোঝাবুঝি ছিল। মথুরকে পরিবারের একজন বলে ভাবতেন রাণী। তাই মথুর যখন বিপত্নীক হলেন তখন রাণী তাঁর সঙ্গে চতুর্থ কন্যার বিয়ে দিলেন। মানুষটিকে ঠিকই চিনেছিলেন রাণী। যেমন ছিল তার সতর্ক বিষয়বুদ্ধি তেমনি ছিল মানবচরিত্র জ্ঞান। এই বোধ থেকেই সাধকের অধ্যাত্মজ্ঞানের সঙ্গে মথুরের সম্যক চেনাজানা হতো। মানুষটি স্বভাবে ছিলেন সহজ। সবরকম সংস্কার মানতেন; তবে যথার্থ ভক্ত ছিলেন বলে ঈশ্বর নিষ্ঠার তাপটুকু নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারতেন। রাগ করতেন, তর্ক করতেন, কিন্তু মনে মনে যাঁদের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে আশ্চর্য রকমের নম্র হয়ে থাকতেন।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় এক আশ্চর্য অনুমান-শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন মথুর। একদিন দেখলেন বাগানে আপনমনে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন রামকৃষ্ণ—সরলতায় উজ্জ্বল যেন এক অপাপবিদ্ধ শিশু। যুবকটিকে দেখেই প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট হলেন মথুর। সেই দণ্ডেই মনে মনে স্থির করে ফেললেন যে এই ছেলেটিকেই রামকুমারের সহযোগীরূপে নিয়োগ করবেন। রামকুমার অবশ্য খুব একটা উৎসাহ দেখালেন না। অনুজ রামকৃষ্ণের

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মনে হতো কাজকর্ম করে এই ছোকরা কোনোদিনই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। মথুর অবশ্য জেদী মানুষ, লোককে কেমন করে বশে আনতে হয় সে বিদ্যেটুকু তাঁর জানা ছিল। তিনি কেবল সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

এইসময় নাগাদ ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এমন একজন মানুষ এলো যে উত্তর-জীবনে রামকৃষ্ণের খুব কাছাকাছি একজন হয়ে উঠেছিল। সে হৃদয়রাম—সম্পর্কে রামকৃষ্ণের ভাগ্নে। বয়সে বছর চারেকের ছোট হলেও দুজনের মধ্যে মেলামেশা ছিল ছেলেবেলা থেকেই। লম্বা চেহারার স্বাস্থ্যবান ছেলেটি দেখতে শুনতেও ভারি সুপুরুষ। কথাবার্তাও মজাদার, আমুদে। পরিশ্রমী এবং আত্মরক্ষায় সমর্থ সৎস্বভাবের ছেলেটি রামকৃষ্ণের সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে গেল অচিরেই। হৃদয়রামের কোনো আধ্যাত্মিক উচ্চভাব না থাকলেও ভগবদভক্তির অভাব ছিল না।

ছেলেবেলা থেকেই রামকৃষ্ণের মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ার সহজাত দক্ষতার কথা বলেছি। দক্ষিণেশ্বরে হৃদয়রামের আসবার কটি দিন পরের কথা। গঙ্গার বুক থেকে মাটি তুলে রামকৃষ্ণ এক চমৎকার শিবমূর্তি গড়লেন, তারপর মন্দির প্রাঙ্গণে বসেই শিবপুজো শুরু করলেন। সেদিন মথুর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মূর্তির গঠনশৈলী দেখে মথুর এত অভিভূত হলেন যে রামকৃষ্ণের কাছ থেকে মূর্তিটি চেয়ে নিলেন রাণীকে দেখাবেন বলে। মূর্তি দেখে রাণীও উচ্ছ্বসিত। সেই থেকে মথুরের ধ্যানজ্ঞান হলো কেমন করে রামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে আটকে রাখা যায়।

রামকৃষ্ণ নিজেও বোধহয় মথুরের উদ্দেশ্যটি আঁচ করতে পেরেছিলেন, তাই চেষ্টা করতেন মথুরকে এড়িয়ে যেতে। মানুষটার মুখের উপর না বলতে রামকৃষ্ণের বাধতো। অথচ মথুরের ইচ্ছে মতন পুজারীর চাকরি নিতেও তো মন চায় না! মাগ ছেলেকে খাওয়ানো পরানোর দায় যার আছে সে দাসত্ব করুক। কিন্তু তিনি তো বন্ধনহীন মুক্ত বায়ু! ঈশ্বর ছাড়া আর কারো দাসত্ব তিনি মানবেন কেন? হৃদয় অতশত বোঝে না। সে তর্ক ক'রে রামকৃষ্ণকে বোঝাবার চেষ্টা করতো। বলতো, দক্ষিণেশ্বরে এমন মহতের আশ্রয়ে চাকরি করা আর ঈশ্বরের দাসত্ব করা এক। কারণ এ-স্থান দিব্যধাম, স্বর্গতুল্য। রামকৃষ্ণের মন কিন্তু মানতো না। বলতেন, চাকরি মানেই চিরকাল আবদ্ধ হয়ে থাকা। তাতে মন পীড়িত হয়। সব থেকে বড় কথা হলো কালীমন্দিরে পূজারীর চাকরি নেওয়া মানেই দেবী অঙ্গের সব গহনার দায় নেওয়া। সে বড় হাঙ্গামার কথা। অতবড় দায়িত্ব নিতে তিনি পারবেন না। আমরা দেখেছি সারা জীবন ধরে টাকা পয়সা ধনরত্ন প্রভৃতি যাবতীয় ঐহিক অধিকার থেকে রামকৃষ্ণ কেমন করে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন। সে যাহোক, হৃদয়রাম এক সহজ সমাধানের পথ বলে দিল। দেবী অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কারের দায় নিতে সম্মত হলো হৃদয়রাম। ব্যাপারটিরও একটি সুমীমাংসা হলো। রামকুমারের অধীনে রামকৃষ্ণ ও হৃদয়রাম উভয়েই কালী মন্দিরের সহযোগী পুজারীর কাজে নিযুক্ত হলেন। স্থির হলো যে দেবীর অঙ্গসজ্জার ভার নেবেন রামকৃষ্ণ আর অলঙ্কারের ভার নেবেন হৃদয়রাম।

সেই বছরেই জন্মাষ্টমী উৎসবের ঠিক পরের দিন রাধাকান্ত মন্দিরে এক দুর্ঘটনা ঘটলো। আমরা জানি যে এই মন্দিরের পুজারী ছিলেন মহেশের অগ্রজ ক্ষেত্রনাথ। বিধিমতে পুজো

ও ভোগরাগাদির পরে রাধারাণী ও গোবিন্দজীকে কক্ষান্তরে শয়ন করানোর ব্যবস্থা ছিল। (পূজান্তে বিগ্রহকে শয়ন করানোর প্রথা পৃথিবীর অনেক ধর্মেই চালু আছে। কিছু কিছু খ্রীশ্চান ক্যাথলিকদের মধ্যে মহোৎসবের পরে পবিত্র যীশুমাতা মেরীকে গির্জার মধ্যেই কোনো রুদ্ধদ্বার কক্ষে একান্তে রাখার প্রথা আছে)। সেদিন গোবিন্দজীকে শয়ন-কক্ষে নিয়ে যাবার সময় ক্ষেত্রনাথ পিছলে পড়ে গেলেন। বিগ্রহের একটি পা ভেঙে গেল।

দুর্ঘটনাটি দক্ষিণেশ্বরের ভক্তদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। সবাই মনে করলো না জানি কী অমঙ্গল ঘটতে চলেছে! অসাবধানতার অপরাধে ক্ষেত্রনাথ কর্মচ্যুত হলেন। পণ্ডিতদের ডাকা হলো। তাঁরা পরামর্শ করে বিধান দিলেন যে অঙ্গহীন বিগ্রহের পূজা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সুতরাং নতুন বিগ্রহ গড়তে হবে আর ভাঙা বিগ্রহটি গঙ্গায় বিসর্জন দিতে হবে।

ভাঙা বিগ্রহটি গঙ্গায় বিসর্জন দেবার পরামর্শ কিন্তু রাণীর মনঃপূত হলো না। ভাঙা হলেও একদিন তো এই বিগ্রহটিই পূজার জন্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন! তখন মথুরের পরামর্শমত তাঁরা দু'জনে রামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন। রামকৃষ্ণকে তাঁরা দু'জনেই শ্রদ্ধা করতেন; বয়সে ছোট হলেও তাঁকে 'বাবা' বলে ডাকতেন। সব কথা মন দিয়ে শুনলেন রামকৃষ্ণ, তারপর হঠাৎই ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। ভাবভঙ্গ হলে বললেন, 'আজ যদি রাণীর এক জামাইয়ের পা ভেঙে যায় তবে কি রাণী তাকে ফেলে দিয়ে আর এক জামাই আনবে? রাণী কি বদ্যি দিয়ে জামাইয়ের চিকিৎসা করাবে না? তবে এ ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থাই নেওয়া হোক। ভাঙা বিগ্রহটি জোড়া লাগিয়ে পুজো চালু করা হোক।'

অঙ্গহীন বিগ্রহ দিয়ে পূজা চালু করার এই প্রত্যাদেশের ঘটনা নিয়ে তার্কিক পণ্ডিতদের মধ্যে খানিক অসন্তোষ দেখা দিলেও রাণী ও মথুর দু'জনেই খুব খুশি হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণও সাগ্রহে এমন সুচারুভাবে বিগ্রহটি জোড়া দিয়েছিলেন যে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করলেও বিগ্রহের ভগ্নাংশটুকু চোখে পড়ত না। পরবর্তীকালে কোনো এক অর্বাচীন জমিদার রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হ্যাঁ মশাই! দক্ষিণেশ্বরের গোবিন্দজীর মূর্তি কি ভাঙা? উত্তরে রামকৃষ্ণ তাঁকে অবজ্ঞার সঙ্গে বলেছিলেন, 'তোমার কি বুদ্ধি গা? অখণ্ড-মণ্ডলাকার যিনি তিনি কি কখনও ভাঙা হন?'

আজকাল রামকুমারের মনে আর সেই উদ্বেগ নেই। মোটামুটি একটি সম্মানজনক কাজে ব্রতী হয়েছেন রামকৃষ্ণ; রামকুমার তাই অনেকখানি নিশ্চিন্ত। পঞ্চাশে পড়েছেন তিনি; বয়সের তুলনায় শরীরটা যেন বেশীই ভেঙে পড়েছে। তাই বেশ বুড়োটে দেখায় তাঁকে।

ইদানিং রামকৃষ্ণকে দিয়েই তিনি কালী মন্দিরের পূজকের কাজ করাচ্ছেন। নিজে নিয়েছেন রাধারাণী ও গোবিন্দজীর সেবার ভার। তাঁর মনোগত ইচ্ছে ধীরে ধীরে কালীমন্দিরের সব ভার রামকৃষ্ণের হাতেই ছেড়ে দেবেন। অন্যদের বেলায় যেমন জানতে পারতেন তেমনি হয়ত নিজের প্রয়াণের দিনটিও সঠিকভাবে জানতে পেরেছিলেন রামকুমার। তার পরের বছরেই অকস্মাৎভাবে চলে গেলেন তিনি। কলকাতার বাইরে কোথাও খুব শান্তভাবে তাঁর প্রয়াণ হলো।

বছরটি ১৮৫৬।

৬

কালী দর্শন

মাত্র কুড়ি বছর বয়সের মধ্যেই দ্বিতীয় দফায় আর একটি বড় শোক রামকৃষ্ণ পেলেন। রামকুমার শুধু বড় ভাই ছিলেন না; রামকৃষ্ণের জীবনে গত চার বছরে তাঁর ভূমিকা ছিল পিতৃতুল্য।

রামকৃষ্ণ ইতিমধ্যে জগৎ সংসারের অনিত্যতা থেকে মুখ ফিরিয়ে সার বস্তুতে মনোনিবেশ করেছেন। জগন্মাতার দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন তিনি—নিত্যদিন যাঁকে ধ্যান করছেন, সেই মূর্তির অন্তর্ঘন সত্যবস্তুতে তাঁকে পৌঁছাতেই হবে। তাই যতক্ষণ মন্দিরের মধ্যে থাকেন ততক্ষণ তদ্গতচিত্তে প্রতিটি মুহূর্তে মার কথাই ভাবেন। তারপর দুপুরে আর রাত্রে কালী ঘরের দরজা যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন মন্দিরের উত্তর সীমান্তের বাইরের বনে একা একা ঘুরে বেড়ান।

হৃদয় সবই লক্ষ্য করে আর মনে মনে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। না-খাওয়া, না-ঘুমানো অবস্থায় মানুষটা দিন কাটাচ্ছে—রাত বিরেতে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে; কেমন যেন অস্বাভাবিক অবস্থা। একে কবরস্থান, তায় জঙ্গল; অন্য কিছু না হোক ভূত প্রেতের ভয়ও তো থাকতে পারে! দক্ষিণেশ্বরের আর কোনো মানুষ ওই জায়গায় এমন করে ঘুরে বেড়াতে সাহস করবে না।

কৌতূহল মেটাতে একদিন রাত্তিরে মন থেকে ভয়ডর তাড়িয়ে হৃদয় তাঁকে অনুসরণ করলো। রামকৃষ্ণ চলেছেন আগে আগে; খানিক পিছনে চলেছে হৃদয়। যাতে তিনি ফিরে আসেন তাই রামকৃষ্ণের আশে পাশে ছোট ছোট পাথর ছুঁড়তে লাগল হৃদয়। রামকৃষ্ণের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। সোজা গিয়ে ঢুকলেন বনের মধ্যে। হৃদয় ফিরে এলো। কিন্তু পরদিনই সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো, 'মাঝ রাত্তিরে জঙ্গলে কি করতে যাও?' রামকৃষ্ণ নির্বিকার। বললেন, 'কেন, ধ্যান করতে!' তারপর যেন বুঝিয়ে দেবার জন্যে বললেন, 'শোন্! ওই বনে একটা আমলকী গাছ আছে। ওই গাছের তলায় বসে ধ্যান করি। শাস্ত্রে আছে আমলকী গাছের তলায় বসে ধ্যান করলে বাসনা সিদ্ধ হয়। আমি তাই মাকে দেখবো ব'লে ওখানে বসে ধ্যান করি।'

কিন্তু দিনের পর দিন মাতুলের এই আত্মনিগ্রহ আর যেন দেখতে পারে না হৃদয়। মন তার দুঃখে কাতর হয়ে ওঠে। অবশ্য রামকৃষ্ণের মন যে গভীর ভগবদ্ভক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে হৃদয় তার কিছু উপলব্ধি করতে পারে না। কেবলই তার মনে হয় রামকৃষ্ণ বোধহয় উচিত অনুচিতের বোধ হারিয়ে ফেলেছেন। আর শুধু একা হৃদয় নয়, দক্ষিণেশ্বরের সব মানুষই ইদানিং সেই কথাই ভাবতে শুরু করেছিল। ছি! ছি! ধর্ম নিয়ে প্রধান পুরোহিতের একি বাড়াবাড়ি! সব ব্যাপারটিই শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না কি?

আর একদিনের কথা। বনের মধ্যে ঢুকে হৃদয় দেখলো আমলকী গাছের তলায় বসে

রামকৃষ্ণ নিবিড় ধ্যানমগ্ন। পরনের কাপড় এমন কি উপবীতখানিও খুলে বেবাক নগ্ন হয়ে ধ্যান করছেন। দৃশ্যটি হৃদয়ের কাছে এতই অশ্লীল মনে হয়েছিল যে ক্ষিপ্ত হয়ে রামকৃষ্ণের ধ্যান ভাঙিয়ে তাঁকে কটু কথা বলতেও সে দ্বিধা করে নি। এমন কাজ পাগল ছাড়া কেউ করে ?

রামকৃষ্ণ কিন্তু একটুও লজ্জিত হলেন না। শান্তভাবে বললেন যে এটিই হলো ধ্যানের যথার্থ বিধি। এর নাম পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করা। জন্মাবধি মানুষ ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান এই অষ্টপাশে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই বন্ধন থেকেই মানুষের মনে ঐহিক কামনা বাসনার উদয় হয় ; ফলে অধ্যাত্ম অনুভূতির উচ্চভাবলোকে মন উন্নীত হতে পারে না। -ধারণ করা উপবীতখানিও মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে, সে ব্রাহ্মণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ। তখন জন্মগৌরব নিয়ে তার মনে অভিমান জন্মায়। সুতরাং সব অভিমান, সব কামনা-বাসনা আর অধিকার বোধের সঙ্গে পৈতাগাছটিও ছেড়ে না ফেললে মাকে ধ্যানে ডাকা যায় না।

যথাযথ হওয়াই ছিল রামকৃষ্ণের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। শুধু মনের দিক থেকে সন্ন্যাসী হওয়া নয়, কাজের মধ্যেও এই ধারণাটি তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। শুধু যে পরনের কাপড় আর পৈতাগাছটি খুলেছিলেন তা নয় ; অন্যভাবেও কঠোব ত্যাগ আর আত্মসংযম অভ্যাস করেছেন। মনকে বিনীত করবার জন্যে সব রকম অভিমান ত্যাগ করেছেন। নিজের হাতে আবর্জনা পরিষ্কার করেছেন ; সর্বজীবে শিবজ্ঞান লাভ করতে কাঙালীদের উচ্ছিষ্টান্ন প্রসাদরূপে ভোজন করেছেন। এঁটো পাতা মাথায় বয়েছেন—ভোজনস্থান পরিশুদ্ধ করেছেন। কাঞ্চন আর লোষ্ট্রখণ্ডের মধ্যে যে কোনো তফাৎ নেই এবং দু'ভাবেই উদাসীন থাকতে পারার শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে, এক হাতে মাটির ঢেলা আর অন্য হাতে রজত মুদ্রা নিয়ে 'টাকা মাটি, 'মাটি টাকা' বলতে বলতে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছেন।

রামকৃষ্ণ তখন জীবনের সেই অধ্যায়ে প্রবেশ করছিলেন, যাকে আধ্যাত্মিক সংযম বা সাধনার কাল বলা যেতে পারে। সব সাধক মহাপুরুষদের জীবনেই এই পর্যায়টি এসেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গৌতম বুদ্ধের পরিভ্রমণ ও কৃচ্ছ্রসাধনের দিনগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—বলা যেতে পারে যীশুর প্রথম যৌবনের দিনগুলির কথা। এই সময়ের কথা খ্রীষ্টের জীবনবৃত্তান্তে উল্লেখ নেই। গবেষকরা অনুমান করেন, তখন যীশু এসীনেসদের (Essenes) মধ্যে অবসর কাটাচ্ছিলেন। গৌতম বুদ্ধ ও চৈতন্য ছাড়া আর কোনো মহাপুরুষদের সাধনার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ নেই। সম্ভবত, পরবর্তী কালের ভক্তেরা চাইতো না যে, তাদের আদর্শপুরুষদের লোভ, হতাশা আর আধ্যাত্মিক বেদনার দিনগুলি সাধারণ মানুষদের কাছে প্রকাশ হয়ে যাক ; দেহায়িত ঈশ্বরও যে সাধারণ মানুষের মত আচরণ করেন, এ সত্যটি তারা জানতে চাইতো না। অবশ্য তাঁরা যথার্থ ভক্ত, তাঁদের মনোভাব কখনো এমন সংকীর্ণ ছিল না। বরং অবতারদের মধ্যে ঈশ্বরোচিত মহিমা ও ক্ষমতার বাহ্য প্রকাশটি তাঁরা না দেখার ভাণ করতেন, যাতে তাঁদের মন থেকে ভক্তির ভাবটি লুপ্ত হয়ে যায় এবং সেই স্থান অধিকার করে বিস্ময়।

গোঁড়া হিন্দুরা মনে করেন যে একজন অবতার সর্বক্ষণই তাঁর দেবত্ব সম্বন্ধে পরিপূর্ণ

সচেতন, ফলে তিনি যা করেন তার নাম লীলা। সারদানন্দ অবশ্য এই মত স্বীকার করেন না। তাঁর মতে অবতারদেরও দুঃখ, বেদনা, হতাশা বা দুর্বলতার মুহূর্ত আছে এবং সেগুলি কৃত্রিম নয়। বরং নিত্যবস্তু সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানসমৃদ্ধ হয়েই তাঁরা সংসারে আবির্ভূত হন এবং সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও দুর্বলতাগুলি নিজেদের মধ্যে ধারণ করে সেই অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হবার দৃষ্টান্ত রেখে যান।

সারদানন্দ বলেন যে অবতারেরা জন্ম থেকেই জ্ঞাত থাকেন যে তাঁরা সাধারণ থেকে একটু অন্যরকম। সেইজন্যে সংসারের বাসনা-কামনার জালে যারা আবদ্ধ, সেইসব সাধারণ মানুষদের জন্যে তাঁদের এত কৃপা। এইসব অজ্ঞ মানুষদের মুক্তির জন্যেই অবতারকে সাধনা করতে হয়।

রামকৃষ্ণ প্রায়ই গল্পটি শোনাতেন : 'তিন বন্ধু মিলে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে মাঠের মাঝখানে এসে দেখলে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা একটি জায়গা—তার ভিতর থেকে সুমধুর সঙ্গীত ভেসে আসছে ; কেউ গান গাইছে, কেউ যন্ত্র বাজাচ্ছে। সবাই মুগ্ধ। সকলের ইচ্ছে হলো ভিতরে কি আছে দেখবে। তারা চারিদিক ঘুরে দেখলে কিন্তু ভিতরে ঢোকার একটিও দরজা খুঁজে পেল না। তখন একজন কোনোরকমে একটি মই যোগাড় করে পাঁচিলের ওপরে উঠতে লাগলো। অপর দু'জন নিচে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রথম লোকটি পাঁচিলের ওপর উঠে ভিতরের ব্যাপার দেখে আনন্দে অধীর হয়ে হা হা করে হাসতে হাসতে ভিতরে লাফিয়ে পড়লো। সে কি দেখলো সেকথা অপর দু'জনকে বলার জন্যে একটুও অপেক্ষা করতে পারলো না। দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধুরা বললো, "বাঃ! বন্ধু তো বেশ! একবার বললোও না কী সে দেখলো!" এবার দ্বিতীয় জন মই বেয়ে উপরে উঠলো। তারপর সেও প্রথম জনের মতন হা হা করে হেসে ভিতরে লাফিয়ে পড়লো। তৃতীয় জন কি করে! সেও তখন মই বেয়ে ওপরে উঠলো। তারপর ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখলো সেখানে আনন্দের হাট বসেছে। দেখে তার খুব ইচ্ছে হলো যে সেও যোগ দেয়। কিন্তু পরে ভাবলো, "আমি যদি ওই আনন্দমেলায় এখনি যোগ দিই তবে বাইরের দশজনে সে কথা জানতে পারবে না। একা আমি এই আনন্দ ভোগ করবো?" তখন সে জোর করে নিজের মনকে ওই দৃশ্য থেকে ফিরিয়ে এনে মই বেয়ে নিচে নামলো, তারপর যাকে দেখলো তাকেই হেঁকে হেঁকে বলতে লাগলো, "ওহে শোনো! শোনো! পাঁচিলের ওপারে আনন্দের মেলা বসেছে। চলো সবাই মিলে তার ভাগ নিই।" তারপর আরও অনেক মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সেই তৃতীয়জন পাঁচিলের ওপারে আনন্দের পংক্তিভোজে যোগ দিল।'

আমাদের শিক্ষা দিতে গিয়ে রামকৃষ্ণ বলেছেন যে, সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন হলো শেষ কথা। সেটিই হলো সাধনার চরম লক্ষ্য। দেশ কালের অতীত যে জগৎকারণ তার সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টারই নাম সাধনা। আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা ব্রহ্মসত্তাকে নানাভাবে দেখি; কিন্তু ব্রহ্মসত্তা এক অনন্য এবং শাশ্বত। মায়াজালে বদ্ধ বলেই আমাদের এই ভ্রম, এবং এই বাহ্য মায়াজাল ব্রহ্মশক্তি দ্বারাই সৃষ্ট। কিন্তু এই ভ্রম কোনো ব্যক্তিগত ভাব নয়। মায়াজালে বদ্ধ আমরা সবাই এই ভ্রম ভাগ করে নিয়েছি বলেই আমাদের সকলের অনুভূতি হুবহু একই রকম। একটা টেবলকে আমি যেভাবে দেখি আপনিও সেই ভাবেই দেখেন। আমাদের

অজ্ঞানতার জন্যে অচেতন টেবলকে অদ্বয় ব্রহ্মবস্তু বলে চিনতে পারি না, যদিও জানি ব্রহ্ম-সত্তা এখানে বিরাজমান। অবশ্য ভ্রম ভাগ করে নিলেও ব্যক্তিগত সাধনার দ্বারা আমরা এই আবদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে পারি।

সাধনার দুই মার্গ। একটি জ্ঞান অপরটি ভক্তি। যেহেতু আমরা জানি যে, মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি এবং মানবজাতির ক্ষেত্রে এই সত্য সর্বজনীন, সেই হেতু অনুমান করা যায় যে, ভক্তির অনেক আগেই জ্ঞানমার্গের সাধনা পরিপুষ্ট ছিল। যা কিছু অনিত্য তাকে বর্জন করে নিত্য জগৎকারণের স্বরূপে পৌঁছানোর সাধনাই হলো জ্ঞানমার্গের সাধনা। বুদ্ধ এই পথেই তাঁর অন্বেষা শুরু করেছিলেন ; অর্থাৎ ব্যাধি জরা ও মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম যোগাযোগের পরেই মানবজীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে বুদ্ধের চরম জ্ঞান হয়েছিল। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, জ্ঞানমার্গের সাধনা হলো 'নেতি নেতি'র সাধনা অর্থাৎ কোনো বস্তুই নিত্য নয় এবং সবকিছুই বর্জন করতে হয়।

অপরপক্ষে ভক্তিমার্গকে 'ইতি ইতি'র সাধনপথ বলে চিহ্নিত কবা হয়েছে। কারণ, এই পথের সাধনায় ভক্ত সর্বত্রই ব্রহ্মস্বরূপের অস্তিত্বের সংগে আপনাকে সম্বন্ধযুক্ত মনে করে। এ কথা বললে জ্ঞানীর সঙ্গে ভিন্ন মত বোঝায় না। ভক্তসাধক প্রত্যক্ষ জগৎকে প্রত্যক্ষ জগৎরূপে দেখে না। তাকে অতিক্রম করে আছেন যিনি, সেই নিত্যবস্তু ঈশ্বরই তাঁর আরাধ্য। পৃথিবীর সব ধর্মেই এই দুই পথের ভক্ত আছেন। তাঁদের মধ্যে প্রভেদ যেটুকু তা প্রকৃতিগত। কেউ জ্ঞান আর প্রজ্ঞার সাহায্য নিয়ে সত্যবস্তুতে পৌঁছান, কেউ পৌঁছান প্রেম ভালবাসার পথে। দুই পথেই অসংখ্য ভক্তসাধক নিত্যবস্তু ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের মিলন ঘটাচ্ছেন। এই মিলনসাধনের পথই হলো যথার্থ যোগীর পথ, সাধকের পথ। বৌদ্ধরা এর নাম দিয়েছেন নির্বাণ ; খ্রীশ্চানরা বলেন অতীন্দ্রিয় মিলন আর হিন্দুদের কাছে এরই নাম 'সমাধি'।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে সমাধি আলোচনার সময় বলেছি যে, সমাধি হলো চৈতন্যের চতুর্থভূমি। এই ভাব জাগরণ নয়, স্বপ্ন নয় আবার নিদ্রাও নয়। অবস্থাটি ঠিক কেমন খুব স্পষ্ট করে আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করাও সম্ভব নয়। অল্প সংখ্যক কিছু সাধক হয়তো এখনও জীবিত আছেন যাঁদের এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। এঁদের বাদ দিলে আর সকলের মতো আমিও অজ্ঞ। আবার যাঁরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তাঁরাও অবস্থাটি বর্ণনা করতে অক্ষম। অর্থাৎ সংজ্ঞার দিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, বিষয়টি অনির্বচনীয়। বাক্য দিয়ে আমরা সেইসব অভিজ্ঞতাই বিবৃত করতে পারি যা পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। সমাধির সর্বোচ্চ অবস্থায় মানুষের পূর্ণজ্ঞান হয়ে যায়। সে অবস্থা হলো জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়-ভেদশূন্য অবস্থা। এরই নাম 'নির্বিকল্প' সমাধি। তথাকথিত নিম্নভাবের যে সমাধি তার নাম 'সবিকল্প' সমাধি। 'সবিকল্প' সমাধি অবস্থায় দ্বৈতভাব একেবারে দূর হয় না। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, এই দুই সত্তার মধ্যে ক্ষীণ একখণ্ড কাঁচের ব্যবধান থেকেই যায়। যিনি ইতিমধ্যেই নিম্নভাবের সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন, ইচ্ছা করলে সাধনার দ্বারা তিনি উচ্চভাবলোকে আরোহণ করতে পারেন।

বাহ্যত সমাধি হলো সংজ্ঞাহীনতা, কারণ সে অবস্থায় মানুষের মন বাহ্য জগতের সব আকর্ষণ থেকে আপনাকে সরিয়ে রাখে। প্রায়শই তাই সমাধিভাবকে সাধারণ চৈতন্যহীনতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সমাধি হলো এমন এক অবস্থা যা অকল্পনীয় ভাবে জাগ্রত

অবস্থার দৈনন্দিন চেতনা থেকেও তীব্র। তাই সমাধিস্থ অবস্থা চৈতন্যহীনতা নয়, বরং ঠিক বিপরীত। চৈতন্যহীনতা হলো একধরনের হতবুদ্ধিকর অবস্থা, এক ধরনের অসাড়তা, জড়ত্ব।

অল্প যে কয়েকজন যোগীসাধক সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা সবাই এর স্বাদ পেয়েছেন জীবনের অন্তিম লগ্নে, মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে। রামকৃষ্ণ এর আস্বাদন একবার দুবার নয়, সারা জীবনে বহুবার পেয়েছেন।

পাঠক এখন সাধারণভাবে দু একটি প্রশ্ন করতে পারেন। প্রশ্নগুলি এইরকম : 'আপনি বলছেন যে নিবিড় ধ্যানময়তা থেকেই সাধক সমাধি অবস্থায় পেঁছাতে পারেন। কিন্তু কোন্ প্রক্রিয়ার সাহায্যে সাধক সেই অবস্থায় পেঁছাবেন? তখন তার দেহের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হবে? পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম অনুভূতি জাগ্রত করতে কোন্ উপায় গ্রহণ করতে হয়?'

হিন্দু শারীরবিজ্ঞান বলে যে অধ্যাত্মশক্তির এক বিরাট ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে আমাদের মেরুদণ্ডের তলদেশে। এই শক্তির নাম কুণ্ডলিনী শক্তি। কুণ্ডলীকৃত সাপের মতন জড়িয়ে থাকে বলে এই শক্তির অন্য নাম সর্পশক্তি। হিন্দু দেহবিজ্ঞান বলে যে সাধারণ মানুষ কদাচিৎ এই বিরাট শক্তি ব্যবহার করে। সামান্য যেটুকু আমরা কাজে লাগাই তার দ্বারা রতিক্রিয়া বা অন্য কোনো শারীরি প্রয়োজন মেটাই মাত্র! কিন্তু নিবিড় ধ্যান বা অন্য যোগক্রিয়ায় যখন কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন তখন ষষ্ঠ চৈতন্যভূমি অতিক্রম করে সে শক্তি সপ্তমভূমি শিরোদেশে আরোহিতা হন। এই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হলেই অপূর্ব অনুভবসমূহ অন্তরে উদিত হয়—অন্তর্লোক দিব্যভাবে আলোকিত হয়। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ এইভাবে প্রক্রিয়াটি বিবৃত করেছেন :

'বেদে সপ্তভূমির (Seven Planes) কথা আছে। এই সাতটি চৈতন্যভূমি হলো মনের স্থান। যখন সংসারে মন থাকে তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি মনের বাসস্থান। মনের তখন ঊর্ধ্বদৃষ্টি থাকে না—কেবল কামিনী কাঞ্চনে মন থাকে। মনের চতুর্থভূমি, হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। তখন চারিদিকে জ্যোতিঃদর্শন হচ্ছে। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতি দেখে অবাক হয়, বলে 'একি একি!' তখন আর নিচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না।

'মনের পঞ্চমভূমি—কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়েছে; ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোনো কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে সেখান থেকে উঠে যায়।

'মনের ষষ্ঠভূমি—কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু 'আমি' থাকে।...যেমন লণ্ঠনের ভিতরে আলো আছে। মনে হয় আলো এই ছুঁলুম, এই ছুঁলুম, কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আছে বলে ছুঁতে পারা যায় না।

শিরোদেশ—সপ্তমভূমি। মন সেখানে গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন ব্রহ্মের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে যায়।'

যাঁদের হিন্দু শারীরদর্শন সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে তাঁদের জন্যেই রামকৃষ্ণ প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি যেমনটি বুঝেছি সেইভাবেই ব্যাখ্যা করছি।

মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে দুটি স্নায়ুপ্রবাহ—ইড়া ও পিঙ্গলা। (আমি শুনেছি, আমার অনুমান যথার্থ নাও হতে পারে, যে পাশ্চাত্য শারীরবিজ্ঞান এই দুটি স্নায়ু-প্রবাহকে যথাক্রমে সেন্সরী ও মোটর নার্ভ বলে অভিহিত করে।) ইড়ার অবস্থান মেরুদণ্ডের বামে, পিঙ্গলার দক্ষিণে। এদের মধ্যবর্তী যে দ্বারপথ তার নাম সুষুম্না। কুণ্ডলিনী জাগরিতা হলে সেই শক্তি সুষুম্না দ্বারপথ দিয়ে উর্ধ্বমুখে প্রবাহিত হন। অন্যথায়, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সুষুম্না দ্বার রুদ্ধ থাকে। রামকৃষ্ণ যখন হৃদয়, কণ্ঠ ইত্যাদি উল্লেখ করেন তখন বিভিন্ন ভূমির সঠিক অবস্থান বোঝাবার জন্যেই তা করেন, আসলে এরা সবাই সুষুম্নার মধ্যেই অবস্থিত।

হিন্দু দর্শনে বিভিন্ন ভূমিগুলি পদ্মরূপে আখ্যাত হয়েছে। কারণ আধ্যাত্মিক দর্শনে যাঁরা সক্ষম তাঁদের কাছে ভূমিগুলি প্রস্ফুটিত পদ্মের মতন দেখায়। ভূমিগুলি স্থূল শারীরযন্ত্র মাত্র নয়। হিন্দু শারীরবিজ্ঞান স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাদানের মধ্যে কোনো ভেদ স্বীকার করে না। তফাৎ যেটুকু তা মাত্রার।

রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে কুণ্ডলিনীর আরোহণের সঙ্গে সহযোগী ছিল রক্তচাপের গতি। হৃদয় ও শিরোদেশের দিকে ধাবিত সেই শোণিতপ্রবাহের জন্যেই রামকৃষ্ণের বক্ষস্থল সর্বদাই রক্তিমাভা ধারণ করে থাকতো।

•

১৮৫৬। দিন যায় মাস যায়; ভগবদ্দর্শনের জন্যে রামকৃষ্ণের ব্যাকুলতাও বাড়তে থাকে। কালীঘরে মা ভবতারিণীর মূর্তির সামনে বসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। হা হা করে ওঠে মন। 'মা, এত ডাকছি কিছুই তুই শুনছিস না। রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমাকে কি দেখা দিবি না?' বলতে বলতে হাউহাউ করে কেঁদে ওঠেন। সেই মানসিক চাঞ্চল্যময় দিনগুলির কথা স্মরণ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে তিনি বলতেন: 'ও! কি অসহ্য যন্ত্রণায় তখন আমার দিনগুলি কাটতো! মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের সেই যন্ত্রণা যে কত নিদারুণ তা তোমরা ভাবতেই পারবে না। মনে করো, যে ঘরে এক থলি সোনার মোহর পড়ে আছে তার ঠিক পাশের ঘরেই এক তস্কর থাকে। দু ঘরের মধ্যে পলকা এক বেড়া। চোর কি তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারে? তার কি মনে হয় না যে বেড়া ভেঙে মোহরের থলি নিয়ে উধাও হয়? আমার ঠিক তেমনি অবস্থা হতো। ভাবতুম মা তো আমার পাশটিতেই রয়েছেন—কত কাছাকাছি তিনি আছেন! আর আমার কি চাই? তিনি তো অনন্ত আনন্দ-স্বরূপিনী! তিনিই তো ঐশ্চর্য! আর সব ঐশ্বর্য তো তাঁর কাছে তুচ্ছ!'

পূজাস্থানে মায়ের মূর্তির সামনে প্রায়ই স্থাণুর মতন স্পন্দনহীন হয়ে যেতেন। সেই ভাবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। পূজাবিধি কিছুই সাঙ্গ হতো না। অন্য পূজারীরা অধৈর্য হতো—তাঁর দিকে চেয়ে হাসাহাসি করতো, বলতো আধ-পাগলা বোকা। ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু মথুর। তিনিই কেবল রামকৃষ্ণকে বুঝেছিলেন। তাই রাণীকেও সেকথা বলে এসেছিলেন। 'আপনি দেখবেন মা! মায়ের পূজায় আশ্চর্য এক পূজারী পেয়েছি। আমার বিশ্বাস ভবতারিণী মাকে উনিই ঠিক জাগাবেন।'

কিছুদিনের মধ্যেই মথুরের অনুমান সত্য হলো। রামকৃষ্ণ নিজেই সেই অনুভূতির কথা বর্ণনা করছেন: 'মার দেখা পেলাম না বলে হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা, জলশূন্য করবার জন্যে

লোকে যেমন সজোরে গামছা নিঙড়ায় মনে হলো হৃদয়টাকে ধরে কে যেন তেমনি করছে। মার দেখা বোধহয় কোনদিনই পাব না ভেবে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলাম। তাই যদি হয় তবে এ জীবনে দরকার কি! সহসা দৃষ্টি পড়লো মার ঘরে ঝোলানো অসিখানার ওপর। স্থির করলাম এই মুহূর্তে জীবনের অবসান করবো। উন্মত্তের মতন ছুটে গেলাম সেদিকে। এমন সময় মার দর্শন পেলাম, অদ্ভুত দর্শন। আর সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে গেলাম।……ঘর দোর মন্দির সব যেন কোথায় হারিয়ে গেল। কোথাও কিছু নেই। শুধু দেখলাম অসীম অনন্ত এক চেতন জ্যোতি সমুদ্র! যেদিকে যতদূর তাকাই দেখি উজ্জ্বল তরঙ্গ মহাবেগে আমার দিকে ছুটে আসছে। দেখতে দেখতে গর্জন করতে করতে তারা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর আমাকে গ্রাস করলো। স্রোতের বেগে কোন্ অতলে তলিয়ে গেলাম; হাঁপিয়ে পড়লাম, হাবুডুবু খেলাম তারপর সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেলাম।'

বিবরণ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না যে সেদিন রামকৃষ্ণ মা জগদম্বাকে চেতন-জ্যোতি-সমুদ্রের মধ্যে দর্শন করেছিলেন কি না। মনে হয় করেছিলেন; কারণ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে প্রথমেই কাতরস্বরে 'মা' 'মা' বলে কেঁদে উঠেছিলেন তিনি। মাকে দর্শন করার পর রামকৃষ্ণ এত অভিভূত হয়ে পড়েন যে মন্দিরের পূজাদি কাজ ঠিকমত পালন করতে পারতেন না। তাঁর কাজ করে দিত হৃদয়। মাতুলের মানসিক অবস্থা দেখে তার খুবই দুশ্চিন্তা হতো। তাই ডাক্তার ডেকে রামকৃষ্ণের চিকিৎসার ব্যবস্থা সে করেছিল। তবে চিকিৎসায় কোনো সুফল হলো না। অবশ্য যেদিন তিনি পূজাদি কাজ করতেন সেদিন নানা বিচিত্র ঘটনা ঘটতো। রামকৃষ্ণ নিজেই সেই অনুভূতির কথা শুনিয়েছেন। 'ধ্যান করতে বসলেই শুনতে পেতাম হাত পা দেহের গাঁটে গাঁটে খটাখট শব্দ হচ্ছে। শব্দটা শুরু হতো পায়ের দিক থেকে। কে যেন ভেতর থেকে আমায় তালাবন্ধ করে দিচ্ছে। একটু যে নড়াচড়া করবো কিংবা ধ্যানাসনের ভঙ্গি বদলে নেবো সে অবস্থা ছিল না। ধ্যান করা ছাড়া আর কিছু করার সামর্থ্য হতো না। একই জায়গায় জোর করে আমায় বসে থাকতে হতো—তখনই সেই খটাখট শব্দ হতো; যেন গ্রন্থিগুলি খুলে যাচ্ছে। এবার শব্দ শুরু হতো গলা থেকে তারপর নেবে যেত পা অব্দি। ধ্যান করতে বসে প্রথম প্রথম জোনাকি পোকার মতন অসংখ্য আলোর কণা দেখতাম। কখনও বা দেখতাম কুয়াশার মতন পুঞ্জ পুঞ্জ আলোয় চতুর্দিক উদ্ভাসিত; আবার কখনও বা সব কিছু ছাপিয়ে গলানো রুপোর মতো উজ্জ্বল সাদা আলোয় ঢেকে যেত সব। কি দেখছি বুঝতাম না। এমন দর্শন ভাল না মন্দ তাও জানতাম না। তাই ব্যাকুল হয়ে মাকে ডাকতাম, "মা এ আমার কি হচ্ছে কিছুই বুঝছি না। কি করলে তোকে পাওয়া যায় আমায় তাই-ই শিখিয়ে দে মা। তুই না শেখালে কে আমায় শেখাবে?"'

তাঁর এই সরল অকপট স্বীকারোক্তির মধ্যে বালকভাবের যে ছবিটি প্রত্যক্ষভাবে ফুটে ওঠে তার কাছে তাঁর সম্বন্ধে সমকালীন মানুষদের সব বর্ণনাই তুচ্ছ মনে হয়। ছেলে যেমন মার কথা শোনে তেমনি তিনি জগদম্বার কথা শুনতেন; তাঁর আচরণ নিয়ে সংসারের আর সবাই কি ভাবতো, এ ব্যাপারে তাঁর একটুও উৎকণ্ঠা ছিল না।

ইদানিং তাঁর ধ্যানে বসার দরকার হয় না। হয় মন্দিরের ভিতরে কিংবা বাইরে প্রায়ই মায়ের দর্শন পান। মূর্তিরূপে নয়, সর্বঅবয়বসম্পন্না জ্যোতির্ময়ী মা রূপে দেবী তাঁকে দেখা দেন। রামকৃষ্ণ নিজেই সে কথা বলেছেন। 'নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে দেখেছি মা

সত্যি সত্যি নিশ্বাস ফেলছেন। রাত্তিরে প্রদীপের আলোয় তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মার দিব্যাঙ্গের কোনো ছায়া পড়তে দেখি নি। ঘরের মধ্যে ব'সে শুনতে পেয়েছি মা যেন পঁইজর পরে ছোট্ট মেয়ের মতন ওপর তলায় হাঁটছেন। শব্দ হচ্ছে ঝমঝম ঝমঝম। তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এসে দেখেছি সত্যি সত্যিই মা চুল খুলে এলো ক'রে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কখনো কলকাতা কখনো গঙ্গা দেখছেন।'

রামকৃষ্ণের তখনকার ভাব আচরণ দেখে হৃদয়ও বলতো, 'মামা যখন কালী ঘরে থাকতেন তখন তো কথাই নেই, এমন কি যখন তিনি থাকতেন না তখনো কালী ঘরে ঢুকলে তার গা ছমছম করতো। তবুও মায়ের পুজোর সময় মামা কি করছেন তা দেখবার লোভ সামলাতে পারতাম না। যতক্ষণ তাঁকে পূজাবত দেখতাম ততক্ষণ আমার মন বিস্ময় ভক্তিতে ভরে থাকত, কিন্তু মন্দিরের ভেতর থেকে বাইরে এলেই মনে সন্দেহ হতো। ভাবতাম, মামা কি সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন? নতুবা পুজোকালে এমন ব্যবহার কেন করেন? আমার ভয় হতো না জানি রাণীমা বা মথুরবাবু সব কথা শুনলে কি ভাববেন! মামার কিন্তু ওসবে কোনো গ্রাহ্য ছিল না।......আমিও এ বিষয়ে তাঁকে বেশি কথা বলতে সাহস পেতাম না। একটা ভয় ও সঙ্কোচ আমার মুখ চেপে ধরতো। তাঁর আর আমার মধ্যে এক অনির্বচনীয় দূরত্বের ব্যবধান অনুভব করতাম। তাই চুপ করে বসে যথাসাধ্য তাঁর সেবা করতাম। সর্বক্ষণই ভয় হতো কোনদিন না মামা একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেন।'

হৃদয়ের আশঙ্কা মোটেই অমূলক ছিল না। সে আরও বলতো: 'দেখতাম মামার বুকে আর চোখ মাতালের চোখের মতন রক্তবর্ণ। সেই অবস্থায় টলতে টলতে পূজাসন ছেড়ে সিংহাসনের ওপর উঠে সস্নেহে মায়ের চিবুক ধরে আদর করছেন, গান গাইছেন, হাসছেন, কথা বলছেন কিংবা হাত ধরে ধেই ধেই করে নাচছেন।.....দেখতাম, মা জগদম্বাকে রান্না করা ভোগ নিবেদন করতে করতে হঠাৎ উঠে পড়েছেন, তারপর থালা থেকে এক গ্রাস ভাত তরকারি মার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলছেন, "খা, মা খা! বেশ করে খা!" আবার হয়ত বলছেন, "আগে আমি খাব, পরে তুই খাবি? বেশ! তাই খাচ্ছি!" এই বলে অন্ন ভোগের খানিকটা নিজে খেয়ে নিতেন, বাকিটা মার মুখে দিয়ে বলতেন, "এই তো আমি খেয়েছি, এবার তুই খা!"

'একদিন দেখি ভোগ নিবেদনের সময় একটা বেড়াল কালীঘরে ঢুকে ম্যাও ম্যাও করে ডাকছে। মামা তার মুখের কাছে অন্নভোগ নিয়ে "খাবি মা খাবি মা" ব'লে সবটুকু ভোগ বিড়ালটাকে খাইয়ে দিলেন।'

যে মহাশক্তি এই নিখিলবিশ্ব সৃষ্টি করেন, তার বিলয় সাধন করান, ভয়ঙ্করী সেই মহাশক্তির প্রকাশ কখনও কখনও প্রশ্রয়দাতৃ মাতৃরূপেও প্রকাশ পায়, তখন তাঁর সেই ভয়ঙ্করী রূপ আর থাকে না। মায়ের সঙ্গে তখন অন্য সম্পর্ক। তিনি হাসেন, খেলা করেন, আদর করেন। এই শক্তি ছড়িয়ে আছে আমাদের আশেপাশের বাতাসে, মন্দিরে দেবীমূর্তিতে এমন কি অন্ত্যজ বিড়ালের মধ্যেও। এই অনিবার্য সত্যটিই রামকৃষ্ণ তাঁর আপাত অপ্রকৃতিস্থ আচরণের দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বলতে দ্বিধা নেই যে রামকৃষ্ণের এই উন্মত্তপ্রায় আচরণটিই কিন্তু মন্দিরের গোঁড়া পূজারীদের কাছে সেদিন অত্যন্ত গর্হিত বলে মনে হয়েছিল। তাই রামকৃষ্ণের নামে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ লিখে তাঁরা মথুরের কাছে লিপি

পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মথুর তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন না, কলকাতায় থাকতেন। অভিযোগটি পেয়ে তিনি জানালেন যে শীঘ্রই স্বয়ং উপস্থিত থেকে তিনি এই অভিযোগের বিচার করবেন। তবে যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত রামকৃষ্ণ যেমন ছিলেন তেমনি থাকবেন।
এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই মথুর এসে হাজির। কালীঘরে তখন রামকৃষ্ণ পূজাদি কাজে মগ্ন ছিলেন। ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ ধরে রামকৃষ্ণের পূজাদি কাজ দেখলেন। দেখতে দেখতেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে রামকৃষ্ণ একটুও অপ্রকৃতিস্থ নন। তিনি সাক্ষাৎ দিব্যভাব। তিনি নির্দেশ দিলেন যে রামকৃষ্ণের পূজাবিধিতে কোনো অসঙ্গতি নেই। অতএব কেউ যেন তাঁর কাজে বাধা না দেয়। রাণীমাকে আশ্বস্ত করে মথুর বলেছিলেন, 'এতদিন পরে মার পুজো ঠিকমতন সম্পন্ন হচ্ছে।' কিন্তু মথুর ও রাণীর বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও রামকৃষ্ণকে আরও কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ঘটনাটি বলি। মাকে দর্শন করতে রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। গঙ্গায় স্নান করে শুদ্ধ হয়ে মন্দিরে এলেন পুজো দিতে। রামকৃষ্ণ তখন মন্দিরেই ছিলেন। রাণী তাঁকে মায়ের গান শোনাতে বললেন। আবেগ আর ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে রামকৃষ্ণ গান গাইছেন, সুমধুর সে সঙ্গীত হঠাৎ থেমে গেল। ক্রুদ্ধ রামকৃষ্ণ রাসমণির দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ করে বললেন, 'ছিঃ! এখানেও ওই চিন্তা!' এ কথা বলেই রাণীর গালে সজোরে চপেটাঘাত করলেন। হৈ হৈ পড়ে গেল মন্দিরে। সবাই উত্তেজিত। রাসমণির খাস পরিচারিকারা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। দ্বাররক্ষক থেকে শুরু করে সবাই ছুটে এসেছে। অপেক্ষা করছে রাণীমার আদেশের। নির্দেশ পেলেই পূজাস্থান থেকে রামকৃষ্ণকে হিড়হিড় করে টেনে সরিয়ে দেবে। রাসমণি কিন্তু স্থির, যেন পাষাণমূর্তি। ওদিকে রামকৃষ্ণেরও কোনো ব্যাকুলতা নেই। মিটিমিটি হাসছেন। ধীরে ধীরে কর্মচারীদের দিকে তাকালেন রাসমণি তারপর বললেন, 'ওঁকে কাজ করতে দাও। ওঁর কোনো দোষ নেই।'

রামকৃষ্ণ কেন তাঁকে আঘাত করেছিলেন রাণী তা বুঝতে পেরেছিলেন। গানের সময় বিষয়-সংক্রান্ত এক জটিল মামলার ফলাফলের কথা ভাবছিলেন তিনি। তাঁর খুব অবাক লাগছিল ভাবাবিষ্ট রামকৃষ্ণ কেমন করে তা জানতে পারলেন! তাই কর্মচারীরা যখন চিৎকার করছিল রাণী তাদের বললেন, 'তোমরা জানো না। মা জগদম্বাই আমায় শাস্তি দিয়েছেন। আমার মন ক্লেদমুক্ত করেছেন।' শুধু তাই নয়, যাতে ঘটনাটির পুনরুল্লেখ কখনও না হয় সে কথা ব'লে সবাইকে সতর্ক করে দিলেন।

৭

রামকৃষ্ণের বিবাহ

এই ঘটনার অল্প কিছুকাল পর থেকেই কালী মন্দিরের কাজ রামকৃষ্ণ ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভাগবদ্গীতায় উল্লেখ আছে যে, মানুষ অধ্যাত্ম সাধনায় যত উন্নতি করে ততই তার সব বৈধিকর্ম ত্যাগ হয়ে যায়; অর্থাৎ অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে নিয়মবিধি বা আচার বিচার পালন ক্রমেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কর্মত্যাগের এই সত্যটি বোঝাবার জন্যে রামকৃষ্ণ প্রায়ই এই গল্পটি বলতেন : 'বউ যদ্দিন না অন্তঃসত্ত্বা হচ্ছে তদ্দিন অব্দি শাশুড়ি তাকে সব কর্ম করতে বলে সব খেতে দেয়। অন্তঃসত্ত্বা হলে বউয়ের কাজকর্ম খাওয়া-দাওয়ার বাছবিচার করতে হয়; দশমাসে কর্ম প্রায় করতেই হয় না, আর ছেলে হলে একেবারে কর্ম ত্যাগ। তখন মা ছেলেটি নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে।'

যে সময়ের কথা বলছি তখন রামকৃষ্ণের ভগবদ্ভক্তি এত দৃঢ় যে দেবীসেবার নৈমিত্তিক বাহ্যিক প্রকরণগুলি নির্বাহ করাও অসম্ভব ছিল। মায়ের সঙ্গে তখন তাঁর আত্মিক যোগ—যখন যে ভাবে সে যোগ স্থাপনের বাসনা হতো তখন সেই ভাবেই সে যোগ স্থাপন করতেন। আলাদা অস্তিত্ব থাকতো না। হয়তো পূজা সাঙ্গ না হতেই ভোগ নিবেদন করতেন; কিংবা মায়েব অঙ্গসজ্জার উপকরণ ফুল চন্দন দিয়ে নিজেকে সাজাতেন। মায়ের সঙ্গে তাঁর এই তন্ময় সহচরত্ব কিছুমাত্র শিথিল হলে রামকৃষ্ণ আকুল হয়ে উঠতেন; মাটির উপর আছড়ে পড়ে মুখ ঘষে ঘষে রক্তপাত ঘটাতেন, তারপর কান্নায় ভেঙে পড়তেন।

মথুর সবই দেখতেন এবং রামকৃষ্ণের বিচিত্র আচরণ তাঁর মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো। মনেব একদিকের ভাব দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন রামকৃষ্ণ সাধারণ মানবমাত্র নন। প্রজ্ঞালোকের শীর্ষস্থানে তাঁর অবস্থান—সেই উচ্চাসন থেকে দৃশ্যবস্তুর অন্তর্লোক রামকৃষ্ণের সামনে প্রকাশিত হতো। দৃষ্টির এই স্বচ্ছতাই তাঁকে সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করে রেখেছিল। মনের অন্য ভাবটি কিন্তু ভাবাবিষ্ট রামকৃষ্ণকে দায়িত্বজ্ঞানহীন উন্মাদ বলে মনে করতো। তাঁর এই মনোভাবটিই রামকৃষ্ণকে সহজ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিল।

একটা সময় ছিল, যখন রামকৃষ্ণকে উন্মাদ বলে প্রচার করার দরুন, মন্দির কর্মচারীদের মথুর ভর্ৎসনা করতেন। এখন তিনিই, হৃদয়রামের মতন রামকৃষ্ণের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়ানোর ব্যাপারে রামকৃষ্ণের বিরূপতার কথা মথুর জানতেন। তবুও সেবার কাশী থেকে একটি দামী শাল কিনে রামকৃষ্ণকে সেটি উপহার দিয়েছিলেন। প্রথমটা রামকৃষ্ণ খুব খুশি। গায়ে চড়িয়ে দিব্যি সবাইকে শালটি দেখাচ্ছেন আর বলছেন, 'দ্যাখো গো, মথুর আমার জন্যে কতটাকা খরচ করে শালটি কিনে এনেছে।' কিন্তু খুশির মেজাজ অচিরেই বদলে গেল। মাকে স্মরণ করে মনে মনে বললেন, 'এর মধ্যে আছেটা কি? ভেড়ার লোম বৈ তো কিছু এটা নয়। আর শীত ঠেকানোর জন্যে তো একখানা কম্বলই যথেষ্ট। এ দিয়ে তো ভগবান পাওয়া যাবে না। বরং গায়ে

চড়ালেই মনে হবে আর সবাই থেকে আমি কত বড়। আর তখনই মন থেকে তোমার চিন্তা চলে যাবে।' মনে মনে কথা কটি ব'লে শালখানি মাটিতে ফেলে তার ওপর থুথু ফেললেন, তারপর সেটি পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে গেলেন। হয়ত বা শালখানিতে সেদিন আগুন ধরিয়ে দিতেন যদি না কেউ সেটি কেড়ে নিত। ঘটনাটি জানতে পেরে মথুর নিজেই তাঁর অন্যায় বুঝতে পেরেছিলেন। তাই যারা রামকৃষ্ণের নামে তাঁর কাছে অভিযোগ করতে এসেছিল তাদের তিনি বললেন, 'বাবা ঠিকই করেছেন।'

আর একবারের কথা। ভুল সংবাদকে কেন্দ্র করে মথুর ও রাণীর ধারণা হলো যে, দীর্ঘদিন ধরে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনের জন্যেই রামকৃষ্ণ স্নায়ুপীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। রামকৃষ্ণের ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করতে দক্ষিণেশ্বরে কয়েকজন গণিকা নিয়ে এলেন মথুর। শুধু তাই নয়, রামকৃষ্ণকে কলকাতার এক গণিকা পল্লীতেও নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রামকৃষ্ণ সব নারীতেই মাতৃভাব দেখতে পান—এক্ষেত্রেও অন্যথা হলো না। গণিকাদের সমীপবর্তী হতেই তাঁর ভাবাবেশ হলো। গণিকারাও স্তম্ভিত। রামকৃষ্ণের ভাবাবেশ দেখে তারা অভিভূত। এমন একজন মহাপুরুষের ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করতে গিয়েছিল তারা! এ যে মহাপাপ! এ পাপের দায় কে নেবে! বারবার তাই আকুল হয়ে রামকৃষ্ণের কাছে তাদের দুষ্কর্মের জন্যে ক্ষমা চাইতে লাগল। এই অঘটনের জন্যে যে রামকৃষ্ণ রাণী কিংবা মথুরকে তিরস্কার করেছিলেন এমন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবত, সব মহাপুরুষদের মতন তিনিও কর্মের চেয়ে কর্মের লক্ষ্যকেই বড় করে দেখেছিলেন।

ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা থেকেই রামকৃষ্ণকে আমরা আক্ষরিক অর্থে ভাববিলাসিতার বদলে কর্মশক্তিতেই যথার্থ আগ্রহী হতে দেখেছি। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করছি। দৃষ্টান্তটি অসাধারণ। যে সময়ের কথা বলছি তখন পিতা ক্ষুদিরামের আরাধ্য দেবতা রঘুবীরের ভাবনাতেই রামকৃষ্ণ বিভোর। রামায়ণ মহাকাব্যে বানররাজ হনুমানকে রামের পরম ভক্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সারা ভারতে তাই হনুমানকেই আদর্শ ভক্তরূপে পুজো করা হয়। মহাবীরের মতন দাস্যভাবের ভক্তিতে সিদ্ধ হবার জন্যে রামকৃষ্ণ তখন নিজের মধ্যেও হনুমানের ভাব আরোপ করলেন, তার চলাফেরা ভাবভঙ্গী নকল করা শুরু করলেন। রামকৃষ্ণ পরবর্তীকালে বলতেন, 'মনে পড়ে তখন হাঁটাচলা, খাওয়া দাওয়া বা অন্য সব কাজ করতাম হনুমানের মতন। এগুলি যে নিজের ইচ্ছায় করতাম তা নয়, কেমন যেন হয়ে যেত। পরনের কাপড়খানা কোমরের সঙ্গে জড়িয়ে লেজের মতন বাঁধতাম আর লাফিয়ে লাফিয়ে চলতাম। ফলমূল ছাড়া অন্য কিছু খেতে প্রবৃত্তি হতো না; তাও আবার খোসা ছাড়িয়ে খেতাম না। বেশির ভাগ সময় গাছের উপর চড়ে কাটাতাম। তখন গভীরভাবে 'রাম' 'রাম' বলে ডাকতাম। বানর জাতির মতন আমার দৃষ্টিতেও একটা ছটফটে ভাব এসেছিল। আর সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার আমার মেরুদণ্ডের শেষ ভাগটা ওই সময় নাগাদ ইঞ্চিখানেক বেড়ে গিয়েছিল। পরে যখন মন থেকে ওই ভাবটা চলে গেল তখন আবার আগের মতন স্বাভাবিক হয়ে গেল আমার মেরুদণ্ড।'

এমনিভাবে শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনায় রামকৃষ্ণ যখন বিভোর হয়ে আছেন তখনই তাঁর সীতা দর্শন হলো। তখন দিনের বেলা। ঝকঝকে সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে চতুর্দিক। চোখ চেয়ে বসে আছেন—ধ্যান করছেন না। পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। সীতার

কথাও ভাবছিলেন না তিনি। অথচ হঠাৎই রামকৃষ্ণের দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠলেন সীতা। ঘটনাটি তিনি এইভাবে বলেছেন : 'একদিন পঞ্চবটীতলে বসে আছি। ধ্যানচিন্তা কিছু যে করছিলুম তা নয়, অমনি বসেছিলুম। এমন সময় এক নিরুপমা জ্যোতির্ময়ী স্ত্রীমূর্তি আমার চোখের সামনে আবির্ভূতা হয়ে জায়গাটি আলোকিত করে দিল। তখন যে কেবল স্ত্রীমূর্তিই দেখছিলাম তা নয় ; পঞ্চবটীর গাছপালা, গঙ্গা সবই দেখছিলাম। দেখলাম তিনি মানবী, দেবীর মতো ত্রিনয়নী নন। কিন্তু কী মহীয়সী রূপ ! প্রেম, করুণা, সহিষ্ণুতার এমন অসাধারণ মাতৃমুখ দেবীমূর্তিতেও সচরাচর দেখা যায় না। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিলাম—কে ইনি হতে পারেন ? এমন সময় হঠাৎই একটা হনুমান উপ্ শব্দ করে কোত্থেকে এসে তাঁর পায়ের গোড়ায় এসে বসলো। চকিতে আমার মনে হলো ইনি নিশ্চয়ই সীতা—জনমদুখিনী, চিরবঞ্চিতা, রাম অনুরাগিণী সীতা। উল্লাসে মা মা বলে ডেকে তাঁর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় সেই দেবীমূর্তি আমায় এক টুকরো স্বর্গীয় হাসি উপহার দিলেন তারপর চকিতে আমার শরীরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে আমি তখনই মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম।······কোনো ধ্যানচিন্তা না করে এমন ভাবে কোনো দর্শন ইতিপূর্বে আমার হয় নি। জনমদুখিনী সীতার সেই বিষাদমূর্তি দেখেছিলাম বলেই হয়ত তাঁর মতন আজন্ম দুঃখভোগ করে চলেছি।'

রামকৃষ্ণকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন যে কী অপূর্ব সুধামাখা মিষ্টি হাসি তাঁর ছিল। সারদানন্দ বিশ্বাস করতেন যে এই দিব্য মধুর হাসিটি ছিল সীতার দান।

পঞ্চবটীর কথা এইমাত্র বলেছি। বৃক্ষপঞ্চকের উদ্যান বলে এর নাম পঞ্চবটী। গাছগুলি যথাক্রমে অশ্বত্থ, বিল্ব (যে গাছের পাতায় শিবপুজো হয়), আমলকী (ইচ্ছা পূরণের এই গাছটির উল্লেখ আগের অধ্যায়ে করেছি), অশোক (কিংবদন্তী যে রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতা এই অশোকবনে থাকতেন) আর শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত বিপুলায়তন বটবৃক্ষ। শাস্ত্রমতে এই বৃক্ষপঞ্চকের রোপণ পদ্ধতিতেও এক বিশেষ বিন্যাস আছে। যেমন পূর্বদিকে অশ্বত্থ, উত্তরে বিল্ব, পশ্চিমে বট, দক্ষিণে আমলকী আর দক্ষিণ-পূর্বে অশোক। বসে ধ্যান করার জন্যে উদ্যানের মাঝামাঝি একটি বেদীও স্থাপনা করতে হয়।

এইরকম সময় নাগাদই দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী উদ্যানটি তৈরি হয়। (আংশিক হলেও পঞ্চবটী এখনও টিকে আছে এবং ভক্তদের কাছে মন্দির প্রাঙ্গণের এই জায়গাটিই সব থেকে পবিত্র) যে আমলকী গাছের তলায় বসে রামকৃষ্ণ ধ্যান করতেন সেটি কেটে ফেলা হয়েছিল। পাশের একটি পুকুর ঝালানোর পরে আশপাশের নাবাল জমি ভরাট করার দরকার হয়। তখনই আমলকী গাছটি কেটে ফেলা হয়। তাই নতুন করে এই স্থানেই পঞ্চবটী উদ্যান স্থাপন করলেন রামকৃষ্ণ। এ কাজে হৃদয়ই তাঁকে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছিল। রামকৃষ্ণ নিজের হাতে শুধু অশথ চারাটিই পুঁতেছিলেন। অন্য চারাগুলি রোপণ করে হৃদয়। রোপণের পর চারাগাছগুলি বেষ্টন ক'রে লতাপাতার বেড়া লাগানো হয়। ফলে পথচারীর দৃষ্টির আড়ালে থাকে পঞ্চবটীর অভ্যন্তর। ভারতবর্ষের সব মন্দির প্রাঙ্গণের মতন এখানেও গো জাতীয় জীবের উৎপাতে বেড়া ঝোপ অক্ষত রাখা যেত না। রামকৃষ্ণ তাই চারাগাছগুলি বাঁচাতে আরও শক্ত বেড়ার ব্যবস্থা করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি

সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। সেবার গঙ্গায় বান এলো। জলের তোড়ে কোথা থেকে গরাণ গাছের খুঁটি, নারকেল দাঁড় আর একখানি কাটারি ভেসে এল। মালীর সাহায্যে রামকৃষ্ণ শক্ত বেড়ার ব্যবস্থা করলেন। সারদানন্দ প্রায়ই এই ঘটনাটির কথা বলতে গিয়ে উপনিষদ থেকে উদ্ধৃত করতেন, আর বলতেন, যিনি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁর আকাঙ্ক্ষা কখনো অপূর্ণ থাকে না।

১৮৫৮ সালে ক্ষুদিরামের ভ্রাতুষ্পুত্র জনৈক রামতারক কর্মান্বেষণে দক্ষিণেশ্বরে এল। রামতারক বয়সে রামকৃষ্ণের চেয়ে বেশ বড়। রামকৃষ্ণ তাকে হলধারী বলতেন। আমরাও তাকে ওই নামেই ডাকবো। হলধারী বুদ্ধিমান, পণ্ডিত আর শাস্ত্র ব্যাখ্যায় কুশলী। মথুর সাগ্রহেই রামকৃষ্ণের নিকটাত্মীয় এই ব্রাহ্মণকে পূজারীর কাজে নিযুক্ত করলেন। ব্যবস্থা হলো যে হলধারী কালীঘরের ভার নেবে আর হৃদয় দেখবে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পূজাদি কাজ। কিন্তু শুরু থেকেই গোলযোগ বেধে গেল।

বিষ্ণুভক্ত হলধারী শাক্তদ্বেষী ছিল না। সুতরাং কালীঘরের কাজে সে কোনো অনাগ্রহ দেখায় নি। তার আপত্তি ছিল অন্যত্র। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ হয়ে মন্দিরের অন্নভোগ করতে সে সম্মত হয় নি। (বলাবাহুল্য এই আপত্তি জাতিগত। রাণীর নিম্নজাতই এই আপত্তির কারণ।) মথুর অবশ্য হলধারীর স্বপাক ভোজনের সব ব্যবস্থাই করেছিলেন; তবে একথাও বলেছিলেন যে রামকৃষ্ণ ও হৃদয়রাম ব্রাহ্মণ হলেও মন্দিরের অন্নভোগ গ্রহণ করতে কখনো আপত্তি করেন নি। জবাবে হলধারী অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেছিল, 'আমার ভাইটির সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না। তার আধ্যাত্মিক উচ্চভাব; তাই কিছুতেই তার দোষ হয় না। কিন্তু অমন উচ্চাবস্থায় আমি এখনও পেঁছুতে পারি নি। সুতরাং নিষ্ঠাচ্যুত হয়ে জাতি-প্রথার নিয়ম ভাঙা আমার সাজে না।'

হলধারীর বিনয়বচনে একটুও আন্তরিকতা ছিল না। জাত্যাভিমান আর বিদ্যাভিমানের ঠুলি পরে হলধারী তার অধ্যাত্ম দৃষ্টি আছন্ন করে রেখেছিল। অবশ্য একটা সময় ছিল যখন বিপুল সংশয় নিয়েও সে রামকৃষ্ণকে ভক্তি করতো। রামকৃষ্ণ তা জানতেন এবং শুধু জানা নয় তাঁদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৈরিভাব থাকা সত্ত্বেও সকলের কাছে হলধারীর প্রশংসা করে বেড়াতেন। সেই ঘটনাতেই আসছি।

দেবী পূজায় জীবন্ত পশু বা প্রাণীর বলিদানের রীতি আছে। সব বড় উৎসবেই এই রীতি মানা হয়। হলধারী কিন্তু কোনো দিনই সহজভাবে ব্যাপারটি দেখে নি। তার মনে হতো প্রথাটি বীভৎস, নিষ্ঠুর। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে বৈষ্ণব আর শাক্ত সাধনার সংঘর্ষের মূল কারণটিও হলো এই পশুবলি প্রথা নিয়ে। নিরামিষাশী এবং অহিংস বৈষ্ণবের আচরণের সঙ্গে কালী সাধকের আচরণের কোনো সমন্বয় হয় না। হলধারীও এই ভুল করেছিল। কালীঘরের পূজারী হতে সম্মত হয়ে পশুবলি প্রথার প্রতি তার ঘৃণাটুকু সে গোপন রাখতে পারে নি। তাই নাটকীয় ভাবেই একদিন তাকে দেবীর দণ্ড গ্রহণ করতে হলো। একদিন যখন মন্দিরের মধ্যে হলধারী ধ্যানমগ্ন, তখন দেবী ভয়ঙ্করী রুদ্রমূর্তিতে তার সামনে আবির্ভূতা হলেন। দেবীর সে কী রোষমূর্তি! হলধারীকে সেই দণ্ডেই মন্দির ছেড়ে চলে যেতে আদেশ করলেন তিনি। তারপর সাবধান করে বললেন, 'খবরদার আমার পূজো করবি না। করলে, সেই পাপে তোর ছেলের মৃত্যু হবে।' আশ্চর্য! এই ঘটনার দিন-

কয়েক পরেই হলধারী স্তম্ভিত হয়ে তার ছেলের মৃত্যুর কথা শুনলো। হলধারী ছুটে গেল রামকৃষ্ণের কাছে। কিছুই গোপন না করে আদ্যোপান্ত সব বললো। আত্মনিন্দামূলক এই স্বীকারোক্তি হলধারীর চরিত্রের এক প্রশংসনীয় দিক। যাহ'ক, সেই থেকে স্থির হলো যে রাধাকান্ত মন্দিরের পূজাদি কাজ করবে হলধারী আর আগের মতন হৃদয়রামের হাতেই থেকে গেল জগন্মাতার নিত্যপূজাদি কাজ।

যাঁরা কৃষ্ণভক্ত তাঁরা ভগবানকে প্রেমিকের চোখে দেখেন। এ-প্রেম স্বামী-স্ত্রীর বিবাহিত প্রেম নয়। শাসন না মানা এই উদভ্রান্ত প্রেম লোকনিন্দাকে তুচ্ছ মনে করে। প্রেমিকা যখন প্রণয়ী সমাগত হয় তখন সে প্রেমের যে স্পর্ধা, তার সঙ্গে সন্তর্পণ বিবাহিত প্রেমের তুলনা হয় না। বিবাহিত প্রেমে সতর্কতা আছে—শোভন-শালীনতার গণ্ডীর মধ্যে ঘোরাফেরা করতেই তার ভাল লাগে। তবে পরকীয়া এই প্রেম দেহজ প্রেম নয়। এ-প্রেম দেহবিযুক্ত, কামগন্ধহীন, অকৃত্রিম। দেহজ কামনার সীমা অতিক্রম করে এই প্রেম দয়িতাকে প্রেমের উচ্চভাবলোকে নিয়ে যায়। ভারতবর্ষে অবশ্য কিছু কিছু এমন সম্প্রদায় চিরকালই ছিল যারা দেবারাধনার সঙ্গে মানব-মানবীর যৌন মিলন এক করে দেখতো। সাধারণ মানুষ এইসব সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকদের খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে কখনও দেখে নি। ফলে লোকচক্ষুর আড়ালে সমাজের সীমান্তের বাইরে তাদের যোগসাধনা করতে হতো। শাস্ত্রে এই যোগাভ্যাসগুলিকেই বামাচার তন্ত্র বলা হয়েছে।

নবম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সমৃদ্ধ তন্ত্রসাহিত্যের এক বিশাল ভাণ্ডার সংস্কৃত ভাষায় রচিত আছে। অনুষ্ঠানগত নানা ক্রিয়াকলাপ, ভোজবিদ্যা, সংকেতচিত্র, অর্থসম্বলিত অক্ষর ইত্যাদির উল্লেখ তন্ত্রসাহিত্যে আছে। তন্ত্রসাধনার উচ্চাবস্থায় জগন্মাতার সঙ্গে আত্মিক মিলন হয়। নিম্নাবস্থায় সাধনার লক্ষ্য হলো ছোট ছোট কামনা পূরণ করা; ব্যাধিমুক্তি, প্রেম, কর্মোন্নতি, শত্রুনাশ ইত্যাদির কামনা। সুতরাং তন্ত্রের পরিধি বহুবিস্তৃত। একদিকে উচ্চতর সাধনা অন্যদিকে শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভণ, বিদ্বেষ, উচাটন, মারণ প্রভৃতি ষড়বিধ নিম্নভূমির যোগাভ্যাস। অর্থাৎ এই সাধনার দুটি দিক এবং ইচ্ছামত একদিকের সাধনা লঘু ও হেয় করে সাধারণ পর্যায়ে নামিয়ে আনা যায়। একজন সাধকের কাছে প্রতীকী অর্থে যা সূক্ষ্ম অন্যজনের কাছে সেটিই স্থূলে এবং ইন্দ্রিয়জ। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। ভারতবর্ষ ও তিব্বতে এমন অনেক তন্ত্রচিত্র আছে যা একদিকে যেমন শিব ও শক্তির (ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি) লীলাকাহিনী ব্যাখ্যা করে তেমনি আবার মিথুনাসক্ত নর-নারীর স্থূলে কামনাও প্রকাশ করে। বামাচারী তন্ত্রের সাধনাই হলো শৃঙ্গাররত মানব-মানবীর দেহমিলনকে শিব ও শক্তির লীলাপ্রেমে উন্নীত করা।

সারদানন্দ মনে করেন যে সুপ্রাচীন বৈদিক যুগের সব সিদ্ধকাম মহাপুরুষই অধ্যাত্ম-সাধনার উন্নতির সঙ্গে ঐহিক ভোগসুখ এক করেছিলেন। তাঁরা জানতেন যে, সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রবল ব'লে জোর ক'রে তা অবদমিত করা যায় না। তাই তাঁরা বিধান দিয়েছিলেন যাঁরা সাধক ভক্ত তাঁরা যেন হীন মহৎ সব কাজের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন। (গীতাতেও সেই কথাই বলা হয়েছে। 'ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন এবং সর্বত্রই তিনি অখণ্ড ত্রুটিহীন। সুতরাং মানুষের পাপাচার ন্যায়াচার নিয়ে ঈশ্বর কেন উদ্বিগ্ন

হবেন ?') কোনো অবস্থাতেই ঈশ্বরচিন্তা অসঙ্গত নয়। অন্তত হীন কাজও ঈশ্বরের নামে শুদ্ধ হতে পারে। অন্যথায় সমস্ত ব্যাপারটিই রবিবারের ধর্মালোচনার মতন ভণ্ডামি হয়ে দাঁড়াবে। পরিচ্ছন্ন বেশবাসে সজ্জিত হয়ে যাঁরা রবিবারের প্রার্থনায় যোগ দেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ভাবেন যে এমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশেই ঈশ্বরচিন্তা অনুকূল হয়—ভগবান দেখা দেন। আর মলিন বসন পরা মানুষের দৈনন্দিনতার গ্লানির মধ্যে ঈশ্বর অনুপস্থিত থাকেন।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের সময় সংস্কারের কিছু চেষ্টা হয়েছিল বলে সারদানন্দ মনে করেন। তবে সেদিনের বৌদ্ধ সংস্কারকরা সাধারণ সংসারী মানুষদের জন্যে এমন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার পথ দেখিয়েছিলেন যা কেবল সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরাই পালন করতে পারতেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাই সংসারী মানুষদের পক্ষে এমন উচ্চ আচরণীয় জীবন-যাপন সম্ভব হয় নি। ফলে এইসব মানুষ একদিন গোপনে তান্ত্রিক সাধনায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল।

একটু চেষ্টা করে ব্যাপারটি বুঝতে হবে কারণ আমাদের পশ্চিমী মন নিষ্ঠার কঠিন নিয়মে বাঁধা। তাই ধর্মসাধনার সঙ্গে যখন যৌনমিলনের ব্যাপারটি এক হয়ে যায় তখন আমরা আঁতকে উঠি। কিন্তু এ আতঙ্ক কেন ? পত্নীর সঙ্গে আমাদের যৌন সম্পর্ক উদ্দেশ্যহীন নয়। বিবাহিত এই সম্পর্কে যেমন প্রেম আছে তেমনি ইন্দ্রিয়সুখও আছে। কিন্তু আমাদের মনে তো সেজন্যে কোনো ক্ষোভ নেই ! এমন অনেকে আছেন যাঁদের কাছে প্রেম হলো 'নিকষিতহেম', তা স্বর্গীয়। তাঁরা মনে করেন স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ প্রেমকে কলুষিত করে। কিন্তু আমরা পশ্চিমী এ মত মানি না। তাহলে যদি কেউ ধর্মানুরাগের সঙ্গে দেহসুখের মিলন ঘটান, সহবাসের সময় পত্নীর মধ্যে জগন্মাতার শারীরি রূপ প্রত্যক্ষ করেন তবে আমরা ক্ষুব্ধ হবো কেন ? সত্যি কথা বলতে কি শৃঙ্গারের সময় পত্নীর মধ্যে জগন্মাতার রূপ কল্পনা করা অভ্যাস করলে আমাদের ভোগবাসনা অনেক ক্ষীণ হয়ে যাবে। তাই সফল না হওয়া পর্যন্ত তেমন চেষ্টা চালিয়ে যেতে ক্ষতি কি !

এইভাবেই তন্ত্রে যৌন-প্রক্রিয়া আমদানি হয়েছে এবং শোভনভাবে আলোচনার মর্যাদা পেয়েছে। অবশ্য রামকৃষ্ণ সারা জীবন ধরে যে শুদ্ধ পরিবেশে তাঁর শিক্ষা ও রুচি গড়ে-ছিলেন সেখানে তন্ত্রের মধ্যে যৌনাচারের কোনো স্থান ছিল না। অবশ্য পরবর্তীকালে বেশ কিছু তন্ত্রসাধকের সঙ্গে আলোচনা করে সাধনার গুহ্য সত্যটি যখন তিনি জানতে পারেন তখন তাঁর অভিমত বদলে ফেলেন। কিন্তু মত বদলালেও তিনি মনে করতেন যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তন্ত্রসাধনা উপযুক্ত নয় ; বরং তা বিপজ্জনক। অবশ্য তিনি এ কথাও জানতেন যে অনেক সাধকসাধিকাই এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি করে-ছেন। তাই ভক্তেরা যখন তন্ত্রসাধকদের ধিক্কার দিত, তখন রামকৃষ্ণ তাদের ভর্ৎসনা করে বলতেন, 'তোমরা ওদের ঘৃণা করো কেন ? অনেক পথের মধ্যে এটিও এক পথ। হয়ত নোংরা পথ। বাড়ির মধ্যে অনেক দোর—সদর দোর, খিড়কি দোর, যে দোর দিয়ে মেথর ধাঙড় অন্দরে ঢুকে ঘর পরিষ্কার করে—সব দোর দিয়েই ঘরে ঢোকা যায়। কে কোন্ দোর দিয়ে ঘরে ঢুকছে তা জেনে কি লাভ ! ঘরে ঢুকতে পারলেই হলো। তার মানে কিন্তু এ নয় যে ওদের মতন হ'য়ে তুমিও খিড়কি দোর দিয়ে ঘরে ঢুকবে। না, তা নয়। কিন্তু মনকে মুক্ত রাখবে, কোনো বিদ্বেষ পুষে রাখবে না।'

ঘটনা হলো যে কঠোর নিষ্ঠাচারী হওয়া সত্ত্বেও হলধারী গোপনে তন্ত্রযোগ অভ্যাস করতো। ক্রমে ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যায়। মন্দিরের অন্য পূজারীরাও ঘটনাটি নিয়ে কানাকানি করতে থাকে। কিন্তু হলধারী বাক্‌সিদ্ধ বলে কুখ্যাত, দোর্দণ্ড তার দাপট। ফলে এসব কথা নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ আলোচনা করতে সাহস পেত না। সংস্কারবশে সবাই মনে করতো যে বাক্‌সিদ্ধ হলধারী কুপিত হয়ে অভিশাপ দিলে সে অভিশাপ ফলে।

হলধারীকে নিয়ে লোকের কানাকানি রামকৃষ্ণ জানতে পারলেন। একদিন সোজা হলধারীর কাছে গিয়ে খোলাখুলি সব কথা জিজ্ঞেস করলেন। কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণের ওপর হলধারী অকারণ চটে উঠলো; বললো, 'বয়সে ছোট হয়ে তুই আমার সমালোচনা করছিস! দেখিস তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।' রামকৃষ্ণ ভয়ে কাঠ; নানাভাবে চেষ্টা করলেন। কিন্তু হলধারীকে প্রসন্ন করতে পারলেন না। বোঝাতে পারলেন না যে তার সম্মানের কথা ভেবেই রামকৃষ্ণ এ কাজ করেছেন। হলধারী বুঝতে চায় নি, অভিসম্পাতও ফিরিয়ে নেয় নি।

কয়েকদিন পরের কথা। সন্ধ্যেনাগাদ রামকৃষ্ণের তালুদেশ সড়সড় করছিল। খানিক পরেই গলগল করে খানিকটা রক্তবমন হলো। ঘটনাটির বিবরণ তিনি এইভাবে দিয়েছেন। 'রক্তের রঙ সিমপাতার রসের মতন মিশকালো। এত গাঢ় সে রক্ত যে কতক গড়িয়ে বাইরে পড়ল, আর কতক মুখের ভিতর জমে সামনের দাঁতের আগা থেকে বটের ঝুরির মতন ঝুলতে লাগল। মুখের ভিতর কাপড় গুঁজে রক্ত বন্ধ করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। তবুও রক্ত পড়া বন্ধ হলো না দেখে বড় ভয় হলো। খবর পেয়ে সবাই ছুটে এলো। হলধারী তখন মন্দিরে সেবার কাজ সারছিল। সংবাদ পেয়ে সেও শশব্যস্তে এসে পড়ল। তাকে বললাম, "দাদা, শাপ দিয়ে তুমি আমার একি অবস্থা করলে দেখ দেখি!" আমার কাতরতা দেখে সেও কাঁদতে লাগল।

সৌভাগ্যবশত সেদিন ঠাকুরবাড়িতে একজন সাধু এসেছিলেন। রক্তের রঙ আর মুখের ভিতরে নির্গত স্থানটি পরীক্ষা করে তিনি বললেন, "ভয় নেই, রক্ত বার হয়ে ভালই হয়েছে। দেখছি, তুমি হঠযোগ সাধনা করতে। তাই সুষুম্নাদ্বার খুলে শরীরের রক্ত মাথায় উঠে যাচ্ছিল। ভালই হ'ল যে মাথায় না উঠে শরীরের রক্ত মুখের ভেতরে একটা পথ করে নিয়েছে; এমনটি না হলে তোমার হয়ত নির্বিকল্প সমাধি হ'ত, আর কিছুতেই তোমার চেতনা ফিরে আসত না। তোমার দেহটি দিয়ে মা কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান; তাই তিনি এইভাবে তোমাকে রক্ষা করলেন।" সাধুর ওই কথা শুনে আমি খুব আশ্বস্ত হলাম।'

(দক্ষিণেশ্বরে একবার একজন সাধক এসেছিলেন। রামকৃষ্ণকে তিনিই হঠযোগের সাহায্যে কুণ্ডলিনী জাগানোর প্রক্রিয়াগুলি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। [ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য] আজকের দিনে হঠযোগ খুব জনপ্রিয়; তাই রামকৃষ্ণের মতামতটি সকলের জানা উচিত। রামকৃষ্ণ কোনোদিনই এই সাধনপথটি সমর্থন করেন নি। তিনি বলতেন ওই সব সাধন একালের জন্যে নয়, কারণ হঠযোগের অভ্যাস করলে শরীর নিয়েই বিভোর থাকতে হয়; ফলে মনের আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে অবহেলা হয়।)

যাকে শাপে বর হওয়া বলে, তাই হলো। হলধারীর অভিসম্পাত আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ালো। মনে মনে তার কিঞ্চিৎ অনুতাপ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মনে প্রাণে সে রামকৃষ্ণকে স্বীকার করে নিতে পারে নি, তাঁকে ভালবাসতেও পারে নি। খানিকটা অনিচ্ছাজনিত শ্রদ্ধা আর

অনেকখানি ঘৃণা নিয়ে রামকৃষ্ণকে সে দেখতো। ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে হলধারীর যথেষ্ট আত্মগর্ব ছিল—জাত্যাভিমানটুকু সে কিছুতেই ভুলতে পারতো না। খুবই ক্ষুব্ধ হতো যখন দেখতো ধ্যানে বসে রামকৃষ্ণ হয়ত উপবীতখানি খুলে রাখলেন কিংবা পূজাবিধির আচার বিচার কঠোর ভাবে পালন করলেন না। তবুও একটা জায়গায় হলধারী আকর্ষণ বোধ করতো। রামকৃষ্ণ যখন ধ্যানে বসতেন তখন তাঁর ধ্যানের সুমধুর ভাবটি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত হলধারী। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে হলধারী বুঝেছিল যে এক মহাশক্তির আবেশ হয়েছে রামকৃষ্ণের মতন এই প্রায়-উন্মাদ এক অদ্ভুত মানুষের শরীরের আধারে—এই ব্যাপারটিই হলধারীর কাছে সবচেয়ে রহস্যজনক মনে হতো।

হলধারীর কথা বলতে গিয়ে রামকৃষ্ণ এমন অনেক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, যখন হাসি-ঠাট্টার মধ্যে শুরু হয়ে আলোচনা বেশ ক্রুদ্ধ বাদানুবাদে পরিণত হয়েছে। যে সময়কার ঘটনা নিয়ে রামকৃষ্ণ আলোচনা করেছেন তা হলো ১৮৫৮ থেকে ১৮৬৫ মধ্যে—হলধারী তখন বছরের সব সময় দক্ষিণেশ্বরেই থাকতেন।

এই রকমই একটি ঘটনার কথা রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'আমার পুজো দেখে মোহিত হয়ে হলধারী কতদিন বলেছে, "রামকৃষ্ণ এবার আমি তোকে চিনেছি!" তাতে আমি ঠাট্টা করে বলতাম, "দেখো, আবার যেন গোলমাল না হয়ে যায়!" হলধারী বলতো, "এবার আর ফাঁকি দেবার যো নেই; তোর মধ্যে নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় আবেশ আছে; এবার আমি ঠিক বুঝেছি!" শুনে বলতাম, "আচ্ছা দেখা যাবে কদিন তুমি ঠিকঠাক থাক।" কিন্তু যে মুহূর্তে মন্দিরের বাইরে এসে নাকে একটিপ নস্যি নিয়ে হলধারী গীতা বা অন্য কোনো শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে বিচার করতে বসতো, অমনি তার উচ্চভাব লোপ পেয়ে যেত—অভিমানে ফুলে ফুলে উঠতো তার বুক। তখন সে একেবারে অন্য মানুষ। এমনি যখন তার আত্মাদর অবস্থা হতো তখন মাঝে মাঝে তার কাছে যেতাম। তাকে বলতাম, 'তুমি শাস্ত্রে যা যা পড়েছ সে সব অবস্থাই আমার উপলব্ধি হয়েছে; আমি ওসব কথা বুঝতে পারি।" শুনে সে যেন ক্ষেপে উঠতো, বলতো, "তুই একটা গণ্ডমূর্খ, এসব উপলব্ধির কথা তুই কি বুঝবি?" আমি বলতাম, "আমার শরীরের মধ্যে যে আছে সে-ই আমায় সব বুঝিয়ে দেয়—তুমি নিজেই তো সে সব কথা বলেছো!" এ কথা শুনে রাগে ক্ষোভে হলধারী প্রায় পাগলের মতন ব্যবহার করতো, "যা যা মুখ্যু কোথাকার, নিজেকে তুই কি ভাবিস? অবতার? শাস্ত্রে বলেছে কলিতে একজনই অবতার, তিনি কল্কি। তুই নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছিস তাই ওসব কথা ভাবিস।" আমি হেসে বলতাম, "এই যে বলেছিলে আমায় তুমি ঠিকঠাক বুঝেছো, আর গোল হবে না?" কিন্তু সেসব কথা শোনে কে! তার মনের অবস্থা তখন অন্যরকম। এমন ঘটনা একআধদিন নয় প্রায়ই ঘটতো।'

মায়ের রুদ্ররূপ দর্শন আর তাঁর কোপে তার শিশুপুত্রের মৃত্যুর পর থেকেই হলধারী মা জগদম্বাকে রাক্ষসী বলে ভাবতে শুরু করেছিল। শুধু তাই নয়; একদিন তার ধারণার কথা রামকৃষ্ণকে বলেও ফেললো হলধারী। 'যে মা শুধু ক্ষতিকরে ধ্বংস করে তার পুজো তুই করিস কেন?'

হলধারীর কথা শুনে গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মার নামে এ মিথ্যে কলঙ্ক। তবুও সেদিন কালীঘরে ঢুকে সোজাসুজি মাকে জিজ্ঞেস

করলেন। 'মা, হলধারী অনেক শাস্ত্র পড়েছে। সে পণ্ডিত। সে তোকে তমোগুণময়ী বলে ; তুই কি তাই মা ?' মা জগদম্বা তখনি পূর্ণশুদ্ধা প্রেমময়ী রূপে রামকৃষ্ণের চোখের সামনে প্রতিভাত হলেন। সে রূপ দেখে রামকৃষ্ণ অভিভূত। উল্লাসে আটখানা হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালেন রাধাকান্ত মন্দিরে। তারপর পূজারত হলধারীর কাঁধে চেপে বারবার বলতে লাগলেন, 'মা-ই সব। তিনি কি শুধু তামসী ? আর বলবি না ওকথা। মা সর্বগুণান্বিতা, তবুও শুদ্ধাপ্রেমময়ী ছাড়া মা আর কিছু নন।'

ভাবাবিষ্ট রামকৃষ্ণের ছোঁয়ায় হলধারীর অন্তর্লোক আলোকিত হলো। সেই উদ্ধত ক্রোধ, সেই উগ্র অভিমান সব যেন নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে সত্যটুকু। হলধারী ফুলচন্দন নিয়ে রামকৃষ্ণের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিলেন, যেন রামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি জগন্মাতাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন।

পরে হৃদয় এসে হলধারীকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি গো, তুমিই না বলেছিলে রামকৃষ্ণ পাগল, তাকে ভূতে পেয়েছে, তা তুমিই আবার তাঁকে পুজো করলে কেন ? হলধারী স্বীকারোক্তি করেছিল। 'সে কথা বলতে পারবো না, তবে রামকৃষ্ণ যখন কালীঘর থেকে ফিরে এলো তখন তাকে দেখেই মজে গেলাম। তার মধ্যে যেন সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রকাশ দেখলাম। কালীঘরে গিয়ে যখনই তার সামনে দাঁড়াই তখনই আমার এমনটি অবস্থা হয়। কেন হয় কিছুতেই বুঝতে পারি না।'

অন্তর্লোকের এই ক্ষণিক উদ্ভাস সত্ত্বেও হলধারী প্রায়ই গোল করে ফেলতো। রামকৃষ্ণের মধ্যেও ঈশ্বরপ্রকাশের স্বরূপটি হলধারী বহুবারই লক্ষ্য করেছে। তবুও তাকে সে যখন সমাগত কাঙালীদের ভোজনাবশেষ গ্রহণ করতে দেখতো তখন নিজেকে সে সামলাতে পারতো না। রামকৃষ্ণকে পতিত অনাচারী বলে মনে হতো। চেঁচিয়ে বলতো, 'কি করছিস ? কাঙালীদের এঁটো খাচ্ছিস ? এইভাবে জাত খোয়াচ্ছিস ? দেখবো বামুনের ঘরে কি ক'রে তোর ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিস্।'

হলধারীর মুখে এমন উদ্ভট কথা শুনে রামকৃষ্ণের যেন সেদিন ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। লাফিয়ে উঠে বলেছিলেন, 'তবে রে শালা ; শাস্ত্রব্যাখ্যা করার সময় তুই না বলিস, জগৎ মিথ্যে, তাই সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয় ? তুই বুঝি ভাবিস, আমি তোর মতন জগৎ মিথ্যে বলবো অথচ ছেলেমেয়ের বাপ হবো ! এই যদি তোর শাস্ত্রজ্ঞান হয়, তবে ধিক তোর জ্ঞানে !'

ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণের এই উন্মাদাবস্থার খবর চন্দ্রা আর রামেশ্বরের কাছেও পেঁছে গেছে। দু'জনেই ভয় পেয়ে গেলেন। যেমন ক'রে হোক ছেলেকে কামারপুকুরে আনাবার জন্যে ব্যাকুল হলেন চন্দ্রা। অধীরা হয়ে চন্দ্রা পত্র পাঠালেন যেন একটিবারের জন্যেও রামকৃষ্ণ দেখা দিয়ে যান। সব মায়ের মতন চন্দ্রাও ভেবেছিলেন ছেলেকে কোনোরকমে ঘরে ফেরাতে পারলেই হয়ত তার রোগবালাই সব দূর হয়ে যাবে।

সুতরাং রামকৃষ্ণ কামারপুকুরে ফিরে এলেন। সেটা ১৮৫৮ সালের শেষ দিক। তাঁকে দেখে চন্দ্রা আর রামেশ্বর দু'জনেই অবাক। অনেক বদলে গেছেন রামকৃষ্ণ। সদাই ছটফট করছেন। পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে কদাচিৎ সচেতন। সারা শরীরে অসহ্য জ্বালা। জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে গা। বোধহয় মুহুর্মুহু সমাধিপ্রাপ্ত হবার দরুনই তাঁর এই অবস্থান্তর। থেকে থেকে 'মা' 'মা'

ক'রে ব্যাকুলভাবে কেঁদে উঠছেন। দেখে শুনে কেমন যেন পাথর হয়ে গেছেন চন্দ্রা। ছেলের এই তীব্র মানসিক কষ্টের কোনো উপশমই তিনি করতে পারছেন না। মা মা বলে ছেলে যাকে ডাকছে সে যে অন্য মা, চন্দ্রা নন, তা তো তিনি জানেন!

ঠিক যেমন রাণী ও মথুর রামকৃষ্ণের চিকিৎসার জন্যে বদ্যি আনিয়েছিলেন, চন্দ্রাও তেমনি ছেলের কল্যাণের কথা ভেবে একদল ওঝা ডাকিয়ে আনালেন। এই ওঝা আনার ঘটনাটি পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ তাঁর অনন্যসাধারণ পরিহাসপ্রিয়তার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। 'একদিন একজন ওঝা এলো। মন্ত্রপড়া একটা পলতে পুড়িয়ে আমায় শুঁকতে দিয়ে বলল, "যদি তোর শরীরে ভূত থাকে তো সে ঠিক পালাবে।" কিন্তু কিছুই হলো না। আর একদিন সবাই মিলে যোগাযোগ করে আত্মা নামাল। পুজোর নৈবেদ্য খেয়ে আত্মা প্রসন্ন হয়ে জানাল, "ওকে ভূতে পায় নি। ওর কোনো অসুখও হয় নি।" তারপর যার মাধ্যমে আত্মা নামানো হয়েছিল তার মুখ দিয়ে আমাকে সম্বোধন করে বলল, "গদাই, তুমি সাধু হতে চাও তবে অত সুপুরি খাও কেন? সুপুরি বেশী খেলে কামবৃদ্ধি হয় জান না?" সত্যিই সুপুরি খেতে আমি বড় ভালবাসতাম আর যখন তখন খেতাম। আত্মার আজ্ঞা শুনে সেই থেকে সুপুরি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

কামারপুকুরে কয়েকমাস থাকতে থাকতেই অনেকটা ধাতস্থ হয়ে উঠলেন রামকৃষ্ণ। ছেলে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে দেখে চন্দ্রাও অনেক নিশ্চিন্ত। আসলে রামকৃষ্ণের তখন আরও উচ্চ ভাবের উপলব্ধি হয়েছে। জগন্মাতার অস্তিত্ব প্রায়ই টের পান। দর্শনাকাঙ্ক্ষায় মনের সেই উচাটন ভাব আর নেই।

কামারপুকুরে এলেও দীর্ঘক্ষণ ধরে ধ্যান করার অভ্যাস রামকৃষ্ণ ছেড়ে দেন নি। কাছাকাছি দুটি শ্মশানেই বেশী সময় কাটাতেন। কালী শ্মশানে থাকতেই ভালবাসেন। সাধনারও নির্বিঘ্ন স্থান হলো শ্মশানক্ষেত্র। মানুষের উপদ্রব নেই—তাছাড়া শ্মশানে এলে একটা বৈরাগ্য আসে; জীবনের অনিত্যতার কথা মনে করিয়ে দেয়। রামকৃষ্ণ সঙ্গে করে খাবারদাবার আনতেন, তারপর শিবা আর অপদেবতাদের উদ্দেশে সেই খাদ্যবস্তু উৎসর্গ করতেন। ধ্যান করতে করতে যেদিন রাত গভীর হতো, সেদিন রামেশ্বর শ্মশানে এসে ভাইকে ডেকে নিয়ে যেতেন। দাদার ডাক শুনলে রামকৃষ্ণ বলতেন, 'দাদা, আমি আসছি। তুমি আর ভেতরে এস না। ওখানেই দাঁড়াও। এরা তোমার ক্ষতি করতে পারে।'

শেষমেশ চন্দ্রা আর রামেশ্বরের একটিমাত্রই করণীয় কাজ ছিল। তা হলো বিয়ে দিয়ে রামকৃষ্ণকে গৃহী করা। একটি সুশীলা মেয়ে ঘরে আনলে তার প্রতি রামকৃষ্ণের ভালবাসা জন্মাবেই। তখন তাঁর মন থেকে ঐশী দর্শন নিয়ে আবেগ আর মাতামাতি অনেক কমে যাবে। স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘরকন্না করতে করতে মন থেকে দায়িত্বহীনতাও চলে যাবে।

কিন্তু সমস্যার সমাধান এত সহজ হলো না। সংসারের অভাব অনটন এত প্রকট ছিল যে, উপযুক্ত বিবাহপণ দিয়ে একটি সুলক্ষণা পাত্রী ঘরে আনা চন্দ্রা বা রামেশ্বরের সাধ্যাতীত ছিল। পাত্রী যৌবনপ্রাপ্তা হলে বিবাহপণের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। রামকৃষ্ণ যদি হিন্দু ঘরের সাধারণ পাত্র হতেন তবে অনেক আগেই তাঁর বিবাহ হতো। সেক্ষেত্রে ন'দশ বছরের বালিকাই তাঁর পাত্রী মনোনীত হতো। (হিন্দু বিবাহ হলো প্রধানত বাগ্‌দানের উৎসব) মনোনীত পাত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা হয়ে যুবক রামকৃষ্ণের উপযুক্ত হতো। সুতরাং সর্বদিক

বিবেচনা করে চন্দ্রা একটি বয়ঃপ্রাপ্তা পাত্রীর সঙ্গেই রামকৃষ্ণের বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণকে কিছু জানানো না হলেও তিনি সব অনুমান করেছিলেন। আর আশ্চর্য যে বিবাহে একটুও আপত্তি করেন নি। অনুমান হয় ব্যাপারটি তাঁর কাছে কৌতুককর মনে হয়েছিল, কারণ বিয়েব কথা উঠলেই তিনি আনন্দে হৈ হৈ করতেন।

কিন্তু সব চেষ্টা বিফল হলো, মনোমত পাত্রীব সন্ধান মিলল না। যা দু'একটি পাওয়া গেল, সেখানে বিবাহপণের পরিমাণ এত বিপুল যে অগ্রসর হওয়া গেল না। অবস্থা যখন এমন, চন্দ্রা এবং রামেশ্বব দু'জনেই হতাশ, তখন একদিন ভাবাবিষ্ট রামকৃষ্ণ তাঁদের বললেন, 'তোমরা অন্য কোথাও খুঁজো না। জয়রামবাটী গ্রামের রাম মুখুজ্জের বাড়িতে আমাব কনে কুটোবাঁধা হয়ে রাখা আছে।' ('কুটাবাঁধা' একটি দেশাচার। বাংলাদেশের গ্রামেব এক প্রাচীন প্রথা। বিশেষ একটি ফল বা কাঁচা আনাজের গায়ে খড় বেঁধে দেবতাকে সেটি উৎসর্গ করা হয়। খড় বাঁধার দরুন্ সেই দ্রব্যের ওপর অন্য কারো অধিকার থাকে না। গাছ থেকে পেড়ে কেউ সেগুলি বেচতেও পারে না।)

রামকৃষ্ণের কথা শুনে চন্দ্রা আর রামেশ্বর জয়রামবাটীর রাম মুখুজ্জেব বাড়িতে লোক পাঠালেন। পরিবারে একটি কন্যা সন্তানের খোঁজও পাওয়া গেল। রামবাবুরই মেয়ে—নাম সারদামণি। কিন্তু নেহাতই বালিকা, মাত্র পাঁচ বছর তার বয়স। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চন্দ্রা রাজী হলেন। রামকৃষ্ণের এই পাত্রী মনোনয়ন অনেকখানি দৈব অনুপ্রাণিত সুতরাং এখানেই রামকৃষ্ণেব বিবাহ পাকা পরে ফেললেন চন্দ্রা। পাত্রীপক্ষের হাতে গুণেগুণে তিনশোটি টাকা বিবাহপণ দিলেন। তারপর ১৮৫৯ সালের মে মাসে তেইশ বছরের যুবক বর রামকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রজ রামেশ্বর, জয়রামবাটী গ্রামে তাঁর শুভ পরিণয় সম্পন্ন করাতে উপস্থিত হলেন।

বিয়েতে যথাসম্ভব মিতব্যয়ী হলেও সম্পূর্ণ দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারেন নি চন্দ্রা। নববধূকে অলঙ্কৃত করতে সব দরকারি গহনাগাটি লাহা পরিবার থেকে কর্জ করে এনেছিলেন। (পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে এই লাহা পরিবারের ধর্মদাস লাহাই গদাধরের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে সব ব্যয়ভাব নিজে নিয়েছিলেন।) এবার গহনাগুলি ফেরত দেবার সময় উপস্থিত। কিন্তু বধূমাতার গা থেকে গহনাগুলি কোন্ প্রাণে চন্দ্রা খুলবেন! রামকৃষ্ণ মাকে আশ্বস্ত করলেন। একদিন বালিকা সারদা যখন নিদ্রিতা তখন গহনা খুলে মার হাতে ফেরত দিলেন রামকৃষ্ণ। ঘুম থেকে উঠে সারদা শোকার্ত হলে চন্দ্রা তাকে কোলে বসিয়ে সান্ত্বনা দিলেন; বললেন রামকৃষ্ণ তাকে অনেক গহনা গড়িয়ে দেবে। বালিকা বুঝলেও বালিকার কাকা বুঝলো না। অসন্তুষ্ট হয়ে সারদাকে জয়রামবাটী নিয়ে গেল তার কাকা। এই ঘটনায় চন্দ্রা খুবই আহত হয়েছিলেন; কিন্তু রামকৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে কৌতুক করে বলেছিলেন, 'তুমি ভাবছ কেন মা! ওঁরা এখন যাই করুন আর যাই বলুন বিয়ে আর ফিরবে না।'

বিয়ের পরে প্রায় একবছর সাত মাস রামকৃষ্ণ কামারপুকুরে থেকে গেলেন। চন্দ্রার ইচ্ছে ছিল গ্রামে স্থায়ীভাবে থেকে রামকৃষ্ণ সংসার করুক। কিন্তু রামকৃষ্ণের মনে অন্যরকম ইচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে জগন্মাতার সেবায় ব্রতী হতে তাঁর মন ব্যাকুল। অন্য একটি কারণও ছিল। মা ভাইয়ের সংসারে নিত্য অভাব। এখানে থাকা মানেই ওঁদের গলগ্রহ হওয়া। বরং

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে মন্দিরের কাজে যোগ দিলে তিনি এদের কিছু অর্থ সাহায্য করতে পারবেন।

দিনকয়েক পরে রামকৃষ্ণ জয়রামবাটী গেলেন, তারপর সারদাকে সঙ্গে নিয়ে 'যোড়ে' কামারপুকুরে ফিরলেন। সেবার রামকৃষ্ণ যখন কলকাতায় ফিরলেন তখন ১৮৬০ সালটি শেষ হতে চলেছে।

পাঠকদের কাছ থেকে সারদানন্দ যে প্রশ্নটি প্রত্যাশা করেন তা হলো সন্ন্যাসী হয়ে রামকৃষ্ণ বিবাহে মত দিয়েছিলেন কেন। সারদানন্দ মনে করেন না যে, তাঁর মতের বিরুদ্ধে কখনো কোনো কাজে রামকৃষ্ণকে কেউ ব্রতী করতে পেরেছে। তাঁর জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে যাঁদের এতটুকু পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে, আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিংবা সঠিকভাবে বলতে গেলে জগন্মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রামকৃষ্ণ কখনও কোনো কাজ করেন নি। এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। পাত্রী মনোনয়ন করে রামকৃষ্ণ স্ব-ইচ্ছায় বিবাহ করেছিলেন।

সারদানন্দ মনে করেন যে, বিয়ে করে রামকৃষ্ণ একটি আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। হিন্দুর বিবাহে তখন ভ্রষ্টাচার এসেছে। পুরুষের সমাজে স্ত্রীর মর্যাদা অনেক হেয় হয়ে গেছে। বিবাহিতা স্ত্রী হয়ে উঠেছে স্বামীর লালসার বস্তু। সংসারে তার পরিচয় হয়েছে দাসীরূপে। রামকৃষ্ণ তাঁর স্ত্রীকে সর্বগুণান্বিতা করে শিক্ষা দিয়েছিলেন শুধু পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেবার জন্যে নয়, তাঁকে আরও মহীয়সীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে একটি দৃষ্টান্ত রাখতেই রামকৃষ্ণ যত্নবান হয়েছিলেন। স্ত্রীকে জগন্মাতারূপে বন্দনা করেছিলেন রামকৃষ্ণ। বিবাহ না করলে শিষ্যদের কাছে নারীর এই মাতৃরূপটি তিনি দেখাতে পারতেন না। শিষ্যরা হয়ত অনুযোগ করে বলতো, 'ওঁর পক্ষে সংযমের কথা বলা সহজ কারণ নারী-সংসর্গ কি তা উনি জানেন না।' কিন্তু আমরা জানি যে সারা জীবন একত্রে বাস করেও রামকৃষ্ণ জিতেন্দ্রিয় ছিলেন; এমনকি যুবতী সারদা যখন বিলক্ষণ সুন্দরী তখনও তাঁর শুদ্ধ সংযম এতটুকু টলে নি বা শিথিল হয় নি।

রামকৃষ্ণ কিন্তু মানবজাতির ধ্বংস কামনা করে দেহাতীত প্রেমের আদর্শ স্থাপন করতে চান নি। তিনি শুধু বলতেন, 'আমি যা করেছি তা তোমাদের সকলের জন্যে। যদি ষোলো আনা পেরে থাকি তোমরা অন্তত এক আনা পারবে।'

৮

ভৈরবীর আগমন

কলকাতায় ফিরেই দেবীর পূজাদিকাজে আবার মেতে উঠলেন রামকৃষ্ণ। কিন্তু এই বাহ্যাচার বেশিদিন চালানো গেল না। দিন কয়েকের মধ্যেই জগন্মাতার প্রত্যক্ষতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা আর একবার তাঁকে অভিভূত করলো। ভাবের বন্যায় তখন হৃদয়ের দুকূল প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে ক্রিয়াকলাপের বাহ্যাচারগুলির প্রতি আর তেমন মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। পুরোনো লক্ষণগুলি আবার সব ফিরে এসেছে। সেই অসহ্য গাত্রদাহ, সর্বক্ষণ রক্তিম হয়ে থাকা বক্ষঃস্থল আর দিনের পর দিন ধরে একনাগাড়ে অনিদ্রা। কিন্তু এবার লক্ষণগুলি বাস্তবিকভাবে তিনি চিনতে পেরেছেন, তাই ভয়ে আত্মহারা হয়ে পড়লেন না।

কিন্তু রামকৃষ্ণ বিচলিত না হলেও মথুর এবারও বিচলিত হলেন। চিকিৎসার জন্যে এবারও একজন ডাক্তার আনা হলো এবং যথারীতি নিষ্ফল ওষুধের এক লম্বা ব্যবস্থাপত্র তৈরি ক'রে দিলেন তিনি। রোগ কিন্তু যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। একদিন রামকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে মথুর ক'লকাতায় ডাক্তার দেখাতে এলেন। অন্য একজন ডাক্তারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রামকৃষ্ণকে তিনিও পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, 'মনে হচ্ছে এঁর অসুখটি সাধারণ নয়। রুগীর দিব্যোন্মাদ অবস্থা হয়েছে। এ যোগজ ব্যাধি। সাধারণ ওষুধে এ রোগ সারবে না।' অনেক বছর পরে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, সেদিন ক'লকাতার ওই ডাক্তারবাবুটিই প্রথম এবং একমাত্র চিকিৎসক যিনি তাঁর অবস্থাটি ঠিকঠাক বুঝেছিলেন। কিন্তু সেদিন মথুর ও অন্য ডাক্তারবাবুটি এই সহকর্মী চিকিৎসকের মতামত একেবারেই মানেন নি।

রামকৃষ্ণের যে আবার উন্মাদ অবস্থা দেখা দিয়েছে সে খবরটি কামাপুকুরেও পৌঁছাল। সব শুনে চন্দ্রা হতাশ হয়ে পড়লেন। ছেলের কল্যাণের জন্যে এতদিন যা করেছেন সমস্ত বিফল হলো দেখে তিনি স্থির করলেন যে প্রায়োপবেশন ক'রে অনশনে হত্যা দিয়ে দেবালয়ে পড়ে থাকবেন, যতদিন না তাঁর মনোভিলাষ পূর্ণ হয়। প্রথমে গেলেন কামারপুকুরের শিব-মন্দিরে। সেখানে প্রায়োপবেশনে থাকাকালীন স্বপ্নাদেশ পেলেন, পাশের গ্রাম মুকুন্দপুরের শিবতলায় হত্যা দিতে হবে। তাই করলেন চন্দ্রা। দিন দুই পরে স্বপ্নে দেখা দিয়ে শিব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ভয় নেই, তোর ছেলে পাগল হয় নি। ঐশ্বরিক আবেশে তার অমন অবস্থা হয়েছে।' দেবাদেশ পেয়ে চন্দ্রা আশ্বস্ত হলেন তারপর শিবের পুজো দিয়ে তিনি কামারপুকুরে ফিরে এলেন। সেই থেকে ছেলের মানসিক শান্তির জন্যে চন্দ্রা একমনে কুল-দেবতা রঘুবীরের সেবা করা শুরু করেছিলেন।

তখনকার মানসিক অবস্থা স্মরণ ক'রে রামকৃষ্ণ বলতেন : 'একটার পর একটা আধ্যাত্মিক-ভাবের বন্যা আসতে লাগল জীবনে। যেন একটা ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে দিনকতক পড়ে গিয়েছিলাম। কখনো পৈতা উড়ে যাচ্ছে, পরনের ধুতি খুলে যাচ্ছে। হয়ত মুখখানি হাঁ

করেছি, মনে হলো চোয়ালটি যেন স্বর্গ থেকে মাটিতে খসে পড়ল। ভয়ে কেঁদে ফেলে মা মা বলে ডাকতাম। মনে হতো টানা জালে মাছ ধরার মতন মাকে টেনে আনি। রাস্তা দিয়ে বেশ্যা চলেছে—তাকে দেখে মনে হতো যেন সীতা চলেছেন যুদ্ধবিজয়ী পতি সন্দর্শনে। সায়েবদের একটা ছেলেকে রাস্তায় ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বালক কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজ্ঞান লোপ! কখনো রাস্তার কুকুরের সঙ্গে ভাগ করে খাবার খেতাম। গায়ের লোম জট পাকিয়ে যেত। মাথার উপর পাখি এসে বসত তারপর খুঁটে খুঁটে পুজোর চাল তুলে নিয়ে যেত। যখন ধ্যানে বসতাম তখন নিশ্চল শরীরের ওপর দিয়ে সাপ ঘোবাফেরা করত। সাধারণ অবস্থায় এই বিকারের চারভাবের এক ভাগ হলেই শরীরের জ্বালায় মানুষ জ্বলে উঠত। ছ'টা বছর একটুও ঘুমুতে পারি নি। চোখের পলক ফেলার ক্ষমতাও আমার ছিল না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম—হাত দিয়ে জোর করে চোখের পলক ফেলবার চেষ্টা করতাম, পারতাম না। শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেলতাম। মাকে ডেকে বলতাম, "মা! তোকে যারা ডাকে তাদের কি এই অবস্থা হয়? নিজেকে তোর কাছে সঁপে দিলাম তাই কি শরীরে এই কালব্যাধি দিলি?" কাঁদতাম আবার পরক্ষণেই মনে দিব্যোল্লাশ হতো। ভাবতাম যা হবার হোকগে, যায় যাক তুচ্ছ শরীর। মা দেখা দিয়েছেন। কৃপা করেছেন। তাঁর চরণে আশ্রয় পেয়েছি সেই ঢের। মন থেকে তখন সব ভয় অস্বস্তি কেটে যেত।'

রামকৃষ্ণ একদিন দ্বাদশ শিবমন্দিরে গিয়ে শিবের মহিমা স্তোত্র আবৃত্তি করছিলেন :

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী
লিখতি যদি গৃহীত্বা শারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি—

আবৃত্তি করতে করতে স্তোত্রের শেষ পর্বে পেঁৗছে আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন রামকৃষ্ণ। দু'চোখ দিয়ে দরদর করে জল ঝরে তাঁর গায়ের জামা ভিজিয়ে দিল। চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'হে দেবাদিদেব, বলে দাও কেমন করে তোমার মহিমা প্রচার করবো!' ইতিমধ্যে মন্দিরের চাকরবাকররা তাঁর চারপাশে ভিড় করে হাসিঠাট্টা করছিল আর বলছিল, 'ওরে! এ তো আজ দেখছি ঘোর পাগল! এরপর মনে হচ্ছে শিবের ঘাড়ের ওপর চড়ে বসবে!' এমন সময় মথুর এসে পড়লেন। যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তাদেরই একজন সমীহ করে চুপিচুপি পরামর্শ দিল, যেন পাগল রামকৃষ্ণকে এখনি সরিয়ে দেওয়া হয়, নইলে উনি ঠিক লিঙ্গমূর্তি ছুঁয়ে একটা অনাচার করে বসবেন। কথাটা শুনেই মথুর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন! কঠিন স্বরে বললেন, 'খবরদার! ওঁর গায়ে যে হাত তুলবে তার মাথা আর আস্ত থাকবে না।' বলা বাহুল্য, রামকৃষ্ণের তখনও ভাবাবেশ চলছে। খানিক পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে রামকৃষ্ণ দেখলেন তাঁর চারপাশে সবাই দাঁড়িয়ে, এমনকি স্বয়ং মথুরও। একটু ভয় পেলেন রামকৃষ্ণ। অপরাধীর মতন ক্ষুণ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু কি দোষ করে ফেলেছি?' 'না না কিছু না'—মথুর তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। 'আপনি স্তোত্র আবৃত্তি করছিলেন। আমি দাঁড়িয়ে দেখছিলুম যাতে কেউ আপনাকে বিরক্ত না করে।'

রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে মথুরের বিশ্বাস শেষকালে যে পুরস্কারটি পেল তা একটি অলৌকিক

দর্শন। নহবতখানার সামনের বারান্দায় রামকৃষ্ণ সেদিন পায়চারি করছেন। মথুর বসেছিলেন তাঁর কুঠি বাড়ির ঘরে। খোলা জানলা দিয়ে তিনি রামকৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছিলেন। রামকৃষ্ণ তখন নিবিড় ধ্যানমগ্ন, কেউ যে তাঁকে নিরীক্ষণ করছেন সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

হঠাৎ কী হলো ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন মথুর তারপর সটান রামকৃষ্ণের পা জড়িয়ে হু হু করে কাঁদতে লাগলেন।

এমনভাবে ভাবভঙ্গ হওয়ায় চমকে উঠলেন রামকৃষ্ণ। মথুরের কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি তখন একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। যদিও রাণী ও মথুরবাবু তাঁকে রীতিমত শ্রদ্ধা করতেন এবং অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে তাঁরা দু'জনেই নানাভাবে রামকৃষ্ণের পরামর্শ নিয়েছেন, তবুও গ্রামের ছেলের পক্ষে একজন প্রভূত বিত্তশালী ও ক্ষমতাবান মানুষকে যে দৃষ্টিতে দেখা উচিত, সেই সম্ভ্রমের দৃষ্টিতেই রামকৃষ্ণ তাঁর অন্নদাতা এবং প্রতিপালকদের দেখতেন। সুতরাং ওই অবস্থায় মথুরকে তাঁর পায়ের ওপর পড়ে থাকতে দেখে রামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, 'ও কি করছেন ? আপনি সদাশয়, রাণীর জামাতা ; লোকে এই অবস্থায় আপনাকে দেখলে কি ভাববেন বলুন তো ? উঠুন, শান্ত হোন।' বেশ খানিকক্ষণ ধরে মথুর কাঁদলেন তারপর নিজেকে সংযত করে বললেন, 'বাবা ! এখুনি আপনি যখন পায়চারি করছিলেন তখন আমার ঘরের জানলা দিয়ে আপনাকে দেখছিলাম। স্পষ্ট দেখলাম যেমন আমার দিকে ফিরে হাঁটছেন তখন আপনি মা জগদম্বা, আবার যখন উল্টোমুখে হাঁটছেন তখন আপনি দেবাদিদেব মহাদেব ! প্রথমটায় নিজের চোখকে বিশ্বাস করি নি। তাই ভাল করে চোখ রগড়ে আবাব দেখলাম। একই ছবি। তারপর যতবার দেখি ততবার সেই একই দৃশ্য।'

ঘটনাটি বলতে গিয়ে রামকৃষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন ; 'তখন যে আমার কোনো ভাববিশেষ হয়েছিল সে হুঁশ ছিল না। এ ব্যাপারে কিছুই জানতে পারি নি। কিন্তু মথুরবাবুকেও আমি বোঝাতে পারিনি। আমার কেবলই ভয় হচ্ছিল রাণী যদি জানতে পারেন, না জানি কি ভাববেন আমার সম্বন্ধে ? হয়তো মনে করবেন মথুরকে যাদু করেছি।'

•

সেই বছবেই শীতের সময় বাসমণি আমাশয় বোগে কাহিল হয়ে পড়লেন। সঙ্গে জ্বর। বাণী বুঝেছিলেন.যে দিন তাঁর শেষ হয়ে আসছে। তাই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ব্যয়নির্বাহেব জন্যে সম্পত্তি দেবোত্র করে দানপত্র লিখে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দানপত্র অবশ্য কোনোদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে লেখা হয় নি। রাণীর দুই মেয়ে তখন জীবিতা। মন্দিরের নামে দানপত্র লিখতে গেলে দু মেয়েরই সম্মতি দরকার, যাতে ভবিষ্যতে ওই সম্পত্তির ওপর মেয়েরা দাবিদার না হতে পারে। কনিষ্ঠা মত দিয়ে সই করলেও জ্যেষ্ঠা পদ্মমণি সই দেয় নি। পদ্মমণির অসম্মতির ব্যাপারটি রাণীর শেষ জীবনের এক বড় মনোকষ্টের কারণ হয়েছিল। এমনকি মৃত্যুশয্যায় মা যখন স্বপ্নে দেখা দিলেন তখনও রাণীর মনে শান্তি ফিরে আসেনি। তাঁব শয্যার চারপাশে অনেকগুলি দীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল। রাণীর দুই চোখ যখন জগন্মাতার দিব্যপ্রভার রোশনাইতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তখন দীপাধারগুলি শয্যার পাশ থেকে তিনি সরিয়ে নিতে বললেন। সেই ঘোরের মধ্যে খানিকক্ষণ থাকবার পর রাণী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মা, এলে ! তারপর একটু চুপ করে আর্তস্বরে বলে উঠলেন, 'কিন্তু পদ্ম যে সই দিলে না মা ! কি হবে?' সেই রাণীর শেষ কথা। শুধু শেষ কথা নয়। এই খেদ এই বিলাপ

যেন তাঁর সারা জীবনের কথা। বস্তুত এই মহাপুণ্যবতী ভক্তিমতী নারী জীবনব্যাপী কদাচ বিষয়সম্পত্তিগত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পাবেন নি। হতভাগ্য রাণীর আশঙ্কা অসঙ্গত ছিল না। কারণ সেই থেকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব নিয়ে মামলাগত বিরোধের অবসান আজ পর্যন্ত হয় নি।

১৮৬১ সালের বিশে ফেব্রুয়ারি রাণী ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন। মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল তালুক জমিদারির অছি নিযুক্ত হলেন জামাতা মথুরামোহন। তাঁর নিজস্ব বিপুল সম্পদের সঙ্গে এই বিশাল জমিদারির আয় যুক্ত হলেও মথরামোহনের মন সংসারী হয়ে ওঠে নি। যেদিন থেকে রামকৃষ্ণের দেহাবয়বে তিনি কালী ও শিবের মূর্তি দর্শন করেছেন, সেই দিন থেকেই রামকৃষ্ণের উপর তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। দেবতাজ্ঞানে রামকৃষ্ণের সেবা করাই যেন তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে উঠেছিল।

রামকৃষ্ণকে তিনি প্রায়ই বলতেন, 'এত ধনসম্পত্তি, এ সবই আপনার। আমি শুধু আপনার নায়েব হয়ে এ সবের তত্ত্বাবধান করছি।' অধিকার থাকলে এই বিপুল জমিদারির বেশ খানিকটা অংশ তিনি হয়ত রামকৃষ্ণের নামেই দানপত্র করে দিতেন। কিন্তু এই ইচ্ছেটুকু জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই মথুরকে একদিন যারপরনাই ভর্ৎসনা করেছিলেন রামকৃষ্ণ। অতএব অন্যভাবে অর্থ ব্যয় করেই রামকৃষ্ণকে সেবা করে খুশি করার চেষ্টা করতেন মথুর। যে সব পণ্ডিতেরা দক্ষিণেশ্বরে আসতেন নানারকম দানে তাঁদের ঝুলি ভরিয়ে দিতেন। গরিবদের খাওয়াদাওয়ার ঢালাও বন্দোবস্ত ছিল। দেবী কালিকার জন্যে নানারকম অলংকার গড়িয়ে দিতেন। রামকৃষ্ণ যখন কোনো ধর্মোৎসবে যোগ দিতে যেতেন তখন সবরকম ব্যবস্থা করে দিতেন ; শুধু তাই নয়, ছায়ার-মতন রামকৃষ্ণের পাশে পাশে দেহরক্ষী হয়ে ঘুরতেন যাতে মানুষের ভিড়ে তাঁর কোনো বিপদ না হয়। 'বাবার' অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে মথুর ধন্য, কৃতজ্ঞ। 'বাবার' ঘরে নিত্য প্রবেশানুধিকার তাঁর কাছে গৌরব-বিশেষ। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে চমৎকার একটি উক্তি করতেন মথুর। বলতেন, 'যেখানে রাত্রি নামে না সেই দেশের মানুষ রামকৃষ্ণ।'

চন্দ্র হালদার নামে মথুরের একজন গৃহ পুরোহিত ছিল। মানুষটি ছিল অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ। সে ভাবতো কর্তা (মথুরা) রামকৃষ্ণকে অনুচিত কৃপা করছেন। অনেকদিন থেকেই তার কর্তা মথুরামোহনের কৃপাধন্য হবার বাসনা ছিল। নীচস্য নীচ এই মানুষটি মনে করতো সরলতার ভেকধারী রামকৃষ্ণ আসলে একটি ধূর্ত এবং কর্তার ওপর চাপ দিয়ে সে এই অনুচিত অনুগ্রহ আদায় করে নিচ্ছে।

একদিন ; সন্ধ্যের একটু আগে, মথুরের জানবাজারের বাড়িতে রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। অর্ধচেতন অবস্থা। ঘরে তখন অন্য কেউ ছিল না। হালদার এই সুযোগটিরই অপেক্ষা করছিল। ঘরে ঢুকে সে রামকৃষ্ণের গায়ে সজোরে নাড়া দিয়ে কড়া ধমক দিয়ে বললো, 'কি ঠাকুর! আমায় নিশ্চয়ই চিনেছ ? একটুও ন্যাকামি না করে সত্যি করে বলো তো চাঁদ, আমাদের কত্তার ওপর কি যাদু ফলাচ্ছ ?' একবার দু'বার নয় বারংবার এই পীড়ন চললো। রামকৃষ্ণ জবাব দেবেন কি ? ভাবোল্লাসে তাঁর তখন বাকশক্তি রহিত হয়ে গেছে !

এদিকে হালদারের উষ্মাও বেড়ে চলেছে। তার ধারণা হলো রামকৃষ্ণ বোধহয় ঘটনাটি চেপে যাবার চেষ্টা করছেন। রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে হালদার চেঁচিয়ে বললো, 'শালা! তুমি তাহলে বলবে না ভেবেছো!' তারপর রামকৃষ্ণের গায়ে সজোরে একটা লাথি মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মথুরের কাছে রামকৃষ্ণ ঘটনাটির কথা বলেন নি, কারণ তিনি জানতেন যে ব্যাপারটি জানাজানি হলে হালদারের নিদারুণ লাঞ্ছনা হবে। পরে অন্য এক অপরাধে হালদারের কর্মচ্যুতি হলে রামকৃষ্ণ সবিস্তারে ঘটনাটির কথা মথুরকে জানান। সব শুনে মথুর বলেছিলেন, 'সেদিন যদি জানতাম তাহলে লোকটাকে আমি খুন করতাম।' মথুর অকারণ আস্ফালন করতেন না এবং সম্ভবত সেদিন তিনি যা বলেছিলেন কার্যত তা-ই করতেন।

রাণীর মৃত্যুর স্বল্পকালের মধ্যেই রামকৃষ্ণ এমন একটি ঘটনার মুখোমুখি হলেন যেটিকে তাঁর সাধনার এক নতুন পর্বের সূত্রপাত বলা চলে।

সে যুগে শিবমন্দিরগুলির সম্মুখভাগের গঙ্গাতীরে একটি সাজানো ফুলের বাগান ছিল। মায়ের পুজো না করলেও রামকৃষ্ণ নিত্য ওই বাগানে ফুল তুলতে যেতেন। সে ফুল পুজোতেই কাজে লাগতো। একদিন সকালে রামকৃষ্ণ যখন ফুল তুলছেন তখন ঘাটে একখানি নৌকা এসে লাগলো। নৌকায় গেরুয়াবসনা একজন শক্তিসাধিকা ভৈরবী বসেছিলেন। বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই হলেও রমণী সুন্দরী, লাবণ্যময়ী এবং দীর্ঘদেহী। ঘাড়ের ওপর অগোছালো ভাবে চুলগুলি ফেলা। হাতে বেশ কিছু বই এবং কিছু পরিধেয় বসন। এগুলিই তাঁর পার্থিব সম্পদ। রমণী সন্ন্যাসিনী।

সেদিন ভৈরবীকে দেখা মাত্র রামকৃষ্ণের মনে তীব্র আবেগের সঞ্চার হলো। যেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন রামকৃষ্ণ। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে এসে হৃদয়কে ভৈরবীর কথা জানিয়ে বললেন, 'যা শীগ্‌গির তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আয়'। হৃদয় থ। 'কিন্তু তোমায় তো তিনি চেনেন না। আসবেন কেন তোমার কাছে?' রামকৃষ্ণ একটুও বিব্রত নন। বললেন, 'গিয়ে আমার নাম কর, দেখবি ঠিক আসবে।' মাতুলের আগ্রহাতিশয় দেখে হৃদয় সেদিন খুবই অবাক হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ঘাটে নেমে ভৈরবী সিঁড়ি দিয়ে চাঁদনীর দিকে এগোচ্ছিলেন। হৃদয় তাঁর কাছে রামকৃষ্ণের কথা বলতেই, কোনো প্রশ্ন না করে তিনি হৃদয়কে অনুসরণ করলেন। তারপর রামকৃষ্ণকে দেখেই ভৈরবীর চোখ দুটি আনন্দে সজল হয়ে উঠলো; অভিভূত হয়ে বললেন, 'বাবা! তুমি এখানে? গঙ্গাতীরে আছ জেনে আমি যে তোমায় সেখানেই খুঁজছিলাম! যাক, ভালই হলো এতদিনে তোমার দেখা পেলাম।' রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু আমায় তুমি কেমন ক'রে জানতে পারলে মা?'

'মা জগদম্বার কৃপায় জানতে পারলাম যে, তোমাদের তিনজনের সঙ্গে আমায় দেখা করতে হবে। ইতিমধ্যে দু'জনের দেখা পেয়েছি; আজ এখানে তোমার দেখা পেলাম।'

তখন এবং ভবিষ্যতেও নিজের সম্বন্ধে ভৈরবী অতি সামান্যই বলেছিলেন। তাঁকে ঘিরে থাকতো এমন এক রহস্যময়তা, যা তাঁর পরিণত সৌন্দর্য আর চারিত্র-স্বাতন্ত্র্য উন্মেষে সাহায্য

করেছিল। আমরা শুধু এইটুকু জানি যে যশোর জেলার এক ব্রাহ্মণবংশে যোগেশ্বরীর জন্ম হয়। (কোনো কোনো বৃত্তান্তকার তাঁকে ভৈরবী বামনী অথবা কেবল ভৈরবী বলে আখ্যাত করেছেন।) তিনি বিবাহিতা কিনা আমরা জানি না। জানি না কোন্ সে প্রেরণা যার জন্যে সংসারের সর্বস্ব ছেড়ে তিনি প্রব্রাজিকার জীবন বেছে নেন।

অপর যে দু'জন সম্বন্ধে ভৈরবী প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন তাঁদের নাম যথাক্রমে চন্দ্র এবং গিরিজা। এঁদের সঙ্গে ভৈরবীর দেখা হয় বরিশাল জেলায়। ভৈরবী এদের দু'জনকেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছিলেন। এই ঘটনার অনেক পরে ভৈরবী এদের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। দু'জন সাধকই অধ্যাত্মসাধনায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, কিন্তু দু'জনার ক্ষেত্রেই সাধনার চরম লক্ষ্যে পেঁছানোর পক্ষে কিছু কিছু বাধা ছিল; এঁরা দু'জনেই সিদ্ধাই শক্তি আয়ত্ব করেছিলেন এবং তা নিয়ে গর্ব করতেন।

সিদ্ধাই ক্ষমতার কথায় রামকৃষ্ণ প্রায়ই বলতেন, 'ত্যাগ কর্, মলমূত্রের মতন এদের ত্যাগ কর্। সাধনার অভ্যাস করতে করতে এই ক্ষমতা এসে পড়ে। তখন এদের সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মালে তোরা এতেই আটকে যাবি। ভগবান অব্দি এগোতে পারবি না।' এমন এক অলৌকিক দৃষ্টি আর শ্রবণসম্পন্ন ক্ষমতা চন্দ্র আয়ত্ব করেছিলেন, যা প্রয়োগ করে কোথায় কত দূরে কি ঘটছে তা তিনি দেখতে পেতেন। কিন্তু এত ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও একজন ধনী কন্যার প্রতি তিনি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর ভাগ্যে অশেষ লাঞ্ছনাও জোটে। গিরিজাও এক অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে একটি আলোকশিখা নির্গত হতো—কোনো বিশেষ প্রয়োজনীয় বিদ্যা এটি নয়। ফলে এইসব চতুরা বিদ্যা নিয়ে রঙ্গ করতে রামকৃষ্ণ এই মজার গল্প দুটি বলেছিলেন:

'একজনের দুই ছেলে। বড় ছেলে অল্প বয়সেই সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। ছোট-ছেলে লেখাপড়া শিখে ধার্মিক হয়। তারপর বিয়ে ক'রে সে ঘরসংসার করতে থাকে। বারো বছর পরে সন্ন্যাসী ভাই সংসারী ভাইটির সঙ্গে দেখা করতে এলো। ছোটভাইয়ের খুব আনন্দ—দু'জনে একসঙ্গে খেতে বসেছে। খেতে খেতে ছোটভাই জিজ্ঞেস করলো, "দাদা! তুমি তো সংসারের সুখ ঐশ্বর্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে এতবছর ঘুরে বেড়ালে। তা কি পেলে?' সন্ন্যাসী বড় ভাই বললো, 'দেখবি, কি পেয়েছি? তবে আমার সঙ্গে আয়।' এই বলে সংসারীভাইকে সঙ্গে করে সন্ন্যাসীভাই নদীতীরে এলো, তারপর বললো, "এই দ্যাখ"। সন্ন্যাসী ভাই তখন জলের ওপর দিয়ে হেঁটে ওপারে পেঁছাল, তারপর সংসারী ভাইকে হাঁক দিয়ে বললো, "দেখলি?" কিন্তু সংসারী ভাই একটুও আশ্চর্য হলো না। সে একটা ডিঙি ভাড়া করে মাঝিকে একটা পয়সা দিয়ে ওপারে গেল, তারপর বললো, "তুমিও দেখলে দাদা কেমন এক পয়সা দিয়ে নদী পেরোলুম! তা তুমি কি বারো বছর ধরে সাধনা করে এইটুকু পেয়েছ?" সংসারী ভায়ের কথায় সন্ন্যাসী ভায়ের চোখ খুলে গেল। সে তখন ভগবান লাভের জন্যে মনকে তৈরি করলো।'

'একজন যোগী ছিল, তার সিদ্ধাই ক্ষমতা খুব। সে যা বলতো, তাই হতো। যদি কাউকে বলতো "মর্" তো সে মরতো, আবার "বাঁচ" বললে সে বাঁচতো। একদিন চলতে চলতে যোগীর সঙ্গে এক ধার্মিক সাধুর দেখা হলো। সাধুটি বহু বছর ধরে কেবল ধ্যান করতো আর ভগবানের নাম করতো। দাম্ভিক যোগী সাধুকে জিজ্ঞেস করলো, "এতবছর ধরে

ভগবানের নাম জপ করলে তা কি পেলে ?" সাধু বিনীত হয়ে জবাব দিল, "আজ্ঞে, আমি তো কিছু চাইনি ? আমি শুধু তাঁর করুণা চেয়েছি, তাই সর্বক্ষণই তাঁর নাম করি যাতে তিনি আমায় কৃপা করেন।" যোগী তো অবাক, এত বছর ধরে এত পরিশ্রম ক'রে শুধু তাঁর করুণা ! যোগী তাই অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "যাই বলো তোমার কিন্তু আরও কিছু চাওয়া উচিত ছিল।" সাধুটি সে কথার জবাব না দিয়ে যোগীকে বললো, "তা তুমি কি পেয়েছ" ? যোগী বললো, "এই দেখ।" তারপর পাশে বাঁধা একটা হাতীর গায়ে ধুলো পড়ে বললো "তুই মর"—হাতীটি ছটফট করে মরে গেল। আবার তেমনি "তুই বেঁচে ওঠ্" ব'লে যোগী হাতীটিকে বাঁচিয়েও দিল। যোগী তখন বিজয়ীর মতো বললো, "দেখলে তো আমার ক্ষমতা ?" সাধু লোকটি এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিল ; তারপর বললো, "আমি দেখলাম হাতীটা মংলো আর বাঁচলো। কিন্তু তোমার তাতে কি লাভ ? জন্ম-মৃত্যুর এই চক্র থেকে কি তুমি মুক্তি পেলে ? মুক্তি পেলে জরা ব্যাধির হাত থেকে ? ভগবান পেতে কি এই ক্ষমতা তোমায় সাহায্য করবে ? যোগী চুপ। এতদিনে যেন তার বোধশক্তি জাগ্রত হলো।

ক্রমে চন্দ্র ও গিরিজারও জ্ঞানবিকাশ হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে কিছুদিন থাকতে থাকতেই রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির সামনে তাদের অলৌকিক ক্ষমতা চলে গেল। তাদের অহংকার গেল, সেই সঙ্গে গেল নানা ঐহিক কামনা-বাসনা, এবং পূর্ণজ্ঞানের উপলব্ধির পথে তারা তাদের সাধনা পরিচালিত করলো।

সাক্ষাতের প্রথম দিনটিতেই নিজের ঘরে ভৈরবীর পাশটিতে বসে রামকৃষ্ণ তাঁর অনুভূতির বিষয়গুলি একে একে বর্ণনা করছিলেন। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, শারীরিক বিকারলক্ষণ, অপ্রকৃতিস্থ আচরণ, ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ দিয়ে রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, 'মা আমার এসব কি হয় ? আমি কি সত্যিই পাগল হলাম ?' ভৈরবী তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, 'তোমার এই ভাব, এই অবস্থা কি সাধারণ মানুষ চিনতে পারে ? শোনো বলি, ওই রকম অবস্থা হয়েছিল শ্রীমতী রাধার, শ্রীচৈতন্যের। এ সব কথা এই পুঁথিতে আছে। আমি তোমায় পড়ে শোনাব—'

এদিকে ভৈরবী ও মাতুলকে এমন পরমাত্মীয়ের মতন কথাবার্তা বলতে দেখে হৃদয় স্তম্ভিত। যেন কত বছর পরে এঁদের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, এমনি ভাব।

সেদিনই বেলার দিকে মন্দিরের ভাঁড়ার থেকে আটা চাল নিয়ে পঞ্চবটীতে পাক করলেন ভৈরবী। তারপর পাক করা অন্নভোগ রঘুবীর শিলাখণ্ডের কাছে নিবেদন করলেন। (এই ছোট্ট শিলাখণ্ডটি গলায় ঝুলিয়ে এনেছিলেন ভৈরবী।) নিবেদন করার পর ভৈরবী ধ্যানে বসলেন আর সমাধিস্থ হলেন।

এদিকে রামকৃষ্ণেরও তখন অর্ধবাহ্য অবস্থা। সেই অবস্থাতেই কিসের টানে রামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে এলেন। তারপর সেই অর্ধচেতন অবস্থায় রঘুবীর শিলার কাছে নিবেদন করা অন্নভোগের অনেকখানি খেয়ে ফেললেন। অল্পক্ষণ পরে দু'জনেরই বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো। পবিত্র অন্নভোগ অপবিত্র করে ফেলেছেন দেখে রামকৃষ্ণ ভয় পেয়ে গেলেন, ভাবলেন ভৈরবী নিশ্চয়ই কুপিতা হবেন। রামকৃষ্ণ তাই ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন, 'কেন যে আত্মহারা হয়ে এসব করে ফেলি ! কেন যে নিজের ওপর সংযম হারিয়ে ফেলি।' কিন্তু ভৈরবী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বেশ করেছ বাবা ; কাজটি তো তুমি করো নি, তোমার ভেতরে যিনি আছেন

তিনি করেছেন। ধ্যান করতে করতে তাঁকে আমি দেখেছি। আর আমার বাহ্যপুজোর দরকার নেই। আমার পুজো এতদিনে সার্থক হয়েছে।' কথা কটি ব'লে একটুও দ্বিধা না করে রামকৃষ্ণের ভোজনাবশিষ্ট অন্নভোগটুকু খেয়ে নিলেন। তারপর রঘুবীর-শিলাখণ্ডটি গঙ্গার জলে বিসর্জন দিলেন। রামকৃষ্ণের মধ্যেই তিনি রঘুবীরকে জীবন্ত দর্শন করেছেন; সুতরাং শিলাখণ্ডের আবশ্যকতা ফুরিয়েছে।

এমনি করে রামকৃষ্ণ ও ভৈরবীর মধ্যে আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপন হলো। পরবর্তী কয়েকটা দিন তাঁরা যেন অবিচ্ছেদ্য হয়ে ছিলেন। অধ্যাত্ম দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে করতে কখন যে দিন রাত কেটে যেত খেয়াল থাকতো না। এইভাবে হপ্তাখানেক কাটবার পর রামকৃষ্ণের মনে হলো যে, এমনি করে রাতে মন্দির প্রাঙ্গণে ভৈরবীর শুয়ে থাকাটা বাঞ্ছনীয় নয়। লোকে তাকে ভুল বুঝতে পারে। (মনে রাখতে হবে নিজের ভালমন্দ সম্বন্ধে উদাসীন হলেও অপরের ভালমন্দ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ সচেতন হতেন, বিশেষ করে সেখানে যদি ভুল বোঝা-বুঝির অবকাশ থাকতো।') যা হোক, নিজের উদ্বেগের ব্যাপারটি ভৈরবীকে জানাতেই তিনি সম্মত হলেন। ঠিক হলো, মাইল দুই উজানে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে গিয়ে ভৈরবী থাকবেন। সেইমত দক্ষিণেশ্বরে এসে ভৈরবী বসবাস শুরু করলেন। স্নানের ঘাটে একটি ছোট্ট ঘরে ভৈরবী থাকতেন। গ্রামের সাধারণ ভক্তমানুষ এই পুণ্যপ্রাণা মাতৃরূপিনী সাধিকার জন্যে সিধা দিয়ে যেত। সেখান থেকে ভৈরবী প্রতিদিনই রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। দু'জনের মধ্যে অপত্যস্নেহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হলো। ভৈরবী নিজেকে যশোদা ভাবতেন, শ্রীকৃষ্ণের পালিতা মাতা। আর রামকৃষ্ণকে ভাবতেন বাল গোপাল। এইভাবে একাধারে রাম-কৃষ্ণের ভক্ত ও শিক্ষাদাত্রী হয়ে উঠেছিলেন ভৈরবী।

গাত্রদাহের কথা আগেই বলেছি। এই সময় নাগাদ সেই দহনজ্বালা দারুন হয়ে উঠলো। সুর্যোদয়ের সঙ্গে শুরু হতো জ্বালা। দুপুর নাগাদ তা হয়ে উঠতো অসহ্য। জ্বালা জুড়াতে সকাল সন্ধ্যে দু'তিন ঘণ্টা ধরে মাথায় তোয়ালে চাপিয়ে রামকৃষ্ণ জলে ডুবে থাকতেন। কিন্তু ঠাণ্ডা লাগার ভয় ছিল। মাঝে মাঝে তাই কুঠি বাড়ির ঘর বন্ধ করে সপসপে ভেজা পাথরের মেঝের উপর গড়াগড়ি দিতেন।

চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারবাবুরা যে ওষুধ দিতেন তাতে ফল হতো না। ভৈরবীর ধারণা হয়েছিল এটি সাধারণ ব্যাধি নয়। পুঁথিপত্র ঘেঁটে এবং রামকৃষ্ণের দৈহিক অবস্থার লক্ষণ মিলিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীরাধিকা এবং শ্রীচৈতন্যেরও বাহ্যদেহে এমন গাত্রদাহ হতো। দাহ প্রশমনের জন্যে যে বিধি তাঁরা পালন করতেন তা খুবই সাধারণ। প্রয়োজন শুধু বিশ্বাস। সুতরাং রামকৃষ্ণকেও এই বিধিগুলি বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি পালন করতে বললেন। বিধান হলো, গলায় সর্বক্ষণ সুগন্ধী ফুলের মালা প'রে, সারা গায়ে ঘন করে চন্দনবাটা মেখে থাকবেন। রামকৃষ্ণ তা-ই করলেন। তিনদিনের মধ্যেই গাত্রদাহ দূর হলো। নাস্তিকরা অবশ্য ভাবতো যে ব্যাপারটি পুরোপুরি কাকতালীয়। আসলে, ডাক্তারের দেওয়া জ্বালা নিবারক একটি তেল ব্যবহার করেই রামকৃষ্ণ সেদিন আরাম পান।

সেই সময় রামকৃষ্ণের আর একটি শারীরিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। সেটি হলো অস্বাভাবিক ক্ষুধা। আগ্রাসী এই ক্ষুধার তাড়নায় রামকৃষ্ণ রীতিমত ব্যাকুল। তাঁর নিজের কথাতেই অবস্থাটি বর্ণনা করছি। 'যতই খাই না কেন পেট ভরত না। খাওয়া শেষ করে

উঠে পড়লেও মনে হতো কিছু খাই নি। খাওয়া না খাওয়ার মধ্যে কোনো অবস্থা ভেদ তখন ছিল না। সারা দিনরাত এই অবস্থা চলত। তখন ভৈরবী একদিন বললেন, "বাবা! অস্থির হয়ো না। যাঁরা শরীর ধারণ ক'রে মর্ত্যে এসেছেন তাঁদের এইসব নানা অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। শাস্ত্রে এসব কথা লেখা আছে। তুমি ভেবো না। তোমার এ ব্যাধি আমি আরাম করে দেবো।" এরপব, মথুরামোহনকে ডেকে মন্দিরের ভাঁড়ারে থরে থরে খাদ্যবস্তু সাজিয়ে বাখতে বললেন। সাজানো হলে একদিন আমায় সব খাদ্যবস্তু দিনেরাতে ইচ্ছেমত খেতে বললেন। আমি তাই করলাম। ঘুরে ঘুরে পছন্দমত খাবার খেয়ে বেড়াতাম। দিনকতক পরে আমার সেই সর্বনাশা ক্ষিদে কোথায় চলে গেল।'

রামকৃষ্ণকে যত দেখেন যত তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা শোনেন, ততই ভৈববীর বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, রামকৃষ্ণ সাধারণ একজন ঋষি বা সাধক নন। কিছু দ্বিধা সংশয় থাকলেও ভৈরবী জানতেন যে, তাঁর সামনে যিনি প্রত্যক্ষরূপে বিরাজ করছেন তিনি সাধারণ মানব থেকে আরও কিছু, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর।

অবতার বলতে হিন্দু কি বোঝে সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন; কারণ অবতারবাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট ভাব আছে এবং সাধারণ শ্রদ্ধার মতন সেটি ভাসাভাসা নয়। পঞ্চম অধ্যায়ে আমি বলেছি যে বিষ্ণু, যিনি এই সৃষ্টি পালন করেন এবং ঈশ্বরের ত্রয়াত্মক রূপকল্পনায় যিনি দ্বিতীয় ঈশ্বর তিনি, হিন্দুর অধ্যাত্ম বিশ্বাস মতে, বারবার বিভিন্ন মানবশরীরমনাশ্রয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এখন প্রশ্ন হলো একজন অবতার আর একজন সাধক, সমাধির উচ্চভূমিতে যিনি আত্মার সঙ্গে মিলনের উপলব্ধি পেয়েছেন, এঁদের মধ্যে তফাৎ কোথায়? নিজের মধ্যে যিনি দেবত্ব উপলব্ধি করেছেন, তিনি এই উপলব্ধির শিখরে পেঁছাতে পেরেছেন বারবার মানবদেহে জন্ম নেবার পর। অতীত জীবন থেকে অসংখ্য বার জন্ম, মৃত্যু আবার জন্ম এই ধারায় বিকশিত হতে হতে কর্মকাণ্ডের শেষ বিন্দুতে কর্ম পেঁছায়। অতঃপর কর্মনাশ্তি। অসকার ওয়াইল্ড বলেছেন, 'প্রত্যেক সাধুর যেমন অতীত আছে তেমনি প্রত্যেক পাপীরও ভবিষ্যৎ আছে'; অসকার ওয়াইল্ডের এই মর্মভেদী উপলব্ধিটি হিন্দুর কাছে খুবই অর্থবহ। যিনি সাধু সাধক যিনি পুণ্যাত্মা, ঈশ্বরানুগ্রহ পেলেও তিনি মানুষের মতন সুখ দুঃখ পান, কারণ তিনিও মানুষ। কিন্তু অবতার মানুষ নন, আবার সাধু বা পুণ্যাত্মাও তিনি নন। সেই বিচারে অবতারের অতীত নেই কারণ তিনি কর্মহীন। কর্মের জন্যে তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হয় না; তিনি কৃপাস্বরূপ মানব দেহমনাশ্রয়ে জন্ম নিয়েছেন মানবজাতির কল্যাণের জন্যে। যদিও স্থান ও কালরূপ জগতের মধ্যে তাঁর ইচ্ছাসম্ভূত প্রবেশ, তবুও তিনি অনাদি অনন্ত। কাল দিয়ে তাঁকে ধরা যায় না; তিনি নিরবধি কাল। মায়াডোরে তাঁকে বাঁধা যায় না, তিনি মায়াধিপতি।

আমরা ইতিমধ্যেই রামকৃষ্ণের মধ্যে অবতারত্বের প্রমাণস্বরূপ দুই অকল্পনীয় শক্তির বিকাশ দেখেছি। একটি হলো দীর্ঘক্ষণ ধরে সমাধিস্থ থাকার ক্ষমতা—যে কোনো সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যা মৃত্যুতুল্য। অন্যটি হলো স্পর্শদ্বারা অপরের মধ্যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি সঞ্জীবিত করা—যেভাবে তিনি হলধারীকে অভিভূত করেছিলেন। বস্তুত, বিভিন্ন অবস্থায় রামকৃষ্ণ

এই ক্ষমতাটি জীবনব্যাপী প্রয়োগ করে এসেছেন।

রামকৃষ্ণ সম্পর্কে নিজের সিদ্ধান্তটি ভৈরবী গোপন রাখেন নি—তাকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সকলের মধ্যে। ফলে সাধারণ মানুষ কি পরিমাণ অবিশ্বাস নিয়ে ব্যাপারটি গ্রহণ করেছিল তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। আধপাগলা একজন পুরুত, ভালবাসলেও যাকে নিয়ে সবাই হাসিঠাট্টা মজা মসকরা করে, সে কিনা স্বয়ং ঈশ্বর! এমনকি মথুরের পক্ষেও এতবড় বিস্ময়টি পরিপাক করা মুশকিল হচ্ছিল। তিনি জানতেন যে রামকৃষ্ণ সাধারণ নন—কিন্তু তাই ব'লে অবতার—!

প্রথম প্রথম ভৈরবী সম্পর্কেও মথুরের কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধা ছিল। অমন অসামান্যা সুন্দরী কি শুদ্ধ নিষ্পাপ থাকতে পারেন? একদিন মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার সময় ঠাট্টা করে মথুর বললেন, 'কি ভৈরবী, তোমার ভৈরব কোথায়?' আভাস ইঙ্গিতে মথুর বলতে চেয়েছিলেন যে ভৈরবীর নিশ্চয়ই কোনো পুরুষ প্রেমিক কাছাকাছি আছে। কিন্তু পুণ্যবতী নারী একটুও ম্লান হলেন না। শুধু শান্তভাবে মথুরকে একবার দেখে কালীপদাশ্রয়ী শিবমূর্তিটিকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন। 'কিন্তু ও ভৈরব তো নিশ্চল, নড়ে চড়ে না,' ব্যঙ্গ করলেন মথুর। মহিয়সীর মতো তাকালেন ভৈরবী, তারপর সহজ করে বললেন, 'নিশ্চল ভৈরবকে যদি সচলই না করতে পারলাম তবে আমি কিসের ভৈরবী?' ভৈরবীর জবাব শুনে লজ্জায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন মথুর। নিজের আচরণের জন্যেও তাঁর কুণ্ঠার সীমা ছিল না।

ভৈরবী কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল, রামকৃষ্ণ যে অবতার তা প্রমাণ করতে তিনি বদ্ধপরিকর। প্রয়োজন হলে মথুর তর্কসভা ডাকতে পারেন, তখন যে কোনো পণ্ডিতের সঙ্গেই তিনি তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন। এমন একটি সম্ভাবনার কথা রামকৃষ্ণ যখন জানলেন তখন যারপরনাই খুশি হলেন এবং মুখ্যত তাঁরই উৎসাহে মথুর তর্কসভার আয়োজন করলেন। মথুর বুঝেছিলেন যে এই বিতর্ক সভা থেকে রামকৃষ্ণের কোনো ক্ষতির আশংকা নেই। কারণ ভৈরবীর যুক্তি অখণ্ডনীয় বলে তাঁর একবারও মনে হয় নি। সুতরাং রামকৃষ্ণের মঙ্গলই হবে এবং নিজেকে অবতার ভাবার দরুন কাজে কর্মে যে শিথিলতা এসেছে তা থেকে মুক্তি পাবেন। ভগবান ইচ্ছে করলে যা খুশি তাই করতে পারেন।

তর্কসভায় প্রধান নিমন্ত্রিত দু'জন হলেন বৈষ্ণবচরণ এবং গৌরী পণ্ডিত। সাধুস্বভাব বৈষ্ণবচরণ একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একজন শিরোমণি ধর্মনেতা। অনেকেই তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক উপদেশ নিতে আসেন। বছর তিনেক আগে এক ধর্মসভায় রামকৃষ্ণের সঙ্গে বৈষ্ণবচরণের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখনই রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর খুব উচ্চ ধারণা হয়েছিল। অবশ্য সেই থেকে দু'জনের আর সাক্ষাৎ হয় নি। অন্যজন হলেন গৌরী পণ্ডিত বিখ্যাত তন্ত্রশাস্ত্রবিদ এবং অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

গৌরী আসার আগেই বৈষ্ণবচরণ দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছলেন। শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে ভূরি ভূরি উদ্ধৃতি তুলে ভৈরবী প্রথমে তাঁর আলোচনাটি পেশ করলেন তারপর বৈষ্ণবচরণকে তর্কে আহ্বান করে বললেন, 'আপনি যদি আমার সঙ্গে একমত না হন তাহলে কারণ ব্যাখ্যা করে বলুন কোথায় আমি ভুল করেছি।' সারদানন্দ বলেছেন যে, তখন ভৈরবীর আচরণ ছিল

অহংকারী মায়ের মতন, ছেলেকে আগলাতে এসেছেন যেন। এদিকে সভায় বসে রামকৃষ্ণ তখন মৃদু মৃদু হাসছেন। কোনো কিছুতেই তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝে মাঝে একটা ছোট্ট থলি থেকে কয়েক দানা করে মৌরী মুখে ফেলছেন আর আলোচনা শুনছেন। অবশ্য এরই মধ্যে বৈষ্ণবচরণের জামার হাতা টেনে তিনি ভুল বোঝা অংশগুলির সঠিক ব্যাখ্যাও করে দিচ্ছিলেন।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে বৈষ্ণবচরণ তাঁর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে রামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অনেক আগেই জানতে পেরেছিলেন। তবুও সভায় পেশ করা ভৈরবীর যুক্তিগুলি বৈষ্ণবচরণ তর্কাতীতভাবে মেনে নেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, শাস্ত্রে ঊনিশরকম অধ্যাত্মভাবের কথা বলা আছে। এই সবগুলি ভাবই মানবদেহাশ্রয়ী অবতারের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। সাধাবণ ধর্মপ্রাণ মানুষের পক্ষে এতগুলি অধ্যাত্মভাব ধারণ কবা সম্ভব নয়। ভৈরবী যখন প্রমাণ দ্বারা রামকৃষ্ণের জীবনে এই ভাবগুলির প্রকাশ দেখিয়ে দিলেন, তখন আর রামকৃষ্ণকে অবতাররূপে মেনে নিতে কোনো বাধা থাকল না। সেদিন বৈষ্ণবচরণের মতন অমন ডাকসাইটে একজন বৈষ্ণবাচার্য শাস্ত্রজ্ঞ যখন অপ্রত্যাশিতভাবে ঘোষণা করলেন যে, রামকৃষ্ণ অবতার তখন সর্বত্রই দারুণ চমক সৃষ্টি হয়েছিল। রামকৃষ্ণেব মনে কিন্তু আলোড়ন ওঠে নি। শান্তভাবে শুধু মথুরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তাহলে উনি মানলেন! ভালই হ'ল ; ব্যামো বলে যে অগ্রাহ্যি কবেন নি তাতেই আমি খুশি।'

এখন প্রশ্ন হলো গৌরী কি বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে একমত হবেন?

গৌরীর যে অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা ছিল সে কথা বলেছি। এই ক্ষমতার একটি দৃষ্টান্ত দিই। ভক্তেরা হোমের আগুনে তাদের সর্ব কর্ম ভগবানেব উদ্দেশে নিবেদন ক'রে কর্মের দোষনাশ্তি ঘটায়। ব্যাপারটি প্রতীকী। সাধারণত হোমের আগুন মাটিতে জ্বালানো হয়। কিন্তু গৌরী তার প্রসারিত বাম হাতের উপর সমিধভার বেখে ডান হাতের সাহায্যে যজ্ঞকাঠে আগুন দিতেন। ঘটনাটি যে অলৌকিক তা নিয়ে মতদ্বৈধ নেই। কারণ আশি পাউন্ড অর্থাৎ একমনের মতন জ্বলন্ত কাঠের ভার হাতের ওপর পৌনে একঘণ্টার মতন ন্যস্ত রাখা এবং সেই তাপের মধ্যে ধ্যানস্থ হয়ে থাকা, একটি অলৌকিক মানসিক ক্ষমতার পরিচয় দেয়। অবিশ্বাস করার যো নেই, কারণ রামকৃষ্ণ তাঁকে (গৌরীকে) এই ক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে দেখেছিলেন।

গৌরীর আর একটি ক্ষমতা ছিল। যেদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছালেন সেদিনই দক্ষিণেশ্বরের মানুষ এই অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখেছিল। ধর্মবিষয়ক কোনো তর্কসভায় যাবার সময় গৌরী একেবারে যুদ্ধং দেহী মনোভাব নিতেন। প্রতিপক্ষকে ঘাবড়ে দিয়ে জয়কে নিশ্চিত করবার জন্যে তিনি হা রে রে শব্দে দেবীস্তোত্র আবৃত্তি করতেন। তখন তাঁর কণ্ঠস্বর অমানুষিক হতো। রামকৃষ্ণ বলতেন 'বজ্র নির্ঘোষ'। শুধু কণ্ঠস্বরই নয়। অন্যভাবেও ভীতি প্রদর্শন করতেন। মল্লবীরদের অনুকরণে বাম হাতের উপর ডান হাতের চাপড় মারতেন। ফলে প্রতিপক্ষ ভয়ে কেঁচো হয়ে যেত। বিপরীত যুক্তিগুলি ভুলে যেত এবং শুরুর আগেই বাকযুদ্ধ শেষ হয়ে যেত ব'লে গৌরীকে বিজয়ী ব'লে ঘোষণা করা হতো।

গৌরীর এই আসুরিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু সেদিন গৌরী যখনই হা রে রে ধ্বনি তুললেন তখন যেন কোন্ ঐশী প্রেরণায় তদোধিক

সবল কণ্ঠে রামকৃষ্ণ তার বিপরীত ধ্বনি দিলেন। সাময়িকভাবে থমকে গিয়ে গৌরী এবার তাঁর কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলে হুংকার ছাড়লেন। রামকৃষ্ণও পালটা হুঙ্কার দিয়ে গৌরীকে থমকে দিলেন। সে যেন এক মল্লভূমি। একদিকে গৌরী অন্যদিকে রামকৃষ্ণ। পাহারাদাররা ডাকাত পড়েছে ভেবে লাঠি সোঁটা নিয়ে দৌড়ে এলো। তারপর রণহুংকাররত দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে এমন যুযুধান অবস্থায় দেখে হাসতে হাসতে ফিরে গেল। শোনা যায় সেদিন গৌরী নাকি তাঁর কণ্ঠস্বরের অমানুষিক ক্ষমতা একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলেন। ফলে প্রথমদিকে রীতিমত অপমানিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন গৌরী। অবশ্য পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণের সঙ্গে গৌরীর বিশেষ বন্ধুত্ব হয়।

তর্কসভার আয়োজন করা হয়েছিল কালীঘরের পাশের নাটমণ্ডপে। তখনও কলকাতা থেকে বৈষ্ণবচরণ এসে পেঁছান নি। তাই গৌরীর সঙ্গেই রামকৃষ্ণ নাটমণ্ডপের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। কিন্তু নাটমণ্ডপে পেঁছানোর আগেই কালীঘরে ঢুকে তিনি দেবীর সামনে সাষ্টাঙ্গ হলেন। কালীঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন রামকৃষ্ণের ভাবাবিষ্ট ভাব। দেহমনের উপর কোনো শাসন নেই। স্খলিত পায়ে এসে দাঁড়ালেন নাটমণ্ডপে। বৈষ্ণবচরণ তখন এসে পেঁচেছেন। রামকৃষ্ণকে সেই অবস্থায় দেখে নিজেকে সম্বরণ করতে পারলেন না বৈষ্ণবচরণ—সাষ্টাঙ্গ হয়ে রামকৃষ্ণের পাদবন্দনা করলেন। পূজা পেয়েই রামকৃষ্ণের ভাবসমাধি হলো—আত্মবিকাশ হলো। বৈষ্ণবচরণের কাঁধের উপর ভাবোল্লাসে চেপে বসলেন রামকৃষ্ণ, তারপর স্পর্শ দ্বারা তাঁর উল্লাসটি বৈষ্ণবচরণের মনে সঞ্চারিত করে দিলেন। সেই উল্লাসমুহূর্তে রামকৃষ্ণের গুণকীর্তন করে বৈষ্ণবচরণ মুখে মুখে একটি স্তোত্র রচনা করে ফেললেন। রামকৃষ্ণের ভাবভঙ্গ হলো, সবাই এসে জড়ো হলো নাটমণ্ডপে; এমন এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতায় সবারই শরীর মৃদু মৃদু কাঁপছে। সেই অবস্থাতেই রামকৃষ্ণের পাশে তারা বসে পড়ল।

গৌরী সেদিন বলেছিলেন, 'পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণকে রামকৃষ্ণ যে কৃপা করেছেন তারপর আমার পক্ষে তাঁর সঙ্গে তর্ক করা সাজে না। কারণ আমি জানি যে, আমার পরাজয় সুনিশ্চিত। কিন্তু এটিই একমাত্র কারণ নয়। আসল কথা হলো, রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বৈষ্ণব-চরণের যা মনোভাব আমারও সেই মনোভাব। তাঁর সঙ্গে আমি একমত।' অতএব ব্যাপারটি নিয়ে আর কোনো গোল থাকলো না।

পরে গৌরীকে পরীক্ষা করবার জন্যে যেন রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'শোনো! বৈষ্ণব-চরণ বলে এই ভাবটি নাকি ঈশ্বরভাব। তা তুমি কি বলো?' (রামকৃষ্ণ নিজের সম্বন্ধে সরাসরি কোনো উপাধি আরোপ না করে 'এটি', 'এই স্থানে' ইত্যাদি দিয়ে ভাব প্রকাশ করতেন।)

রামকৃষ্ণের প্রশ্নের জবাবে গৌরী তাঁর অনন্যসাধারণ উৎসাহে বলে উঠলেন, 'বৈষ্ণবচরণ আপনাকে দেহধারী ঈশ্বর ভাবে? এ তার হীনভাব। আমি মনে করি আপনি স্বয়ং ঈশ্বর। আপনার মধ্যে 'তিনিই' বিদ্যমান, যাঁর মহাশক্তির খণ্ডাংশ নিয়ে অবতার 'তাঁর' কাজ সম্পন্ন করতে পৃথিবীতে জন্ম নেন।'

গৌরীর জবাব শুনে রামকৃষ্ণ মৃদু একটু হেসে বলেছিলেন, 'হ্যাঁগা! তুমি তো তাহলে ওকেও হারিয়ে দিলে! আমি কিন্তু কিছুই জানি না বুঝি না।' উত্তরে গৌরী বলেছিলেন,

'তাহলে তো সব ঠিকঠাকই হলো। শাস্ত্রেও সেই কথাই বলে, "তুমি নিজেই জানো না তুমি ঠিক কি।"'

পাঠকেরা যেন সন্দেহবশে ভেবে না বসেন যে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই শেষ কথাটি বলার পেছনে বৈষ্ণবচরণ বা গৌরীর কোনো উদ্দেশ্য ছিল, অর্থাৎ কোনো কৃপা যাচ্ঞা বা আর কিছু। কিংবা এটি ছিল শুধুই সৌজন্য। তা নয়। কারণ পরবর্তীকালে বৈষ্ণবচরণ বারবার রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং আপামর মানুষের কাছে রামকৃষ্ণকে অবতাররূপে প্রচার করে গেছেন। এমনকি এই প্রচারে তিনি উপহসিত হতে পারেন ভেবেও বিচলিত হন নি। আর গৌরী তো দক্ষিণেশ্বরের বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসতেই পারেন নি। রামকৃষ্ণের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ হয়েছেন ততই যেন দর্শন আর পাণ্ডিত্যের মোহ তাঁর কেটে গেছে। এতদিন ধরে যা পড়েছেন, শাস্ত্রপাঠ করে যে প্রজ্ঞা তিনি অর্জন করেছেন, তাকেই খোঁজার ব্যাকুলতা তাঁর বেড়েছে। বউ ছেলেমেয়ে পরের পর চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু গৌরীর ভ্রূক্ষেপ নেই। শেষমেশ যখন এমন সম্ভাবনা হলো যে, তাঁকে সংসারে ফিরিয়ে নেবার জন্যে তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে এসে পড়বেন, গৌরী তখন সংসার ত্যাগের সংকল্প করলেন। রামকৃষ্ণের কাছে বিদায় নেবার সময় গৌরী বলেছিলেন, 'ঈশ্বরানুভূতি না হওয়া অব্দি আর সংসারে ফিরবো না।' রামকৃষ্ণ তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, এই সত্যানুসন্ধান তাঁর সফল হবে। গৌরী বিদায় নিয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে গেলেন। পরবর্তীকালে ভক্তেরা তাঁকে অনেক খুঁজেছেন। কিন্তু গৌরীর কি হয়েছিল কোথায় তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতে পারে নি। কিছু শোনাও যায় নি কখনও।

৯

দক্ষিণেশ্বরে দর্শক সমাগম

দক্ষিণেশ্বরে ভৈরবীর আগমনের আগে পর্যন্ত রামকৃষ্ণ প্রায় নিঃসঙ্গ ছিলেন। জনতা ছিল- তারা ভালওবাসতো; তবে এদের কারোরই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ছিল না। তাই রামকৃষ্ণের সাধনার ধারাটি তারা বুঝতে পারে নি। ফলে অনেক মানুষের ভিড়ে রামকৃষ্ণ নিজেকে বড় একা মনে করতেন। সাধনার লক্ষ্য হলো ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতাবোধ। বেশ সুখকর কামনা সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধনাটি সহজ নয়। এরূপ সাধনায় শুধু যে সাহস আর উদ্যমের প্রয়োজন তা নয়—আমরা ধারণাও করতে পারি না কতখানি অহংবোধ আর আত্মসত্তা বিসর্জন দিলে তবে ঈশ্বর উপলব্ধি সফল হয়। অবস্থাটি সম্বন্ধে অস্পষ্টভাবে ভাবতে বসলেও আমাদের কাছে তা মৃত্যুর মতন ভয়াবহ মনে হবে—মনে হবে বুঝি গভীর শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপ দিলাম।

প্রথমদিকে রামকৃষ্ণের সাধনার সবটুকুই ছিল ভূয়োদর্শনলব্ধ। বইপত্তর নেই যে জ্ঞানার্জন করবেন; কেউ ব'লে দেবার নেই যে পূর্বের সাধকদেরও এমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। অবশ্য রামকৃষ্ণ ভাবতেন এমন অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনেই প্রথম ঘটলো। তাই অনিবার্য ভাবেই একাকীত্ববোধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতো একটা ভয়; ভাবতেন আত্মবঞ্চনার মধ্যেই বুঝি সবটুকু শেষ হয়ে যাবে। রামকৃষ্ণের জীবনে এটি ছিল অন্যতম এক কঠিন পরীক্ষা।

ভৈরবীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে একজন গুরু পেয়ে গেলেন। ভৈরবী নিজে নিষ্ঠার সঙ্গে শাস্ত্র মানতেন; শাস্ত্রবাক্য যে অমোঘ সে বিশ্বাসও তাঁর ছিল। তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পুঁথি ঘেঁটে তিনিই রামকৃষ্ণকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন তা নতুন কিছু নয়; বরং পৃথিবীর সব মহান সাধকের জীবনেই এই আত্মোপলব্ধি হয়েছে এবং ইতিহাসেও তার নজির আছে। শাস্ত্র নির্দেশ মেনেও যে পরমার্থ লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় তা প্রমাণ করাই ছিল ভৈরবীর উদ্দেশ্য।

রামকৃষ্ণকে আমরা অবতার বলে মেনে নিয়েছি—তা সত্ত্বেও তাঁকে কিছুটা অজ্ঞতার ছল করতে হয়েছে, যাতে সংশয় ভয় আর লোভের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রামের দৃষ্টান্তটি তিনি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারেন। এমন সংগ্রাম যীশুকেও করতে হয়েছিল—নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তিনিও সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো রামকৃষ্ণকে অবতার মেনে নেওয়া সত্ত্বেও ভৈরবী তাঁকে নতুন করে শিক্ষা দিতে গেলেন কেন?

একথা ঠিক যে, রামকৃষ্ণকে ভৈরবী সর্বক্ষণের জন্যে অবতাররূপে ভাবতে পারতেন না। কোনো মানুষেব পক্ষেই তা সম্ভব নয়। সাময়িক বিস্মৃতি অনিবার্য। অপরাপর অবতারদের সঙ্গীদের ক্ষেত্রেও আমরা এই বিস্মৃতি লক্ষ্য করেছি। দেখেছি কৃষ্ণসখা অর্জুনের মধ্যেও। শ্রীমদ্ভাগবত গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের উল্লেখ আছে। তাঁর বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে তিনি কৃষ্ণকে বিশ্বরূপ দেখাতে বলেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁর সখার

অনুরোধ রাখলেন। ভয়ে ত্রাসে অভিভূত হয়ে অর্জুন সেই মহিমময় রূপ দেখলেন—দেখলেন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের লীলা। দেখলেন, যিনি মানবজাতির পিতৃস্বরূপ, যিনি বিশ্বকর্মা, তিনি যেন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা, আর সেই অনলে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিটি প্রাণী অবলুপ্ত হচ্ছে। গীতাভাষ্যের বর্ণনাটি এইরকম। 'আকাশে প্রজ্বলিত সহস্র সূর্যের যেমন গৌরবময় দীপ্তি, অসীম ঈশ্বর ঠিক তেমনি দ্যুতিমান।' সে রূপ দেখে ভয়েত্রাসে অর্জুন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। সেই মহানভীতির প্রেরণায় কৃষ্ণের পদপ্রান্তে লুটিয়ে ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, 'তোমায় কৃষ্ণ বলেছি, সখা বলেছি—এ আমার ভ্রান্তি আমার অজ্ঞানতা। ভালবাসি বলেই তোমায় চিনতে পারি নি, তোমার মহান সত্তার উপলব্ধি হয় নি। কতভাবে তোমায় অমর্যাদা করেছি। শয়নে-জাগরণে, আহারে-বিহারে তোমার অন্তরঙ্গ হয়েছি—তোমায় পরিহাস করেছি। তখন কি কোনোভাবে তোমার অমর্যাদা করেছি? যদি তেমনটি করে থাকি, হে অনন্ত প্রভু,—আমায় ক্ষমা করো! সখা যেমন সখাকে, পিতা যেমন পুত্রকে, দয়িত যেমন দয়িতাকে ক্ষমা করে, তেমনি আমাকেও তুমি ক্ষমা করো!'

এই মিনতি শুনে কৃষ্ণ অর্জুনকে পুনরাশ্বস্ত করলেন এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে গেলেন। তখন পরম স্বস্তি পেয়েছিলেন অর্জুন। উল্লসিত হয়ে বলেছিলেন, 'সখা কৃষ্ণ! এই তো সদানন্দ রমণীয় মানবদেহে আবার তুমি ফিরে এসেছ! তোমায় মানবমূর্তিতে দেখে আমিও স্বস্তি পাচ্ছি।' অর্থাৎ ইতিমধ্যেই কৃষ্ণের ঈশ্বরভাবরূপের চেতনা অর্জুনের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। তাই বিস্মৃতির মধ্যে আত্মগোপন ক'রে কৃষ্ণকে মানবমূর্তিতে দেখবার প্রত্যাশায় তিনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন। যীশু যখন দিব্যমূর্তি ধারণ করেছিলেন তখন তাঁর সম্পর্কে পীটার, জেম্‌স্ এবং জনেরও একইরকম মনোভাব হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হলো সর্বক্ষণের জন্য একজন অবতারের কাছাকাছি থাকা কি আমরা কামনা করি না? তর্কের খাতিরে বলবো 'করি'। কিন্তু কার্যত বলবো 'না, করি না', কারণ, অজ্ঞতার জন্যে অবতারের প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না। অজ্ঞতা দুইরকমের এবং এদের মধ্যে প্রভেদটি কোথায় তা বোঝা দরকার। সাধারণ মানুষ যখন একজন যীশু বা রামকৃষ্ণকে দেখে, তখন তাদের স্থূল অনুভূতি দিয়ে তাঁদের সাধারণের পর্যায়ে নামিয়ে আনে। কিছু কিছু অসাধারণত্ব চোখে পড়লেও সেগুলি সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অন্তর্গত হয় না। কারণ, উদ্বেগ আর অস্থিরতার দরুন কোনো ব্যাপারের গভীরে প্রবেশ করে শেষপর্যন্ত দেখার মানসিকতা সাধারণ মানুষেব নেই। (যীশু এবং পন্টীয়াস পীলেটের মধ্যে সেই আশ্চর্য সাক্ষাতের বর্ণনার কথা স্মরণ করুন। কথোপকথনের সময় রোমানজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে পন্টীয়াসের আগ্রহ ক্ষণিক হলেও ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের চিত্রটি প্রকট হলো সেই মুহূর্তে রোমানদের সম্পর্কে পন্টীয়াসের সব আগ্রহ সব কৌতূহল নিবারিত হয়েছিল।) এটি এক ধরনের অজ্ঞতা। আবার কিছু মানুষ আছেন, যেমন অর্জুন, যাঁরা তাঁদের অন্ধ অনুরাগের জন্য অবতারের প্রকৃত রূপ দেখতে পান না। ভৈরবীর অজ্ঞতা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর। সারদানন্দ বলছেন যে, ভালবাসার এই টানের কাছে মহত্তের মহত্ত্ব ক্ষীণ হয়ে যায়। তখন মহামানব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ভয়-ভক্তি অন্তর্হিত হয়ে যায়। পুত্রজ্ঞানে স্নেহ করতেন বলেই ভৈরবী তাঁকে শিক্ষা দেবার কথা ভাবতে পেরেছিলেন এবং রামকৃষ্ণও তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তন্ত্রসাধনা শুরু করেছিলেন।

পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ বলতেন যে, প্রথমদিকে এই সাধনা নিয়ে তাঁর কিছু কিছু সংশয় হয়েছিল। কিন্তু ভবতারিণীর অনুজ্ঞা পাবার পর তাঁর সব সংশয় দূর হয়ে যায়। মনটি একবার তৈরি হয়ে যাবার পর তন্ত্রচর্চা নিয়ে তাঁর আগ্রহ তীব্র হয়ে ওঠে এবং সাধনার ক্ষেত্রে তিনি দ্রুত উন্নতি করতে থাকেন।

তন্ত্রসাধনার মূল লক্ষ্য হলো ইন্দ্রিয়জ সব বাহ্য বস্তুর আড়ালে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধির ক্ষেত্রে দু'রকমের বাধা আছে। এক বাধা প্রলোভন, অন্য বাধা বিতৃষ্ণা। ইহজাগতিক জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও এই বাধা দু'ভাবে কাজ করে। চিকিৎসা করতে এসে পুরুষ ডাক্তারকে সুন্দরী নারীদেহের প্রতি প্রলোভন জয় করতে হয়; আবার রোগীর দেহের ক্যানসারজনিত পচনশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে সংক্রমণ-আশঙ্কাও কাটিয়ে উঠতে হয়। এই প্রলোভন এবং বিতৃষ্ণা কাটাতে না পারলে, বাহ্য বস্তুতেই আমাদের মনোযোগ সীমাবদ্ধ থাকবে এবং অন্তর্নিহিত সত্য বস্তুতে পেঁছাতে পারবে না। অবশ্য বাহ্য সত্তা অতিক্রম করে যখন আমরা ঈশ্বর-অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, তখন এই প্রলোভন আর বিতৃষ্ণার ভাবটি থাকে না। সুতরাং তন্ত্রসাধনার মূল লক্ষ্য হলো সাধনাকে এমন কঠিন নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা, যাতে মোহ আর ঘৃণা জয় করে সাধক তার অন্তর্লোকের দেবত্বকে উপলব্ধি করতে পারে।

সাধনা করতে করতে রামকৃষ্ণ বেশ কিছু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। এই সিদ্ধাই শক্তিগুলি মনে প্রাণে তিনি চান নি, তাই অধ্যাত্মসাধনার কোনো ক্ষতি না করেই এই ক্ষমতাগুলি তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। যেমন, কথিত আছে যে রামকৃষ্ণ পশুপাখি কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি যাবতীয় অন্ত্যজ প্রাণীর আহ্বান ও বিলাপধ্বনি যথাযথ বুঝতে পারতেন; শুনতে পেতেন সেই 'অনাহতধ্বনি' যা বিশ্বগত যাবতীয় ধ্বনির ঐকতান। এই প্রণবধ্বনি এত নিগূঢ় যে সাধারণ মানুষের শ্রুতিগম্য হয় না। কঠোর তন্ত্রসাধনা করে রামকৃষ্ণ আর একটি প্রত্যক্ষ ফল পেয়েছিলেন। সে সময় তাঁর অঙ্গকান্তি হয়ে উঠেছিল আশ্চর্য দিব্য-প্রভাময়। সে দিব্যকান্তি অনেকেই দেখেছেন। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ নিজেই সে রূপের ব্যাখ্যা করে বলেছেন ; 'আমার অঙ্গ থেকে সে সময় স্বর্ণবিভাময় আলোকচ্ছটার বিচ্ছুরণ হতো। লোকে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকতো আমার দিকে। তাই সর্বক্ষণই শরীরে শাল জড়িয়ে লোকনয়নের আকর্ষণ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতাম। ভাবতাম হায়! এরা আমার বাহ্য রূপ দেখেই আত্মহারা অথচ যিনি আমার অন্তর্লোকবাসী—দিব্যসত্তা, তাঁর প্রতি এরা কত উদাসীন! জগন্মাতার কাছে আকুল হ'য়ে তাই প্রার্থনা করতাম। বলতাম, "মাগো! আমার এই বাহ্যরূপ নিয়ে আমার আন্তর রূপ ফিরিয়ে দাও!" মা আমার আকুল কান্না শুনেছিলেন। অবশেষে অঙ্গলাবণ্য অদৃশ্য হ'য়ে ধীরে ধীরে দেহপট বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।'

যে শব্দগুলি সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়জ ভাব প্রকাশ করে, রামকৃষ্ণের কাছে সেগুলিই উচ্চ-ভাবার্থে প্রকাশিত হতো। যেমন স্ত্রীজাতির গোপনাঙ্গ 'যোনির' মধ্যে তিনি ত্রিজগৎপ্রসবিনী ব্রহ্মযোনি দর্শন করতেন। তিনি ভাবতেন, যে বর্ণমালা দিয়ে বেদবেদান্ত লেখা হয়েছে সেই বর্ণমালার সাহায্য নিয়েই রচিত হয়েছে নানা অশ্লীল শব্দ। সুতরাং যে সব বাক্য সাধারণ-ভাবে অশ্লীল বলে প্রতীয়মান হয় সেগুলিও তাঁর কাছে পবিত্র মনে হতো।

রামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনা শুরু হয় ১৮৬১তে শেষ হয় ১৮৬৩তে। এই দীর্ঘদিনের সাধনায় তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে শক্তিসাধিকা (ভৈরবী) ছাড়াই গূঢ় তন্ত্রক্রিয়া শুদ্ধ সংযমের

সঙ্গে পালন করা যায়। তবে এ কথাটি ভুললে চলবে না যে, রামকৃষ্ণের মতন উচ্চতর অধ্যাত্মসাধকের পক্ষেও আত্মসংযমের শিক্ষা সহজ হয় নি। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ নিজেও স্বীকার করেছেন যে, তিনিও একবার কামমোহিত হয়েছিলেন। মূল কারণ হলো অহঙ্কার। তিনি ভাবতেন, যখনই কেউ অহংকারবশে মনে করে, 'আমি কামপ্রবৃত্তি জয় করেছি', তখনই সে প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়ে। রামকৃষ্ণ তাই বলতেন যে, প্রবৃত্তিকে মেনে নেওয়া লজ্জা বা পাপ নয়। প্রবৃত্তির তাড়নায় সংযম বিবশ হলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রে কামভাব স্তিমিত করতে হয়। তখন শরীরের আর সব ব্যাধিবালাইয়ের মতন কামপ্রবৃত্তিও দূর হয়ে যায়। আত্মরতিমগ্ন হলেই এই প্রবৃত্তি ঘাড়ের উপর চেপে বসে। সুতরাং শ্রেয় পথ হলো প্রবৃত্তিকে মেনে নেওয়া। এই উৎপাত মাঝে মাঝেই দেখা দেবে আবার চলেও যাবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া কোনো মানুষই নিষ্কাম হতে পারে না।

এই সময় নাগাদ রামকৃষ্ণের মধ্যে জগন্মাতার মোহিনী মূর্তি দর্শনাভিলাষ প্রবল হয়ে ওঠে এবং তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা পূরণও হয়। তবে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের যে লীলা তিনি দর্শন করেছিলেন তা যে কোনো সাধারণ ভক্তের কাছেই ভীতিপ্রদ হতে পারতো। ঘটনাটি বলি। রামকৃষ্ণ একদিন দেখলেন যে রূপলাবণ্যবতী অপরূপ এক সুন্দরী গঙ্গাগর্ভ থেকে উঠে পঞ্চবটীর দিকে আসছেন। তিনি যত এগিয়ে আসছিলেন ততই তাঁর গর্ভাবস্থা বাড়ছিল। একসময় রামকৃষ্ণ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে রমণী পূর্ণগর্ভা। খানিক পরে রমণীটি তাঁর সামনেই একটি সুকুমার শিশু প্রসব করলেন। পরম স্নেহে রমণী সেই শিশুকে স্তন দিলেন। হঠাৎ করালবদনা হয়ে রমণী সেই সদ্যোজাত শিশুর হাড়মাংস চিবিয়ে তাকে উদরসাৎ করলেন। তারপর আবার গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করলেন।

এই সময় নাগাদ রামকৃষ্ণের আর একটি অলৌকিক দর্শন হয়। তিনি জানতে পারেন যে, উত্তরজীবনে অনেক ভক্ত ধর্মজ্ঞান লাভ করতে তাঁর কাছে আসবে এবং কৃতার্থ হবে। রামকৃষ্ণ তাঁর এই দর্শনের কথাটি হৃদয় আর মথুরকে বলেছিলেন। ঈর্ষাবোধ দূরের কথা, মথুর বরং অত্যন্ত খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'বেশ তো বাবা! আমরা সবাই একসঙ্গে আপনাকে নিয়ে আনন্দ করবো!'

পনেরো কি তারও কিছু বছর পরের কথা; মথুর তখন দেহত্যাগ করেছেন। সেই সময় নাগাদ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম ব্রহ্মচারী হবার সৌভাগ্য নিয়ে ছেলেরা দক্ষিণেশ্বরে আসতে শুরু করলেন। কিন্তু এরই মধ্যে অনেক সন্ন্যাসী ভক্তের ভিড়ে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠেছিল। দলে দলে তাঁরা সেদিন এসেছিলেন এবং এঁদের কয়েকজনের কথা রামকৃষ্ণ বিশেষ করে মনে রেখেছেন। যাঁদের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি, তেমনই কয়েকজন সন্ন্যাসীর কথা তিনি পরবর্তীকালে বলেছেন। তাঁর ভাষাতেই বর্ণনা করছি। 'একবার একজন এলো। সাধুর মুখখানিতে সুন্দর জ্যোতি রয়েছে। সে কেবল বসে থাকে আর ফিক ফিক করে হাসে। দিনে দুবার, সকালে আর সন্ধ্যায় একবার করে ঘরের বাইরে এসে সে গাছপালা, আকাশ, গঙ্গা সব তাকিয়ে দেখতো আর বিভোর হয়ে দুহাত তুলে নাচতো। কখনও বা আবার হেসে গড়াগড়ি দিত আর বলতো, 'বাঃ বাঃ! ক্যায়া মায়া—ক্যায়সা প্রপঞ্চ বনায়া'! অর্থাৎ ঈশ্বর কি সুন্দর মায়া বিস্তার করেছেন আর তার ফাঁদে ফেলে আমাদের মজিয়েছেন। আর ছিল

এই উপাসনা।'

'আর একবার এক সাধু আসে—সে জ্ঞানোন্মাদ। দেখতে যেন পিশাচের মতো—উলঙ্গ, গায়ে মাথায় ধুলো, বড় বড় নখ চুল, গায়ে মড়ার কাঁথার মতো একখানা কাঁথা! কালীঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শন করতে করতে এমন স্তব পড়লে যেন মন্দিরটা শুদ্ধ কাঁপতে লাগল, আব মা প্রসন্না হয়ে হাসতে লাগলেন। তাবপর কাঙালীরা যেখানে ব'সে প্রসাদ পায় সেখানে তাদের সঙ্গে প্রসাদ পাবে ব'লে ব'সতে গেল। কিন্তু তার ওই রকম চেহারা দেখে তারাও তাকে কাছে বসতে দিলে না, তাড়িয়ে দিলে। তারপর দেখি প্রসাদ খেয়ে সকলে যেখানে উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো ফেলেছে, সেখানে বসে কুকুরদের সঙ্গে এঁটো ভাতগুলো খাচ্ছে!-একটা কুকুরের গলা জড়িয়ে ধরে একই পাত থেকে তার সঙ্গে খাচ্ছে। অচেনা লোক ঘাড় ধরেছে, তাতে কুকুরটা কিছু বলছে না বা পালাতে চেষ্টা করছে না! তাকে দেখে মনে ভয় হলো যে, শেষে আমারও অমনি অবস্থা হবে না তো—ওমনি করে থাকা আর উন্মাদের মতন ঘুরে বেড়ানো। দেখে এসে হৃদয়কে বললুম, "হৃদু এ যে-সে উন্মাদ নয়, জ্ঞানোন্মাদ।" আমার কথা শুনে হৃদু তাকে দেখতে ছুটলো। গিয়ে দেখে সে তখন বাগানের বাইবে চলে যাচ্ছে। হৃদু অনেক দূর তার সঙ্গে সঙ্গে চললো আর বলতে লাগলো, "মহারাজ, ভগবানকে কেমন ক'রে পাব। কিছু উপদেশ দিন।" প্রথমে সে কিছুই বললে না। তারপর হৃদু যখন কিছুতেই ছাড়লে না সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল, তখন পথের ধারের নর্দমার জল দেখিয়ে বললে, "এই নর্দমার জল আর ওই গঙ্গার জল যখন এক বোধ হবে, সমান পবিত্র জ্ঞান হবে, তখন পাবি।" হৃদু আরও কিছু শোনার জন্যে জিজ্ঞেস করলো, "মহারাজ, আমাকে আপনার চেলা করে নিন।" তাতে সেই সাধু কোনো কথাই বললে না। তারপর বেশ কিছু দূরে গিয়ে একবার ফিরে তাকাল। যখন দেখলে হৃদু তখনও সঙ্গে আসচে, তখন চোখ রাঙিয়ে ইঁট তুলে তাকে মারতে তাড়া করলে। হৃদু যেমনি পালাল ওমনি ইঁট ফেলে সে যে কোন্ দিকে সরে পড়লো আর তাকে হৃদে দেখতে পেল না।

'ওই সাধুটির ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা হয়েছিল। অমন সব সাধু, লোকে বিরক্ত করবে বলে ওই রকম ভেক নিয়ে থাকে। তারা বালকবৎ, পিশাচবৎ, উন্মাদবৎ হয়ে সংসারে থাকে। ছোট ছোট ছেলেদের নিজেদের কাছে রেখে তাদের মতো হতে শেখে। ছেলেদের যেমন সংসারের কোনো কিছুতে আঁট নেই, সব ব্যাপারে তেমনি হতে চেষ্টা করে। দেখিস নি, ছেলেকে হয়ত মা একখানি নতুন কাপড় পরিয়ে দিয়েছে, তাতে তার কত না আনন্দ! যদি বলিস, "কাপড়টা দিবি?" সে বলবে, "না, দেবো না। মা আমায় দিয়েচে।" বলেই আবার হয়ত কাপড়ের খোঁটটা জোর করে ধরবে। আর তোর দিকে তাকাবে—পাছে তুই বস্ত্রখানি কেড়ে নিস! কাপড়খানাতেই তখন যেন তার প্রাণটা পড়ে আছে! তার পরেই হয়ত তোর হাতে একটা আধ পয়সার খেলনা দেখে বলবে, "ওইটে দে, আমি তোকে কাপড়খানা দিচ্চি।" আবার খানিক পরেই হয়তো খেলনাটা ফেলে সে একটা ফুল নিতে ছুটবে। তার কাপড়েও যেমন আঁট, খেলনাতেও তেমনি আঁট। ঠিক ঠিক জ্ঞানীদেরও ওই রকমটি অবস্থা হয়।

'আর একবার একজন সাধু এলো—সঙ্গে তার কিছুই নেই, কেবল একটি লোটা আর একখানি গ্রন্থ। গ্রন্থখানি তার বড় আদরের—ফুল দিয়ে তার নিত্য পুজো করতো আর এক

একবার খুলে খুলে দেখতো। তার সঙ্গে আলাপ হবার পর একদিন অনেক ব'লে ক'য়ে বইখানি দেখতে চেয়ে নিলুম। খুলে দেখি তার সব পাতায় কেবল লাল কালিতে "ওঁ রামঃ" লেখা। সে বললে, "মেলা বই পড়ে কি হবে? এক ভগবান থেকেই তো বেদপুরাণ সব বেরিয়েছে; আর তাঁর নাম ও তিনি তো অভেদ! অতএব শাস্ত্রে যা আছে তাঁর একটি নামেতেই সেসব রয়েছে। তাই আমি তাঁর নাম নিয়েই আছি"।'

প্রয়োজনবোধেই কাহিনী-বর্ণনা বন্ধ করছি কারণ সাধু এবং তাঁর নামগ্রন্থটি রামকৃষ্ণের কাছে কেমনভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তা আমাদের বোঝা দরকার।

হিন্দুর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদে আছে আদিতে ছিলেন স্রষ্টা ব্রহ্মা। স্রষ্টার পরে এলেন বাক্য……অর্থাৎ বাক্যই পরম ব্রহ্ম। (প্রজাপতির বৈ ইদম্ অগ্রে আসীৎ, তস্য বাক্ দ্বিতীয়া আসীৎ……বাক্ বৈ পরমম্ ব্রহ্ম—প্রজাপতি প্রথমে আবির্ভূত হলেন, তাঁর পরে হলেন বাক্। এই বাক্ই পরম ব্রহ্ম) বেদের এই উক্তিরই সমর্থন পাই সেণ্ট জনের উপদেশাবলীর প্রথম শ্লোকে। 'আদিতে ছিলেন বাক্য, ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন এবং বাক্যই ঈশ্বর।' বাক্যই যে ভাবের প্রকাশ এ প্রতীতি মানব সভ্যতার শুরু থেকেই আশ্রিত। একথা নিশ্চিত যে ভাব ও বাক্য অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং যে বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের ভাববস্তু প্রকাশ হয় সেই বাক্যের সাহায্য ছাড়া ঈশ্বরকে ধারণা করা যায় না।

ঈশ্বরকে বোঝবার জন্য যত ধ্বনির ব্যবহার হয়েছে তার মধ্যে প্রাচীনতম হলো ওংকার ধ্বনি। এই প্রণবধ্বনি ঈশ্বরের বাচক। ভারতে এবং অন্যত্র লক্ষ লক্ষ ভক্ত এই মাঙ্গলিক অক্ষরটি উপাসনার বীজমন্ত্ররূপে ব্যবহার করেন। ওঁ ধ্বনি ঈশ্বরের কোনো বিশেষ মূর্তি বা গুণের প্রতীক নয়—সর্বদেবতার প্রতীকরূপেই এই একাক্ষর উচ্চারিত হয়। প্রণবঃ সর্বদেবতাঃ।

এখন প্রশ্ন হলো এই মহোত্তম ভাব প্রকাশের জন্যে ওম্ ধ্বনি বেছে নেওয়া হলো কেন? খুব সহজভাবে হিন্দু এর ব্যাখ্যা করেছে। মানবজাতির সব থেকে সুস্পষ্ট ও অভ্রান্ত জ্ঞান হলো ঈশ্বরজ্ঞান। এই আপ্তজ্ঞানটি বোঝবার জন্যে একটি নির্ভরযোগ্য ধ্বনি খুঁজে পাওয়া দরকার। এমন এক ধ্বনি যা মুখ কণ্ঠ ও জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত হয়। এর শুরু 'অ' এই মূল ধ্বনি দ্বারা। জিহ্বা ও তালু স্পর্শ না ক'রে শুধু কন্ঠ থেকে এই ধ্বনি উদ্গত হয়। দ্বিতীয় ধ্বনি 'উ'—যেটি কণ্ঠ থেকে ওষ্ঠ অব্দি মুখগহ্বরের সর্বত্র স্পর্শ করে। অন্ত্যধ্বনি 'ম্ম' ; দৃঢ়বন্ধ ওষ্ঠের মধ্যেই উৎপন্ন। তিন বর্ণ এক করে হলো 'অউম' অর্থাৎ ওম্ বা ওঁ।

ভারতবর্ষে কোনো শিষ্য যখন গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে আসে তখন গুরু তাঁকে 'মন্ত্র' দেন। মন্ত্র হলো এক বা একাধিক পবিত্র নামাবলী যাতে সাধারণত 'ওঁ' প্রণবধ্বনি অন্তর্ভুক্ত থাকে। মন্ত্রপ্রাপ্ত শিষ্য নিবিড় অনুধ্যানে সেই নামমালা জীবনব্যাপী জপ করে। এই নামজপ গোপন, নিভৃত এবং পবিত্র। জপমন্ত্র অন্য কারো কাছে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। গুরুর এই মন্ত্রদানের তাৎপর্য দ্বিবিধ। প্রথম, মন্ত্রের দ্বারা গুরু তাঁর শিক্ষার নির্যাসটুকুই শিষ্যের মনে সঞ্চারিত করেন; মন্ত্রদানের পর শিষ্যকে আর কিছু দেবার থাকে না। দ্বিতীয়, মন্ত্রদান করে শিষ্যের সঙ্গে গুরুর মেলবন্ধন হয়। শিষ্য যেমন গুরুর কাছে মন্ত্র

নিয়েছে তেমনি গুরুও একদিন তাঁর পূর্ববর্তী গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছিলেন। শিষ্যাদি পরম্পরায় এই ধারা দূর অতীত থেকে প্রবহমান; এবং এইভাবেই সুদূর অতীতের কোনো এক মহাসাধকের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি একই ধারায় শিষ্য-পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

বারংবার মন্ত্র-আবৃত্তি করার নাম 'জপ' করা। সাধারণতঃ জপমালা নিয়ে 'জপ' করতে হয়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সহযোগ ঘটানো হয়। মন্ত্রজপের অন্য হিতকর দিকও আছে। আমাদের শরীরের মধ্যে অহরহ যে উদ্যোগশক্তি সৃষ্টি হচ্ছে, মন্ত্র-জপ হলো সেই শক্তির নির্গমন পথ। অর্থাৎ, এই নির্গমন পথটি না থাকলে স্নায়ুশক্তি দেহের মধ্যেই সঞ্চিত হতে হতে বিপুলাকার ধারণ করতো, আব আমাদের মন অপ্রকৃতিস্থ করতো। অধ্যাত্মসাধনায় যাঁরা অভিলাষী তাঁদের প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যায় জপ করতে হয় এবং জপমালার এক একটি গুটি বা দানা দিয়েই জপের হিসাব নির্ণয় হয়। আলাদা-ভাবে হিসাব রাখার দায় নিতে হয় না। জপমালার সাহায্যে জপ করার পদ্ধতি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীশ্চান, ইসলাম সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত।

শ্লোগানসর্বস্ব বর্তমানের এই বণিক ও রাজনৈতিক সমাজে বিজ্ঞাপনের মোহিনী শক্তির প্রভাব অনস্বীকার্য। সুতরাং বারংবার আবৃত্তির দ্বারা জপমন্ত্রও যে আমাদের মনে এই সম্মোহনী প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম, সে কথা একজন ঘোব নাস্তিকও মানতে বাধ্য। টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে ওঠা বিজ্ঞাপনের ছবি দেখে যদি সমাজের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পথে পথে গান গেয়ে বেড়ানোর প্রেরণা পেতে পারে—যদি প্রতিবেশী কোনো দেশ সম্বন্ধে কোনো এক অপ্রমাণিত মিথ্যা উক্তি সমগ্র জাতিকে যুদ্ধোন্মাদনায় উদ্দীপ্ত করতে পারে, তবে ঈশ্বরের নামগান ও মন্ত্ররূপের প্রভাব যে ভক্তমনে পড়বে না সে কথা কেমন করে বলি? আমরা মূলতঃ কল্পনাবিলাসী, যুক্তিবাদী নই। জীবনের খুব অল্প সময়েই আমরা যুক্তিসম্মত ধারাবাহিক চিন্তা করি। সংবাদপত্রের শিরোনাম, শ্লোগান অথবা হঠাৎ শোনা কোনো ভয় লোভ বা ঘৃণার কথা সকলের অলক্ষ্যে দৃষ্টি আর শ্রুতি দিয়ে চেতনার মধ্যে প্রবেশ ক'রে সংস্কার গড়ে তোলে। এই কল্পনাবিলাসিতার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের সঠিক মূল্যায়নের চেষ্টা করি। মন্ত্রপাঠের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে আমাদের কল্পনার কাছাকাছি এনে ফেলি এবং মনের মধ্যে তখন কিছু গভীর মহৎ অবস্থা সৃষ্টি হয়। প্রথম প্রথম মনের এই বদল বোঝা যায় না। কিন্তু অনতিকাল পরেই মনের এই মহৎ ভাবটি অনিবার্যভাবে প্রকাশ হয়—প্রথমে ব্যক্তির স্বাভাবিক চরিত্রের মধ্যেই এই সাধু ভাবটি লুকিয়ে থেকে ক্রিয়া করে, কিন্তু ভাবটি পরে ব্যক্তির স্বভাব ও চরিত্রটির আমূল বদল করে দেয়।

ঘুরতে ঘুরতে সন্ন্যাসী জটাধারী দক্ষিণেশ্বরে এসে পড়লো। সেটি ১৮৬৪ সাল। জটাধারী রামের সেবক। সঙ্গে করে এনেছে শ্রীরামচন্দ্রের বালক মূর্তি—নাম রামলালা। (ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকে বালক বালিকাদের আদর করে লালা বা লালী বলে ডাকে।) অষ্টধাতু নির্মিত এই ছোট্ট বিগ্রহটি ভারি ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে জটাধারী পুজো করতো। জটাধারীকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখে রামকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে সাধারণ

ভক্ত বা সাধু নয়। বস্তুত, জটাধারী যেন বালক রামচন্দ্রের ভাবঘন মূর্তির সদাসর্বদা দর্শন পেত। বিগ্রহ এবং বালকরূপী রামচন্দ্র যেন তার দৃষ্টিতে এক হয়ে গিয়েছিল। তার এই পরম নিষ্ঠাই রামকৃষ্ণকে মোহিত করেছিল। জটাধারীর পাশটিতে বসে মূর্তির দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি নিত্যই যেন রামলালাকে দেখতে পেতেন। কেমন সে লীলা সে কথা রামকৃষ্ণ নিজেই বর্ণনা করেছেন। 'দিনের পর দিন যত যেতে লাগলো রামলালারও তত আমার উপর পীরিত বাড়তে লাগলো। যতক্ষণ বাবাজির (জটাধারী) কাছে থাকি ততক্ষণ সে বেশ থাকে, খেলাধুলো করে। আর যেই সেখান থেকে নিজের ঘরে চলে আসি ওমনি সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। আমি বারণ করলেও জটাধারীর কাছে থাকে না। প্রথম প্রথম ভাবতুম বুঝি আমার মাথার খেয়ালে অমনটি দেখি। নইলে জটাধারীর চির-কেলে পুজো করা ঠাকুর, যাকে সে কত ভালবাসে, সেবা ভক্তি করে, সে সাধুর চেয়ে আমায় বেশি ভালবাসবে, এটা কি হতে পারে? কিন্তু আমি সত্যি সত্যি তাকে দেখতুম—দেখতুম রামলালা কখনো আগে কখনো পেছনে নাচতে নাচতে আসছে। কখনো বা কোলে ওঠবার জন্যে বায়না কচ্চে। আবার হয়তো কখনো বা কোলে করে রয়েচি—কিছুতেই কোলে থাকবে না। কোল থেকে নেবে রোদে দৌড়াদৌড়ি করবে, কাঁটাবনে গিয়ে ফুল তুলবে বা গঙ্গার জলে ঝাঁপাই জুড়বে! যত বারণ করি, "ওরে, অমন করিসনি, পায়ে ফোস্কা পড়বে! ওরে, অত জল ঘাঁটিসনি ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয়ে জ্বর হবে,"—সে কি তা শোনে? যেন কে কাকে বলচে! হয়ত তার বড় বড় সুন্দর চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো বা ঠোঁট দু'খানি ফুলিয়ে মুখ ভ্যাঙচাতে লাগলো! তখন সত্যি সত্যি রেগে গিয়ে বলতুম, "তবে রে পাজি, রোস্—আজ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব!" এই ব'লে রোদ থেকে বা জল থেকে জোর করে টেনে নিয়ে এটা ওটা দিয়ে ভুলিয়ে ঘরের মধ্যে খেলতে বলতুম। তখনও যদি দুষ্টুমি না থামতো তবে চড়টা চাপড়টা বসিয়েই দিতুম। মার খেয়ে সুন্দর ঠোঁট দু'খানি ফুলিয়ে জলভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে দেখতো। মনে তখন বড় কষ্ট পেতুম। কোলে তুলে আদর করে তাকে ভুলাতাম।

'একদিন নাইতে যাচ্ছি, বায়না ধরলে সেও যাবে। কি করি? নিয়ে গেলুম। কিন্তু জল থেকে আর কিছুতেই উঠবে না। যত বলি কিছুতেই শুনবে না। শেষে রাগ করে জলে চুবিয়ে ধরে বললুম, "তবে নে—কত জল ঘাঁটতে চাস ঘাঁট!" যখন চুবিয়েছি তখন দেখলুম জলের ভিতরে সে হাঁপিয়ে শিউরে উঠেছে! তখন নিজেই ভয় পেয়ে যেতুম, "একি করলুম, একি করলুম?"—ব'লে কোলে করে জল থেকে উঠিয়ে আনতুম।

'আর একদিন; খেতে চেয়ে খুব বায়না করচে। তাকে ভোলাবার জন্যে ধানসুদ্ধ দু'চারটি খই দিয়েছিলুম। ওই খই খেতে খেতে ধানের তুষ লেগে তার নরম জিব চিরে গেল। তখন মনে যে কষ্ট হলো তা বলার নয়। তাকে কোলে করে ডাক ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললুম, "যে মুখে তোর মা, ব্যথা পাবি বলে, ক্ষীর সর ননী অতি সন্তর্পণে তুলে দিতো, আমি এমন হতভাগা যে সেই মুখে তোকে এমন শক্ত খাবার দিয়েছি"।'

অনেক বছর পরে এই বিশেষ ঘটনাটির কথা সাঙ্গোপাঙ্গদের কাছে বলতে গিয়ে রামকৃষ্ণ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন। সেখানে সারদানন্দও ছিলেন। রামলালার কথা শুনতে

শুনতে তাঁরা বিমূঢ় হয়ে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিলেন। বয়সে নবীন ব'লে এটি যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। অসম্ভব মনে হয়েছিল। তবে তাঁরা জানতেন এ গল্পের কথক স্বয়ং রামকৃষ্ণ, যিনি জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন নি। দলের মধ্যে পরিণত বয়সী ছিলেন একমাত্র সারদানন্দই। তাই তাঁর গ্রন্থে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশে পরিচ্ছন্ন একটি পরিহাস করে গেছেন। তাঁর মত হলো, 'গল্পের যতটুকু পরিপাক করতে পারবে ততটুকুই নেবে। যদি মনে করো তবে মাথা-লেজও বাদ দিতে পার।' অবশ্য অপরের উদ্দেশে সারদানন্দ যা-ই বলুন না কেন, তিনি নিজে এই গল্পের আদ্যোপান্ত বিশ্বাস করতেন।

রামকৃষ্ণ বলেছেন; 'এক একদিন রেঁধে বেড়ে ভোগ দিতে বসে জটাধারী রামলালাকে দেখতেই পেত না। তখন মনে কষ্ট পেয়ে আমার ঘরে ছুটে আসত; এসে দেখত রামলালা আমার ঘরে খেলা করচে। তখন অভিমানে তাকে কত কি বলত বাবাজি। বলতো, "আমি এত রেঁধে বেড়ে তোকে খাওয়াব ব'লে খুঁজে বেড়াচ্চি আর তুই কিনা এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুলে রয়েচিস! তোর রকমই ওমনি! মায়া দয়া কিছুই নেই! একদিন বাপ-মাকে ছেড়ে বনে গেলি, বাপটা কেঁদে কেঁদে মরে গেল তবুও ফিরলি না—তাকে দেখা দিলি না!" এইসব ব'লে রামলালাকে টেনে নিয়ে জটাধারী খাওয়াত। এমনি করে দিন যেতে লাগল। জটাধারী অনেকদিন এখানে ছিল, কারণ রামলালা এখান থেকে যেতে চাইত না আর জটাধারীও তার চিরদিনের আদরের রামলালাকে ফেলে যেতে পারত না।

'কিন্তু একদিন জটাধারী হঠাৎ এসে সজল-চোখে বললে, "রামলালা আমাকে কৃপা করেচে—যেমনভাবে দেখতে চাইতাম তেমনভাবে দর্শন দিয়েচে, আমার প্রাণের পিপাসা মিটিয়েচে। রামলালা আমাকে বলেচে এখান থেকে সে যাবে না, তোমাকে ছেড়ে সে যেতে চায় না। আমার মনে এখন আর কোনো দুঃখুকষ্ট নেই। তোমার কাছে ও সুখে থাকে, খেলাধুলো করে তাই দেখেই আমি আনন্দে ভরে আছি। আমি বুঝেছি যাতে ওর সুখ তাতেই আমার সুখ! তাই তোমার কাছে আমি ওকে রেখে যেতে পারবো। তোমার কাছে সুখে থাকবে ভেবেই আমার আনন্দ।" এই ব'লে রামলালার বিগ্রহটি আমায় দিয়ে জটাধারী বিদায় নিয়ে চলে গেল। আর সেই থেকে রামলালা আমার কাছেই রয়েছে।'

বিগ্রহটি বহুদিন রাধাকান্ত মন্দিরে রাখা ছিল। এই শতকের গোড়ার দিকে মূর্তিটি চুরি হয়ে যায়, সেই থেকে এটির আর পুনরুদ্ধার হয় নি।

১৮৬৩ সাল; রামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনা সবে শেষ হয়েছে। কামারপুকুর থেকে চন্দ্রা দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন। মনোগত বাসনা যে জীবনের শেষ ক'টা দিন এখানেই কাটাবেন। মন্দির প্রাঙ্গণের উত্তরে যে নহবৎখানা সেখানেই চন্দ্রার থাকার ব্যবস্থা হলো। তাঁর ঘর থেকে রামকৃষ্ণের ঘরের বাইরের চাতালটি পরিষ্কার দেখা যেত। সুতরাং ছেলের কাছে আসতে চন্দ্রাকে কয়েক পা মাত্র হাঁটতে হতো।

টাকা পয়সা বা অন্য কোনোভাবে রামকৃষ্ণের সেবা করার সব চেষ্টা যে মথুরের নিষ্ফল হয়েছিল, তা বলেছি। এখন চন্দ্রাদেবী দক্ষিণেশ্বরে এসে পড়ায় পরোক্ষভাবে ঠাকুরকে সেবা করার সুযোগ মথুর পেলেন। চন্দ্রার কাছটিতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন তিনি। চন্দ্রাকে ডাকতেন 'ঠাকুমা'। মথুর তাঁর পাশটিতে থাকলে বৃদ্ধাও খুশি হতেন। মথুর তাঁর

বড় আপনার হয়ে গিয়েছিল। একদিন কথাচ্ছলে বৃদ্ধাকে কিছু দান নিতে বললেন। বৃদ্ধা তো ভেবেই আকুল। খুবই বিপন্না হয়ে উঠলেন চন্দ্রা। কি দান নেবেন? কি তাঁর অভাব? আকাশপাতাল ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না। অথচ ছেলেটাকে খুশি করতে পারলে তিনি যেন বেঁচে যান! শেষ পর্যন্ত পেঁটরা খুলে বসলেন বৃদ্ধা। মথুরকে ডেকে দেখালেন তাঁর পরবার কতগুলি শাড়ি। বললেন, 'বাবা! তোমার কল্যাণে আমার তো কিছুরই অভাব নেই! থাকবার ঠাঁই দিয়েচ, অন্নজলের ব্যবস্তা করেচ, আর আমার কি চাই?' কিন্তু মথুরও ছাড়বার পাত্র নন। একটা কিছু তাঁকে চাইতেই হবে। অগত্যা মাথা ঘামিয়ে মন তোলপাড় ক'রে একটি অভাবের কথাই বৃদ্ধার মনে পড়ল। চন্দ্রার একটিই বিলাসিতা—মাঝে মাঝে ভাজা মশলা দিয়ে তিনি দোক্তাপাতা খেতে ভালবাসতেন। তাই মথুরকে খুশি করতে চন্দ্রা সেদিন সেইটুকুই চেয়েছিলেন—এক আনার দোক্তাপাতা!

১০

তোতাপুরী

ভক্ত যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব অবলম্বন করে তাঁর হৃদয় দেবতার পূজা করেন সে কথা আগে বলেছি। এখন রামকৃষ্ণের অভিজ্ঞতার নিরিখে সেই ভাবগুলি বিশদভাবে আলোচনা করবো।

ভগবদারাধনার যেটি সরলতম ভাব তার নাম 'শান্ত'। সেব্য যিনি তাঁর সঙ্গে সেবকের, সৃষ্টির সংগে স্রষ্টার দ্বৈতবাদী সম্পর্ক স্থাপনের এটি মূল 'ভাব'। অবশ্য এর সংগে কোনো মানবিক সম্পর্কের সাদৃশ্য নেই।

পরবর্তী ভাব 'দাস্য'। সন্তানের সঙ্গে পিতামাতা কিংবা ভৃত্যের সঙ্গে প্রভু—এইরকম এক মানবিক সম্পর্ক দাস্য ভাবের মধ্যে পাই। রামের প্রতি হনুমানের আচরণের এটিই মুখ্যরস। (দ্রঃ সপ্তম অনুচ্ছেদ) হনুমান নিজেকে রামের সেবক মনে করতেন এবং আমরা দেখেছি যে, রামের আরাধনার সময় রামকৃষ্ণও নিজেকে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও, হনুমানের সঙ্গে অভিন্ন করে ফেলেছিলেন। এ ছাড়াও জীবনব্যাপী রামকৃষ্ণ নিজেকে জগন্মাতার সন্তান মনে করতেন।

এরপরের ভাব 'সখ্য'। ভক্ত ও ভগবান যেন পরস্পর সখা। ভক্ত নিজেকে বৃন্দাবনের গোপ-বালক মনে ক'রে ভগবানের কাছাকাছি আসে। এই গোপবালকেরাই তো একদিন বাল-গোপালের লীলাসহচর ছিলেন! রামকৃষ্ণ মনে করতেন তাঁর অনুগত ভক্ত রাখালও (ইনিই পরবর্তীকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দরূপে পরিচিত হয়েছিলেন) আগের কোনো এক জন্মে গোপ-বালক ছিলেন।

সখ্যর পর 'বাৎসল্য'। এই ভাবানুষঙ্গে ভক্তের মনে পিতৃমাতৃভাবের অভিব্যক্তি হয়। ভক্ত যেন ভগবানের পিতামাতাস্বরূপ। বালকরাম রামলালার আরাধনার সময় আমরা রামকৃষ্ণ ও জটাধারীর মধ্যে এই ভাবের প্রকাশ দেখেছি।

রসপঞ্চকের শেষ রস বা ভাব হলো 'মধুর'। ভগবানের কাছে ভক্ত আসেন প্রিয়ারূপে। এটিই রাধাভাব। হিন্দুর চোখে শ্রীরাধিকা হলেন কৃষ্ণপ্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁর জীবনের সবখানিই মধুর রসে ভরপুর। মধুর রসে অন্য রস বা ভাবসমষ্টিগুলিও মূর্ত আছে। কারণ প্রিয়া কখনও সখী, কখনও দাসী, কখনও মাতা, কখনও বা গৃহিণীরূপে ভগবানের ভজনা করেন। (গৃহিণী সচিব সখী ললিতা কলাবিধৌ)

রাধাভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে রামকৃষ্ণ যখন কৃষ্ণ ভজনা করতেন তখন হাব-ভাব, পোষাক-আশাক, আচার-আচরণে তিনি হয়ে উঠতেন রমণী। আমি জানি, রামকৃষ্ণের মধ্যে রমণী-ভাবারোপের ঘটনাটি আমার পাশ্চাত্য পাঠকেরা উদার দৃষ্টিতে দেখবেন না। ঘটনাটি অপ্রাকৃত ব'লে তাঁরা ক্ষুন্ন হবেন। তাঁদের এই সংশয় বা দ্বিধা অস্বাভাবিক নয়।

তাই প্রশ্ন হলো, পুরুষভক্তের পক্ষে রমণীভাব গ্রহণের আদৌ কোনো সার্থকতা আছে কি? আমি বলি আছে। কারণ ভগবানকে আপনজন মনে করতে পারলে তাঁকে সখা, পুত্র,

প্রাণপতি—কিছুই বলতে দ্বিধা হয় না। তখন ভক্তের চোখে ভগবান যেন পরাণ-বঁধুয়া।

বেদান্ত দর্শনের সূত্র অনুসরণ করলে আমরা দেখবো যে 'মধুরভাব' সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের এই ব্যাখ্যাটি খুবই যুক্তিগ্রাহ্য। বেদান্ত বলে যে, নির্গুণ ব্রহ্মছাড়া আর কোনো বস্তু সত্য নয়। নাম ও আকারের রূপ নিয়ে যে সব বস্তু জড়বাদী জগতে সত্য ব'লে পরিচিত, তারা সকলেই এক অদ্বয় ব্রহ্মবস্তু। এ যেন এক ব্রহ্মকেই নানারূপে নানা আকারে দেখা ও শোনা। অথচ আমরা এটিকেই সত্য ব'লে জানি কারণ সবাই আমরা ভ্রমের মধ্যে নিমজ্জিত। এই ভ্রম বা মায়ার বাধা নির্বাসনে না পাঠালে ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে না। জড়বস্তুর যে আকার আমরা দেখি তা আমাদের মনেরই কল্পনা; অর্থাৎ আমাদের ইগো, অহম্বোধ থেকেই এর উৎপত্তি। যতক্ষণ এই অহম্বোধ ততক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান দূরে, অনেক দূরে। ইগো বা আমিত্বের এই প্রকাশ দেহচেতনা থেকে। যখন বলি, 'আমি এই দেহের অধিকারী', তখন আমিত্ব সুস্পষ্ট। এবং এই দেহচেতনা থেকেই উদ্ভূত হয় দুই স্বতন্ত্র সংস্কার, 'পুরুষ ও প্রকৃতি'।

ভক্ত যদি ভেদজ্ঞান ভুলে আপনাকে বিপরীত প্রকৃতির কোনো এক সত্তা ভাবে তাহলেই এই ভ্রম দূর হয়; কারণ সে বুঝতে পারে যে, আসলে এই বিভেদ মনঃকল্পিত। সুতরাং পুরুষভক্তের পক্ষে পুরুষভাব ত্যাগ ক'রে বাক্য, মনন ও বেশভূষায় রমণীভাব গ্রহণ করা এবং সেই ভাবানুকূল আচরণ করা নিশ্চয়ই অবাঞ্ছিত নয়।

ভক্তিরসের যে অবলম্বনগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি সেগুলি বৈষ্ণবসাধনারই অঙ্গ। বিষ্ণুতত্ত্বের মধ্যেই অবতারবাদ নিহিত আছে। বিষ্ণুর এক অবতার রাম। রাম ছিলেন রামকৃষ্ণের গৃহবিগ্রহ। তাই অনুমান করা যায় যে, তন্ত্রসাধনা শেষ ক'রে রামকৃষ্ণ বৈষ্ণবসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর এই সাধনের পথে বিষ্ণুসাধিকা ভৈরবীও রামকৃষ্ণকে উদ্বুদ্ধ করেন।

ছেলেবেলা থেকেই রামকৃষ্ণের মধ্যে 'প্রকৃতি' ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তখন রঙ্গ করতে তিনি রমণীভাব গ্রহণ করতেন, যেমন দুর্গাদাস পাইনের সঙ্গে করেছিলেন। (দ্রঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ) কখনও বা সাধনার প্রয়োজনে ভাবারোপ ক'রে নিজেকে কৃষ্ণের প্রিয়া মনে করতেন। তাঁর স্বভাবে যে কোমলতা ও মাধুর্য ছিল তাও যেন রমণীসুলভ ব'লে অনেকে মনে করতেন। কিন্তু পুরুষ বা স্ত্রী, কোনো ভাবটিই তাঁর মধ্যে বিসদৃশ ছিল না। বরং তাঁর চরিত্রে এমন অনন্যসাধারণ এক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, পুরুষ বা রমণী যে কোনো ভাবেরই প্রকাশ নিঃসংকোচ হতো। অনুমান হয়, রামকৃষ্ণের মনে পুরুষ-প্রকৃতি ভেদজ্ঞান ক্ষীণ ছিল বলেই যে কোনো একটি ভাবারোপ এত সহজ হতো।

রামকৃষ্ণ যতদিন ভৈরবীর সাধনপুত্র ছিলেন ততদিন তাঁর স্বভাবে ছিল উগ্র পুরুষভাব। তখন কারো মধ্যে মধুরভাবের উদ্দীপন দেখলে তিনি বিতৃষ্ণ হতেন। একদিনের কথা বলি, অবতাররূপী রীতিনায়ক কৃষ্ণের ভজনা করে ভৈরবী গান ধরেছেন, কিন্তু মধুর রসাশ্রিত সেই গানের রসাস্বাদনে রামকৃষ্ণ একটুও উৎসাহ দেখালেন না। বরং ভৈরবীকে তখনই গান থামাতে বললেন। যাহোক, আমরা লক্ষ্য করেছি, যখন যে ভাবসাধনে তিনি ব্রতী হতেন তখন ভাবানুকূল সেই বেশবাস পরতেন। কখনো রক্তাম্বর, কখনো শ্বেতাম্বর কখনো বা গৈরিক। তাই কৃষ্ণভজনার সময় যখন তাঁর মধ্যে রাধাভাবের উদ্দীপন হতো তখন তিনি

রমণীর বেশভূষায় সজ্জিত হতেন। লোকনিন্দার কাছে সমর্পণ ক'রে যে কিছু করতেন তা নয়—বরং যখন যে প্রেরণায়, যে সাধনানুষ্ঠানে রত হতেন, তখন শাস্ত্রমর্যাদা মেনেই তা পালন করতেন। কখনো 'ভাবের ঘরে চুরি' করতেন না।

রামকৃষ্ণের মনে যখন মধুরভাবের কুণ্ঠাহীন উদ্দীপন হলো তখন একদিন তিনি মথুরকে স্ত্রীবেশ আনতে বললেন। মথুরও তাঁর নির্দেশটি মান্য করলেন বিনা দ্বিধায়। বহুমূল্য একখানি বেনারসি শাড়ি, ঘাগরা, ওড়না, কাঁচুলি কিনে আনলেন। পরে ঠাকুরের রমণীবেশ সর্বাঙ্গসুন্দর করতে এক সেট সোনার গহনা এবং একটি পরচুলাও কিনে এনেছিলেন। বলা-বাহুল্য তাঁর স্ত্রীভাবের সাধনা নিয়ে রামকৃষ্ণ ও মথুরের নামে অনেক কলঙ্ক রটেছিল। অবশ্য এঁদের দুজনের কেউই এই কলঙ্ককে আমল দেন নি।

রমণীবেশে সর্বাঙ্গসুন্দর হবার পর রামকৃষ্ণের মনে আশ্চর্য এক রমণীভাবের উদ্দীপন হয়েছিল। তখন যারা তাঁকে দেখতো, তারা সবাই তাঁর আচার-আচরণ ও স্বভাবের বদল দেখে অবাক হতো। তাঁর চলা, বলা, হাসি, কটাক্ষ এমনকি ছোট ছোট অঙ্গভঙ্গির মধ্যেও ললনা-সুলভ আচরণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একবার, এই সময়কার সাধনকালে রাণী রাসমণির জানবাজারের বাড়িতে তাঁকে থাকতে হয়। তখন অন্তঃপুরের মেয়েদের সঙ্গে এমনভাবে মেয়ে হয়ে বাস করতেন যে চেনা যেত না। মথুরের জামাইবাবাজিরা শ্বশুরবাড়ি এলে রামকৃষ্ণই মেয়েদের পোষাক-আশাক গহনা দিয়ে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতে তাদের চুল বেঁধে দিতেন; তারপর সখীর মতন মেয়েদের হাত ধবে তাদের বরের কাছে পেঁাছে দেবার সময় বরের মনোরঞ্জনের উপায়গুলি শিখিয়ে দিতেন। কখনো বা নিজেই বরের পাশটিতে বউকে বসিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন।

হৃদয় বলতো, 'অমনভাবে রমণীপরিবৃত হয়ে থাকবার সময় নিকট আত্মীয়রাও রামকৃষ্ণকে চিনতে পারতো না। একদিন মথুরামোহন আমাকে অন্তঃপুরে নিয়ে এলেন তারপর মেয়েদের দেখিয়ে বললেন, "কোনটি তোমার মামা বলতে পারো?" এতদিন একসঙ্গে থেকে তাঁর নিত্যসেবা করলেও চট করে সেদিন তাঁকে চিনতে পারি নি। দক্ষিণেশ্বরে রোজ সকালে সাজি হাতে মামা ফুল তুলতেন; আমরা দেখতুম ফুল তোলার সময় মেয়েদের মতন মামাও তাঁর বাঁ পাখানি আগে ফেলে হাঁটছেন।'

১৮৬৪ সাল। সেবার মথুরের জানবাজারের বাড়িতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে অন্তঃপুর-বাসিনীদের সঙ্গে রামকৃষ্ণও স্ত্রীবেশে বাস করছিলেন। অষ্টমী পুজোর দিন রামকৃষ্ণের দিব্য-ভাব হলো। সঙ্গে সঙ্গেই বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। এদিকে আরতির সময় বয়ে যায় দেখে মথুর-গৃহিণী জগদম্বার মহা ভাবনা। প্রদীপ জেলে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে মায়ের আরতি করতে হবে। কিন্তু করবে কে? রামকৃষ্ণকে অমন জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ফেলে তিনি যেতেও পারেন না। ক'দিন আগেই তো জ্বলন্ত কয়লার মধ্যে প'ড়ে হাত পা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন! এমনি যখন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা, তখন হঠাৎ যেন দৈববাণী পেলেন জগদম্বা। তাড়াতাড়ি হাতের কাছে যা যা গহনা ছিল সেগুলি সব পরিয়ে রামকৃষ্ণের রমণী-বেশ সর্বাঙ্গসুন্দর করে দিলেন। তারপর বীজমন্ত্র জপ করার মতন কানে কানে বলতে লাগলেন, 'এখন আরতির সময়—পঞ্চ প্রদীপের আলো জেলে চামর দুলিয়ে মায়ের আরতি করবেন না?' দেখা গেছে ভাবাবেশ কাটিয়ে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে আনতে রামকৃষ্ণের কানে ভাব-

সঞ্চারকারী বিষয়ের বীজমন্ত্র বারবার জপ করতে হয়। তাহলেই তাঁর ভাবরাহিত্য ঘটে। ব্যাপারটি জগদম্বা জানতেন। ফলে দেবীদুর্গার নামোল্লেখ মাত্রই রামকৃষ্ণের ভাবরাহিত্য হলো। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে জগদম্বার সঙ্গে রামকৃষ্ণ পূজাস্থানে এসে দাঁড়ালেন। আরতি শুরু হলো। চামর হাতে রামকৃষ্ণ যখন দেবীকে ব্যজন করছিলেন তখন মথুরামোহন এসে দাঁড়ালেন। দূর থেকে দেখলেন তাঁর স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে একজন অপরিচিতা মহিলা হাতে চামর নিয়ে ব্যজন করছেন। বেশভূষা ঠাটঠমকে মহিলাটিকে রীতিমত মহিয়সী দেখাচ্ছিল। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে মথুর ভাবলেন ইনি নিশ্চয়ই কোনো ধনী গৃহিণী এবং জগদম্বার বিশেষ নিমন্ত্রিতা। একটু কৌতূহল ছিলই। তাই আরতি শেষ হতেই স্ত্রীর কাছে গিয়ে এই ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলাটির খোঁজখবর নিতে লাগলেন। স্বামীর কৌতূহল দেখে মুখটিপে একটু হেসে জগদম্বা বললেন, 'চিনতে পারলে না? উনি যে বাবা?' মথুর স্তম্ভিত। ঘোরটুকু কাটতে স্ত্রীকে বললেন, 'চেনা না দিলে বাবাকে কেউ চিনতে পারে না।'

নিজের মধ্যে রমণীভাব আরোপ করে ব্রজগোপিনীদের মতন কৃষ্ণপ্রেমে অধীর হয়ে উঠেছিলেন রামকৃষ্ণ। বিরহব্যাকুল শরীর যন্ত্রণায় অবশ হয়ে যেত। আহার-নিদ্রা ভুলে তিনি শুধু কাঁদতেন। শরীরের রোমকূপ দিয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত ক্ষরণ হতো। রামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন যে রাধিকার কৃপা ছাড়া কৃষ্ণদর্শন অসম্ভব। তাই আকুল হয়ে রাধাধ্যানে প্রবৃত্ত হলেন। এমনি করে কিছুদিন সাধনার পর তাঁর স্বপ্ন সফল হলো। কৃষ্ণদর্শন লাভ ক'রে রামকৃষ্ণ ধন্য হলেন। একদিন আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটলো। তদ্‌গতচিত্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনছেন। শুনতে শুনতেই ভগবান কৃষ্ণের জ্যোতির্ময়রূপ দর্শন হলো। দেখলেন 'দড়ার মতো' একটা জ্যোতি ভাগবত গ্রন্থ ছুঁয়ে রামকৃষ্ণের বক্ষসংলগ্ন হয়ে তিন বস্তুকে একত্র ক'রে একটি ত্রিকোণ আকার নিল। রামকৃষ্ণ পরবর্তীকালে বলতেন, 'সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখার পর বুঝেছিলুম যে ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান তিন এক, এক তিন।

রামকৃষ্ণ কিভাবে দ্বৈতভাবসাধনের চরম উপলব্ধিতে পেঁছে গিয়েছিলেন তা আমরা দেখেছি। কিন্তু মাস কয়েক না যেতেই তাঁর জীবনে সম্পূর্ণ বিপরীত এক উপলব্ধি হলো। সে উপলব্ধি চরম অদ্বৈতবাদ—অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে লীন হওয়া, যা কিনা বেদান্তের শিক্ষা। (আদি শাস্ত্রগ্রন্থ বেদের মধ্যেই এই দর্শনটি নিহিত বলে এর নাম বেদান্তদর্শন।)

সাধনার এই নতুন ধারা শুরু হলো ১৮৬৫ সালে দক্ষিণেশ্বরে-সন্ন্যাসী তোতাপুরীর আগমনের সময় থেকে। শংকরাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের একটি সম্প্রদায় হলো 'পুরী' সম্প্রদায়। রামকৃষ্ণ কখনো তোতাপুরীর পূর্ণ নাম ব্যবহার করেন নি। কারণ পরবর্তীকালে তিনি তোতাপুরীকে গুরুর পদে বরণ করেছিলেন। আসলে তোতাপুরীকে তিনি 'নাঙটা' বলেই ডাকতেন কারণ জীবনের অধিকসময় তোতাপুরী সম্পূর্ণ নাঙ্গা হয়েই কাটাতেন।
'পুরী'দের মধ্যে এক উপ-সম্প্রদায় হলো 'নাগা' এবং তোতা ছিলেন এই নাগাদের একজন। একেবারে শিশু বয়সেই লুধিয়ানার (পাঞ্জাব) এক নাগা মঠে তোতা সাধনসঙ্গী হন। মঠে সন্ন্যাসীর সংখ্যা ছিল সাতশ'। কঠোর কৃচ্ছ্রতার জন্যে সম্প্রদায়টি সুবিদিত ছিল। সম্প্র-

দায়ের অন্তর্গত সন্ন্যাসীদের একে একে সবরকম ঐহিক আসক্তি থেকে মুক্ত হবার শিক্ষা দেওয়া হতো। এমনকি আহার পানীয় নিয়েও তাঁরা সংযমী ছিলেন। শরীর নগ্ন রেখে তাঁরা কঠোর তপশ্চর্যা করতেন—যাতে শরীর দৃঢ় ও কঠিন হয়। কালে এই সন্ন্যাসীদের শিরোমণি হয়েছিলেন তোতা। অবশ্য বেশিদিন তিনি মঠবাসী থাকেন নি। পরিব্রাজক হয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতেই ভালবাসতেন আর এইভাবেই ঘুরতে ঘুরতে একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে পেঁৗছেছিলেন।

নাগা উপ-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা আগুনকে খুবই পবিত্র ভাবেন। যখন যেমন অবস্থাতেই থাকুন না কেন, ধুনি জেবলে তার পাশটিতে বসে ধ্যান করবেনই। সাধনার যা কিছু সব ধুনির আগুনকে ঘিরেই। খাওয়া শোওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। নাগা সন্ন্যাসীরা কখনো গৃহবাসী হন না। তোতার একমাত্র সম্পদ ছিল একজোড়া চিমটা। অন্য কাজ ছাড়া চিমটা দিয়ে আত্মরক্ষাও চলতো। আর ছিল একটি লোটা। তোতা যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন তখন তিনি মধ্যবয়সী প্রৌঢ়। গড়নে বেশ লম্বা, স্বাস্থ্য রীতিমত মজবুত। হঠাৎ দেখলে বলশালী বলে মনে হবে। ধ্যান করা বা ঘুমানোর সময় তোতা সর্বদা গায়ে একখণ্ড কাপড় জড়িয়ে রাখতেন।

দেশে ফেরার পথে তোতা দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। নর্মদার তীরে আব পুরীর দেবস্থানগুলি দর্শন করে ফিরছিলেন। পথে পড়ল দক্ষিণেশ্বর। ভেবেছিলেন দিনতিনেক থাকবেন; সাধারণত কোনো দেবস্থানেই তিনদিনের বেশি থাকতেন না। প্রাচীন শাস্ত্রনির্দেশ মতন তিনি মনে করতেন যে, আসক্তি কাটাতে হ'লে কোথাও থেমে থাকতে নেই। শুধুই চলা—প্রবহমান নদীর মতন শুধু বয়ে চলা। চরৈবেতি। রামকৃষ্ণকে দেখে, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার বাসনায় তোতা যে তাঁর পরিকল্পনা বদলে ফেলেছিলেন, তা নয়। কারণ, রামকৃষ্ণের কোনো কথাই তোতা জানতেন না এবং ভৈরবীর মতন প্রত্যাদেশ পাওয়া বা দেবী দর্শন তাঁর হয় নি।

মন্দির চত্বরে পেঁৗছেই তোতা প্রথমে গেলেন ঘাটের প্রশস্ত চাঁদনিতে। অনেকেই ছিলেন—একপাশে রামকৃষ্ণও আনমনে বসে ছিলেন। একছুট চাদর দিয়ে গা মুড়ে তিনি বসেছিলেন। তবুও তোতার সন্ধানী চোখ তাঁকে খুঁজে পেল। একনজর দেখেই তোতা বুঝতে পারলেন যে, এ যুবক আর পাঁচজন সাধারণ থেকে একটু আলাদা!

তোতার স্বভাবটি ছিল বেশ উদ্ধত, প্রকৃতি দাম্ভিক। সেইভাবেই সরাসরি রামকৃষ্ণের কাছে এসে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন, 'তোকে উত্তম অধিকারী মনে হচ্ছে। বেদান্ত সাধনা করবি?'

আকস্মিক হলেও রামকৃষ্ণ একটুও বিচলিত হলেন না। খুব শান্ত স্বাভাবিক ভাবে জবাব দিয়ে বললেন, 'কি করবো তার আমি কি জানি! মা সব জানেন। তিনি যদি হ্যাঁ বলেন তবে করবো!' তোতা বললেন, 'তবে যা' মাকেই জিজ্ঞেস করে আয়! জিজ্ঞেস করেই সোজা আসবি—এখানে আমি বেশিক্ষণ থাকবো না।'

তোতা ভেবেছিলেন রামকৃষ্ণ বুঝি তাঁর মানবী মায়ের অনুমতি নিতে চলেছেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে তোতা দেখলেন রামকৃষ্ণ সোজা গিয়ে ঢুকলেন কালীঘরে। খানিক পরেই যখন বেরিয়ে এলেন তখন একেবারে অন্য মানুষ। ভাবে টলমল—অর্ধচেতন অবস্থা! সোজা

তোতার কাছে এসে দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণ। তারপর হর্ষোৎফুল্ল মুখে বললেন, 'মা-কে জিজ্ঞেস করলুম। মা বললেন, "যা শেখ্! তোকে শেখাবে বলেই অদ্দূর থেকে সন্ন্যাসী এসেছে।" জগন্মাতা কালীর উপর রামকৃষ্ণের অমন সরল নিষ্পাপ বিশ্বাস, ভক্তি দেখে তোতা মুগ্ধ। অবশ্য রামকৃষ্ণের এই কুণ্ঠাহীন বিশ্বাস ও ভক্তির ব্যাপারটি তোতা একটু অবজ্ঞার চোখে দেখেছিলেন। তাঁর ধারণা, বাংলাদেশে ধর্মসাধনা ভ্রষ্ট পথে পরিচালিত। বিশেষ করে তন্ত্রাচার ও দ্বৈতসাধনা। একজন অদ্বৈত সাধকরূপে তিনি মনে করতেন যে, অধ্যাত্ম উন্নতির লক্ষ্য হলো নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মের সঙ্গে সরাসরি মিলিত হওয়া। নির্বিকল্প সমাধি-ভাবের মধ্য দিয়েই সেটি পাওয়া সম্ভব। যেমনটি তিনি পেয়েছেন। এই সমাধিভাব অর্জনের পথ ভক্তি নয়, জ্ঞান। যিনি কর্মফল প্রদান করেন, সেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব তর্কের খাতিরে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিলেও এ কথা যথার্থ যে, প্রেম বা নিবেদন ছাড়াও তাঁর কাছে পেঁছানো যায়। তোতা তাই ব্রহ্ম ছাড়া অন্য দেবদেবী বা অবতার মানতেন না। জগন্মাতা কালী ও তাঁর শক্তি 'মায়া' তাঁর কাছে কোনো কৌতূহলই সঞ্চার করতে পারতো না। কালীঘরে যে দেবী-মূর্তি তিনি দেখেছিলেন সেটি তাঁর কাছে শুধুই মূর্তি; তাই অবজ্ঞা ও কুসংস্কার নিয়ে রামকৃষ্ণ যে কেমন করে অধ্যাত্ম সাধনে এতখানি এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন সেটিই তাঁর কাছে রহস্যময় মনে হতো। অবশ্য এসব কথা ব'লে যুবক রামকৃষ্ণকে আহত করার দায় নিতে তোতা চান নি কারণ তিনি জানতেন যেদিন থেকে রামকৃষ্ণ অদ্বৈতসাধনায় ব্রতী হবেন, সেদিন থেকে তিনি সবরকম কুসংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

অদ্বৈতসাধনায় যোগ্যতা অর্জন করতে হলে রামকৃষ্ণকে আনুষ্ঠানিক ভাবে তোতার কাছে সন্ন্যাস নিতে হবে; তাঁকে গুরু ব'লে মেনে নিতে হবে। যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করে মাথার চুল কেটে ব্রাহ্মণত্বের শেষ অহংকারটুকুও মুছে ফেলতে হবে। রামকৃষ্ণ সব শর্তগুলিই মানতে রাজী হলেও, দীক্ষা নেবার ব্যাপারটি গোপন রাখতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁ মানবী মা (চন্দ্রা) এসব কথা জানতে না পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো রামকৃষ্ণ কেন চন্দ্রার কাছে ব্যাপারটি গোপন রাখতে চেয়েছিলেন? চন্দ্রা আপত্তি করবেন? তাই যদি সত্য হয় তাহলে পাঠক অবাকই হবেন। একথা ঠিক যে বাহ্যানুষ্ঠান ক'রে সন্ন্যাস না নিলেও অনেক আগে থেকেই তো রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী! ভগবানকে পাবার জন্যে যা কিছু দরকার সবই তিনি করেছেন। বাকী ছিল শুধু অনুষ্ঠানটি পালন করা। তার জন্যই কি এই আপত্তির আশঙ্কা? এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সেকালে বাংলাদেশের সন্ন্যাসীরা সংসারে থাকতেন না। সংসার ত্যাগ করে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতেন, যা পেতেন খেতেন। সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে চন্দ্রার মনের আতঙ্কের কথা আমরা জানি। রামকৃষ্ণ যখন নেহাতই বালক তখনই সন্ন্যাসীরা তাঁকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার প্রলোভন দেখিয়েছিল। তোতার কাছে সন্ন্যাস নিয়েছেন শুনে চন্দ্রা পাছে ভেবে বসেন যে, তাঁর ছেলে সন্ন্যাস নিয়ে বিবাগী হবেন, তাই এই সাবধানতা। মায়ের প্রাণ তো! আসলে তাঁর মানবীমাকে অকারণ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই রামকৃষ্ণ যত্নবান হয়েছিলেন।

সুতরাং পঞ্চবটীতে ধুনি জ্বালিয়ে দীক্ষাদানের একটি অনুকূল ও শুভ মুহূর্তের জন্যে তোতা অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে সেই শুভ মুহূর্তটি এলো—দিন কয়েক পরেই এলো। সূর্যোদয়ের দুঘণ্টা পূর্বে ব্রাহ্মমূহূর্তে পঞ্চবটীর পূর্বদিকের একটি ছোট্ট চালাঘরে

রামকৃষ্ণকে দীক্ষা দিলেন তোতাপুরী। (চালাঘরটি আজও মন্দির চত্বরে অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে। চালাঘরের বর্তমান নাম ধ্যানঘর। ভক্তেরা এই ধ্যানঘরটিকে খুবই পবিত্র মনে করে।)

দীক্ষাগ্রহণ অনুষ্ঠানটি সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ যা বলেছেন তা এইরকম : 'দীক্ষা দিয়ে নাঙটা-বাবা আমাকে অদ্বৈতভাবের অনেক উপদেশ দিল। তারপর যাবতীয় সৃষ্টি থেকে মনকে সরিয়ে নির্বিকল্প আত্মধ্যানে নিমগ্ন হতে বলল। কিন্তু ধ্যানে বসেও মনকে নামরূপের গণ্ডি ছাড়াতে পারলাম না। সে নামরূপ আমার মনের মধ্যে ঠিকই ক্রিয়া করে যেতে লাগলো। অন্য সব সৃষ্টি ও প্রাণী থেকে মনকে সহজেই গুটিয়ে নিতে পারলাম; কিন্তু যতবারই তা করতে যাই ততবারই জগন্মাতার সেই পরিচিত চিদ্‌ঘনোজ্জ্বল শুদ্ধ মূর্তি যেন ঝলমল করে আমার মনে ফুটে উঠতে লাগলো। বারবার ওইভাবে ধ্যানমগ্ন হবার চেষ্টা করতে লাগলাম আর বারে বারে একই ঘটনা ঘটতে লাগলো। তখন নিরাশ হয়ে চক্ষুরুন্মীলন করে নাঙটাকে বললাম, "না, পারলাম না। মনকে নির্বিকল্প করে আত্মজ্ঞানে মগ্ন করতে পারলাম না।" নাঙটা তখন বিষম উত্তেজিত; আমাকে তিরস্কার করে বললো, "কেঁও হোগা নেহি ? জরুর হোগা।" এই ব'লে চালাঘরের আশপাশ দেখতে দেখতে ভাঙা এক কাঁচের টুকরো তুলে আনলো। তারপর কাঁচখণ্ডের সূচাগ্রভাগটি আমার দুই ভুরুর মধ্যে সজোরে ঢুকিয়ে দিয়ে বললো, "এবার এই বিন্দুতে মনকে গুটিয়ে আন্।" আবার ধ্যানে বসলাম কিন্তু মায়ের চিদ্‌ঘনমূর্তি মনে ভেসে ওঠামাত্র আমার অদ্বৈত জ্ঞানরূপ অসি দিয়ে মায়ের মূর্তি দ্বিখণ্ডিত করে ফেললাম। তখন মনে আর কোনো বিকল্প থাকলো না। একেবারে হু হু করে মন এমন এক মার্গে উঠে গেল যেখানে কোনো বিকল্প নেই—সমস্তই একীভূত।'

এই প্রথম মনকে নির্বিকল্প ক'রে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। মন নির্বিকল্প হলে জ্ঞান ও ও জ্ঞানীর মধ্যে ভেদ থাকে না। আত্মাই ব্রহ্ম—ব্রহ্মজ্ঞান হলে আত্মভাবের সামান্য লক্ষণও থাকে না। নিম্নভূমিতে সমাধিস্থ হলে এই একাত্মবোধ যে হয় না, সে অভিজ্ঞতা রামকৃষ্ণের পূর্বেও হয়েছিল। রামকৃষ্ণ জানতেন যে, জগন্মাতা কালী ও পরম ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ নেই। কিন্তু জগন্মাতার প্রতি প্রবল অপার্থিব প্রেম তাঁর উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। তখন তিনি ভাবতেন কালীকে ব্রহ্মস্বরূপিনী মনে করা আর তাঁকে নিহত করা সমার্থক। তাই জ্ঞানকে তিনি খড়্গ কল্পনা করার কথা বলতেন। জগন্মাতা কালীর প্রতি প্রেমই ছিল তাঁর দ্বৈতভাবের শেষ অস্তিত্ব। তিনি জানতেন, যেদিন এই বাধাটুকু কাটাতে পারবেন সেদিন ব্রহ্মসত্তার সঙ্গে মিলনে আর কোনো বাধা থাকবে না।

অদ্বৈতবাদের যে সাধনায় তোতাপুরী নির্বিকল্প সমাধিভূমিতে পৌঁছেছিলেন, সে সাধনা জ্ঞানমার্গের—নেতি নেতির সাধনা একে একে নাম ও সীমারূপের বন্ধন কাটিয়ে ব্রহ্মস্বরূপে উপনীত হবার সাধনা। এহ বাহ্য আগে কহ বা ! দ্বৈতবাদীর ভক্তিভাব তোতার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো না। সব রকম ভক্তিবাদ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল শীতল। এবং এইভাবেই তার অনেক পূর্বসূরীদের মতন তিনিও প্রমাণ করে গেছেন যে, অধ্যাত্ম অভি-জ্ঞতার সর্বোচ্চ ভূমিতে পৌঁছাবার জন্যে ভক্তির পথ অপরিহার্য নয় এবং একমাত্রও নয়।

অবশ্য একথা ঠিক যে জ্ঞানমার্গের সাধনা সকলের জন্যে নয়। কিন্তু ভক্তির পথ সকলের

জন্যে অবারিত। রামকৃষ্ণই একমাত্র আদর্শ সাধক যিনি প্রমাণ করে গেছেন যে, ভক্তির হাত ধরেও ব্রহ্মসত্তার সঙ্গে মিলিত হতে পারা যায়। ভক্তির পথ অনেক সহজ অনেক নির্বিঘ্ন। কিন্তু জ্ঞানের পথ সকলের উপযোগী নয়। তীব্র মনোবল আর দৃঢ় আত্মসংযম না থাকলে সাধক এ পথে সার্থক হতে পারেন না। সব থেকে বড় কথা; 'নেতি নেতির' সাধনায়, কখন যে চোরা পথে অহংবোধ আর দম্ভ ঢুকে পড়ে তা জানা যায় না। হয়ত সেইজন্যেই দ্বৈত-সাধনার পথটি ধরেই অদ্বৈতভূমির দোরগোড়ায় উপনীত হবার সন্ধানটি রামকৃষ্ণ সকলকে জানিয়ে যান।

রামকৃষ্ণের বাহ্যজ্ঞান পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়েছে দেখে তোতা অনেকক্ষণ তাঁর পাশটিতে বসে থাকলেন। পরে ঘর থেকে বাইরে এসে তালা লাগিয়ে দিলেন যাতে রামকৃষ্ণকে কেউ বিরক্ত করতে না পাবে। শেষে পঞ্চবটীতলে নিজের আসনে বসে রামকৃষ্ণের আহ্বানের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দিন গেল, রাত গেল—এমনিভাবে পরপর দু'দিন দু'রাত কেটে গেল। কিন্তু ঘর খুলে দেবার ডাক এলো না। তিনদিনের শেষে তোতা নিজেই ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। আশ্চর্য! ঠিক যেমনটি দেখে গিয়েছিলেন সেইভাবেই রামকৃষ্ণ ধ্যাননিমগ্ন; দেহে প্রাণের সাড়া নেই, শুধু মুখখানি অদ্ভুত জ্যোতিঃপূর্ণ! তোতা স্তম্ভিত। আপন মনেই বলে উঠলেন, 'য়হ ক্যা দৈবী মায়া!' যেটি লাভ করতে আমায় কয়েক বছর ধরে কঠিন সাধনা করতে হয়েছে, যুবক রামকৃষ্ণ সেটি একদিনে পেয়ে গেলেন! দেবতার এ কি মায়া! এ কি সত্যিকারের নির্বিকল্প? তন্নতন্ন করে দেখতে লাগলেন তোতা। হৃদস্পন্দন হচ্ছে কিনা, নিশ্বাস পড়ছে কিনা! সন্দেহমুক্ত হবার পর রামকৃষ্ণকে সমাধিভাব থেকে ব্যুত্থিত করতে সুগভীর স্বরে বার বার 'হরি ওঁম্' মন্ত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন। অবশেষে রামকৃষ্ণের উত্থান হলো। চোখ চেয়ে দেখলেন সামনেই দাঁড়িয়ে তোতা, তাঁর নতুন গুরু। গুরুর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লেন রামকৃষ্ণ! তোতাও অভিভূত। শিষ্য প্রেমে মুগ্ধ তোতা গভীর শ্রদ্ধায় রামকৃষ্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সেদিন তাঁর এত আনন্দ হয়েছিল যে সংকল্প ভেঙে দক্ষিণেশ্বরেই বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দেবেন ঠিক করলেন।

রামকৃষ্ণ ও তোতার ব্যক্তিত্ব ছিল দুই মেরুর মতন বিপরীত। কখনও বা এই বৈপরীত্য বেশ কৌতুককর পরিণতি নিত। ভ্রমবশতঃ তোতা মনে করতেন যে, বেদান্তে দীক্ষা পাবার পর রামকৃষ্ণের দ্বৈতবিশ্বাসগুলি নড়বড়ে হয়ে গেছে। কিন্তু ফলত তা হয় নি। নির্বিকল্প আত্মধ্যানের পরেও কালী ও কৃষ্ণের ভজনা থেকে রামকৃষ্ণ সরে আসতে পারেন নি। ছেলে-বেলা থেকেই তিনি সকাল সন্ধ্যায় হাততালি দিয়ে ভাবে বিভোর অবস্থায় নেচে নেচে হরিনাম করতেন। একদিন ওইভাবে শ্রীহরির স্মরণ-মনন করছেন; কাছেই ছিলেন তোতা। রামকৃষ্ণকে অমনভাবে উদ্দাম আচরণ করতে দেখে বিদ্রূপ করে বললেন, 'ক্যারে! রোটী ঠোক্‌তে হো?' তোতার বিদ্রূপ শুনে রামকৃষ্ণ হাসলেন বটে কিন্তু এই ঔদ্ধত্যের জন্যে তাঁকে তিরস্কারও করলেন। সেই থেকে রামকৃষ্ণের ভক্তি নিয়ে তোতা আর কখনও বিদ্রূপ করেন নি।

প্রতিদিন তোতা তাঁর ঘটি ও চিমটাটি অনেকক্ষণ ধরে মাজতেন যাতে সেগুলি চকচকে

থাকে। আবার অনেকক্ষণ ধরে ধ্যানও করতেন। একদিন রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি তো ব্রহ্মজ্ঞ ; তাহলে আবার রোজ ধ্যানে বসা কেন ?' চকচকে ঘটিটির দিকে রামকৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তোতা বললেন, 'দ্যাখ্, ওঠা কেমন চকচক করছে ! রোজ মাজি ঘষি তাই কলঙ্ক পড়ে না। মনও তেমনি। সর্বদা সাধুসঙ্গ না করলে মনেও কলঙ্ক পড়বে।' 'কিন্তু ঘটিটি যদি সোনার হতো ? তাহলেও কি রোজ মাজতেন ?' তোতা নিরুত্তর।

তোতার নির্ভীকতা নিয়ে রামকৃষ্ণ একটি ভুতুড়ে ঘটনার কথা প্রায়ই বলতেন। একদিন গভীর রাতে পঞ্চবটীতে ধুনি জেলে তোতা ধ্যানে বসবার উপক্রম করছেন। জগৎ নীরব নিস্তব্ধ। মন্দির চূড়া থেকে শুধু পেঁচাব ডাক সেই গভীর নৈঃশব্দ ভঙ্গ করছিল। কোথাও এতটুকু বাতাস ছিল না। হঠাৎ পঞ্চবটীর গাছের শাখাগুলি আলোড়িত হতে লাগল এবং একজন লম্বা মানুষ গাছের উপর থেকে নেমে, তোতা যেখানে ধুনি জেলে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে এসে দাঁড়ালো। তারপর তোতার দিকে স্থির চোখে দেখতে দেখতে ধুনির পাশে এসে বসলো। তোতার মতন সেও সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আগন্তুককে তোতা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে ?' পুরুষটি বললো, 'আমি দেবযোনি, ভৈরব। এই দেবস্থান রক্ষা করবার জন্যে আমি এই গাছের ওপর থাকি।' তার কথা শুনে তোতা নির্ভীক ভাবে বললেন, 'ভালই তো ! তুমি যা আমিও তাই। তুমিও ব্রহ্মের প্রকাশ আমিও তাই। এস বসো ; আমরা দুজনেই ধ্যান করি।' দেবযোনি কিন্তু সে কথা শুনে হা হা করে হেসে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। তোতা কিন্তু একটুও বিচলিত না হয়ে ধ্যানে বসে গেলেন, যেন কিছুই হয় নি। পরদিন রামকৃষ্ণকে ওই ঘটনার কথা জানালেন। সব শুনে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, ওখানে উনি থাকেন বটে। আমিও অনেকবার ওঁর দর্শন পেয়েছি। কখনও কখনও উনি ভবিষ্যতের কথাও বলে দিয়েছেন। বারুদখানা গড়বার জন্যে কোম্পানি (ইংরাজ শাসক) একবার পঞ্চবটীর সমস্ত জমি কিনে নেবার চেষ্টা করছিল। ওঁর মুখে সে কথা শুনে আমার বিষম ভাবনা হলো। নির্জন পঞ্চবটীতে মাকে ডাকি—তা বুঝি হবার নয়। মথুর রাণীর তরফে কোম্পানির নামে মামলা লাগিয়ে দিলে, যাতে তারা জমিটি না নিতে পারে। সেই সময় একদিন ওই ভৈরবকে গাছে বসে থাকতে দেখেছিলুম। আমায় দেখে ইঙ্গিতে বললে, "ভয় নেই ; ওরা মামলায় হেরে যাবে। জায়গা নিতে পারবে না।" বাস্তবিক তাই হয়েছিল।'

আর একবারের ঘটনা। তোতা ও রামকৃষ্ণ ধুনির পাশে বসে অদ্বৈতদর্শন নিয়ে উচ্চভাবের আলোচনা করছিলেন। বেদান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তোতা বললেন যে ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা ; যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তাঁর কাছে পরিদৃশ্যমান যা কিছু সব মিথ্যা, সব মায়া। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। মায়ার যে কোনো প্রভাব আছে তোতা তা মানতেন না। রামকৃষ্ণ অবশ্য তোতার যুক্তি কখনও স্বীকার করে নেন নি। মায়ার বিপুল শক্তি আর প্রভাব কে অস্বীকার করবে ! যাক, এসব নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, তখন মন্দিরের একজন চাকর সেখানে এলো। কল্‌কেতে তামাক সেজে তাতে আগুন ধরাতে ধুনির একখানা জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিতে গেল। হঠাৎ তা দেখতে পেয়ে তোতা রেগে আগুন। লোকটাকে অর্বাচীন ব'লে গালাগালি তো দিলেনই ; আবার চিমটা নিয়ে মারতে তাড়া করলেন। দেখে শুনে লোকটা পালাল বটে কিন্তু রামকৃষ্ণ হেসে গড়াগড়ি। রামকৃষ্ণকে হাসতে দেখে তোতা অবাক। বললেন, 'তুই যে বড় হাসছিস ?

লোকটার ধৃষ্টতা দেখতে পাস নি ?' হাসতে হাসতেই রামকৃষ্ণ বললেন, 'নিশ্চয়ই দেখেচি। সেই সঙ্গে আপনার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়টাও দেখ্‌চি। এই তো মুখে বললেন ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তা নেই। সবই ব্রহ্মের প্রকাশ। আর মায়া, মিথ্যে! বলেন নি!' তোতা নিরুত্তর। রামকৃষ্ণ বলে চললেন, 'আবার পরক্ষণেই দেখলুম সব ভুলে ব্রহ্মের প্রকাশ মানুষকেই মারতে গেলেন ? তবেই বুঝুন! মায়ার কি প্রভাব!' স্তম্ভিত তোতা চুপ করে শুনলেন। পরে বললেন, 'ঠিক বলেছিস। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সব ভুলে গিয়েছিলুম। ক্রোধ বড় পাজী। আজ থেকে আর ক্রোধ করবো না।' শোনা যায় সেদিনের ঘটনার পর আর কেউ তোতাকে কখনও রাগতে দেখে নি।

তোতার শক্ত মজবুত ধাত, রোগ ব্যাধির বালাই ছিল না। ফলে নিবিড় ধ্যানের সময় তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য হতো না। কিন্তু বাংলাদেশের জল বাতাসের প্রভাবে মাস কয়েক যেতে না যেতেই কঠিন রক্ত-আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে! ব্যাধিগ্রস্ত হবার কিছুদিনের মধ্যেই তোতার ব্রহ্মনিষ্ঠ মন দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে যাবার ইঙ্গিত দিয়েছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণের আনন্দময় সঙ্গ ছেড়ে কি ক'রে যান! যতবার ভেবেছেন রামকৃষ্ণকে বিদায় জানিয়ে চলে যাবেন, ততবারই দু'জনে দু'জনের সাক্ষাতের জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন। সাক্ষাৎ হলে এমনভাবে সৎ প্রসঙ্গ আলোচনায় মেতে উঠেছেন যে, বিদায় নেবার কথা মনেই হয় নি। সুতরাং যত দিন যেতে লাগল ততই যেন শরীর দুর্বল ও রোগ কঠিন হয়ে দাঁড়াল। রামকৃষ্ণ অবশ্য মথুরের সাহায্যে তোতার ঔষধ পথ্যের নিয়মিত ব্যবস্থাই করতেন কিন্তু রোগের নিবারণ হয় নি।

তোতা সদাই ভাবতেন যে ব্রহ্মচেতনার পথে শরীর যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে তাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়। এমনি যখন মনের ভাব, তখন একদিন রাত্রে পঞ্চবটীবনে দারুণ পেটের যন্ত্রণায় তোতা অস্থির হয়ে পড়লেন। কিছুতেই মনকে শরীর থেকে গুটিয়ে এনে ধ্যানে নিমগ্ন করতে পারছিলেন না। হাড়মাসের খাঁচা এই দেহের জ্বালায় মন যখন কিছুতেই বশে থাকে না, তখন মনে মনে স্থির করলেন সব উৎপাতের মূল এই দেহটি আর রাখবেন না। গঙ্গার জলে বিসর্জন দেবেন।

(খ্রীস্টধর্মের মতন হিন্দু ধর্মেও আত্মহনন পাপ ব'লে ধিকৃত হয়েছে। হিন্দুধর্ম বলে যে বহুবহু অন্ত্যজ কুলে জন্মের কর্মফল জোড়া দিলে তবে মনুষ্য দেহের অধিকারী হওয়া যায়। কারণ, একমাত্র মানব দেহধারীরাই জীবনব্যাপী সাধনা করে ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। সুতরাং অত্মহননের অর্থ হলো অধ্যাত্মসাধনার ক্রমোন্নতি নিষ্ফল করে দেওয়া। ফলে অন্ত্যজ কুলে পুনর্জন্ম তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তমূলক আরও কঠিন কোনো ব্যবস্থা, যেমন রৌরবগমন ইত্যাদির মধ্যেও দীর্ঘদিন পতিত থাকতে হয়।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান যাঁর সম্পূর্ণ তাঁর ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত দেহনাশ আত্মহননরূপ পাপাচার নয়। কারণ তাঁর দেহধারণের উদ্দেশ্য ইতিমধ্যেই সফল হয়েছে। অতএব তোতাপুরীর দেহনাশের বাসনা আত্মহত্যা ব'লে ধর্মে নিন্দিত হয় না।)

এইসব ভেবে ব্রহ্মসত্তায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তোতা ধীরে ধীরে জলে নামলেন। কিন্তু এগিয়ে গিয়েও ডুব জল পেলেন না। (পরবর্তীকালে এই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে রামকৃষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন যে, সেদিন তোতা হয়ত জলের ঠিক তলায় দৃষ্টির আড়ালে কোনো চড়ার

উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে করেছিলেন যে পরপারে পৌঁছে গেছেন)। তোতা হেঁটেই চলেছেন। একসময় অপর পারের গাছপালা বাড়ি ঘরদোর সব যেন অস্পষ্ট ছায়ার মতন চোখের ওপর ভেসে উঠল। তখন এক উজ্জ্বল চোখধাঁধানো আলোয় তাঁর মনের আঁধার কেটে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন দৈবী মায়ার কি বিশ্বব্যাপী প্রভাব! গম্ভীর আরবে তোতা চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'মা মা বিশ্বজননী, অচিন্ত্যশক্তিরূপিণী মা! তুমিই সব! তুমি না চাইলে মরবারও সামর্থ্য কারো নেই!' জীবনে সেই প্রথম জগন্মাতার প্রতি ভক্তি ভালবাসায় তাঁর হৃদয় ছেয়ে গেল। তোতা ধীরে ধীরে আবার পঞ্চবটীতলে ফিরে এলেন, তারপর ধুনির পাশে বসে রাতটুকু কাটিয়ে দিলেন।

ভোর না হতেই তোতার কুশল জানতে এসে রামকৃষ্ণ অবাক হয়ে দেখলন যেন তিনি একেবারে অন্য মানুষ। দিব্য আনন্দে মুখখানি উদ্ভাসিত। কোথাও রোগযাতনার এতটুকু লক্ষণ নেই। রামকৃষ্ণকে দেখে একমুখ হেসে তোতা তাঁকে পাশে বসালেন তারপর বললেন, 'রোগই আমার বন্ধুর কাজ করেছে। হায় রে! এতদিন আমি কতই না অজ্ঞ ছিলাম!' তখন ধীরে ধীরে ভোর হচ্ছে—প্রভাতী সুর ভেসে আসছে নহবৎখানা থেকে। রামকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে দেবী দর্শন করতে তোতা কালীঘরে ঢুকলেন। সেই তাঁর প্রথম দেবী দর্শন। মায়ের মূর্তির সামনে সটান লুটিয়ে পড়লেন তোতা।

তোতা বুঝেছিলেন, এইভাবে দক্ষিণেশ্বরে টেনে এনে মা ভবতারিণী তাঁকে দিয়ে দু'ভাবে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করালেন। ক'টা দিন পরেই রামকৃষ্ণের কাছে বিদায় নিয়ে আবার কোন্ এক অনির্দেশের পথে পাড়ি দিলেন তোতা। এসেছিলেন তিনদিনের জন্যে, থেকে গেলেন এগারো মাস।

দক্ষিণেশ্বরে আর কখনও তিনি ফিরে আসেন নি।

দক্ষিণেশ্বব থেকে তোতার বিদায়ের পর রামকৃষ্ণ স্থির করলেন যে, অন্তত ছ'মাস নির্বিকল্প মনে সমাধিস্থ থাকবেন। পরে তিনি বলেছিলেন, 'ছ'মাস ধরে আমি এমন সমাধিভাবের মধ্যে ছিলাম যা থেকে সাধারণ মানুষ ফিরতে পারে না। সাধারণত, মানুষের শরীর অমন অবস্থায় একুশ দিন অব্দি অবিকল থাকতে পারে, তারপর শুকনো পাতার মতন দেহটি খসে পড়ে। কখন দিনরাত্রি এলো সময়ের সে জ্ঞান থাকে না। মড়া মানুষের নাক-মুখের মধ্যে যেমন মাছি ঢোকে তেমনি আমারও ঢুকতো। সেই সময় একজন পুণ্যাত্মা দক্ষিণেশ্বরে এলেন। তাঁর হাতে একটি ছোট্ট ছড়ি থাকতো। তিনি আমার অবস্থা দেখেই বুঝেছিলেন। তাই ছড়িটি দিয়ে মাঝেমাঝে আমার দেহটি ঝাঁকাতেন যাতে আমার ভাবভঙ্গ হয়। যখনই দেখতেন আমার ভাবভঙ্গ হয়েছে, তখনই মুখে খানিকটা খাবার গুঁজে দিতেন। এইভাবে খানিকটা খাবার আমার পেটে যেত, আবার কখনও বা কিছুই ঢুকতো না।'

শেষমেশ আমার ওই সমাধিভাবের অন্ত হলো মায়ের দর্শন পেয়ে। মা আদেশ দিলেন 'ভাবমুখে থাক্'! কারণ ধর্মগ্লানি দূর ক'রে লোকহিতসাধনের জন্যেই রামকৃষ্ণের দেহ ধারণ; সুতরাং সমাধিভাবের নিভৃতে তিনি হারিয়ে যেতে পারেন না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু জগতের সঙ্গে যখন 'নিখিল-মনে'র মধ্যে দিয়ে চেনাজানা হয়, ব্যক্তি যখন আত্মাভিমান বা ছোট আমিত্ব ছেড়ে বিশ্বগত-আমিত্বের সঙ্গে এক হয়ে যায়, সেই একাকার অবস্থা হলো

'ভাবমুখ'। সাধারণ মানুষ এই অবস্থা কল্পনা করতে পারে না ; রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'ওটা শেষকালের কথা।' সুতরাং অতি সরল ক'রে ভাবটি সকলকে বোঝাবার চেষ্টা না ক'রে বরং বলি যে, বস্তুজগতে বাস করেও রামকৃষ্ণ নিজেকে বিরাট ব্রহ্মের অংশরূপে প্রত্যক্ষ করতেন।

মনের নির্বিকল্প সমাধিভাব থেকে রামকৃষ্ণ যে বিশেষ শিক্ষাটি লাভ করেছিলেন, সেটি হলো পরমতসহিষ্ণুতা। ভগবানকে জানার জন্যে যে কোনো ধর্মাবলম্বী মানুষ বা শ্রেণীর যে কোনো সাধনাই তিনি সহানুভূতির চোখে দেখতেন। সেই সময় নাগাদ গোবিন্দ রায় নামে একজন ক্ষাত্রিয় হিন্দু দক্ষিণেশ্বরে এলেন। হিন্দু সাধক গোবিন্দ নানা ধর্মের মতপথ অনুসন্ধান ক'রে, অবশেষে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও, এর সামাজিক আচারবিচারগুলি তিনি কতদূর পালন করতেন তা বলা শক্ত। তবে একথা ঠিক যে, সুফী মতের সাধনভজনে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল।

রাসমণি চেয়েছিলেন তাঁর দক্ষিণেশ্বর হয়ে উঠুক সর্বধর্মের সাধনভূমি। সংসারত্যাগী যে কোনো সাধক, তিনি হিন্দু বা মুসলমান যাই হোন না কেন, তাঁদের সকলের জন্যে দক্ষিণেশ্বর ছিল অবারিত-দ্বার। সবাই ঠাঁই পেতেন সবাই আহার পেতেন। তাই সুফী গোবিন্দও পঞ্চবটীর শান্তিপ্রদ বৃক্ষছায়ার উদার পরিবেশে তাঁর সাধনার আসনখানি বিছিয়ে দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ প্রায়ই আলাপ করতে আসতেন। গোবিন্দের গভীর ঈশ্বরপ্রেম দেখে তিনি মুগ্ধ ; মনে মনে ভাবতেন, 'ভগবানকে জানার এও তো এক পথ!' আরও ভাবতেন, 'লীলাময়ী মা তো কত ভক্তকেই এই পথে দেখা দিয়ে ধন্য করেছেন! তবে আমিও না হয় এই মতেই সাধন-ভজন করি!'

রামকৃষ্ণের অনুরোধে গোবিন্দই তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। দীক্ষার পরে, রামকৃষ্ণ বলতেন, 'আল্লামন্ত্র জপ করতাম। আরব মুসলমানদের মতন কাছা খুলে কাপড় পরতাম। দিনে পাঁচবার নমাজ পড়তাম। তখন মন থেকে হিন্দুভাব সম্পূর্ণ চলে গিয়েছিল। এমনকি হিন্দু দেবদেবীদের মূর্তি দর্শন করতেও প্রবৃত্তি হতো না। ওইভাবে তিন-দিন কেটে যাবার পর ইসলাম ধর্মের সাধনফল সম্যক উপলব্ধি হয়েছিল।' সাধনকালে একজন দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট জ্যোতির্ময় পুরুষ মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণকে দর্শন দিয়ে ধন্য করতেন। সেই জ্যোতির্ময় মূর্তি সগুণ ঈশ্বরে লীন হয়ে যান ; পরে সগুণ ঈশ্বর ও নির্গুণ ব্রহ্ম একাকার হয়ে গিয়েছিল।

হৃদয় বলতো যে, রামকৃষ্ণ যখন ইসলাম মতে সাধনা করতেন, তখন মুসলমানদের খাদ্য খেতে চাইতেন। অথচ মুসলমানদের খাদ্য তালিকায় গো-মাংস অপরিহার্য। মথুর তাই তাঁকে এ ব্যাপারে জিদ না করতে অনুরোধ করতেন। শেষপর্যন্ত রফা হলো যে, একজন মুসলমান পাচক আনা হবে এবং কালীবাড়ির হিন্দু পাচককে সে মুসলমানী খাদ্য রন্ধনে সাহায্য করবে। ইসলামমতে সাধনার সময় রামকৃষ্ণ একদিনও কালীমন্দিরের চত্বরে ঢোকেন নি। সে সময় তিনি নিজের ঘরেও থাকতেন না। রাত্রে শুতে যেতেন মথুরের কুঠিতে।

রামকৃষ্ণের ইসলাম ধর্ম সাধনের মধ্যে সারদানন্দ এক বিশেষ তাৎপর্য লক্ষ্য করেছিলেন। সারদানন্দের বিশ্বাস, এই সাধনার দৃষ্টান্ত দিয়ে রামকৃষ্ণ বলতে চেয়েছিলেন যে, অদ্বৈতবাদী বেদান্তই হলো সর্বধর্মের যোগসূত্র। ধর্মানুরাগী কিছু কিছু উদার মানুষের ধারণা যে,

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও জাতির মধ্যে বিভেদ সামান্যই। কিন্তু তাঁদের এমন ধারণার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। বিভেদ অবশ্যই আছে এবং সে বিভেদ পর্বতপ্রমাণ। অবশ্য এই বিভেদের অস্তিত্ব তলার দিকে। মিলও আছে ; কিন্তু এই মিলটুকু খুঁজতে আরও গভীরে যেতে হবে—পেঁছাতে হবে সর্বব্যাপী ব্রহ্মসত্তার নিবিড়ে।

রক্তামাশয় থেকে রামকৃষ্ণ সবে নীরোগ হয়েছেন ; কিন্তু দেহটি বেশ কাহিল। তার ওপর নতুন আশঙ্কা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব শরীরটিকে আবার না রোগগ্রস্ত ক'রে তোলে! বর্ষা আসন্ন ; তখন গঙ্গার জলে লোনা স্বাদ হবে। সে জল পান করার অযোগ্য। সুতরাং স্থির হলো যে বর্ষার ক'টি মাস রামকৃষ্ণ কামারপুকুরে গিয়ে থাকবেন। সেই ব্যবস্থাই হলো। সঙ্গে গেলেন ভৈরবী আর হৃদয়। সেটি ১৮৬৭ সালের মে মাস। চন্দ্রা দক্ষিণেশ্বরেই থেকে গেলেন। জীবনের শেষ ক'টি দিন গঙ্গাতীরে বাস ক'রে বৃদ্ধা যে সান্ত্বনা পেয়েছেন তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইলেন না।

কামারপুকুরে শেষবার এসেছিলেন সাতবছর আগে, ১৮৬০ সালে। মধ্যে আর আসতে পারেন নি। এই ক'বছরে গ্রামবাসীরা মনের দিক থেকে অনেক বদলেছে। সেবার তারা রামকৃষ্ণের মধ্যে সন্ন্যাসী ভাবটি দেখে বেশ শঙ্কিত হয়েছিল। সেই থেকে ক্রমাগত আরও কত কি গুজব তারা শুনে আসছে। রীতিমত ভীতিপ্রদ সেসব গুজব। রামকৃষ্ণ নাকি কাপড়চোপড়ে সারাক্ষণ মেয়ে সেজে থাকেন, তিনি নাকি মুসলমান হয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি! কিন্তু চাক্ষুষ দেখে তেমন কিছু মনে হলো না। অবশ্য রামকৃষ্ণ তখন তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির লক্ষণ স্বরূপ এমন এক দেহজ্যোতিঃ দ্বারা মণ্ডিত থাকতেন যে, সাধারণ মানুষ তাঁর কাছে যেতে সংকোচ করতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণের সপ্রেম অন্তরঙ্গতা গ্রামের মানুষকে তাঁর বুকের কাছটিতে টেনে এনেছিল।

রামকৃষ্ণ এসেছেন। বাড়ির মেয়েরা লোক পাঠিয়ে জয়রামবাটী থেকে সারদাদেবীকে আনিয়ে নিলেন। সারদা তখন তেরো বছরের কিশোরী। রামকৃষ্ণ তাঁকে যত্ন করে হাত ধরে গৃহকর্ম, স্ত্রীধর্ম শেখাতে লাগলেন, ঠিক যেমনটি মথুরের অন্তঃপুরের মেয়েদের শিখিয়েছিলেন। সারদাদেবীও যেন এতদিনে তাঁর এই অসাধারণ স্বামীটিকে ঠিকমতন বুঝতে পেরেছেন, তাই স্বামীসঙ্গ লাভ ক'রে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন।

শুধু ভৈরবীরই যেন কিছুই পছন্দ হচ্ছিল না। দুঃখজনক হলেও এই আশ্চর্য রমণীটির মধ্যে সাময়িক এক বদলের কাজ হচ্ছিল। বোধহয় দক্ষিণেশ্বরে তোতাপুরীর আগমনের সময় থেকেই এই বদল চলছিল। ভৈরবীর আধ্যাত্মিক উন্নতি যথেষ্ট হলেও অদ্বৈততত্ত্ব বিচারের ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাই তোতার কাছে দীক্ষা নিতে রামকৃষ্ণকে তিনি সরাসরি বারণ করে দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণকে সাবধান করে বলেছিলেন, 'শোনো বাবা, অত ঘনঘন ওর কাছে যেও না ; ওর পথ তোমার পথ এক নয়। ওর পথ শুকনো সন্ন্যাসীর পথ। ওপথে গেলে তোমার ভক্তিরস শুকিয়ে যাবে।' হয়ত ভালো হবে মনে করেই ভৈরবী কথাগুলি বলেছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক যে, তাঁর মন তখন ঈর্ষা আর অধিকারবোধের অহঙ্কারে কাতর। তিনি ছাড়া রামকৃষ্ণকে আর কেউ শিক্ষা দিক, এ যেন সইতে পারছিলেন না ভৈরবী।

কামারপুকুরে এসে ভৈরবী প্রকাশ্যেই প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন যে, সুন্দরী যুবতী

বধূর সঙ্গে অত ঘনিষ্ট মেলামেশায় রামকৃষ্ণের সংযম হানি হচ্ছে। এক সময় তোতার বিরুদ্ধেও ভৈরবী প্রচার করতেন; তখনও রামকৃষ্ণ আমল দেন নি—এবারও দিলেন না। এই অবজ্ঞাটিই ভৈরবীর ক্রোধানল হুহু ক'রে বাড়িয়ে দিল। নিজেকে আর চেপে রাখতে পারলেন না তিনি। রামকৃষ্ণের কাছে যারা আধ্যাত্মিক উপদেশ নিতে আসতো তাদের কাছে বেহায়ার মতন বলতেন, 'ও আবার কি বলবে? ওর চোখ তো আমিই খুলিয়েছি!' বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে অযথা নির্মম ব্যবহার করতেন; যেন সংসারের তিনিই কর্ত্রী। রামকৃষ্ণ চুপ করে থাকতেন; আগের মতই ভৈরবীকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। এমনকি সারদাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি যেন শাশুড়ির মতন ভৈরবীকে সেবাযত্ন করেন।

কিন্তু অনর্থ ঘটলো। তুচ্ছ অথচ খুবই জটিল একটি কারণ—জাতপাঁতের একটি ঘটনা নিয়ে একদিন তুমুল কলহ বেধে গেল ভৈরবী আর হৃদয়ের মধ্যে। ঘটনাটি কিন্তু এতই তুচ্ছ যে তার উল্লেখও অবান্তর। অথচ সেদিন ভৈরবী রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যধন্য হৃদয়ের উপর ক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। অনেক শাপমন্যি অনেক কুবাক্য ব'লে, ঈর্ষাবিষে জরজর ফণিনীর মতন সবটুকু বিষ উদ্গিরণ ক'রে, তবে শান্ত হয়েছিলেন ভৈরবী। মন শান্ত হলে অনুতাপ-দগ্ধা ভৈরবী অবতাররূপী রামকৃষ্ণকে মনোহর বেশে সাজাতে বসলেন। চোখে জল, মুখে হাসি—সে এক আশ্চর্য মহিমময় রূপ ভৈরবীর! ফুলের মালা আর চন্দনবাটা দিয়ে মনের মতো সাজিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণকে। সাজানো শেষ হলে অবতাররূপী ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লেন ভৈরবী।

রামকৃষ্ণ তাঁকে মুক্ত মনে ক্ষমা করলেন। তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে ভৈরবী গিয়ে পৌঁছলেন কাশীধাম এবং সেখানে থাকতে থাকতেই ভগবদ্ আরাধনার শীর্ষলোকে চলে গেলেন।

১১

মথুর

দুর্গোৎসবের সময় সখীভাবধারী রামকৃষ্ণকে মথুর যে চিনতে পারেন নি সে কথা বলেছি। মথুরের জানবাজারের বাড়িতে দুর্গোৎসবের সময় এই ঘটনাটি ঘটে, ১৮৬৪ সালে। এই অধ্যায়ে মথুরের অবিচল ভক্তি-বিশ্বাসের একটি দৃষ্টান্ত দিতে আবার সেই দুর্গোৎসবের ঘটনাতেই ফিরে যাচ্ছি। রামকৃষ্ণের একই অঙ্গে মথুর যেদিন ভবতারিণী আর শিবকে দর্শন করেছিলেন, সেদিন থেকেই রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর বিশ্বাস আর ভক্তি দৃঢ় হয়ে ওঠে। অষ্টম অধ্যায়ে সে কাহিনী বর্ণনা করেছি।

দুর্গোৎসবের সময়সীমা পাঁচ দিন। পঞ্চম বা শেষ দিনে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। হিন্দুর পূজাবিধিতে দু'রকমের মূর্তিপূজার রীতি আছে। কখনো শ্বেতপাথর বা অন্য কোনো মজবুত পাথর দিয়ে মূর্তি গড়া হয় এবং সে মূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁর নিত্যপূজাদি করা হয়; কখনো বা নির্দিষ্ট কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষ ক'রে মাটির প্রতিমা গড়ে তাঁর পূজা করা হয়। শেষোক্ত বিধিমতে পূজান্তে মৃন্ময়প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করতে হয়।

দু'রকমের পূজাবিধিই সমান পবিত্র। সাময়িক পূজাবিধিতেও মৃন্ময়মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়; তারপর বিসর্জনের আগে পূজারী সেই প্রাণ ফিরিয়ে নেন। নিয়মটি শাস্ত্র-সম্মত হ'লেও সর্বক্ষেত্রে এই বিধান সুফল দান করে না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই পূজারীকে দৈহিক ও মানসিক যাতনা সইতে হয়। ব্যাপারটি খুলেই বলি। মৃন্ময়মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর পূজারী তাঁর ভক্তিটুকুও নিবেদন করেন; তখন মূর্তি জীবিত হন এবং পূজারীর হৃদয়ের সঙ্গে এক হ'য়ে যান। বিসর্জনের সময় যখন প্রাণটুকু পৃথক করার প্রয়োজন হয় তখন অসহ্য ঈশ্বরবিরহের যাতনায় পূজারী অশেষ ক্লেশ পান।

বিসর্জনের দিন মথুরের মানসিক অবস্থাও ঠিক এমনি উদ্বেগপূর্ণ হয়েছিল। বিজয়া-দশমীর দিন মা-র বিসর্জনের জন্য পুরোহিতেরা যখন মথুরকে ডেকে পাঠালেন, তখন আসন্ন বিয়োগব্যথায় মথুর প্রথমে কাতর হয়ে পড়েন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবান্তর কাটিয়ে উত্তেজিত হ'য়ে আদেশ দিলেন, পূজাঙ্গন থেকে যেন মায়ের মূর্তি সরানো না হয়। হুকুম জারি ক'রে এও জানিয়ে দিলেন, যেন মায়ের নিত্যপূজার ব্যবস্থা করা হয় এবং আদেশ ঠিক মতো পালিত হয়। অন্যথায় খুনোখুনি পর্যন্ত হ'তে পারে।

এমন হটকারী আদেশ পেয়ে পুরোহিতেরা অবাক; পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন—একি অর্বাচীন আজ্ঞা! রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছিল এবারও যেন তারই পুনরাবৃত্তি ঘটলো। অর্থাৎ সবাই সিদ্ধান্ত করে বসলো যে মথুরেরও নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে। কিন্তু 'মাথা খারাপ' ব'লে সিদ্ধান্ত নিলেও মথুরই কর্তা; তাঁর অনভিমতে পুরোহিতেরা

কোনো কাজই করতে পারেন না ; তিনি না চাইলে মায়ের বিসর্জনও হতে পারে না এবং অর্বাচীন মনে হলেও তাঁর এই আজ্ঞা পুরোহিতেরা মানতে বাধ্য। আর আশ্চর্য ভাগ্যের পরিহাস ! শেষপর্যন্ত বিপদুদ্ধারের জন্যে সবাইকে রামকৃষ্ণের কাছেই ধরণা দিতে হলো।

মথুরের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে রামকৃষ্ণ বললেন, 'তোমার এত ভয় কিসের ? কে বললে মা-কে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে ? আর বিসর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায় ? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখনো থাকতে পারে ? তিনদিন বাইরে দালানে ব'সে মা তোমার পুজো নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরও কাছে থেকে—সর্বদা তোমার হৃদয়মন্দিরে ব'সে তোমার পুজো নেবেন।' স্পর্শের কি মোহিনী শক্তি ! যেন জাদুবলে সেদিন তাঁর কথাগুলি প্রাণময় হয়ে উঠেছিল—মথুর বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর এই ভয় কত অর্থহীন। প্রকৃতিস্থ মথুর সেদিন যেন শতগুণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। বলা বাহুল্য মূর্তি-বিসর্জনের পক্ষে আর কোনো বাধা হয় নি।

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে ভবিষ্যদবাণী করতেন। এক-দিন তেমনি ভাবাবেশে মথুরকে বললেন, 'যদ্দিন তুমি বেঁচে থাকবে তদ্দিন আমিও দক্ষিণেশ্বরে থাকবো।' কথাটি শুনে মথুরের ভালো লাগলেও স্ত্রী ও পুত্রের কথা ভেবে একটু যেন বিষণ্ণ হয়েছিলেন। দীনভাবে বললেন, 'বাবা ! আমার স্ত্রী জগদম্বা আর ছেলে দ্বারকাও যে আপনার ভক্ত ! আমি মরলে তাদের ছেড়ে যাবেন !' সেদিন মথুরকে আশ্বস্ত ক'রে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'তবে তাই হ'ক ! যদ্দিন ওরা দু'জন বেঁচে থাকবে তদ্দিন আমি এখানে থাকবো।' ঠিক তেমনটিই ঘটেছিল। শুধু মথুরই নন, ১৮৮১ সালের মধ্যে জগদম্বা ও দ্বারকাও ইহধাম ছেড়ে চলে যান ; অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে রামকৃষ্ণের বিদায় নেবার কিঞ্চিদধিক তিনবছর আগের ঘটনা সেটি।

রাণী রাসমণির মৃত্যুর পর তার সব সম্পত্তি দুই মেয়ে পদ্মমণি আর জগদম্বার মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। একদিন পদ্মমণির ভাগের এক পুকুরে জগদম্বা চান করতে গেছেন। গিয়ে দেখেন শালুকফুলে ভর্তি হয়ে আছে পুকুর। ভাবলেন স্নান শেষে গোটাকতক ফুল নিয়ে যাবেন। যখন ফুল ছিঁড়ছেন তখন পাশ দিয়ে রামকৃষ্ণ যাচ্ছিলেন। পদ্মমণির ভাগের পুকুর থেকে জগদম্বাকে ফুল ছিঁড়তে দেখে রামকৃষ্ণ প্রায় ছুটে গিয়ে পদ্মমণিকে এই চুরির খবরটি দিলেন। রামকৃষ্ণের আচরণ দেখে পদ্মমণির বেশ আমোদ হচ্ছিল। তিনি ভাবতেও পারেন নি এমন তুচ্ছ একটি ব্যাপারের জন্যে রামকৃষ্ণ এতখানি উতলা হয়ে উঠবেন। তবুও, যেন খুব বিরক্ত হয়েছেন এমনি ভান ক'রে বললেন, 'ওমা ! তাই নাকি ? তা এতো ভারি অন্যায় !' বলতে বলতে জগদম্বাও এসে হাজির। সব শুনে দু-বোনে মিলে রামকৃষ্ণকে অপদস্থ করতে লাগলেন। কিন্তু কপট ক্রোধ বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারলেন না ; দু-বোনে খিল খিল করে হেসে উঠলেন। রামকৃষ্ণ অবাক ; কিছুতেই যেন ওদের রঙ্গতামাসার কারণটি বুঝতে পারছিলেন না। তাই অবাক হয়ে বললেন, 'তোমাদের সংসারের নিয়ম ঠিকমতন বুঝি না। তবে সম্পত্তি যখন ভাগ হয়ে গেছে তখন অনুমতি ছাড়া আর একজনের ভাগের থেকে কিছু নেওয়া উচিত নয়।' দু'বোনে তখনও হাসছেন। রামকৃষ্ণের সরল মধুর বালক-ভাব দেখে সেদিন তাঁরা যেন মুগ্ধ !

মথুর ও রামকৃষ্ণের মধ্যে সম্পর্কটি ছিল বিচিত্র, এবং প্রায়ই সে সম্পর্কের বদল হতো। মথুর কখনও তাঁকে পিতার মতন দেখতেন—যেন রামকৃষ্ণ তাঁর গুরু! কখনও বা দেখতেন হটকারী যুবকের মতন। মথুর নিজেও মাঝে মাঝে দায়িত্বজ্ঞানহীন বালকের মতন ব্যবহার করতেন। তবে মথুরের ব্যবহার সবসময় খুব নির্দোষ হতো না। যেমনটি সেবার হলো। প্রতিবেশী এক প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারের সঙ্গে অকারণ দাঙ্গা বাধিয়ে দিলেন—সদলবলে সেখানে চড়াও হ'য়ে এমন হামলা করলেন যে, অনেক মানুষ খুন হলো। ঘটনাটি আদালত অব্দি গড়াল। কোর্ট থেকে মথুরের নামে পরোয়ানা জারি হলো। অপরিণামদর্শী বালকের মতন মথুর ছুটে গেলেন রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ তাঁকে পিতার মতন শাসন তো করলেনই উপরন্তু বললেন যে মথুরকে এর পরিণাম ভোগ করতেই হবে। কিন্তু মথুরও জিদ করতে লাগলেন; এ বিপদ থেকে তাঁকে বাঁচাতেই হবে। শেষমেশ রামকৃষ্ণ বললেন, 'দেখি—মা কি চান! তিনি যেমনটি চাইবেন তাই হবে!' তাতেই মথুর খুশি। অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জেনেছেন যে রামকৃষ্ণ এইভাবেই ভরসা দেন। বলাবাহুল্য, মথুরের নামে ফৌজদারী মামলাটি শেষ পর্যন্ত আদালতে ওঠে নি।

রামকৃষ্ণের প্রতি মথুরের উদারতার অনেক ঘটনার কথা আমরা জানি। টাকাপয়সার ব্যাপারে রামকৃষ্ণের কোনোরকম সাংসারিক বুদ্ধিই ছিল না। ফলে এই উদারতার বেশ কঠিন পরীক্ষা হয়ে যেত। বিশেষ ক'রে পুরাণ কাহিনী নিয়ে রচিত যাত্রাপালা দেখার সময় এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। হয়ত কারও উঠানে বা ফাঁকা মাঠে যাত্রাপালা দেখতে গেছেন রামকৃষ্ণ; মথুর তাঁর হাতে একশ' টাকার একটি বাণ্ডিল দিয়ে গেছেন—উদ্দেশ্য, পছন্দমত অভিনেতাকে খুশি-মতন পুরস্কার দিতে পারবেন। কিন্তু টাকা পয়সার উপর যাঁর মোহ নেই তাঁর কি হিসাবের জ্ঞান থাকে? ফলে, খুশি হয়ে রামকৃষ্ণ হয়ত টাকার পুরো থোকটাই একজন অভিনেতার হাতে তুলে দিতেন। এমন ঘটনা যখন ঘটতো, তখন মথুর আবার তাঁর হাতে টাকা দিয়ে আসতেন। সেবারও রামকৃষ্ণ হয়ত তেমনটি করতেন। শেষমেশ নিজের পরনের ধুতি, চাদর উড়ানি খুলে দিয়ে হয়ত একেবারে উলঙ্গ হ'য়ে যেতেন।

সেবার মথুরকে নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রামকৃষ্ণ দেখা করতে গেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মোপাসক আবার ধর্মসংস্কারও। হিন্দুধর্মের সনাতন কিছু বিশ্বাস এবং প্রথার সংস্কারের উদ্দেশেই ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি। এই সমাজেরই একটি শাখার শিরোমণি ছিলেন আচার্য দেবেন্দ্রনাথ। মথুর এবং দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে এক-সঙ্গে পড়াশুনা করেছেন। দু'জনার মধ্যে বেশ সম্প্রীতি। তাই অতবড় মানী লোক হলেও দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ঘটানোতে কোনো গোল হয় নি।

রামকৃষ্ণ শুনেছিলেন যে, অধ্যাত্মসাধনায় দেবেন্দ্রনাথ অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। তাই সাক্ষাতের জন্যে তাঁর এই আকুলতা। দেখা হতেই দেবেন্দ্রনাথকে সরাসরি গায়ের জামা খুলে বক্ষঃস্থল দেখাতে বললেন। দেবেন্দ্র তাই করলেন—সম্ভবত ঈষৎ আত্মতুষ্টি নিয়েই দেবেন্দ্রনাথ তা করলেন। কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁর গৌরবর্ণ রক্তিম বক্ষঃস্থল নিবিড় ধ্যানময়তার লক্ষণটিই প্রকাশ করে। এরপর বেদ থেকে কিছু পাঠ ক'রে শোনালেন

বললেন, 'এই জগৎ যেন একটি ঝাড়বাতি; আর প্রাণী, জীব যেন এক একটি ঝাড়ের আলো। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর মহিমা প্রচারের জন্যে। ঝাড়ের আলো নিবে গেলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।' বেদের এই ব্যাখ্যাটি রামকৃষ্ণকে সেদিন খুব অভিভূত করেছিল; কারণ পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান করতেন তখনও তাঁর ঠিক ওই রকমটিই দর্শন হয়েছিল।

সেদিন আরও অনেক কথাবার্তা হলো। দেবেন্দ্রনাথ খুশি হয়ে রামকৃষ্ণকে ব্রহ্মোৎসব দেখতে আসতে অনুরোধ করলেন। রামকৃষ্ণ বললেন, 'সে ঈশ্বরের ইচ্ছে। আমার তো এই অবস্থা —কখন তিনি আমায় কি ভাবে রাখেন!' দেবেন্দ্রনাথ তবুও অনুরোধ করলেন। বললেন, 'আসতেই হবে, যে অবস্থাই হ'ক না কেন! তবে এমন এলোমেলো ভাবে নয়। ধুতি উড়ানি প'রে আসবেন।' রামকৃষ্ণ বললেন, 'তা হবে না; আমি বাবু সাজতে পারবো না।' সে কথা শুনে কৌতুকে হেসে উঠলেন দেবেন্দ্রনাথ। তবে দেবেন্দ্রনাথের কৌতুকটি সেদিন খুব নির্দোষ ছিল না। কারণ, পরদিনই নেমতন্ন বাতিল ক'রে মথুরের নামে একটি চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। লিখেছিলেন যে, উপযুক্ত পোষাক ছাড়া রামকৃষ্ণের পক্ষে উৎসবে আসা উচিত হবে না।

স্পর্শদ্বারা ভাবসমাধি পেতে চাইতেন মথুর, আর তাই বারেবারেই রামকৃষ্ণকে অনুরোধ করতেন। মথুরকে ঠেকাতে চাইতেন রামকৃষ্ণ। বলতেন, এ গৃহীর ভাব নয়। সুতরাং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। বলতেন, ঈশ্বরে ভক্তি আর সংসারে কর্তব্য পালন করার মধ্যে সাম্যভাব রাখাই হলো যথার্থ গৃহীর ধর্ম পালন করা। কিন্তু মথুর একেবারে 'নাছোড়-বান্দা'—ভাবসমাধি করে দিতেই হবে। অগত্যা রামকৃষ্ণকে বলতে হলো, 'মা-কে জিজ্ঞেস করে দেখি; তিনি যা হয় করবেন।' এর দিন কয়েক পরেই অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে সমাধিস্থ হলেন মথুর।

সেটি কেমন ভাব, পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ তা বর্ণনা করেছেন। 'মথুর আমায় ডেকে পাঠাল; গিয়ে দেখি আগের সেই মানুষ সে নেই—একেবারে অন্য মানুষ। যখনই ঈশ্বরের কথা বলে তখনই বন্যার ধারার মতন চক্ষু দিয়ে জল ঝরে। কেঁদে কেঁদে চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ। ফুলে ফুলে উঠছে বুক। আমায় দেখেই ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আমার পা-দু'খানি জড়িয়ে ধরে বললে, "বাবা! ঘাট মানছি—আমার হার হয়েছে! তিনদিন ধ'রে এই দুঃসহ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি; যত কঠোর ভাবেই চেষ্টা করি না কেন সংসারে যেন কিছুতেই মন দিতে পারছি না। সব যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে। দয়া করো, বাবা! আমার এ আবেশ কাটিয়ে দাও। এ আমি চাই না।" আমি বললাম, "কিন্তু তুমি তো চেয়েছিলে!" সে বললে, "জানি চেয়েছিলাম। এও জানি, এ এক আশ্চর্য আনন্দঘন অবস্থা—কিন্তু কি দরকার এই অপার্থিব আনন্দ পেয়ে, যখন সংসারের আর সব পাওয়া টুকরো টুকরো হ'য়ে হারিয়ে যাচ্ছে? এ-আবেশ তোমাদেরই মানায়, আমাদের মানায় না। যা দিয়েছ, দয়া ক'রে তা ফিরিয়ে নাও।" আমি হেসে উঠে বললাম, "আমিও তোমায় ঠিক এই কথাই ব'লে এসেছি এতদিন।" "জানি তা", সে বললে। "কিন্তু কখনও বুঝি নি যে ভূতের মতন এই ভাব আমার ঘাড়ের ওপর এমন ক'রে চেপে বসবে; চব্বিশ ঘণ্টা ইচ্ছে মতন আমায় দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে!" সব-

কথা শুনে আমার হাতখানা মথুরের বুকে ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিলাম। পূর্বাবস্থা পেয়ে মথুর আবার বাহ্যভূমিতে ফিরে এলো।'

সস্ত্রীক মথুরের সঙ্গে রামকৃষ্ণও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল তীর্থদর্শনে যেতে অভিলাষী হয়েছেন। তাঁর এই অভিলাষের দুটি কারণ দেখিয়েছেন সারদানন্দ। তিনি (সারদানন্দ) মনে করেন যে, প্রত্যেক অবতার ও মহাপুরুষদেরই তীর্থভ্রমণ করতে হয়; নইলে সাধারণ মানুষের যথার্থ আধ্যাত্মিক ভাবটি তাঁরা জানতে পাবেন না। এটি প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণটি উচ্চভাবের। তীর্থদর্শন ক'রে অবতার ও মহাপুরুষগণ তাঁদের আধ্যাত্মিক ভাবটি দেবস্থানে সঞ্চার ক'রে দেন। যাতে অগণিত ভক্ত পুণ্যতীর্থদর্শন শেষে সেই উচ্চভাবটি গ্রহণ করতে পারেন। তীর্থদর্শন ক'রে মহাপুরুষগণ নেন না কিছুই, কিন্তু দেন অনেকখানি।

রীতিমত রাজকীয় মর্যাদায় এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে এই তীর্থযাত্রার আয়োজন শুরু হলো। দলে থাকলেন সস্ত্রীক মথুর, রামকৃষ্ণ, হৃদয়রাম এবং অসংখ্য আত্মীয় পরিজন। একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং দু'খানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করা হয়েছে। ব্যবস্থা হয়েছে যাতে সংরক্ষিত কামরাগুলি ইচ্ছামতন বিচ্ছিন্ন করা যায়। হাওড়া স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু হলো ১৮৬৮ সালের ২৭শে জানুয়ারী।

তীর্থযাত্রীরা প্রথমে বৈদ্যনাথজী দর্শন করতে দেওঘর গেলেন। বৈদ্যনাথধামে ক'টি দিন বেশ আনন্দেই কাটলো। অবশ্য একটি ঘটনায় রামকৃষ্ণ খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। দেওঘর গ্রামের দরিদ্র মানুষের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে দুঃখে বেদনায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। খেতে না পাওয়া, পরতে না পাওয়া মানুষগুলি মাথায় দেবার তেলটুকুও পায় না। (গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রীতি হলো মাথার চুল তৈলাক্ত ক'রে সিক্ত রাখা। নতুবা শুক্‌নো আবহাওয়ায় মাথার চুল গুঁড়ো হয়ে যায়। এটি কোনো বিলাসিতা নয়; যদিও গরিব মানুষদের ক্ষেত্রে এটি বিলাসিতারই শামিল।) রামকৃষ্ণ একদিন তাই মথুরকে ডেকে বললেন, 'মায়ের এত ধনসম্পদের তুমিই তবিলদার। তোমার হাতেই সব। এইসব গরিবদের জন্যে তুমি কিছু ব্যয় কর। এদের প্রত্যেককে একখানি কাপড় ও মাথায় মাখবার তেলের ব্যবস্থা ক'রে দাও। একদিন সবাইকে তৃপ্ত ক'রে ভোজন করাও।' ব্যয়কুণ্ঠ মথুর দ্বিধা করছিলেন। অকারণ ব্যয়বৃদ্ধির আশংকা ক'রে কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, 'বাবা! এ তীর্থযাত্রায় অনেক অর্থব্যয় হবে। আপনার কথামত এদের জন্যে ব্যয় করলে অর্থাভাব হবার আশঙ্কা আছে। সেক্ষেত্রে এই অকারণ অর্থব্যয় করা কি উচিত হবে? আপনি কি বলেন? কিন্তু রামকৃষ্ণ এত কুপিত হলেন যে কোনো আলোচনায় যেতে চাইলেন না। গ্রামের মানুষের দুর্দশার কথা ভেবে তাঁর দু'চোখ বেয়ে তখন জল ঝরছিল। মথুরের দ্বিধা দেখে তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। মথুরকে ডেকে বললেন, 'তুই একটা শয়তান। শোন! আমি ঠিক করেছি এখানে এদের সঙ্গেই বাস করবো—এদের ছেড়ে তোর সঙ্গে আমি কাশী যাব না।' নিরুপায় মথুর বাধ্য হয়ে কলকাতা থেকে বস্ত্র আনালেন তারপর রামকৃষ্ণ যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনি ভাবেই গরিব মানুষদের পরিচর্যা করলেন।

আবার যাত্রা; এবার গন্তব্যস্থান কাশীধাম। যাত্রাপথে আর একটি বিপর্যয় ঘটেছিল। মোগলসরাই স্টেশনের নিকটবর্তী এক ছোট্ট স্টেশনে কার্যান্তরে রামকৃষ্ণকে নামতে হয়ে-

ছিল। সঙ্গে হৃদয়রামও ছিল। কিন্তু তাঁরা না উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দেয়। বিপন্ন মথুর কাশীধামে পেঁছেই তার পাঠালেন যেন পরের ট্রেনেই রামকৃষ্ণ ও হৃদয়রামকে কাশী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য পরবর্তী ট্রেনের জন্যে ওঁদের অপেক্ষা করতে হয় নি। রেল কোম্পানির জনৈক বিশিষ্ট কর্মচারী পরিদর্শন-কাজে ওই স্টেশনে এসেছিলেন। তিনিই তাঁর স্বতন্ত্র গাড়িতে রামকৃষ্ণ ও হৃদয়রামকে তুলে কাশীধামে নামিয়ে দেন।

নৌকাযোগে বারাণসী প্রবেশের সময় থেকেই ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ। ভাব-নয়নে দেখলেন এই শিবপুরী যেন সুবর্ণনির্মিত। যুগযুগ ধরে অসংখ্য সাধুভক্তদের বিশ্বাস-ভক্তি ও ভালবাসায় অভিষিক্ত এই নগরী যেন জ্যোতির্ময়ী ভাবঘনরূপ পরিগ্রহ ক'রে স্বর্ণ-বিভায় ঝলমল করছে। এই শিবপুরীর প্রতিটি ধূলিকণাও পবিত্র। তাই একমুহূর্তের জন্যেও এই পুণ্যভাবঘন পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে রামকৃষ্ণের প্রাণ চাইছিল না। কিন্তু বাস্তবচোখে সেদিন তিনি যা দেখেছিলেন তাতে তাঁর চরম মনোভঙ্গ হয়েছিল। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ ব্যথিত অন্তরে সে কথা প্রকাশ করে ফেলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি ভেবেছিলাম কাশীধামে গিয়ে সবাইকে সমাধিস্থ দেখবো। যেন শিবধ্যানে সবাই অষ্টপ্রহর নিমগ্ন। বৃন্দাবনেও সব ভক্তকে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা দেখতে পাব ভেবেছিলাম। কিন্তু কাশী বা বৃন্দাবনে গিয়ে আমার সে আশা পূর্ণ হয় নি। আমি নিরাশ হয়েছিলাম।'

কাশীতে কেদারঘাটের উপরে পাশাপাশি দুটি বাড়ি নিয়ে বেশ ঘটা ক'রে মথুর থাকতেন। যখন কোথাও যেতেন একজন ছত্রধারী তাঁর মাথায় রুপার ছাতা ধরে রাখতো। রামকৃষ্ণের জন্যেও আলাদা শিবিকার ব্যবস্থা ছিল—পাছে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়ে যান তাই এমন সাবধানতা। কাশীতে এসেই মথুর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মাধুকরী দেন। ঢালাও ব্যবস্থা। তবুও ব্রাহ্মণরা নিজেদের মধ্যে কলহ করতো। ধনী জমিদারবাবুরাও আসতো। মথুর তাদের সঙ্গে বৈষয়িক বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। মথুরের ব্যবহারে রামকৃষ্ণ মানসিক ক্লেশ পেতেন। একা ব'সে কাঁদতেন আর বলতেন, 'এর চেয়ে যে দক্ষিণেশ্বরে আমি ঢের ভালো ছিলাম!'

তবে কাশীতে এসে রামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ নিরাশ হন নি। কারণ এখানেই তিনি তৈলঙ্গ স্বামীর সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্য হন। সেই সাক্ষাতের বিবরণ দিতে গিয়ে রামকৃষ্ণ বলছেন, 'দেখলাম সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর তাঁর (তৈলঙ্গ স্বামী) দেহখানি আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত! তিনি আছেন বলেই কাশী উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে! উঁচু জ্ঞানের ভাব। শরীরের কোনো হুঁশই নেই। রোদে বালি এমনি তেতেছে যে পা দেয় কার সাধ্যি! সেই বালির ওপরেই দিব্যি সুখে শুয়ে আছেন। পায়েস রেঁধে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলাম। তখন কথা কন নি—মৌনী। ইশারায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ঈশ্বর এক না অনেক?" তাতে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে সমাধিস্থ হলে, এক। নইলে যতক্ষণ 'আমি', 'তুমি' ভাব আছে ততক্ষণ অনেক। তাঁকে দেখিয়ে হৃদয়কে বলেছিলাম "একেই ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা বলে।"

একদিন মথুরের সঙ্গে নৌকাবিহার ক'রে কাশীধামের পুণ্যস্থানগুলি দেখছেন। নৌকা এসে লাগল মণিকর্ণিকার শ্মশান ঘাটে। সারা শ্মশান-ভূমি চিতাধূমে আচ্ছন্ন। সৎকারের জন্যে এখানে ওখানে শব পড়ে আছে। সেদিকে তাকিয়েই রামকৃষ্ণের ভাবোল্লাস হলো। রোমাঞ্চিত কলেবর হয়ে নৌকার ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। সারা দেহের রোমগুলি

শক্ত কঠিন—ধীরে ধীরে নৌকার কিনারায় এসেই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। মাঝি-মাল্লারা ছুটে এলো, যাতে অমন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তিনি জলে না পড়ে যান। কিন্তু রামকৃষ্ণ জলে পড়লেন না। কাউকে ধরতেও হলো না। দেখা গেল, নিবাত দীপশিখার মতন তিনি স্থির অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সারা মুখমণ্ডল আশ্চর্য মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত। দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মথুর আর হৃদয়রাম। কেউ তাঁকে স্পর্শ করছেন না। সেদিন নৌকার মাঝি-মাল্লারা স্তব্ধ হ'য়ে রামকৃষ্ণের এই অসামান্য ভাবাবিষ্ট মূর্তিখানি দেখেছিল।

পরে দিব্যভাবের বিরাম হ'লে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, সেদিন সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি একজন দীর্ঘাকার পুরুষকে দেখেছিলেন। তাঁর গায়ের বর্ণ ধপধপে সাদা, মাথায় পিঙ্গল-বর্ণ জটা। সযত্নে চিতা থেকে শবটি তুলছেন, তারপর তার কানে তারক-ব্রহ্মমন্ত্র জপ করে দেহখোল থেকে আত্মাকে মুক্ত করছেন। চিতার আর এক পাশে সর্বশক্তিময়ী মহাকালী। সেখানে ব'সে তিনি যেন স্থূল—সূক্ষ্ম সকল কর্মের সংস্কার-বন্ধনগুলি একে একে খুলে দিচ্ছেন এবং আত্মার নির্বাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন। সেদিন যেসব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত দর্শনের কথা শুনেছিলেন, তাঁরা সবাই তাঁদের জ্ঞানের নিরিখে এটি সমর্থন করেছিলেন। কারণ, শাস্ত্রে লেখা আছে যে কাশীধামে দেহরক্ষা করলে স্বয়ং বিশ্বনাথ কৃপাপরবশ হ'য়ে জীবকে তৎক্ষণাৎ তার জন্ম মৃত্যুর আবর্তন থেকে মুক্ত করে নির্বাণ-পদবী দান করেন।

এক সপ্তাহ কাশীধামে বাস করার পর তীর্থযাত্রীরা প্রয়াগে এসে পৌঁছলেন। সেখানে গঙ্গা ও যমুনার পুণ্যসঙ্গমতীর্থে স্নান করে সবাই ধন্য হলেন। প্রয়াগ থেকে তাঁরা গেলেন বৃন্দাবনধাম। শ্রীবৃন্দাবন হলো কৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি। এখানে আসার পর রামকৃষ্ণের মুহুর্মুহু ভাবাবেশ হতো। মানস দৃষ্টিতে দেখতেন যেন সন্ধ্যা সমাগমে রাখাল বালকেরা গোষ্ঠ থেকে ফিরছে—তাদের সঙ্গে আসছে গরুর পাল। নদী পেরিয়ে তারাও গৃহাভিমুখী। দেখছেন গোচারণভূমি, ছোট ছোট টিলা, তালতমালরাজি, ময়ূরী, হরিণী—এরা সবাই কৃষ্ণ সঙ্গত। মনে পড়িয়ে দেয় শিখিপুচ্ছধারী নবনীরদশ্যাম কৃষ্ণের কথা। কিন্তু 'কোথায় কৃষ্ণ ! কোথায় তিনি ! হা কৃষ্ণ যো কৃষ্ণ !' কেঁদে আকুল রামকৃষ্ণ। 'কেন তাঁকে আমি দেখতে পাচ্ছি না ? এখানকার সব কিছুই তো তাঁর স্পর্শধন্য ! তবে তিনি কোথায় ?'

যাহোক, গঙ্গামাতার সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হলো এই বৃন্দাবনেই ! গঙ্গামাতার বয়স তখন ষাঠের কোটায়। শ্রীরাধার পুণ্য জন্মস্থান বর্ষণা গ্রামেই তপস্বিনী গঙ্গার বেশি সময় কেটেছে। লোকে বলে গঙ্গা নাকি শ্রীরাধার প্রধানা সঙ্গিনীদের একজন। স্বয়ং দেহধারণ ক'রে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। রামকৃষ্ণের শরীরে ইনি শ্রীরাধার মহাভাবের প্রকাশ দেখেছিলেন। সাক্ষাতের পরে পরস্পরের প্রেমে এঁরা দু'জন এত মোহিত হয়ে যান যে রামকৃষ্ণ স্থির করেন আর তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরবেন না, গঙ্গামাতার কুটিরেই বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দেবেন। ব্যবস্থাটি হৃদয়ের মনঃপূত হয় নি। কিন্তু মথুর বা হৃদয় কেউই রামকৃষ্ণকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেন নি। শেষপর্যন্ত রামকৃষ্ণের মাতৃভক্তিরই জয় হলো ! হঠাৎই মাতা চন্দ্রার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় রামকৃষ্ণের মনটি হুহু করে উঠেছিল। সুদূর দক্ষিণেশ্বরের নহবৎখানায় একা একা দিন গুণছেন বৃদ্ধা। সুতরাং ফিরতে তাঁকে হবেই,

নইলে বুড়ো মা-কে দেখবে কে ?

হপ্তা দুই পরে আবার কাশীধাম। প্রথমবার কাশী দর্শনকালে ভৈরবীর সঙ্গে রামকৃষ্ণের দেখা হয়েছিল। অন্য এক ভক্ত রমণীর সঙ্গে ভৈরবী এক ঘাটে থাকতেন। ভৈরবীকে বৃন্দাবনে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। তাঁকে তিনি বৃন্দাবনেই রেখে এসেছিলেন। ভৈরবী সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসার অল্পদিন পরেই ভৈরবী সেখানে দেহরক্ষা করেন।

বৃন্দাবনে থাকতেই রামকৃষ্ণের বীণাবাদন শোনার শখ হয়। কিন্তু বৃন্দাবনে সে সময় কোনো উচ্চাঙ্গের বীণকার না থাকায় রামকৃষ্ণের সাধ পূর্ণ হয় নি। কাশীতে ফিরে তাঁর সে সাধ মিটলো। সে সময় কাশীতে মহেশচন্দ্র সরকার নামে একজন নিপুণ বীণকার ছিলেন। রামকৃষ্ণকে একদিন তাঁর মদনপুরার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। বীণার প্রথম মধুর ঝঙ্কারটি কানে যাওয়া মাত্রই রামকৃষ্ণের সেদিন ভাবাবেশ হয়েছিল। পরে অর্ধবাহ্যদশা ফিরে এলে রামকৃষ্ণ আকুল হয়ে ব'লে উঠলেন, 'মা আমায় হুঁশ দাও; আমি যে ভালো ক'রে বীণা শুনবো ব'লে এসেছি!' এরপর বাহ্যভাবদশায় ফিরে এসে সদানন্দে বীণাবাদন শুনলেন। সেদিন বীণাবাদনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রামকৃষ্ণ গানও গেয়েছিলেন। সেই থেকে প্রায় প্রত্যহই মহেশচন্দ্র রামকৃষ্ণকে দর্শন করতে আসতেন আর বীণাবাদন শোনাতেন। বীণাবাদনের সময় মহেশচন্দ্রের আকুলভাবের খুব প্রশংসা করতেন রামকৃষ্ণ। বলতেন, 'মহেশ যখন বীণা বাজায় তখন নিজেকে ও হারিয়ে ফেলে।'

এদিকে ধর্মানুষ্ঠান পালন করার জন্যে মথুরকে মে মাস পর্যন্ত কাশীতে থাকতে হলো। অনুষ্ঠানগুলি শেষ হ'লে ফেরার পথে মথুরের গয়াধাম দর্শনের বাসনা হলো। কিন্তু রামকৃষ্ণের প্রবল অনাগ্রহ। ফলে মথুরকেও সে ইচ্ছা ত্যাগ করতে হলো। এই গয়াধামেই ক্ষুদিরামের দিব্যদর্শন হয়েছিল। তখন প্রত্যাদেশ হয় যে, ক্ষুদিরামের পুত্ররূপে বিষ্ণু মর্ত্যে অবতীর্ণ হবেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে কাহিনী নিবেদন করেছি। রামকৃষ্ণ সে কথা জানতেন। তিনি জানতেন যে, গয়াধামে উপস্থিত হ'লে আরব্ধ কর্ম শেষ করার আগেই বিষ্ণুর মধ্যে তিনি লীন হয়ে যাবেন। একই কারণে তিনি জগন্নাথধামও দর্শন করেন নি; কারণ এই জগন্নাথ-ধামে আর একজন অবতার তাঁর দিব্যসত্তার মধ্যে লীন হয়ে গিয়েছিলেন।

তীর্থভ্রমণ শেষ হলো। ১৮৬৮ সালের মাঝামাঝি তীর্থযাত্রীরা ক'লকাতায় ফিরে এলেন। বৃন্দাবন থেকে রামকৃষ্ণ যে রজ নিয়ে এসেছিলেন তার খানিকটা তিনি পঞ্চবটীর চারপাশে ছড়িয়ে দিলেন। বাকীটুকু ছড়িয়ে দিলেন তাঁর সাধনকুটিরের চারপাশে। এই সাধন কুটিরেই তিনি তোতাপুরীর কাছে দীক্ষা নেন—এখানেই তাঁর প্রথম নির্বিকল্প সমাধি হয়। এ কাজ সমাপ্ত হ'লে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'আজ থেকে এই স্থান বৃন্দাবন-তুল্য দেবভূমি হলো!'

তীর্থদর্শন থেকে ফিরে আসার অল্পদিনের মধ্যেই হৃদয়ের স্ত্রী-বিয়োগ হয়। ফলে কিছু-কালের জন্যে তার মন সংসারের প্রতি বিরাগসম্পন্ন হয়ে ওঠে। হৃদয়ের স্বভাবে এতকাল কোনো ভাবুকতা ছিল না। তার সমস্ত অধ্যাত্মসাধনার কেন্দ্র ছিল সেবা—রামকৃষ্ণের প্রতি অকপট প্রেম, শ্রদ্ধাভক্তি। কিন্তু পত্নী-বিয়োগের পর থেকেই তার মন দুঃখ-বেদনায় বিধুর হয়ে ওঠে। সংসারের কাজে তীব্র উদাসীনতা থেকেই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির জন্যে

সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। রামকৃষ্ণ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। বলতেন এমন ভাব বৈরাগ্য তার সাজে না, কারণ সে মূলত সংসারী। কিন্তু অবুঝ হৃদয় তাঁর কোনো উপদেশই শুনতে চাইত না। মথুরও একদিন এমন জিদ করেছিলেন। সেদিন তাঁকে যেমন নিরাশ করেন নি, তেমনি হৃদয়কেও নিরাশ করলেন না।

দিনকয়েক পরের কথা। সেদিন শেষরাত। সমস্ত পৃথিবী সুষুপ্ত। হৃদয় হঠাৎ দেখলো রামকৃষ্ণ পঞ্চবটীর দিকে চলেছেন। তার কি মনে হলো; রামকৃষ্ণের দরকার হতে পারে ভেবে গাড়ু, গামছা নিয়ে সেও পিছু পিছু চললো। খানিক দূর হাঁটার পর হৃদয়ের এক অপূর্ব দর্শন হলো। সে স্পষ্ট দেখলো রামকৃষ্ণ যেন স্থূল-দেহধারী কেউ নন। তিনি যেন আলোক শিখা। মনুষ্য অবয়বের চিহ্নমাত্রও সে দেখতে পেল না। সবটাই দ্যুতিময়। সারা পঞ্চবটীও সেই অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। যখন তিনি পথ চলেছেন তখন তাঁর পদযুগল ভূমি স্পর্শ করছে না—শূন্যে শূন্যেই তাঁকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে! হৃদয় যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। মনে হলো বোধহয় সে দিবাস্বপ্ন দেখছে। বারবার চক্ষু মার্জনা করল, আর বারবারই সেই একই দৃশ্য-দর্শন হলো। দিব্যদেহধারী মূর্তি হারিয়ে গেল না। এমনকি পথিপার্শ্বের বৃক্ষরাজি লতাগুল্ম সবই যেমনটি ছিল তেমনি প্রাকৃত হয়েই থাকলো। হঠাৎ নিজের দিকে তার নজর পড়ল। দেখলো সেও যেন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। তার মনে হলো এই দেহ যেন রামকৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূত—সেও যেন তাঁরই অংশ বিশেষ। সে তাঁরই সেবক, তাই ভিন্ন শরীরেও এই দিব্যজ্যোতি অবস্থিত। যেমনি সেকথা হৃদয় বুঝলো ওমনি আনন্দের প্রবল বন্যায় সে যেন উন্মাদ হয়ে উঠল। আবেগতাড়িত হ'য়ে হৃদয় চিৎকার ক'রে উঠল, 'ও রামকৃষ্ণ, ও রামকৃষ্ণ! তুমি যা আমিও তাই! আমরা কেউ মানুষ নই। তবে আর এখানে থাকি কেন? চল দেশে দেশে যাই, জীবোদ্ধার করি!'

হৃদয়ের এই উন্মত্ত চিৎকার শুনেই ঘুরে দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণ। মিনতি ক'রে তাকে থামতে বললেন—নইলে মন্দিরের সবাই জেগে উঠবে, ভাববে না জানি কে কাকে খুন করলো। কিন্তু কে শোনে কার কথা। রামকৃষ্ণ তখন দ্রুত হৃদয়ের কাছে এসে তার বুকে হাতখানি ছুঁয়ে বললেন, 'দে মা, শালাকে জড় করে দে!'

ওই কথা বলা মাত্র হৃদয় যেন আনন্দজগৎ থেকে স্থূল জড়জগতে নিক্ষিপ্ত হলো। তার মন কেঁদে উঠল। রামকৃষ্ণকে উদ্দেশ ক'রে আর্তস্বরে হৃদয় ব'লে উঠলো, 'মামা! অমনটি কেন করলে? কেন আমার দর্শনানন্দ কেড়ে নিলে? আর তো অমনটি আনন্দ আমি পাব না!'

রামকৃষ্ণ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আমি কি তোকে একেবারে জড় হ'তে বলেছি? বলেছি, এখন ক'টা দিন স্থির হয়ে থাক। তুচ্ছ দর্শন পেয়ে তুই যা গোল শুরু করেছিলি, তাই তো মা-কে ব'লে তোকে জড় করে দিলাম! আমি চব্বিশ ঘন্টা কত কি দেখি। কখনও কি গোল করি? তোর এখনও দর্শনের সময় হয় নি। এখন স্থির হয়ে থাক, সময় হলে আবার কত কি দেখবি!'

সেদিন রামকৃষ্ণের ভর্ৎসনা নীরবে মেনে নিলেও মনে মনে হৃদয় ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তাই কাউকে না জানিয়ে একদিন গভীর রাত্রে পঞ্চবটীতলে গিয়ে রামকৃষ্ণ যে আসনে ব'সে জপধ্যান করতেন, সেখানেই ধ্যানে বসলো। সৌভাগ্যবশত রামকৃষ্ণেরও সে রাতে ধ্যান করার বাসনা

হয়েছিল। পঞ্চবটীতে এসে পেঁছানো মাত্র হৃদয়ের কাতর বিলাপ তিনি শুনতে পেলেন। হৃদয় তখন কাতর স্বরে চিৎকার করছিল, 'মামা! বাঁচাও। আমি পুড়ে মলুম!' রামকৃষ্ণ দ্রুতপায়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন; কিন্তু আগুন কোথায়? তখন হৃদয়কে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে! কি হয়েছে?' হৃদয় বললে, 'সবে এই আসনে ধ্যানে বসেছি, কে যেন এক মালসা আগুন গায়ে ঢেলে দিল। সেই থেকে শরীরে অসহ্য দাহজ্বালা।' সব শুনে রামকৃষ্ণ তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। অচিরেই দাহজ্বালা জুড়িয়ে গেল। রামকৃষ্ণ বললেন, 'তোকে তো বলেছিলাম আমার সেবা করলেই তোর সব হবে। তবে এমন কেন করলি?' সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার পর হৃদয় আর কখনও পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে যায় নি।

তবে কিছুদিনের মধ্যেই হৃদয়ের দর্শনানন্দ লাভ হয়েছিল। সেবার (১৮৬৮) হৃদয় মনস্থ করলো নিজের বাড়িতে দুর্গোৎসব করবে। মথুর তাকে অর্থ সাহায্য করলেন। রামকৃষ্ণ তাকে তন্ন তন্ন ক'রে অনুষ্ঠানের সব খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু হৃদয়ের মন ভরলো না। তার অভিলাষ, রামকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত থেকে পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করুন। কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব? দুর্গোৎসবের সময় তাঁকে যে মথুরের গৃহে থাকতেই হবে। হৃদয় তাই ক্ষুণ্ণ; কিন্তু রামকৃষ্ণ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, পূজার তিনদিন তিনি সূক্ষ্ম শরীরে হৃদয়ের পূজাস্থানে উপস্থিত থাকবেন। যথার্থই তা ঘটেছিল। পূজার তিনদিনই রামকৃষ্ণকে সূক্ষ্মমূর্তিতে হৃদয়ের গৃহপ্রতিমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। সেই দর্শনানন্দ লাভ ক'রে হৃদয় যেন নতুন উৎসাহ পায়। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, পূজার প্রতিদিন যখনই মথুরের গৃহপ্রতিমাব সামনে ধ্যানে বসতেন তখনই সমাধিস্থ হতেন। তাঁব মনে হতো উজ্জ্বল একটি আলোর পথ ধ'রে তিনি পেঁছে গেছেন হৃদয়ের নিভৃত পূজাস্থানটিতে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে মাতৃহারা অক্ষয়ের কথা বলেছি। রামকুমারের মা-মরা এই ছেলেটি শিশুকাল থেকেই রামকৃষ্ণের বড় আদরের। অক্ষয়ও তাই এই স্নেহ-ভালবাসার প্রতিদানটুকু রামকৃষ্ণকেই দিয়েছিল। অক্ষয়কে কোলে-পিঠে ক'রে তিনিই মানুষ করেছিলেন—তার শিশুমন ভরিয়ে দিয়েছিলেন ভালবাসা দিয়ে। এ ব্যাপারে রামকুমার ছিলেন নিষ্ঠুরের মতন উদাসীন। আদর করা দূরে থাক, অক্ষয়কে কখনও কোলে চড়ান নি—তার সঙ্গে খেলাও করেন নি। কিন্তু কেন? পুত্র অক্ষয়ের আয়ু যে অনিশ্চিত আগেভাগে সেটুকু জেনেছিলেন ব'লেই কি এই অবহেলা? যে ছেলে বাঁচবে না তার জন্যে মায়া বাড়িয়ে লাভ কি! এই সান্ত্বনাটুকুই কি পেতে চেয়েছিলেন রামকুমার? কিন্তু ভয়ের এই কাল্পনিক কারণটুকু কি অকিঞ্চিৎকর নয়? বিশেষ, ভাগ্য যখন তাঁকেও রেহাই দেয় নি! পুত্রের অকাল মৃত্যুর তেরো বছব আগেই তো রামকুমারকেও এই পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়েছিল। তাই সর্বদিক ভেবে দেখলে বলতে হয় যে, রামকুমারের এই আতঙ্কের অনেকখানিই ছিল অকারণ। তাঁর এই ভবিষ্যত দর্শন রামকুমারকে সেদিন কিছুই দেয় নি।

এদিকে সকলের অলক্ষ্যে কখন যে শিশু অক্ষয় কৈশোর পেরিয়ে পূর্ণ যুবক হয়ে উঠেছে সে খেয়াল কেউ করে নি। যখন খেয়াল হলো তখন অক্ষয় দিব্যি যুবক। অনিন্দিত দেহকান্তি,—সুগঠিত শরীর। সবাই মুগ্ধ—সবারই প্রিয়পাত্র। আর যুবক গদাধরের সঙ্গে কি আশ্চর্য

আকৃতিগত সাদৃশ্য ! এই সাদৃশ্য পরিবারের আর কারো সঙ্গেই নেই । শুধু আকৃতিগত মিলই নয় । গদাধরের মতন অক্ষয়ও যৌবনারম্ভেই দক্ষিণেশ্বরে এসে পূজারীর কাজে ব্রতী হয়েছিল । মোট ১৮৬৫ সাল—সেই বছরেই হলধারীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিষ্ণু মন্দিরের পূজারীর কাজে অক্ষয় নিযুক্ত হয় ।

অক্ষয়ের বিবাহ হলো ১৮৬৯ সালে । কিন্তু বিয়ের কয়েকমাসের মধ্যেই শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সে কঠিন অসুখে পড়ল । যাহোক, সুচিকিৎসার পর সেরে উঠে সে আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলো । অক্ষয় কিন্তু সম্পূর্ণ নীরোগ হয় নি । কারণ, দিন কয়েকের মধ্যেই সে আবার পীড়াগ্রস্ত হলো । এবারের ব্যাধি আরও জটিল । দিন দিন শরীর ক্ষয় হয়—গাত্রতাপ কমে না । সুচিকিৎসক এনে আশ মিটিয়ে চিকিৎসা করতে বললেন রামকৃষ্ণ । সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চরম কথাটিও বলে দিলেন । ভাবাবেশে হঠাৎই বলে ফেললেন সে কথা । 'ছোঁড়াটা কিন্তু বাঁচবে না !' কাছেই ছিল হৃদয়—ভাবাবিষ্ট রামকৃষ্ণের শ্রীমুখ থেকে কথাটি স্খলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভিত বিস্ময়ে সে রামকৃষ্ণের দিকে তাকাল । কেন ? কেন অমন নিষ্ঠুর কথাটি বললেন তিনি ? রামকৃষ্ণ কিন্তু নির্বিকার । শুধু অক্ষয়কে শোনাতেই যেন বলে উঠলেন, 'আমি কি ইচ্ছে ক'রে বলেছি ?'

শেষ সময় ঘনিয়ে এলো । স্তব্ধ রামকৃষ্ণ সর্বক্ষণ মুমূর্ষুর শয্যাপাশেই ছিলেন । শুধু শেষের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটি যখন এগিয়ে এসেছে, তখন পুত্রতুল্য অক্ষয়ের কানে কানে বললেন, 'বাবা অক্ষয় ! বলো গঙ্গা, নারায়ণ, ওঁ রাম !' একবার, দু'বার, তিনবার ওই মন্ত্র আবৃত্তি করল অক্ষয়, তারপরই সব শেষ । হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল হৃদয় । আর ভাবাবিষ্ট রামকৃষ্ণ হো হো করে হেসে উঠলেন ।

পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'সে সময় আমার কিছুই মনে হয় নি । শুধু দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কেমন ক'রে দেহখোল থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায় । দেহটি যেন তরবারির কোষ । কোষমুক্ত হ'য়ে তরবারিটি বেরিয়ে এলো । যেমন ছিল তেমনি । আর শূন্য কোষখানি একপাশে পড়ে থাকল । যেন কিছুই হয় নি । চোখের সামনে যখন এই অবস্থান্তর দেখলাম তখন তীব্র আনন্দে ছেয়ে গেল আমার মন । আমি হাসলাম, গাইলাম, নাচলাম । আর ওরা আমার সামনে দিয়ে দেহটিকে পোড়াতে নিয়ে গেল ।

'পরের দিন ভাবভঙ্গ অবস্থায় ঘরের বাইরে চাঁদনিতে দাঁড়িয়ে আছি—দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো, আমার মনের মধ্যে কে যেন ভিজে গামছা নিঙড়াচ্ছে । অক্ষয়ের জন্যে আমার মনোকষ্ট ছিল ওই রকমটি । মনে হলো মা কে বলি, মা আমার এই দেহটার সঙ্গে অক্ষয়ের কি সম্পর্ক ? তবে কেন আমার এই কষ্ট ? আর আমার যদি এমন কষ্ট, তবে না জানি ওর আত্মীয় স্বজনের কষ্ট আরও কত নিদারুণ ! মা-গো ! তুমি কি আমায় সেই শিক্ষাই দিলে ? কিন্তু তুমি তো জান, যারা ঈশ্বরে সবকিছু সমর্পণ করে দিয়েছে, দুঃখ পেয়ে তারা নিজেদের হারিয়ে ফেলে না !'

যে কুঠিবাড়িতে অক্ষয় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল, অতঃপর সেখানে রামকৃষ্ণ বাস করতে যান নি ।

ক'লকাতার কলুটোলা অঞ্চলের একটি গৃহে হরিসভা বসতো । পল্লীর বৈষ্ণব ভক্তগণ সেখানে কীর্তন, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি শুনতে আসতেন । সে গৃহে একটি বিশেষ ধ্যানাসন নির্দিষ্ট

ছিল ; প্রত্যহ সেই আসনটি ফুল ও মালা দিয়ে সাজানো হ'ত। আসনটি শূন্যই থাকতো এবং ভক্তগণ ওই আসনটিতে চৈতন্যের আবির্ভাব কল্পনা করতেন। আসনটিকে 'চৈতন্যের আসন' বলা হতো। চৈতন্যেব আবির্ভাব হয় পনেরো শতকে। তিনিও এক অবতাররূপে পূজ্য। বৈষ্ণবধর্মের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের তিনিই প্রবর্তক। হরিসভার সব উৎসবেই ভক্তেরা তাঁর দিব্যাবির্ভাব কল্পনা করতেন ; তাই চৈতন্যাসনটিকে তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র মনে করতেন।

অক্ষয়েব মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরেই হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে রামকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে প্রায় সবার অলক্ষ্যেই রামকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ভাগবতের অমৃতকথা কানে শোনা মাত্রই রামকৃষ্ণ যেন আত্মহারা হয়ে পড়লেন। একরকম ছুটে গিয়ে সেই চৈতন্যাসনের উপর দাঁড়িয়ে ভাবাতিশয্যে গভীব সমাধিস্থ হয়ে গেলেন তিনি।

উত্তোলিত দুটি হাত—মুখে মধুর হাসি। সেই তন্ময় ভাব-মুখ দর্শনে সবাই স্তম্ভিত। সেই প্রবল ভাববন্যায় সবাই অভিভূত, উন্মত্ত কীর্তনে মুখর। খানিক পরে বাহ্য ভাবদশা ফিরে এলে হৃদয়কে নিয়ে রামকৃষ্ণ সে স্থান ত্যাগ করলেন। তিনি চলে যাবার পর সেই হরিসভায় কিছুটা আন্দোলন হয়েছিল। 'চৈতন্যাসন' অধিকার সঙ্গত কি অসঙ্গত, এই নিয়েই গোলযোগের সূত্রপাত। একদল যেমন প্রতিবাদ করলেন, অন্যদল তেমনি সমর্থনও করলেন। কিছুতেই মীমাংসা হয় না দেখে তাঁবা ভগবানদাস বাবাজীব শরণাপন্ন হলেন। ভগবানদাস চৈতন্যের পরম ভক্ত। সব কথা জানার পর তিনি উত্তেজিত ক্রুদ্ধ এবং অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। শুধু তাই নয, ভবিষ্যতে যাতে ধূর্ত ভণ্ডের দল এমনভাবে আসনটি অধিকার করতে না পারে, তার জন্যে ভক্তদের সাবধানও করে দিলেন। বলা বাহুল্য, রামকৃষ্ণ কিন্তু এতসব ঘটনার কিছুই জানতেন না।

এর ঠিক একবছব পরের ঘটনা। ১৮৭০ সাল। মথুর ও হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে রামকৃষ্ণ নদীয়ায় চলেছেন—চৈতন্যের জন্মভূমি দর্শন করবেন ব'লে। পথেই কালনা। এখানেই ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রম। কালনায় যাত্রা স্থগিত করা হলো। মথুর গেলেন বাসস্থান খুঁজতে। রামকৃষ্ণ ও হৃদয় চললেন বাবাজীর আশ্রমের উদ্দেশে।

আশ্রমের কাছাকাছি এসে রামকৃষ্ণ যেন কুণ্ঠিত বোধ করছিলেন। তাই হৃদয়কে আগে প্রবেশ করতে বললেন। আশ্রমে প্রবেশের মুখেই হৃদয় শুনলো ভগবানদাস যেন কাউকে বলছেন, 'মনে হচ্ছে আশ্রমে আজ এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে।' কিন্তু ইতস্তত তাকিয়েও হৃদয় ছাড়া আর কোনো আগন্তুককে তিনি দেখতে পেলেন না। যাকে তিনি খুঁজছিলেন সে ব্যক্তি যে হৃদয় নয় তা বুঝে ভগবানদাস আবার পুরোনো প্রসঙ্গের আলোচনায় মন দিলেন। সেদিন জনৈক বৈষ্ণব সাধুর কিছু গর্হিত আচরণের আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনার মধ্যেই উত্তেজিত হয়ে ভগবানদাস ঘোষণা করলেন যে, ওই অনাচারী বৈষ্ণবের কণ্ঠী কেড়ে নিয়ে তাকে বৈষ্ণব-সমাজ থেকে বার করে দেওয়া হোক। এইরকম উত্তেজিত আলোচনার মধ্যেই রামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রবেশ করলেন। তাঁর সারা দেহখানি এমনকি মুখমণ্ডলের খানিকটা অংশও একখানি কাপড় দিয়ে ঢাকা। দূর থেকে সসম্ভ্রমে বাবাজীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অতি দীনভাবে অন্য ভক্তদের মধ্যেই একপাশে বসে পড়লেন। তখন হৃদয় এগিয়ে গিয়ে ভগবান

দাসেব কাছাকাছি হয়ে বলল, 'আমার মামা আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন। ঈশ্বরের কথা শুনলে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না। কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েন—নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।'

বাবাজীর কৌতূহল হলো। তখনকার মতন অনাচারী বৈষ্ণবের নিন্দাবাদ বন্ধ রেখে রামকৃষ্ণ ও হৃদয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ করে তাঁদের পরিচয়াদি জেনে নিতে লাগলেন। হৃদয় লক্ষ্য করছিল যে, কথাবার্তার মধ্যেই কণ্ঠী ফিরিয়ে বাবাজী জপ করছেন। হৃদয়ের কি খেয়াল হ'ল, বাবাজীকে উদ্দেশ ক'রে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা বাবা! আপনি তো সিদ্ধ হয়েছেন, তবে আর এই নাম জপ কেন?' বাবাজী বললেন, 'তা ঠিক। তবে নিজের প্রয়োজনে এসব এখন করি না। এখন যা করি সবই লোকশিক্ষার জন্যে। যাতে আমার দেখাদেখি লোকে এসব করে। নয়ত তারা যে সবাই ভ্রষ্ট হয়ে যাবে!'

বাবাজীর কথাবার্তায় বেশ চড়া আত্মাভিমানের সুর ছিল। রামকৃষ্ণের কানে সেটি বড় কটু শোনাল। ভগবানদাস তো সিদ্ধ হয়েছেন—সবাই তো তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তবুও কেন এই অহঙ্কার? এই অহংভাব? রামকৃষ্ণ মনে করতেন 'আমি,' এই সর্বনামটির সার্থক ব্যবহার তখনই হয়, যখন 'আমি' হয় ঈশ্বরের দাস, যখন 'আমি' হয় তাঁর হাতের যন্ত্র! তাই বাবাজীর অহংভাবের কথাগুলি শুনে অবজ্ঞাভরে দাঁড়িয়ে উঠে রামকৃষ্ণ বললেন, 'সিদ্ধ হয়েও তোমার এত অহঙ্কার? তুমি লোকশিক্ষা দেবার অহঙ্কার করছো, আবার সমাজ থেকে তাড়িয়েও দিচ্ছ! এত অধিকার কে তোমায় দিল? এমন কি, নাম জপ করবে না ছাড়বে, এ সিদ্ধান্তও কি তুমি নিতে পারো? লোকশিক্ষার কথা বলছ—কিন্তু শিক্ষা দেবার তুমি কে? যাঁর জগৎ তিনি না শেখালে তুমি শিখাতে পারো?'

তখন রামকৃষ্ণের কথাগুলি সাধারণ বাক্য ব'লে মনে হচ্ছিল না। যেন ঐশী প্রেরণায় ঋদ্ধ কোনো উপলব্ধি, বহু ব্যবহারে যা জীর্ণ হয়ে যায় নি। বাক্য ও অর্থের সীমানা পেরিয়ে অতিদূরলোকে যার ব্যঞ্জনা। যেখানে লক্ষ্যবস্তু কোনো একজন বা দু'জন ব্যক্তি নন—লক্ষ্য সমগ্র মানবসমাজ। সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা ছিল তা কখন ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, কেউ জানে না। ছিন্ন কন্থার মতন কটিদেশের বস্ত্রখানিও শিথিল হয়ে খসে পড়েছে। সমগ্র দেহাবয়ব উন্মুক্ত নগ্ন; স্থির প্রত্যয়দৃঢ় স্তব্ধ দণ্ডায়মান ভঙ্গী—অপূর্ব তেজে, আশ্চর্য জ্যোতিতে সারা মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত।

সত্যের একটা আলাদা শক্তি আছে। বহুকাল এমন বলদৃপ্ত কথা ভগবানদাস শোনেন নি। ভক্তি আর বিনয়ের চোরাপথ বেয়ে যা তাঁর কাছে গড়িয়ে এসেছে তা সত্য নয়, চাটুবাদ। ভগবান দাসও সিদ্ধমানব। তিনি উপলব্ধি করলেন, যা তিনি শুনলেন তা সত্যাশ্রিত জ্ঞান। তাকে গ্রহণ না করলে তাঁর এতদিনের সাধনা ক্ষুণ্ণ হবে। বিস্মৃতির অতলে ডুবে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল, তিনিই সর্বকর্মের প্রেরণা। ঈশ্বর কেউ নন। সে ভুল তাঁর ভেঙেছে। রামকৃষ্ণের কাছে তিনি অনন্ত কৃতজ্ঞ। এরপর দু'জনের মধ্যে যে বাক্যালাপ হয়েছিল তা ঐশী দীপ্তিতে উজ্জ্বল। তার আঁচটুকু শুধু দু'জনের মধ্যেই নিমগ্ন ছিল। কথোপকথনের সময়েই ভগবানদাস বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইনিই সেই মহাপুরুষ যিনি 'চৈতন্যাসনে' দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন রামকৃষ্ণকে তিনি ভুল বুঝেছিলেন, তাই তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন ভগবানদাস। বিদায়ের পূর্বে দু'জনের মধ্যে যথার্থই প্রীতির প্রসার

হয়েছিল।

নদীয়ায় থাকাকালীন রামকৃষ্ণের মধ্যে আধ্যাত্মিক উচ্চভাবের বিকাশ হয় নি। কিন্তু যে ঘটনাটি কেন্দ্র ক'রে তাঁর ভাবাবেশ হয়েছিল তা ঘটে নদীবক্ষে। নৌকার উপরে বসে ছিলেন রামকৃষ্ণ। হঠাৎ যেন দিব্যদর্শন হলো। দেখলেন, ছুটতে ছুটতে আসছে দুটি সদানন্দ কিশোর ; গলানো সোনার মতন তাদের গায়ের রঙ। হাত তুলে তাঁর দিকে হাসতে হাসতে আসছে। তারপর নিকটে এসে তারা তাঁর দেহের মধ্যে লীন হয়ে গেল। পূর্ণ জ্ঞানে রামকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে, কিশোর দু'জনের একজন চৈতন্য, অন্যজন চৈতন্য-সখা নিত্যানন্দ। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছিলেন যে নদীয়ায় থাকাকালীন এই দর্শনানন্দ তাঁর হয় নি কারণ, চৈতন্যের যথার্থ জন্মস্থান বর্তমানে নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।
চৈতন্যের সঠিক জন্মস্থান নিয়ে যে গবেষণা চলছে সম্ভবত সেটিও এই ঐশী ঘটনার প্রামাণিকতা সমর্থন করবে।

১৮৭১ সালের জুলাই মাস ; টাইফয়েড জ্বরে শয্যাগত হলেন মথুর। তারপর মাত্র কয়েকদিন রোগভোগের পরেই দেহত্যাগ করলেন। মথুরের দেহত্যাগের সময় রামকৃষ্ণ সেখানে স্থূল শরীরে উপস্থিত ছিলেন না। সারদানন্দ মনে করেন যে, সে সময় রামকৃষ্ণ যদিও তাঁর দক্ষিণেশ্বরের ঘরটিতে ছিলেন, তবুও দিব্য শরীরে উপনীত হয়ে ভক্ত মথুরকে মৃত্যুর পরপারে সেই পুণ্যলোকে পেঁৗছে দিয়েছিলেন। সেদিন ঠিক বেলা পাঁচটায় রামকৃষ্ণের ভাব ভঙ্গ হয়েছিল। তারপর বাহ্যদশাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'মথুরের পুণ্য আত্মা মা জগদম্বা দিব্যরথে উঠিয়ে নিলেন।' বলাবাহুল্য ক'লকাতার জানবাজারের বাড়িতে সেদিন ঠিক বেলা পাঁচটাতেই মথুর দেহত্যাগ করেন।
কিছুদিন পরে মথুরের বন্ধুস্থানীয় একজন রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা বাবা! মথুরের কি হবে? তার কি পুনর্জন্ম হবে?'
সেদিন রামকৃষ্ণ সুনিশ্চিত কোনো উত্তর দেন নি। শুধু বলেছিলেন, 'মথুরের তো ভোগ কাটে নি! তাই আবার তাকে জন্মাতে হবে। তবে এবার সে রাজা হয়ে জন্মাবে।' কথাগুলি বলেই রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গান্তরে চলে যান।

১২

সারদা এবং চন্দ্রা

রামকৃষ্ণ কামারপুকুরে এসেছিলেন ১৮৬৭তে। সারদাদেবীর সঙ্গে সেই তাঁর শেষ দেখা। তারপর বেশ ক'টি বছর কেটে গেছে। এখন সারদাদেবী পিত্রালয়ে, জয়রামবাটীতে—আর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে। ক'টি বছরের ব্যবধানে সারদা বড় হয়েছেন। তিনি এখন পূর্ণ যুবতী —শান্ত, গভীর। নিঃশব্দে গৃহকর্ম করেন—মানুষের আপদবিপদে দুঃখিত হন, যথা-সাধ্য সেবা করার চেষ্টা করেন। জীবনধারা গতানুগতিক ভাবে ব'য়ে চলেছে—কোথাও আত্মপ্রচারের দম্ভ নেই। লোকের চোখেও তাই যেন তিনি নেহাতই সাদামাটা। সেদিন তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং সখীদের মধ্যে কম মানুষই ছিলেন যাঁরা তাঁর মধ্যে মহাভাবসাধিকার বিকাশ-সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন।

তেরো বছর বয়সের এক কিশোরীর চোখ দিয়ে দেখা রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সারদাদেবীর ধারণাটি কিন্তু খুব স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ছিল। তারপর তো অনেকগুলি নিঃসঙ্গ বছর কেটে গেছে। কিন্তু রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহবন্ধন যে পূর্বনির্দিষ্ট ছিল সারদাদেবী তা জানতেন। ফলে স্বামী চেনা নিয়ে তাঁর কোনো অকারণ উৎকণ্ঠা হয় নি। স্বামীর প্রতি তাঁর যে প্রেম, তা ছিল একেবারে কামগন্ধহীন। অপ্রাকৃত সে প্রেমের স্পর্শ তাঁকে নির্ভয় করেছে; অধিকারিণীর সচেতনতা থেকে, ঈর্ষা-বিদ্বেষের কলুষ থেকে মুক্ত রেখেছে। প্রেমানুষঙ্গে সারদাদেবী সর্ব-ক্ষণই দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি আছেন মনে করতেন। তবুও বাহ্য অস্তিত্বে রামকৃষ্ণের নিকটতম হবার বাসনা মাঝে মাঝেই তীব্র হতো। তখন এই ব'লে নিজেকে সান্ত্বনা দিতেন যে, সময় হ'লে ডাক আসবেই। বাস্তবিক, সেই ডাকটুকু শোনার অপেক্ষাতেই সারদাদেবী বসে ছিলেন।

কিন্তু সময় শুধু উদাসীন নয়, নিষ্ঠুরও। অপেক্ষার প্রহর শেষ হলো না—ডাকটুকুও এলো না। এদিকে কি সব যেন গালগল্প ছড়িয়েছে ওঁর নামে—নিত্যনতুন সে সব গুজব ভেসে আসছে দক্ষিণেশ্বর থেকে। ওঁর আচরণ, ব্যাভার-সাভার যেন কেমনতরো, বেহুঁশ! জয়রামবাটীর মানুষজন তাঁকে নিয়ে রঙ্গ-তামাসা করে। পাগল মানুষের বউ ব'লে সখীদের কাছেও সারদা যেন অনুকম্পার পাত্রী। সারদার যুবতী মনেও ধন্দ জাগে। কামারপুকুরে যখন ছিলেন, তখন তো দিব্যি ভালোমানুষ! তবে কি ইতিমধ্যে এতসব ঘটে গেছে! হয়ত তাই; কারণ সেও তো আজকের কথা নয়। কতদিন পেরিয়ে গেছে তারপর। কিন্তু তেমনটি যদি হয়, তবে তো আর ডাক শোনার অপেক্ষায় থাকা চলে না। আর ডাকবেই বা কে? মানুষটার তো হুঁশই নেই! হয়ত সারদাকে এখন ওঁর সত্যিই দরকার! আর স্ত্রীরও তো সেটিই কর্তব্য—অনুক্ষণ অসুস্থ স্বামীর পাশটিতে থাকা। সুতরাং আর অপেক্ষা নয়। মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন সারদা। এমনভাবে নিজেকে আর সরিয়ে রাখবেন না।

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে সত্যটুকু তাঁকে জানতেই হবে এবং অনতিবিলম্বে। সারদাদেবীর যখন মানসিক অবস্থা এমনটি তখন তিনি অষ্টাদশী যুবতী। বছরটি ১৮৭২।

ফাল্গুনের দোলপূর্ণিমা বসন্তকালের একটি মহোৎসব। কিংবদন্তী যে, সেকালে কৃষ্ণ ও শ্রীরাধা এই দোলপূর্ণিমার দিন দোলায় ব'সে দোল খেতেন। একালেও তাই দোলাতে যুগল-মূর্তি বসিয়ে দোল দেওয়া হয়। তাছাড়াও, দোলপূর্ণিমা হলো শ্রীচৈতন্যের মর্ত্যে আবি-র্ভাবের দিন। দোল উৎসব, রঙের উৎসব—শুকনো আবীর এবং রঙগোলা জল ছুঁড়ে দেহমন রাঙানোর উৎসব। এইদিন ভক্তেরা ক'লকাতায় এসে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতে স্নান ক'রে পুণ্যার্জন করে।

সেবার জয়রামবাটী গ্রাম থেকেও সারদাদেবীর দূরসম্পর্কীয়ারা ক'লকাতায় এসে গঙ্গাস্নান করবেন, ভাবলেন। সারদাদেবীর বাসনা তিনিও ওদের সহযাত্রিনী হন। কিন্তু পিতার অভিমত ছাড়া আত্মীয়ারা কোন্ ভরসায় তাঁকে সঙ্গে নেন! পিতা রামচন্দ্রের কানে সে কথা গেল। তিনি বুঝলেন সারদা কেন ক'লকাতা যেতে চেয়েছেন। যাহোক, তিনি নিজেই সারদাকে সঙ্গে ক'রে ক'লকাতা আনবেন স্থির করলেন।

সেকালে জয়রামবাটী ও ক'লকাতার মধ্যে রেল যোগাযোগ ছিল না (আজও নেই)। ধনীরা আসতেন শিবিকায়—অন্যেরা পায়ে হেঁটে। সারদাকেও পায়ে হেঁটেই আসতে হয়েছিল। অনভ্যস্তা সারদা পথচলার এই ধকল সইতে পারলেন না। যাত্রাপথ হ্রস্ব করতে ব্যাকুলা সারদাকে ক্ষমতার অধিক পরিশ্রম করতে হলো। ফলে জ্বরবিকারে আক্রান্ত হলেন তিনি। এদিকে মেয়ের ওই অবস্থা দেখে রামচন্দ্রও বিব্রত। কোনোরকমে পথের ধারে এক চটিতে মেয়ের আশ্রয় ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। অসহায় সারদা রোগযাতনায় বিছানায় শুয়ে মুহূর্ত গুনছেন আর ভাবছেন কখন দেখা পাবেন। এদিকে জ্বরবিকার বেড়েই চলেছে।

সেরাত্রে এক আশ্চর্য স্বপ্নদর্শন হলো। প্রবল জ্বর বিকারের মধ্যেও সারদা যেন খানিকটা স্বস্তি পেলেন। পরবর্তীকালে সারদাদেবী নিজেই সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন: 'জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছি—লজ্জাসরমের বালাই নেই, এমনি শরীরের অবস্থা। তখন দেখলাম আমার পাশে একজন রমণী এসে বসলো। মেয়েটির রং কাল, কিন্তু এমন সুন্দর রূপ আগে কখনও দেখি নি। আমার পাশে বসে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো—আঃ! কি ঠান্ডা নরম হাত! যেন গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে গেল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কোত্থেকে আসছ গা?" মেয়েটি বললো, "দক্ষিণেশ্বর থেকে।" কথা শুনে অবাক হয়ে বললাম, "দক্ষিণেশ্বর থেকে? মনে করেছিলাম আমিও দক্ষিণেশ্বর যাব, তাঁর সেবা করবো। কিন্তু পথে জ্বর হয়ে যাওয়ায় আমার ভাগ্যে এসব আর হলো না।" মেয়েটি বললো, "কেন হবে না? দক্ষিণেশ্বরে তুমি যাবে বই কি, একটু সেরে উঠলেই যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যেই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।" আমি তখন বললাম, "আহা! তুমি কি ভালো! তা তুমি আমাদের কে হও গা?" মেয়েটি বললো, "আমি তোমার বোন হই।" আমি ভারি নিশ্চিন্ত হলাম; বললাম, "আঃ! তাই তুমি এসেছ!" তারপরেই সেদিন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

পরদিন সকালেই সারদার জ্বর তখনকার মতন ছেড়ে গেল। রামচন্দ্র স্থির করলেন পথের

মধ্যে নিরুপায় উদ্বেগ নিয়ে চুপ করে বসে থাকার চেয়ে, পথ চলাই সারদার পক্ষে শ্রেয়। সুতরাং আবার পথ চলা শুরু হলো। সৌভাগ্যবশত খানিকদূর পথ চলার পর সারদার জন্যে একখানি শিবিকাও পাওয়া গেল। এদিকে সারদার আবার জ্বর আসছিল। তবে জ্বর বেশি নয়; সঙ্গে বিকারও নেই। সারদাও কাউকে কিছু বললেন না। অবশেষে পথের শেষ হলো। রাত ন'টা নাগাদ সারদাদেবী আর রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে এসে পেঁছিলেন।

সারদাকে ওই অবস্থায় দেখে সেরাতে রামকৃষ্ণ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরেই সারদার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন। দুঃখ ক'রে বারবার বলতে লাগলেন, 'আর কি আমার মথুর আছে যে তোমার যত্নআত্তি করবে?' তবে মথুরের অভাবও তিনি বুঝতে দিলেন না। সারদার ওষুধপথ্য ইত্যাদির সব ব্যবস্থা নিজেই করলেন। দিন তিন-চারের মধ্যেই সারদা বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন। তখন নহবৎঘরে শাশুড়ি চন্দ্রার সঙ্গে সারদারও থাকবার ব্যবস্থা হলো। সারদাও আশ্বস্ত; চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটেছে। কে বলে রামকৃষ্ণ পাগল? এমন প্রকৃতিস্থ স্বামী ক'জনের ভাগ্যে জোটে! তাঁর জন্যে কত চিন্তা, কত মনোযোগ! মনে মনে সারদা ভারি উৎফুল্ল—এখন থেকে প্রতিদিন স্বামীকে দেখতে পাবেন, তাঁর সেবা করতে পারবেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে—রামকৃষ্ণ তো সারদাকে ইতিপূর্বেই দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসতে পারতেন; তাঁর ইচ্ছাই তো এ ব্যাপারে যথেষ্ট! তবে তিনি তা করেন নি কেন? সারদানন্দ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, সাধারণ মাপকাঠি দিয়ে রামকৃষ্ণের আচরণের বিচার করা যায় না। ঈশ্বরেই যিনি সব কামনা-বাসনা সমর্পণ করেছেন, আমাদের খণ্ড বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বোঝার চেষ্টা সমীচীন নয়। তাঁর সব কাজের প্রেরণা তো ঈশ্বর! ঈশ্বরই তাঁকে কর্মে প্রবৃত্ত করেছেন। সুতরাং স্বেচ্ছায় কোনো কাজে তিনি প্রবৃত্ত হবেন কেন? পরিকল্পনা ক'রে কাজ করার কথা ভাবতেও তাঁর ভয় হতো। (এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা বলি। একদিন দেখলেন হৃদয়রাম একটি বাছুরের গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। রামকৃষ্ণ অবাক, জানতে চাইলেন—কেন অমন ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। হৃদয় বললে, 'বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। দু'এক বছরের মধ্যেই বলদ হয়ে যাবে—তখন চাষের কাজে লাগিয়ে দেব।' হৃদয়ের কথা শুনে রামকৃষ্ণ স্তম্ভিত! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ভাবমূর্চ্ছা হলো। বাহ্যদশা ফিরে এলে রামকৃষ্ণ দুঃখ ক'রে বলেছিলেন, 'দ্যাখ্! বিষয়ী মানুষ কেমন ভবিষ্যতের জন্যে সব যোগাড় করে আনে। একটা বাছুর ধরে এনেছে, বড় ক'রে সেটাকে চাষে যুতে দেবে ব'লে। সব সময়েই ফন্দি আঁটছে, মতলব করছে ভবিষ্যতের জন্যে। হায়! এরা কি কখনও ঈশ্বরে নির্ভর করতে পারবে! এরই নাম মায়া!')

এ ছাড়াও আর একটি দিকের কথা সারদানন্দ বলেছেন। রামকৃষ্ণের কাছে সারদাদেবী এসেছেন—এখন তাঁর সংযমের পরীক্ষা। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় এই আগমন ঘটেছে; অতএব ঈশ্বরই স্থির করবেন কখন তাঁকে এই সংযমের পরীক্ষা দিতে হবে। বস্তুত, এই সংযমের পরীক্ষাই তাঁর সাধনার শেষ পর্যায়। পরবর্তী আঠারো মাস রামকৃষ্ণ ও সারদা ঘনিষ্ঠ ভাবে বাস করেছেন। পাশাপাশি এক খাটে শুয়েছেন। কিন্তু কখনও সংযম ছিন্ন হয় নি। সারদাদেবী বলতেন যে, তখনকার দিনগুলি ছিল অবিচ্ছিন্ন আনন্দ আর সুখের দিন। কামগন্ধহীন বিবাহিত জীবনের পরিপূর্ণ তৃপ্তির দিন। এমন সম্পর্ক কি ক'রে সম্ভব হয়েছিল তা

বলতে পারবো না—তা আমাদের চিন্তারও অগম্য। সুতরাং, শুধু বিশ্বাস করা ছাড়া আমাদের করণীয় কিছু নেই।

সারদাদেবী সম্পর্কে রামকৃষ্ণ বলতেন, 'ও যদি এত ভালো না হতো, আত্মহারা হয়ে যদি আমাকে আক্রমণ করতো, তা হ'লে সংযমের বাঁধ ভেঙে আমার দেহবুদ্ধি আসতো কি না, কে বলতে পারে? বিয়ের পর মা-কে ব্যাকুল হয়ে বলেছিলাম, যেন সারদার ভেতর থেকে কামভাব এককালে দূর হয়ে যায়। এখন ওর সঙ্গে একত্রে বাস ক'রে বুঝেছি যে, মা আমার প্রার্থনা শুনেছেন।'

একদিন রামকৃষ্ণের পদসেবা করতে করতে সারদাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা! আমি কে বলতে পারো?' রামকৃষ্ণ তখনই উত্তর দিলেন; বললেন, 'কেন, তুমি তো মা! যিনি মন্দিরে বিরাজ করছেন, যিনি আমায় গর্ভে ধারণ করেছেন—ওই যিনি এখন নহবৎখানায় বাস করছেন, আর যিনি আমার পদসেবা করছেন; এঁরা সবাই আমার মা। এটাই সত্য। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলেই তোমাদের আমি ওই রূপে দেখি।'

আর একদিনের কথা—সারদা নিদ্রিতা। সেদিন যুবতী স্ত্রীকে নিদ্রিতা দেখে রামকৃষ্ণ নিজের মনের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মনকে সম্বোধন ক'রে রামকৃষ্ণ বললেন, 'মন! ওই তোমার সামনে যুবতী স্ত্রী—নারী দেহের সব ঐশ্বর্য নিয়ে নিদ্রিতা। লোকে এই নারী-দেহ ভোগ করার জন্যে লোভীর মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে। নারীদেহ ভোগ করলে দেহসুখের পরিপূর্ণ তৃপ্তি হয়। কিন্তু আত্মপ্রীতির জন্যে দেহভোগ করলে মন দেহতেই আবদ্ধ থাকে। সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে না। মন, বলো তুমি কি চাও! ভাবের ঘরে চুরি হয় না। পেটে এক মুখে এক ক'রে থেক না। সত্য বল, নারীদেহ চাও না ঈশ্বর চাও। যদি নারী চাও, ওই দেখ নারী তোমার সামনেই। এখনই বাসনা পূর্ণ করে ফেলো!' এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই মন যেন অজান্তেই কামপরবশ হয়ে সারদার দেহ ছুঁতে গেল; তখনই কুণ্ঠিত হলো মন—ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হলেন রামকৃষ্ণ। সেদিন আর তিনি বাহ্যভূমিতে নেমে আসতে পারেন নি।

রামকৃষ্ণের এইরকম সমাধিস্থভাব দেখতে দেখতে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন সারদা। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে তাঁর উদ্বেগ হতো। রামকৃষ্ণের ভাবভঙ্গ হ'তে বিলম্ব হ'লে সারদা ভয় পেতেন। তখন জেগে থাকতেন, চুপটি ক'রে বসে দেখতেন, কখন আবার স্বামীর সমাধি হয়। বাহ্যদশায় ফিরে সারদাকে অমনভাবে দেখে, রামকৃষ্ণ একরকম জোর করেই তাঁকে নহবৎ-খানায় পাঠিয়ে দিতেন যাতে অবশিষ্ট রাতটুকু সারদা ঘুমাতে পারেন।

এদিকে, কামারপুকুরে যেমনটি শিখিয়েছিলেন, এখানেও তেমনি ক'রে হাতে ধরে সারদাকে নিত্যকর্ম শেখাতে লাগলেন। রামকৃষ্ণ মনে করতেন যে, স্ত্রীরূপে ভক্তরূপে সারদাকে তিনিই সবকিছু শেখাবেন। ব্যবস্থাও সেইরকমই করলেন। কেমন ক'রে লণ্ঠনে পলতে পরাতে হয়, কেমন ক'রে লোকের বাড়ি গিয়ে ব্যবহার করতে হয়, কেমন ক'রে পরিবারের লোক-জনদের সঙ্গে শিষ্টাচার পালন করতে হয়, কেমন ক'রে ধ্যানে বসতে হয়, কেমন ক'রে পূজাদিকর্ম করতে হয়, ব্রহ্মজ্ঞান পেতে হলে কেমন ক'রে মনকে সংযমী করতে হয়, ইত্যাদি। রামকৃষ্ণের শিক্ষার মধ্যে তুচ্ছ মহৎ ব'লে কোনো ভেদজ্ঞান থাকতো না।

কিছুদিন আগে সারদাদেবী তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমাকে তোমার কি মনে হয়?'

সেদিন রামকৃষ্ণ তাঁকে যে উত্তরটি দিয়েছিলেন, যেন তারই সমর্থনে অবশেষে তাঁর জীবনের এক স্মরণীয় সাধনা সম্পন্ন করলেন তিনি। ঘটনাটি নিবেদন করি। মে মাসের ২৫; জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিক। অমাবস্যা তিথি। এই তিথিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দেবীর বিশেষ পূজা হয়। সেবারও তাই হয়েছে—তাছাড়াও, নিজের ঘরে জগন্মাতার পৃথক পূজার আয়োজন করেছেন রামকৃষ্ণ।

মন্দিরের পূজায় হৃদয় ব্যস্ত থাকবে তাই রাধাকান্ত মন্দিরের পূজারী তাঁর কাজ শেষ ক'রে রামকৃষ্ণকে সাহায্য করতে এলেন। সারদাদেবীকে পূজার সময় উপস্থিত থাকতে বলে পাঠালেন রামকৃষ্ণ। সারদা যখন তাঁর ঘরে এলেন, তখন রামকৃষ্ণ পূজায় বসেছেন।

পূজারীতির প্রথম বা পূর্বকৃত্য হলো পূজাদ্রব্যগুলি শোধন করা। মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে বা বিশেষ মুদ্রাসহযোগে এই কৃত্য সম্পন্ন করা হয়। উত্তরাস্যা বা পূর্বাস্যা হয়ে পূজারী বসেন। আলপনা আঁকা দেবীর কাষ্ঠাসনটি থাকে পূজারীর সামনে বা তাঁর বাঁ পাশে।

রামকৃষ্ণ পূর্বকৃত্য সমাধা করলেন তারপর সারদাকে দেবীর জন্য নির্দিষ্ট কাষ্ঠাসনে বসতে বললেন। সারদার তখনই প্রায় আধ্যাত্মিক উচ্চভাবাবস্থা—সুতরাং মন্ত্রমুগ্ধের মতন তিনি স্বামীর আদেশ পালন করলেন।

এবার রামকৃষ্ণ মন্ত্রঃপূত জল ছিটিয়ে সারদাকে শুদ্ধ করলেন; তারপর দেবীজ্ঞানে সারদাকে অভিষিক্ত করে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন, 'হে দেবী, হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী, হে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী—সিদ্ধিদ্বার খুলে দাও। এঁর দেহমন পবিত্র কর। এঁর মধ্যে আবির্ভূতা হও। সকলের কল্যাণসাধন কর।' অভিষেকের পর রামকৃষ্ণ তাঁকে ষোড়শবিধ উপচারের সঙ্গে পঞ্চতত্ত্ব (ক্ষিতি, অব, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) দান ক'রে নিখিল বিশ্বের অধীশ্বরী, সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে সারদার পূজা করলেন। পূজার পরে ভোগ। নিবেদিত ভোগের খানিকটা তুলে রামকৃষ্ণ সারদার মুখে দিলেন। সারদার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত হলো। তিনি সমাধিস্থ হলেন। এরপর রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। এমন ভাবমগ্ন অবস্থায় দুজনেই রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রম করলেন। তৃতীয় প্রহরের খানিক আগে রামকৃষ্ণের বাহ্যসংজ্ঞার কিছু লক্ষণ দেখা গেল। সেই অর্ধবাহ্যদশায় সারদাদেবীকে আত্মনিবেদন করলেন রামকৃষ্ণ। এই নিবেদনই তাঁর শেষ নিবেদন। এই আত্মনিবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সারা জীবনের সমস্ত সাধনার ফল ও জপের মালা দেবী সারদার পায়ে বিসর্জন দিলেন। রামকৃষ্ণের শেষ সাধনা সমাপ্ত হলো।

এমনিভাবে প্রায় একবছর পাঁচমাস কাল দক্ষিণেশ্বরে কাটিয়ে ১৮৭৩ সালের অক্টোবর কি নভেম্বর মাসে কামারপুকুরে ফিরে গেলেন সারদা।

পরের বছর নাগাদ এমন একজন মানুষের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হলো, যিনি মথুরের শূন্যস্থান অনেকখানি পূরণ ক'রে উদার হাতে রামকৃষ্ণের সেবাভার নিতে পেরেছিলেন। মানুষটির নাম শম্ভুচরণ মল্লিক। রামকৃষ্ণ তাকে রসদ্দার বলে ডাকতেন। মল্লিকমশাইয়ের অনেক পড়াশুনো—নানা ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ বিস্তর পড়েছেন। এই মল্লিকমশাই সর্বপ্রথম রামকৃষ্ণকে বাইবেল পাঠ করে শোনান আর নাজারেথের অধিবাসী যীশুর পবিত্র জীবন-কাহিনীর কথা বলেন। হিন্দুদের কাছে যীশু হলেন খ্রীষ্টা। বাইবেল ধর্মগ্রন্থ

এবং যীশুর পবিত্র জীবনকথা শোনার পর থেকেই, এই ধর্মমতের কথা জানবার কৌতূহল রামকৃষ্ণের হয়েছিল। একদিন অদ্ভুত উপায়ে তাঁর সে বাসনা পূরণও হলো। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের দক্ষিণদিকে মল্লিকদের বাগান বাড়ি। রামকৃষ্ণ সে বাগানে বেড়াতে যেতেন, মাঝে মাঝে বাগানবাড়ির বৈঠকখানায় বিশ্রাম করতেন। বৈঠকখানা ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো ছিল মহাসাধকদের অনেকগুলি পূর্ণাবয়ব চিত্র। একটি চিত্র ছিল মাতা মেরীর—কোলে তাঁর বালক যীশু। সে ঘরে যখনই যেতেন এই ছবিখানির দিকে তিনি তাকিয়ে থাকতেন। একদিন এমনি তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছেন, তাঁর মনে হলো দেবজননী ও দেবশিশুর অঙ্গ থেকে জ্যোতিরশ্মি বার হ'য়ে তাঁর দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হলো। আর তখনই তাঁর মনোভাবের বদল হয়ে গেল। ঠিক যেমনটি গোবিন্দরায়ের সাহায্যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার সময় ঘটেছিল, ঠিক তেমনি মনের অবস্থা তাঁর। আজন্মলালিত হিন্দু সংস্কারগুলি কোন্ নিভৃত অন্তরালে তলিয়ে গেল—হিন্দু দেবদেবীদের প্রতি প্রেম অনুরাগ যেন কোথায় হারিয়ে গেল। তখন তাঁর হৃদয় ভরে গেছে যীশু ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মবিশ্বাসে। সে এক আশ্চর্য অবস্থা—কাতর হ'য়ে মা জগদম্বাকে ডেকে উঠলেন রামকৃষ্ণ, 'মা, আমাকে দিয়ে একি করাচ্ছিস ?' কিন্তু এই আকুলতা সত্ত্বেও মনের ভাবের একটুও বদল হলো না। বরং মানস চোখে অন্য চিত্র দর্শন হলো। দেখলেন, খ্রীশ্চান পাদরীগণ যীশুমূর্তির সামনে ধূপ জ্বালিয়ে, দীপের আরতি সাজিয়ে যীশুর প্রার্থনা করছে। প্রার্থনার সেই আঁচটুকু রামকৃষ্ণও পেলেন। যখন দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন, সেই মুগ্ধভাব তখনও কেটে যায় নি। পরপর তিনদিন ওই ধ্যানেই অভিভূত হয়ে ছিলেন রামকৃষ্ণ ; এমনকি মন্দিরে ঢুকে মা-কে দর্শন করার কথাও তাঁর মনে হয় নি। তৃতীয়দিন সন্ধ্যা নাগাদ যখন পঞ্চবটীতলে পায়চারি করছেন, তখন দেখলেন একজন দীর্ঘকায় মানুষ, ধপধপে ফরসা গায়ের রঙ, সৌম্য চেহারা, অভিজাত ভঙ্গীতে তাঁর দিকে হেঁটে আসছেন। দেখেই মনে হলো মানুষটি বিদেশী। বড় বড় দুই চোখ তাঁর মুখের শোভা অপূর্ব করেছে ; নাসিকার অগ্রভাব ঈষৎ চাপা ব'লে সেই সৌন্দর্য আরও বেড়েছে। অবাক হ'য়ে রামকৃষ্ণ ভাবতে লাগলেন, কে ইনি ? তখনই যেন অন্তরের গভীর থেকে কে বলে উঠল, 'ইনিই যীশু ; মহাযোগী, অভিন্ন ঈশ্বর এবং মানবপ্রেমিক যীশুখ্রীস্ট ! মানুষের মুক্তির জন্যে ইনি হৃদয়ের শোণিত দান করেছেন—মানুষের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন।' দেবমানব যীশু রামকৃষ্ণের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপরেই মিলিয়ে গেলেন রামকৃষ্ণের শরীরে। সেদিন থেকেই রামকৃষ্ণের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, যীশুও অবতার—স্বয়ং ঈশ্বর তিনি।

রামকৃষ্ণের অগ্রজদের মধ্যে উত্তরজীবী ছিলেন শুধু রামেশ্বর। তা তিনিও চলে গেলেন ; যে মাসে সারদা কামারপুকুরে ফিরে এসেছিলেন সেই মাসে। সেটি ১৮৭৩ সালের অক্টোবর মাস।

রামেশ্বরের সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকতো। এর জন্যে রামেশ্বর নিজেই অনেকখানি দায়ী ছিলেন। উদার, নির্লিপ্ত, সংসার-অনভিজ্ঞ রামেশ্বর প্রায়ই ঘটি বাটি থেকে শুরু ক'রে পরনের কাপড়, মায় লোটা কম্বলও দান করে দিতেন। সংসারের অসুবিধা হলে বলতেন, 'ভাবছো কেন ? ওসব আবার হবে।'

অক্ষয়ের মৃত্যুর পর রামেশ্বরই রাধাকান্ত মন্দিরের পূজারীর কাজটি পান। কিন্তু সংসার দেখতে প্রায়ই তাঁকে কামারপুকুরে ছুটতে হতো। তখন তাঁর জায়গায় অন্য পুরোহিত নিযুক্ত হতেন। ফলে মাসান্তে যা পেতেন বরাদ্দের চেয়ে তা অনেক কম। তা সেবার কামারপুকুর যাবার আগে ভবিষ্যদর্শী রামকৃষ্ণ বললেন, 'তাহলে আপনি বাড়ি যাচ্ছেন? যান, তবে যদি বেশিদিন বাঁচতে চান তাহলে আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করবেন।' কিন্তু কামারপুকুরে পোঁছেই রামেশ্বর সেবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে রামকৃষ্ণের কথাটি তাঁর মনেই হয় নি।

অবশ্য রামেশ্বর নিজেও খানিকটা আঁচ করতে পেরেছিলেন—শেষ দিনটির জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। দিন চারপাঁচ আগের একটি ঘটনা থেকে সেটি অনুমান হয়। সেদিন বাড়ির সামনের আমগাছটি কাটা হচ্ছিল। রামেশ্বর তা দেখতে পেয়ে হঠাৎই বলে উঠলেন, 'ভালই হলো! আমার কাজে লাগবে।' অন্তিম মুহূর্তের আগে গৃহবিগ্রহ রঘুবীরের মন্ত্র জপ করতে করতেই রামেশ্বরের চৈতন্যলোপ হয়। তারপর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই, মাঝরাত নাগাদ, সব শেষ। রামেশ্বর চেয়েছিলেন তাঁর শবদেহটি যেন শ্মশানে দাহ করা না হয়। যে পথের ধুলো মাড়িয়ে অগণিত ভক্ত সাধু প্রতিদিন তীর্থদর্শনে যান, সেই পথেরই ধারে যেন তাঁর শব দাহ করা হয়। এমন অদ্ভুত ইচ্ছার কারণ জানতে চাইলে রামেশ্বর বলেছিলেন, 'কত ভক্ত সাধুর পদরজ ধারণ ক'রে আছে ওই পথ। তার কিছুটা আমিও পাব। ধন্য হবে আমার আত্মা।' রামেশ্বরের অন্ত্যেষ্টির পর ভস্মাবশেষ ক'লকাতায় নিয়ে এলো রামেশ্বরের ছেলে রামলাল। তারপর সেই ভস্মাবশেষ গঙ্গায় ভাসিয়ে দিল। রামলালই পরে রাধাকান্ত মন্দিরের পূজারীর কাজে পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল।

রামেশ্বরের মৃত্যু সংবাদটি কেমন ক'রে বৃদ্ধা মায়ের কাছে পোঁছে দেবেন সেই ভাবনাতেই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন রামকৃষ্ণ। না জানি বৃদ্ধা কত কাতর হবেন—হয়ত তাঁর প্রাণ সংশয়ও হতে পারে। অথচ, এ বিষম সংবাদ না জানিয়েও উপায় নেই। তাই বৃদ্ধা মাকে প্রথম শোকের আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্যে আগে মন্দিরে গিয়ে জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করলেন। তারপর সজল চোখে মায়ের কাছে গিয়ে দুঃসংবাদটি জানালেন। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'ভেবেছিলাম, ওই কথাটি শুনে মা হতজ্ঞান হবেন। হয়ত তাঁর প্রাণসংশয়ও হতে পারে। কিন্তু দেখলাম, ফল হলো বিপরীত। মৃত্যু সংবাদ শুনে অল্পস্বল্প দুঃখ প্রকাশ ক'রে, আমাকেই শান্ত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মা, বললেন, "বাবা! সংসার অনিত্য, সকলকেই একদিন না একদিন মরতে হবে। তাহলে বৃথা শোক করা কেন?" মায়ের মুখে মুখে ওই কথা শুনেই ভাবলাম জগন্মাতা আমার কথা শুনেছেন। তানপুরার কান মুচড়ে যেমন সুরকে চড়িয়ে দেওয়া হয়, তেমনি মায়ের মন উচ্চগ্রামে চড়িয়ে দিয়েছেন মা জগদম্বা। পার্থিব শোকদুঃখ মা-কে আর স্পর্শ করছে না। আমি অভিভূত হ'য়ে বারবার মা জগদম্বাকে মনে মনে প্রণাম করলাম। সেদিন থেকে মায়ের জন্যে আমার আর কোনো দুর্ভাবনা হয় নি।

এক বছরের মধ্যেই (১৮৭৪) সারদা আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন। এবারও পায়ে হেঁটেই পথটুকু পার হন। সঙ্গে অনেক পুণ্যার্থিনী ছিলেন। পথ চলতে বারবার পিছিয়ে

পড়ছিলেন সারদা—সঙ্গিনীরা দাঁড়িয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু এমনভাবে পথ চলায় অহেতুক বিলম্ব হচ্ছে দেখে, সারদা তাঁর সঙ্গিনীদের এগিয়ে যেতে বললেন। এর অন্য একটি কারণও ছিল। যেখান দিয়ে তাঁরা হাঁটছিলেন, সেটি ছিল ডাকাত ঠেঙাড়েদের জায়গা। মানুষগুলো নিষ্ঠুর—হত্যা আর লুণ্ঠনই তাদের পেশা। সারদা চান নি যে, সন্ধ্যের পর এখানে পেঁছে তাঁরা সবাই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস! সঙ্গিনীরা এগিয়ে যেতে পারলেও সারদা পারলেন না। অকুস্থলে যখন গিয়ে পেঁছলেন তখন রাত গভীর হচ্ছে। চারদিকে থমথম করছে অন্ধকার। একা এই নির্জন অন্ধকারে সারদা খুবই ভয় পেয়ে গেলেন। হঠাৎ দেখলেন, অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে একজন সবল দীর্ঘকায় মানুষ, হাতে লম্বা একখানা বাঁশের লাঠি নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। সারদা দেখেই বুঝলেন যে মানুষটা ঠেঙাড়ে। কিন্তু করার কিছু নেই; তাই নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটার সামনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকটা তখন এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে এসে বেশ কর্কশ স্বরে সারদার কাছে জানতে চাইল, তিনি কোথায় যাবেন। এই সময় চকিতেই সারদার ভয় পাওয়া মুখখানি দেখতে পেল লোকটা। আর তখনই তার কঠিন স্বর নরম হয়ে গেল। ঠেঙাড়েটা তখন সারদাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ভয় নেই মা; আমার বউ আমার সঙ্গেই আসছে। এখুনি সে এসে পড়বে।' লোকটার মুখে মাতৃ সম্বোধন শুনে সারদার ভয় ডর সব কোথায় চলে গেল। কিসের প্রেরণায় এমন বিশ্বাস জন্মালো যে, লোকটাকে ডাকাত ঠেঙাড়ে ব'লে মনেই হ'লো না। সারদা নির্ভয়ে তাকে বললেন, 'বাবা, আমার সঙ্গিনীরা আমাকে ছেড়ে অনেক এগিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমার স্বামী দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। তুমি বাবা আমায় সেখানে নিয়ে চল। আমার স্বামী তোমায় খুব আদর যত্ন করবেন।' বলতে বলতে ঠেঙাড়ের বউও এসে হাজির। সারদা তাকেও বললেন, 'মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা। পথ হারিয়ে ভাবছিলাম কি করবো, এমন সময় বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।' ঠেঙাড়ে আর তার বউ সত্যিই মেয়ের মতন সারদাকে সে রাত্তিরটা তাদের কাছে রাখলো। তাঁর খাওয়া-শোওয়ার ব্যবস্থা করলো। পরদিন সারদাকে তাদের সঙ্গিনীদের কাছে পেঁছে দিল। এরপর ওই দম্পতি অনেকবার দক্ষিণেশ্বরে এসেছে, আর প্রতিবারই রামকৃষ্ণ নিজে তাদের দেখাশোনা যত্নআত্তি করেছেন।

আগের মতন এবারও নবত্‌ঘরেই সারদা বাস করতে লাগলেন। বাইরে থেকে দ্বিতল নবত্‌খানাটি খুবই সুদৃশ্য আর প্রশস্ত দেখায়। কিন্তু নবত্‌খানার অনেকখানি জায়গা অধিকার করে আছে চওড়া খিলানওলা চাতাল। বাজানদারেরা ওই চাতালে বসেই গান বাজনা করে। ফলে নবতঘরের মূল বাসস্থানের পরিসর সংকীর্ণ হয়ে গেছে। দরজাগুলিও নিচু মাপের। অথচ ওই সংকীর্ণ অংশেই সেদিন কেমন করে দু'জন মানুষ পাশাপাশি বাস করে গেছেন, সে কথা আজকের মানুষ ভাবতে পারবে না। কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও সারদা মুখ ফুটে কোনো অভিযোগ করেন নি। শুধু মল্লিকমশাই সেদিন খানিকটা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত সারদার কষ্টের লাঘব করবার জন্যে মন্দির চত্বরের বাইরে বড়সড় একটি চালাঘর বানাবার উপযুক্ত জমি কিনেছিলেন।

জমি তো হলো; কিন্তু চালাঘর তুলতে কাঠের প্রয়োজন। এত কাঠ কোথায় পাবেন? তখন রামকৃষ্ণের আর এক ভক্ত কাপ্তেন বিশ্বনাথ, কাঠ যোগানোর ভার নিলেন। নেপাল

রাজসরকারের কাঠগোলার দায়িত্ব ছিল কাপ্তেন বিশ্বনাথের উপর। গঙ্গার ওপারেই এই কাঠের গোলা। একদিন খানকয়েক গুঁড়ি জলে ভাসিয়ে দিলেন বিশ্বনাথ। কিন্তু রাত্তিরে প্রবল জোয়ার এলো—একখানি গুঁড়ি জলে ভেসে গেল। শোনা যায় এই দুর্ঘটনার জন্য হৃদয়রামের কাছে সারদাকেই অপদস্থ হতে হয়েছিল। সারদার প্রতি হৃদয়ের তীব্র ঈর্ষাভাব ছিল; তাই সুযোগ পেলেই সারদাকে সে অপদস্থ করতো। এ-এক বিচিত্র মানসিকতা। হৃদয়ের মতন মানুষ যখন কোনো মহাপুরুষের সান্নিধ্যধন্য হয়, তখন সাধ করে তারা সেই কৃপার আসনটি স্ত্রীদেরও ছেড়ে দেয় না। বলাবাহুল্য, হৃদয়রামও এই জটিল মানসিকতা থেকে মুক্ত ছিল না। যাহোক, বিশ্বনাথ আর একটি গুঁড়ি পাঠিয়ে দিলেন এবং চালাঘরটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হলো। ঘর তৈরি হ'লে সারদা সেখানেই চলে এলেন। একজন পরিচারিকা তাঁকে গৃহকর্মে সাহায্য করতো। সারদা নিজের হাতেই পাক করতেন। পাক করা অন্নাদি প্রথমে জগদম্বাকে উৎসর্গ করতেন। তারপর দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে রামকৃষ্ণকে ভোজন করাতেন। কখনও কখনও সারদাকে দেখাশোনার জন্যে রামকৃষ্ণও তাঁর ঘরে আসতেন, আবার মন্দিরে ফিরে যেতেন। কেবল, একরাত্রে বৃষ্টিতে আটকা পড়ায় রামকৃষ্ণ মন্দিরে ফিরতে পারেন নি।

বছরখানেক ওই চালাঘরে থাকবার পর কঠিন আমাশয় রোগে সারদা অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। সেবার শম্ভুই তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। খানিকটা আরাম হবার পর সারদা জয়রামবাটীতে চলে এলেন। কিন্তু জয়রামবাটীতে এসে সারদা একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। রোগ এত বৃদ্ধি পেল যে, জীবনসংশয় দেখা দিল। রামকৃষ্ণের কানেও কথাটি গেল। সব শোনার পর নাকি আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন, 'তাই তো রে হৃদে, ও কেবল আসবে যাবে, মনুষ্যজন্মের কিছুই করা হবে না!' রামকৃষ্ণ একথা কেন বলেছিলেন তা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য যদি ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়, তাহলে তো উদ্বেগটুকু অকারণ বলেই মনে হয়। কারণ, সারদা তো ইতিমধ্যেই সমাধিস্থ হয়েছেন! তবে এ কথা রামকৃষ্ণ কেন বলেছিলেন? তাহলে কি তিনি সারদাকে আরও মহৎ কোনো ভূমিকায় দেখতে চেয়েছিলেন? আমাদেরও সেই রকমটিই অনুমান হয়। পরবর্তী কালে সারদাদেবীকে আমরা সমগ্র রামকৃষ্ণসংঘের মঙ্গলময়ী মাতৃরূপে দেখেছি। রামকৃষ্ণের ওই উক্তি থেকে আর একটি সংশয়ও কেটে যায়। সারদাদেবীর জীবনাবসান যে শীঘ্র ঘটবে না, রামকৃষ্ণের সেদিনের উক্তিটি যেন তা সপ্রমাণ করেছিল।

কিন্তু সারদাদেবীর অন্যরকম ভাবনা—তিনি যে কোনোদিনও আরোগ্যলাভ করবেন, তা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। তাঁর ধারণা হয়েছিল দিন বুঝি ঘনিয়ে আসছে। সবসময় বিমর্ষ মনমরা হয়ে থাকতেন। তখনই প্রায়োপবেশন করে রোগযাতনার হাত থেকে মুক্তি পাবার কথা ভাবতে শুরু করেন। বছর কয়েক আগে চন্দ্রাও হত্যাদান করেন। সেবার গুজব রটেছিল, রামকৃষ্ণ নাকি উন্মাদ হয়ে গেছেন। সারদা ভাবলেন তিনিও ওই পথটিই বেছে নেবেন। কিন্তু পাছে কেউ বাধা দেন, তাই মা ভাই বা কারও কাছে ইচ্ছাটি প্রকাশ করলেন না। পিতা রামচন্দ্রও গত হয়েছেন। সুতরাং একদিন সকলের অলক্ষ্যে মন্দিরে গিয়ে ধরনা দিলেন। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা হত্যাদানের পরেই দেবী প্রসন্না হ'য়ে সারদাকে রোগমুক্তির ঔষধ বুঝিয়ে দিলেন। সেই প্রত্যাদিষ্ট ঔষধ খেয়েই সারদা দ্রুত নীরোগ হয়ে

উঠেছিলেন।

১৮৭৬ সাল নাগাদ বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হ'য়ে শম্ভু মল্লিক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রামকৃষ্ণ একদিন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে হৃদয়কে বললেন, 'শম্ভুর প্রদীপে তেল নেই দেখে এলাম।' রামকৃষ্ণের কথাই সত্য হলো। দিন কয়েকের মধ্যেই শান্ত স্থিরভাবে শম্ভু মল্লিক দেহ রাখলেন। মৃত্যুর ক'টা দিন আগেও শম্ভু তাঁর বন্ধুদের কাছে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'মরণ নিয়ে আমার কোনো দুর্ভাবনা নেই। আমি পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে যাবার জন্যে তৈরি হ'য়েই আছি!'

সেই বছরের মার্চ মাসে চন্দ্রাদেবীও দেহ রাখলেন। তখন তাঁর বয়স চুবানব্বই। জীবনের শেষদিকে মন আর ইন্দ্রিয় স্ববশে রাখতে পারতেন না তিনি। দেহ জরাজীর্ণ, মনও তাই। হয়ত সেজন্যেই ইদানিং হৃদয়কে মোটেও সইতে পারতেন না। বৃদ্ধার ধারণা হয়েছিল, অক্ষয়কে সেই মেরেছে। এখন চেষ্টা করছে রামকৃষ্ণ আর সারদাকে মেরে ফেলতে। রামকৃষ্ণকে প্রায়ই বলতেন, 'হৃদুর কথা শুনে খবরদার কোনো কাজ করবি নি।' দক্ষিণেশ্বর বাগানের কাছে একটা পাটকল ছিল। মধ্যাহ্নে কলের শ্রমিকরা কিছুক্ষণের ছুটি পেতেন; তারপর বাঁশি বাজিয়ে আবার তাদের কাজে আনা হতো। কলের ভোঁ শুনে বুড়ি ভাবতেন বুঝি বা বৈকুণ্ঠে শঙ্খধ্বনি হচ্ছে। ফলে প্রতিদিন যতক্ষণ না শঙ্খধ্বনি হতো, ততক্ষণ বুড়ি আহারে বসতেন না। বলতেন, বৈকুণ্ঠে এখনো লক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ হয় নি—শাঁখ বাজে নি, এখন খাবেন কেমন ক'রে! ছুটির দিনই মুশকিল হতো। কিছুতেই আহারে বসানো যেত না। পরে নানা কথায় ভুলিয়ে বৃদ্ধাকে খাওয়ানো হতো—সে কাজটি কখনও রামকৃষ্ণ করতেন, কখনও হৃদয়।

চন্দ্রা গত হবার দিনচারেক আগের কথা। একটিবার দেশের বাড়িতে যাবার দরকার পড়ল হৃদয়ের। কিন্তু তার মনে ক'দিন থেকেই একটা অনিশ্চিত অমঙ্গলের ইশারা উঁকি দিচ্ছিল। রামকৃষ্ণকে সেকথা জানাতে তিনি বললেন, 'তাহলে তুই বরং থেকেই যা!' দিনচারেক কেটে গেল। অসাধারণ কিছু ঘটলো না। চন্দ্রাও দিব্যি স্বাভাবিক। চতুর্থ দিনের সন্ধ্যেটা রামকৃষ্ণ চন্দ্রার কাছেই কাটালেন। ছেলেবেলার কত কথা আর গল্প ব'লে বুড়ির মন খুশি ক'রে দিলেন তিনি। মাঝরাত নাগাদ মাকে শুইয়ে রামকৃষ্ণ নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

সকাল আটটা নাগাদ ঘুম ভাঙতো চন্দ্রার। কিন্তু সেদিন আটটা বেজে গেল, তবুও চন্দ্রা ওঠেন না দেখে যে মেয়েটি তাঁর দেখাশোনা করতো, সে ওপরে গিয়ে ডাকাডাকি শুরু করলো। কোনো সাড়া নেই। দরজার পাল্লায় কান পেতে মেয়েটি শুনতে পেল বুড়ির গলা থেকে কেমন বিকৃত একটা শব্দ বার হচ্ছে। হাঁকাহাঁকি ক'রে মেয়েটি তখন রামকৃষ্ণ আর হৃদয়কে ডেকে আনল। হৃদয় দরজার হুড়কো ভেঙে ভেতরে ঢুকলো। সবাই দেখলেন, চন্দ্রা সংজ্ঞাহীন।

তিনদিন ওই অবস্থাতেই চন্দ্রা বেঁচে রইলেন। গঙ্গার জল আর দুধ ফোঁটাফোঁটা ক'রে তাঁকে খাওয়ানো হতো। তারপর যখন অন্তিমকাল প্রায় উপস্থিত তখন বৃদ্ধাকে অন্তর্জলি করা হলো। মায়ের পায়ে ফুল দিয়ে অঞ্জলি দিলেন রামকৃষ্ণ। শান্তভাবে চন্দ্রা ইহধাম ছেড়ে চলে গেলেন।

যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে সন্ন্যাসীর জীবন গড়ে ওঠে, সেখানে জীবন ও জগতের

সব অভিজ্ঞতাই অসার, অপ্রকৃত। জীবন, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি কোনো অনুষ্ঠানেই সন্ন্যাসীর যোগ দেওয়া বারণ। এদের কোনো অস্তিত্বই তাঁর কাছে স্বীকৃত নয়। সুতরাং, সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণকেও সেদিন সন্ন্যাসধর্মের মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। মায়ের শেষকৃত্য তিনি পালন করতে পারেন নি। সে কাজ করেছিল ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল। কিন্তু পুত্রোচিত এই পরম কর্তব্যটি পালন করতে না পারার জন্যে রামকৃষ্ণের মনে ক্ষোভ ছিল। তাই শ্রাদ্ধাদি শেষ হবার পর রামকৃষ্ণ স্থির করলেন যে তর্পণ করবেন। কিন্তু যতবার অঞ্জলি ভরে মায়ের আত্মার উদ্দেশে জলদান করতে যান ততবারই তাঁর আঙুলগুলি অসাড় হয়ে যায়, আর অসংলগ্ন আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। একবার, দু'বার—কিন্তু প্রতিবারই রামকৃষ্ণ অসফল হলেন। তখন অক্ষম রামকৃষ্ণ হুহু ক'রে কেঁদে ফেললেন। নিজের অক্ষমতার কথা ব'লে সজল চোখে মায়ের আত্মার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।...... একজন শাস্ত্রজ্ঞ পরে রামকৃষ্ণকে বলেছিলেন যে, এ ব্যাপারে তাঁর পশ্চাত্তাপের কারণটি অমূলক। আধ্যাত্মিক সাধনায় যিনি ইতিমধ্যেই উচ্চভূমিতে পেঁছে গেছেন, শাস্ত্রবিহিত কোনো কর্মেরই তিনি অধিকারী নন। সুতরাং তেমন কর্মে ব্রতী হতে গেলে বাধা আসবেই। ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্নটি এখানে ওঠেই না!

১৩

কেশব সেন

চন্দ্রাদেবীর দেহাবসান হয় ১৮৭৬ সালের মার্চ মাসে—আগের পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছে এই ঘটনা দিয়ে। ঠিক একবছর আগে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। সেটি হলো রামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ। এমন তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আগের পরিচ্ছেদে নেই; ইচ্ছাপূর্বকই সে কাহিনী উহ্য রেখেছি, যাতে ঘটনাটি নিয়ে পুরো একটি অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে পারি। কেশব সেনকে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত একজন সমাজসংস্কারকরূপে জানি। তাঁর সম্পর্কে সামান্য আলোচনা ইতিমধ্যেই করেছি। এখন দেখা যাক তাঁর সংস্কারের ধারণাটি কি ছিল এবং রামকৃষ্ণের চিন্তা ও জীবনায়নের দ্বারা সেগুলি কেমনভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তির নির্বিচার প্রভুত্ব ও তার প্রভাব নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি। বিদেশী অধিকারের একটা মন্দ দিক হলো বিজিত দেশের পরানুকরণ-প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিতে বাছবিচার থাকে না; ক্রীতদাসের মতন বিদেশীর সবটুকু নকল করার মধ্যে বিজিত দেশের মানুষের বানর-সুলভ মনোভাব কাজ করে। অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে নির্বোধের মতন সে ভাবতে শুরু করে, বুঝি অনুকরণ করেই সেও একদিন জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনটি লাভ করবে।

পরাধীন ভারতকে ইংরেজের অনেক মহার্ঘবস্তু দেবার ছিল; যেমন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং, শিল্পকলা, আইনশাস্ত্র ইত্যাদি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুটি অনুদার বিশ্বাস সঙ্গে করে আনা ছাড়া ইংরেজ সেদিন ভারতবর্ষকে আর কিছু দিতে পারে নি। একটি ছিল নিরীশ্বরবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, অন্যটি যীশুকে ভগবানরূপে প্রচার। তত্ত্ব-দুটির মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা যেমন সুস্পষ্ট তেমনি সুস্পষ্ট, এদের সঙ্কীর্ণতা। যেখানে এই তত্ত্বদুটির জন্ম, সেই পাশ্চাত্য দেশেই এরা প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে; তারপর তত্ত্ব-দুটি যখন ভারতবর্ষে আমদানি হলো, তখন এখানকার আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ভাবমণ্ডল বিশৃঙ্খল করা ছাড়া আর কিছু দিতে পারে নি। এই মতাদর্শের সংস্পর্শে এসে সেদিনের ইয়ং ইণ্ডিয়া যে প্রবলভাবে নাড়া খেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অভিঘাতে ইয়ং ইণ্ডিয়া নতুন মূল্যবোধ গড়ে নিতে পারে নি। হয় সনাতন হিঁদুয়ানীর প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে এক চরম হতাশার মধ্যে তারা ডুবে গিয়েছিল; আর নয়তো উন্মাদের মতন খ্রীস্টধর্মের এমন এক নিকৃষ্ট ব্যাখ্যার কাছে আত্মবলি দিয়েছিল, যা কোনো মহৎ ভাবনাকে প্রশ্রয় দেয় না। (এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সেদিন সরকারী শিক্ষানীতির নতুন নতুন নানা সুবিধা-গুলি আত্মসাৎ ক'রে খ্রীশ্চান মিশনারীরা তৎকালীন যুবসমাজের মগজধোলাইয়ের কাজটি নিষ্পন্ন করার অবাধ সুযোগ পেয়েছিল।) যাহোক, অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যখন এদেশের ধর্মান্তরিত যুবসমাজের একটি শাখা এক দোআঁশিলা সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠে; সে

সংস্কৃতি না ছিল ঘরকা, না ঘাটকা। তারা সেদিন না হতে পেরেছিল ইংরেজের সমকক্ষ, না থাকতে পেরেছিল হিন্দু। নির্বোধ অনুকরণের জন্যে ইংরেজের সমাজ যেমন তাদের উপহাস করতো, তেমনি ভ্রষ্টাচার আর ধর্মদ্রোহিতার দরুন হিন্দুসমাজ তাদের ধিক্কার দিত।

পৌত্তলিকতা আর বহুঈশ্বরবাদের মধ্যে জড়িয়ে থাকা হিন্দুধর্মই ছিল সেদিন খ্রীশ্চান মিশনারীর আক্রমণের মূল লক্ষ্য। কিন্তু বেদবিদ্যায় অনধিকারী ও অজ্ঞ মিশনারীরা জানতো না যে, বেদগর্ভ ব্রহ্মই হ'লো হিন্দুর সব ঈশ্বরতত্ত্বের মূলভিত্তি। তাদের অভিযোগ ছিল যে, 'পৌত্তলিক হিন্দু কাঠ ও পাথরের কাছেও মাথা নোয়ায়।' সেদিন যারা এই অভিযোগ করেছিল, তাদের বেশীরভাগ ছিল প্রটেস্ট্যান্ট খ্রীশ্চান। ক্যাথলিক খ্রীশ্চানদের মূর্তিপূজারও বিরোধিতা তারা করতো। অবশ্য তাত্ত্বিক বিচারে ক্যাথলিকরা মূর্তিপূজার অনুসারী হলেও অন্য ধর্মের মূর্তিপূজা তারা সমর্থন করত না।

সেদিন মিশনারীদের এই স্থূল অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে বেশকিছু হিন্দু রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান যথোচিত থাকলেও এঁদের ভাবতে শেখানো হয়েছিল যে, বহু ব্যবহারে হিন্দুধর্ম জীর্ণ হয়ে গেছে এবং যুগধর্মের সঙ্গে তাল রেখে চলবার জন্যে এই ধর্মের সংস্কার হওয়া দরকার। কুসংস্কার ও অপ্রচলিত রীতিনীতিগুলি ছেঁটে ফেলে, তাকে (হিন্দুধর্ম) বিশ্বধর্মের উপযোগী ক'রে তোলা প্রয়োজন। সবধর্ম থেকেই কুসংস্কার ছাঁটাই করা যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে যে মানসিকতাটি বিশেষভাবে কাজ করেছিল, তা হলো পরাধীন জাতির হীনমন্যতা। আমরা এই হীনমানসবোধের নিন্দা করতে পারি, কিন্তু ভুললে চলবে না যে, সেদিন যাঁরা ধর্মসংস্কারকের ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা কোনো নিকৃষ্ট স্বদেশীয়ানার মোহে যে একাজ করেছিলেন, তা নয়। সে যুগের সংস্কারকরা মনে করতেন (অন্তত নিজের কাছেও) যে, রাজনৈতিক পরাধীনতা সত্ত্বেও এদেশের অধ্যাত্মবাদ কোনো রাজশক্তির কাছেই মাথা হেঁট করে নি। অধ্যাত্মবাদের মধ্যেই ভারতবর্ষের মানসিক শক্তি নিহিত; সুতরাং এই পথেই ভারতবর্ষকে তার হৃত অধিকার ফিরে পেতে হবে, এবং সেটিই হবে রাজনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের প্রথম পদক্ষেপ।

প্রথম সচেতন সংস্কারান্দোলনের সূচনা হয় উনিশ শতকে। রাজা রামমোহন রায় হলেন সে আন্দোলনের পথিকৃৎ। ১৭৭৪ সালে বাঙলাদেশের এক রক্ষণশীল হিন্দুব্রাহ্মণ পরিবারে রামমোহনের জন্ম হয়। মাত্র ষোলো বছর বয়সেই মূর্তিপূজাবিরোধী একটি পুস্তিকা প্রকাশ ক'রে, তিনি পরিবারের রক্ষণশীল ধর্মবিশ্বাসকে আহত করেছিলেন। এই ঘটনার পরেই তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। অনেক দেশ ঘুরে তিব্বতে আসেন; তিব্বতে এসে তিনি বৌদ্ধ অতীন্দ্রিয়বাদ নিয়ে নিবিড় চর্চা করেন। খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্মমতগুলি তিনি শ্রদ্ধা করতেন। সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, ইংরেজী এবং অনেকগুলি ইউরোপীয় ভাষায় তাঁর গভীর জ্ঞান, রামমোহনকে সে যুগের এক বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে পরিচিত করেছিল।

১৮২৮ সালে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন এবং 'যিনি এই নিখিলবিশ্বের স্রষ্টা ও পিতা—যিনি অনাদি ও সমস্ত অন্বেষার অতীত—সেই অপরিবর্তনীয় পরমসত্তার ধ্যানে ও আরাধনায়' নিবেদন করেন তাঁর সমাজকে। (ব্রাহ্মসমাজ, এই নামকরণের যথার্থ ইংরেজি তর্জমা করা যায় না। যাঁরা নিরাকার জীবনদেবতা তত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁদের উদ্দেশেই এই

সমাজের প্রতিষ্ঠা) ব্রাহ্ম সমাজের আরাধ্য ভগবান, নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম নন। তিনি হিন্দুর ঈশ্বর (দ্রঃ পঞ্চম অধ্যায়), ইসলামের আল্লা অথবা একেশ্বরবাদীর পরমপিতার সঙ্গে সমার্থক। একেশ্বরবাদীর পরমেশ্বরও নিরাকার, কিন্তু তাতে পিতৃত্ব আরোপিত। খ্রীস্টধর্মের অনেক উক্তি রামমোহন অবাধে গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু হিন্দুর অবতারবাদ যেমন স্বীকার করেন নি, তেমনি যীশুকেও অবতাররূপে মেনে নেন নি। খ্রীস্টধর্মের মতন হিন্দু ধর্ম থেকেও, বিশেষত উপনিষদের নির্বাচিত অংশগুলি উদ্ধৃত ক'রে রামমোহন তাঁর নিরাকার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যেই তাঁর ব্রাহ্মসমাজ ছিল অবারিতদ্বার। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মসমাজের মতাদর্শ যে আবেদনটি উপস্থিত করেছিল, ক্লাসিকাল হিন্দুধর্মের সমালোচকদের সামনে তা চ্যালেঞ্জের মতন এসে দাঁড়ায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বিপুল আয়তনকে এই ধর্মমত ঢেকে রাখতে পারে নি, কারণ ব্রাহ্মসমাজের তেমন কর্মদ্যোগ ছিল না। সমাজের মূল জোরটুকু ছিল সংস্কারমূলক পরিকল্পনায়। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসক হিন্দুর কুপ্রথাগুলি মেনে নিলেও, সমাজ তাদের উচ্ছেদের দাবিতে মুখর হ'য়ে উঠেছিল। সমাজ কোনোরকম ভেদপ্রথা মানত না—এমনকি সভ্যদের মধ্যেও কোনোরকম জাতিপ্রথা ছিল না। আর একটি বিষয়ে ব্রাহ্ম সমাজ সেদিন অগ্রকর্মীর ভূমিকা নিয়েছিল—সেটি হ'লো নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষান্দোলন।

১৮৩০ সালে দিল্লীর সম্রাট রামমোহনকে রাজা খেতাব দিলেন। (এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ১৮৭৭ পর্যন্ত রাণী ভিক্টোরীয়ার জন্য ব্রিটিশ রাজশক্তি কোনো রাজকীয় মর্যাদা দাবি করে নি।) যাহোক, রাজা খেতাব পাবার পর রামমোহনকে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে ইংল্যান্ডে পাঠানো হ'লো। সেখানে তিনি পার্লামেন্ট কমিটির সামনে ভারতবর্ষের বিচারপদ্ধতি ও রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ের উপর সাক্ষ্য দিলেন। সেদিন ইংল্যান্ডের বিদ্বজ্জন ও রাজনীতিজ্ঞরা বিস্ময় আর শ্রদ্ধার সঙ্গে এই মানুষটিকে দেখলেন। তারপর ইংল্যান্ডের কমন্সসভা যেদিন সতীদাহপ্রথা আইন-বিরুদ্ধ ব'লে ঘোষণা করল, সেইদিনটিতে রামমোহনও সেখানে উপস্থিত থেকে তাঁর স্বপ্ন সার্থক হ'তে দেখেছিলেন। ১৮৩৩ সালে ইংল্যান্ডে থাকতে থাকতেই মস্তিষ্কের পীড়ায় আক্রান্ত হ'য়ে হঠাৎই দেহত্যাগ করেন। ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে রামমোহনকে সমাহিত করা হয়।

সুতরাং রামমোহনের সঙ্গে মিলিত হবার কোনো সুযোগ রামকৃষ্ণ পান নি। অবশ্য রামমোহনের উত্তরসাধক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়েছিল। এগারো অধ্যায়ে সে সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছি। রামমোহনের মৃত্যুর আট বছর পরে দেবেন্দ্রনাথ সমাজের কর্তৃত্ব হাতে নেন। এই আট বছরের ব্যবধানে সংস্কার আন্দোলনের ধারাটি অনেক ক্ষীণস্রোত হ'য়ে গিয়েছিল। কর্তৃত্ব হাতে নিয়েই সমাজের পুনর্গঠনের কাজে দেবেন্দ্রনাথ উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর কর্তৃত্বাধীনে ব্রাহ্মসমাজ আগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দেবেন্দ্রনাথও মূর্তি বিরোধী ছিলেন। কিন্তু সমর্থন খুঁজতে তাঁকে অন্য ধর্মের দিকে তাকাতে হয় নি। এর মুখ্য প্রেরণা হিন্দুর উপনিষদ থেকেই তিনি আহরণ করেছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁকে হুঁশিয়ার থাকতে হয়েছিল যাতে চোরাপথে খ্রীশ্চান বিশ্বাসগুলি ব্যবহারিক ধর্মে ঢুকে না পড়ে। দেবেন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসাধক হলেন কেশবচন্দ্র। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এই একটি বিষয় নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়।

বয়সের বিচারে রামকৃষ্ণের চেয়ে দু'বছরের এবং দেবেন্দ্রনাথের চেয়ে প্রায় এক পুরুষের কনিষ্ঠ ছিলেন কেশব সেন। মোটামুটি এক স্বচ্ছল বাঙালী পরিবারে কেশব সেনের জন্ম হয়। তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন এক ইংরেজী স্কুলে। সংস্কৃত একেবারেই জানতেন না। হিঁদুয়ানী নিয়ে তাঁর সামান্যতম গর্ববোধও ছিল না। যীশুর মহান ব্যক্তিত্ব তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। খ্রীশ্চানদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের কারণ ছিল মাত্র একটি জায়গায়, যেখানে তারা একদেশদর্শী। কেশব মনে করতেন যে, যীশুর মতন মোজেস, বুদ্ধ এবং মহম্মদও মহামানব।

কেশবের অনুগামীরা তাঁর নয়া-খ্রীস্টবিশ্বাসটি আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতে এক নতুন খ্রীস্টধর্ম প্রবর্তিত হোক, যা যীশু খ্রীস্টের নামে জগতের সর্বধর্মের মিলন-সাধন ঘটাবে—কোথাও কোনো অবিরোধ থাকবে না। কেশব সেন প্রবর্তিত 'নববিধান' পত্রিকার শেষের দিকের এক সংখ্যায় এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার অংশ বিশেষ ছাপা হয়েছিল। প্রবন্ধের সেই অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি। 'ভারতবর্ষকে কে শাসন করছে—কোন্ সে শক্তি যা এই মুহূর্তে ভারতের ভাগ্যবিধাতা? সে শক্তি কি ইংরেজের বাহুবল, বেয়নেট আর কামান-বন্দুক—যার রক্তচক্ষুর শাসন এদেশের মানুষকে চিরানুগত ক'রে রেখেছে?……না। এ আনুগত্য অন্য পথে এসেছে। সে পথ আধ্যাত্মিক, সে পথ নৈতিক। তুমি জানো না কোন্ শক্তির পায়ের কাছে হৃদয় উজাড় ক'রে তুমি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছ—কে তোমায় বশ করেছে। শোনো বলি, সে শক্তি যীশুর প্রেম। ব্রিটিশ রাজশক্তি এখানে তুচ্ছ; যে মহাপুরুষ তাঁর বাণী ও বোধ দিয়ে এই বিশাল দেশটি এক সূত্রে গেঁথেছেন—যিনি তাঁর মহান হৃদয়ে ধারণ ক'রে রেখেছেন এই দেশের প্রতিটি মানুষের সুখদুঃখ, হাসি অশ্রুর অনুভূতি, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর—যীশু খ্রীস্ট। ভারতবর্ষরূপ এই মহামূল্যবান রাজমুকুটখানি শিরোপরে রাখার যোগ্যতা মহামানব যীশু ছাড়া আর কোনো শক্তির নেই; তাই যীশুর মাথাতেই ভারতবর্ষ মুকুটমণি হ'য়ে বিরাজ করছে।' কেশবের এমন মতামত প্রকাশের দরুন খ্রীশ্চান মিশনারী ও গোঁড়া হিন্দুরা যে রুষ্ট হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বলতে গেলে, কেশবের তৎকালীন কাজকর্মের ধারা মিশনারীদের কাছে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে এক বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর এই বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবের সম্পর্কটি ছিন্ন হয়ে যায়। নিরুপায় কেশব তখন নতুন এক সমাজের প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ। আন্দোলনের অন্য অংশের নেতৃত্ব দেবেন্দ্রনাথের হাতেই থেকে গেল। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন সমাজের নামকরণ হলো আদি ব্রাহ্মসমাজ।

কেশব ইংল্যাণ্ডে যান ১৮৭০ সালে। ইংল্যাণ্ডের মানুষ, বিশেষ ক'রে একেশ্বরবাদীরা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য ইংল্যাণ্ডের রাণী ভিক্টোরীয়াও তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছিলেন। এরপর কেশব সাক্ষাৎ করতে গেলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিসম্পন্ন ধর্মতত্ত্ববিদ এডওয়ার্ড পুশের সঙ্গে। কেশবের সঙ্গে ছিলেন আর একজন বিখ্যাত মানুষ—ভারতবন্ধু ম্যাক্স ম্যুলর। সেদিন এডওয়ার্ড পুশের সঙ্গে কেশবের আলোচনাটি ম্যাক্স ম্যুলর এইভাবে বর্ণনা করেছেন। 'আলাপাদির শেষে কথা উঠল যারা খ্রীশ্চান নয় এবং অন্য ধর্মীয় পরিবেশে যাঁরা জন্মেছেন ও মানুষ হয়েছেন তাঁদের মুক্তির

কি উপায় হবে! কেশব ও আমি বললাম যে, তাদেরও মুক্তি হবে। পুশে কিন্তু আমাদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। অবশ্য মুক্তি বলতে কি বোঝায় তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছিল। কেশব ব্যাখ্যা ক'রে বললেন যে, মুক্তি হলো ঈশ্বরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন মিলন। সেদিন কেশব বলেছিলেন, 'আমার ভাবনার মধ্যে ঈশ্বর কখনো অনুপস্থিত থাকেন না। আমার জীবন হ'লো চিরায়ত প্রার্থনা; এমন মুহূর্ত কদাচ আসে যখন ঈশ্বর-চিন্তায় আমি নিমগ্ন থাকি না।" সেদিন কেশবের কথার মধ্যে এমন এক হৃদ্যতা ছিল যা পুশের অন্তর স্পর্শ করেছিল। কেশবকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ বলে উঠেছিলেন, "তাহলে তোমার কথাই ঠিক।" এরপর পরম বন্ধুর মতন দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।' এই ছোট্ট আখ্যানটির উল্লেখ করলাম যাতে কেশবকে যথাযথ বুঝতে পারি। উত্তেজনার মুখোমুখি হ'য়েও কেশব আশ্চর্য সংযম দেখাতে পারতেন। সেদিন বৃদ্ধ ভালমানুষটির সংস্কারাচ্ছন্ন মন যুক্তির কথা না মানলেও কেশব ধৈর্যহারা হন নি।

১৮৭৫ সালে আর একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—ভারতীয় আর্য সমাজ। প্রতিষ্ঠাতার নাম স্বামী দয়ানন্দ। দয়ানন্দ বেজায় পণ্ডিত, সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বিস্তর জ্ঞান। দেবেন্দ্রনাথ আর কেশবের মতন তিনিও ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। তবে তাঁর আন্দোলনের ধারাটি ছিল অন্যরকম। ভারতবর্ষের ধর্মান্দোলনে তিনি সবরকম বিধর্মী প্রেরণার বিরোধী ছিলেন। স্বভাবেও দয়ানন্দ ছিলেন উগ্র। তাঁর যুদ্ধংদেহী মনোভাব আর্যসমাজের চরিত্রটি আধা-সামরিক ক'রে তোলে। একেশ্বরবাদ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণার সমর্থনে বেদের সুক্তগুলি ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত ধর্মবিশ্বাসে এমন উগ্র এক অহঙ্কার থাকত যা কখনো সাধারণ মানুষের মনের কাছাকাছি পেঁছয় নি। আর্য-সমাজ আন্দোলনের সব থেকে দৃঢ়ভূমি ছিল পঞ্জাব। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রদায়গত বিরোধের মধ্যে উৎকট ভাবে বেঁচে ছিল আর্যসমাজীদের সংস্কারান্দোলন।

এই দয়ানন্দের সঙ্গেও রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়েছিল। দয়ানন্দ তখন বাঙলাদেশ ভ্রমণে এসেছেন। মহেন্দ্রনাথ সে সাক্ষাতের কথা রামকৃষ্ণের মুখে শুনেই কথামৃতে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন (১৮৮৪ সালের ১১ অক্টোবর) 'হ্যাঁ, তাঁকে আমি দেখতে গিয়েছিলুম। তখন ওধারে একটা বাগানে সে ছিল। কেশব সেনের আসবার কথা ছিল। তা সে যেন চাতকের মতন কেশবের জন্যে ব্যস্ত হতে লাগল। (মানুষের তীব্র আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা বোঝাবার জন্যে রামকৃষ্ণ প্রায়ই চাতক পাখির জলতৃষ্ণার উদাহরণ দিতেন।) খুব পণ্ডিত সে। দেবদেবী সব মানতো—কেশব মানতো না! তাই বলতো, "ঈশ্বর এত জিনিস করেছেন আর দেবতা করতে পারেন না!" দয়ানন্দ ছিল নিরাকারবাদী। সেদিন কাপ্তেন (বিশ্বনাথ উপাধ্যায়) 'রাম রাম' করছিল। তা দয়ানন্দ তাকে ব্যঙ্গ করে বলল—"তার চেয়ে সন্দেশ সন্দেশ বল্‌" !' (দয়ানন্দ অবশ্য জপতপ করার পৃক্ষপাতী ছিলেন না।)

১৮৭৫ সালের মার্চ মাসের কোনো একদিন—রামকৃষ্ণ সেদিন সমাধিস্থ হয়েছেন। সেই ভাবাবিষ্ট অবস্থাতেই কেশবকে খুব দেখতে ইচ্ছে হলো তাঁর। অনেকদিন আগে একটিবার দেখেছিলেন। তখন কেশবের মতন তিনিও যুবক। দেখলেন, অন্য ভক্তদের সঙ্গে বসে কেশব ধ্যান করছেন। ওদের সমাজ তখনও ভাগ হয়ে যায় নি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই তখন ওদের শিরোমণি। অতগুলি ভক্তের সঙ্গে ব'সে ধ্যান করলেও রামকৃষ্ণ তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে সেদিন

ঠিক বুঝেছিলেন, যেন একমাত্র কেশবই যথার্থ ধ্যানীভাব অর্জন করতে পেরেছেন। সেই ভাবাবিষ্ট অবস্থার মধ্যেই রামকৃষ্ণ যেন স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, বিচিত্রবর্ণের লেজ ছড়িয়ে কেশব যেন ময়ূরের মতন বসে আছেন। তাঁর মাথায় বৈদূর্যমণি। ছড়ানো লেজ হলো তাঁর দলবল। মাথার মণিখণ্ডটি হ'লো খাঁটি কেশব—তাঁর জিদ, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর নেতৃত্ব।

কেশব তখন শিষ্যসাঙাতদের নিয়ে বেলঘরের বাগানবাড়িতে সাধনা করতেন। হৃদয়কে নিয়ে রামকৃষ্ণ একদিন কেশবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কাপ্তেনের দেওয়া ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে তাঁরা বাগানবাড়িতে যখন পেঁছিলেন তখন বেলা দুপুর। রামকৃষ্ণ সেদিন খুবই সাদা-মাটা পোষাক পরে এসেছিলেন। লাল পাড় একখানি ধুতি—কোঁচার খুঁটটি কাঁধের উপর ফেলা। গাড়ি থেকে নাববার সময় হৃদয় দেখলো যে, পুকুরঘাটের এক কোণায় দলবল নিয়ে কেশব বসে আছেন। কেশবকে দেখে হৃদয় সোজা তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল; তারপর ভগবান-দাস বাবাজীর কাছে যেমনটি বলেছিল তেমনি কেশবেব কাছেও বলল। 'আমার মাতুল এক-জন পরম ঈশ্বরভক্ত। হরিকথা বলতে হরিগান শুনতে তাঁর বড় সাধ। যখনই সে সব শোনেন তখনই ভাবসমাধি হয়। তিনি শুনেছেন আপনিও পরম ভক্ত। আপনার মুখ থেকে ঈশ্বরের মহিমার কথা শুনবেন ব'লে এতদূর ছুটে এসেছেন। আপনাকে দেখতেও তাঁর সাধ। এখন আজ্ঞা হ'লে তাঁকে আপনার কাছে নিয়ে আসি।' কেশব হ্যাঁ বললেন। হৃদয় ছুটে গেল রামকৃষ্ণকে আনতে। কেশব আর তাঁর দলবলও অধীর। রামকৃষ্ণের কথা শুনেছেন, এখন চাক্ষুষ দেখে কৌতূহল মেটাতে চান। কিন্তু মানুষটি কাছে এলে তাঁকে দেখে সবাই খুব নিরাশ হলেন। রামকৃষ্ণকে দেখে অতি সাধারণ লোক ছাড়া আর কিছুই তাঁদের মনে হলো না।

কেশবের কাছে এসে রামকৃষ্ণ বললেন, 'বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বরকে দর্শন করো? আমার বড় জানতে ইচ্ছে করে তিনি কেমন, তাই আমি তোমাদের কাছে এসেছি।' বলতে বলতে রামপ্রসাদের সেই বিখ্যাত গানটি গেয়ে উঠলেন—কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন। তারপর গানও শেষ হলো রামকৃষ্ণও সমাধিস্থ হলেন। রামকৃষ্ণের সেই ভাবাবস্থা দেখেও কিন্তু কেশব বা তাঁর সঙ্গোপাঙ্গদের মনের বিরূপ ভাব কেটে গেল না। সমস্ত ব্যাপারটিই তাঁরা ছলনা বা ভাঁড়ামি ব'লে ধরে নিলেন। কিন্তু হৃদয় যখন তাঁর বাহ্যচেতনা ফিরিয়ে আনতে রামকৃষ্ণের কানে ওঁ প্রণবমন্ত্র শোনাতে লাগল এবং সে প্রণব শুনতে শুনতে যখন রামকৃষ্ণের মুখখানি মধুর, সরল হাসিতে ভরে উঠল, তখন কেশবের মন থেকে সব সন্দেহ সব অবিশ্বাস দূর হয়ে গেল। রামকৃষ্ণ তখন তাঁর প্রিয় নীতিগল্পগুলি কেশব আর তাঁর দলবলদের শোনাতে লাগলেন। সেই অন্ধের হস্তীদর্শন আর বহুরূপী গির-গিটির বহুরঙ ধারণের গল্প। হাতীর এক এক অঙ্গ স্পর্শ করে অন্ধ যেমন খণ্ড ধারণা করে তেমনি ঈশ্বরও আমাদের কাছে খণ্ডভাবে প্রকাশ হন। ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ঈশ্বরের খণ্ড-রূপ দেখে ভাবে সেটিই আসল, সেটিই সত্য। সবাই তখন মুগ্ধ, অভিভূত। সরল ভাষায় রামকৃষ্ণ তাঁদের গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। এদিকে স্নানাহারের সময় অতীত হ'য়ে আবার যে উপাসনার সময় আগত, সে খেয়ালও তাঁদের থাকলো না। তাঁদের মনোভাবের এই বদল দেখে রামকৃষ্ণেরও খুব আমোদ হচ্ছিল। মৃদুমৃদু হেসে তিনি বললেন, 'দ্যাখো, গরুর পালে অন্য জানোয়ার এসে গেলে গরুর দল তাদের গুঁতোতে যায়।

কিন্তু পালে গরু এলে সবাই গা চাটাচাটি করে। তা আমাদেরও আজ সেই ভাব হয়েছে।' তারপর কেশবের দিকে চেয়ে রামকৃষ্ণ তেমনি ভাবাবেশে বলে উঠলেন, 'তোমার ল্যাজ খসেছে।' কেশবের স্যাঙাতদের কানে রামকৃষ্ণের মন্তব্যটি কটু শোনাল ; কেশবকে অপমান করা হলো ভেবে তারা যেন একটু অসন্তুষ্ট। রামকৃষ্ণ তখন তাদের বুঝিয়ে বললেন, 'দেখ, ব্যাঙাচির যদ্দিন ল্যাজ থাকে তদ্দিন সে জলেই থাকে। ডাঙায় উঠতে পারে না। কিন্তু ল্যাজ যখন খসে পড়ে, তখন জলে থাকে আবার ডাঙাতেও চরে বেড়ায়। তেমনি মানুষের যদ্দিন অবিদ্যারূপ ল্যাজ থাকে, তদ্দিন সে সংসার-জলেই থাকে। ওই ল্যাজ খসে গেলে সংসার ও সচ্চিদানন্দ, এই দুই রাজ্যেই মন বিচরণ করতে পারে। কেশব, তোমার মন এখন সেই ভাবভূমিতে পৌঁছে গেছে, তুমি সংসারে থাকতে পার আবার সচ্চিদানন্দেও থাকতে পার।'

সেই থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রভাবের মধ্যেই কেশব ছিলেন। অবশ্য বিচার না ক'রে তিনি নিজেকে সমর্পণ করে দেন নি। প্রথম প্রথম নিজের বিচারবুদ্ধির উপর যখন বিশ্বাস হারিয়েছেন, তখন দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের পাঠিয়ে দিয়েছেন । তারা ফিরে এসে রামকৃষ্ণের আচার-আচরণের কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছে। এমনকি রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উচ্চভাব সম্পর্কে যখন তিনি নিঃসন্দেহ তখনও দীর্ঘদিনের সংস্কার তাঁর মনে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। রামকৃষ্ণকে পুরোপুরি মেনে নিতে তিনি দ্বিধা করেছেন। তবুও রামকৃষ্ণের প্রভাব ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছিল—দু'জনের মধ্যে অনুরাগ গভীর হচ্ছিল। একজনের প্রতি অন্যজনের আকর্ষণ তখন এত তীব্র যে, পরপর কয়েকদিনের অদর্শনে দু'জনেই অস্থির হয়ে উঠতেন। হয় কেশব দক্ষিণেশ্বরে যেতেন, নয়ত রামকৃষ্ণকে তাঁর 'কমল কুটীরে' নেমন্তন্ন করে আনতেন। মাঝে মাঝে স্টীমার ভাড়া ক'রে একত্রে গঙ্গাবক্ষে বেড়াতে বেরোতেন। সঙ্গে অন্য ব্রাহ্মভক্তেরাও থাকতেন। তাঁর সহচরত্ব পেতে কেউ নিজেকে অযোগ্য ভাবতেন না।

কেশব তখন স্বনামধন্য পুরুষ—একজন ডাকসাইটে ধর্মগুরু। কিন্তু রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি কখনও কমে নি। দক্ষিণেশ্বরে যখনই আসতেন সঙ্গে ফলমূলের ডালি আনতেন—যেন গুরুদর্শনে এসেছেন। তারপর অনুগত শিষ্যের মতন রামকৃষ্ণের পায়ের কাছটিতে বসে কথাবার্তা বলতেন। রামকৃষ্ণ একদিন কৌতুক করে বলেছিলেন, 'কেশব তুমি এত মানুষকে বক্তৃতায় মুগ্ধ কর, তা আমাকে কিছু শোনাও ?' বিনয়াবনত কেশব বলেছিলেন, 'আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বেচতে বসবো ! তার চেয়ে আপনি বলুন, আমি শুনি। আপনার মুখ থেকে শোনা যে দুচারটি কথা লোককে বলি তারা তা শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়।'

রামকৃষ্ণ একদিন কেশবকে ব্রহ্মতত্ত্ব বোঝাচ্ছিলেন। বললেন, ব্রহ্ম মানলে ব্রহ্মশক্তিকেও মানতে হয়, কারণ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ। এই নিখিলবিশ্ব ব্রহ্মশক্তিরই সৃষ্টি। কেশব সে তত্ত্ব মেনে নিলেন। রামকৃষ্ণ তখন তাঁকে বললেন যে ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান—এই তিন পদার্থ এক, অভিন্ন। তিনে এক, একে তিন। কেশব তাও মানলেন। তখন রামকৃষ্ণ আবার বোঝালেন যে গুরু, ভগবান ও ভক্ত—এক অভিন্ন। কিন্তু কেশবের মনে দ্বন্দ্ব জাগলো। বিনীত হয়ে কেশব বললেন, 'আজ এই পর্যন্ত থাক—অধিক না এগোনোই শ্রেয়।' রামকৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন, 'তবে তাই হো'ক।'

১৮৭৮ সালে একটি কুৎসাকে কেন্দ্র ক'রে ব্রাহ্মসমাজ দু'টুকরো হয়ে যায়। কেশবের বালিকা কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে কোচবিহারের মহারাজা প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। বিবাহযোগ্যা যে কোনো হিন্দু কন্যার কাছে এমন প্রস্তাব আশাতীত সৌভাগ্য—সুতরাং কেশব রাজী হলেন। কেশব যে মেয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই রাজী হয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু লোকে অন্য কথা রটনা করতো। নিন্দে ক'রে তারা বলে বেড়াত যে, মহারাজার অর্থপ্রতিপত্তি ও সামাজিক মর্যাদা দেখে কেশব লোভী হয়ে উঠেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত মেয়ে তখনও নাবালিকা। এই বালিকা মেয়ের বিবাহপ্রস্তাবে রাজী হয়ে কেশব নিজের প্রতিজ্ঞাই ভঙ্গ করেছেন। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এতদিন যা ব'লে বেড়িয়েছিলেন সে সবই মিথ্যে হয়ে গেল। ফলে বিয়ের পরেই দুটি দলে বিরোধ শুরু হয়ে গেল। একদল রইল কেশবের সমর্থনে—অন্যদল ব'লে বেড়াতে লাগল কেশব ভণ্ড, কেশব প্রতারক। বিরুদ্ধবাদীরা মূল সমাজ ত্যাগ করে নতুন এক সমাজ গড়ল—নাম দিল সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ।

ভাগাভাগির খবর শুনে রামকৃষ্ণ খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। তবে বাল্যবিবাহ নিয়ে কেশবের বাড়াবাড়ি কোনোদিনই তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি বলতেন, 'জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে। যা ঈশ্বরাধীন তাদের অত নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আনা যায় না। কেন তবে কেশব অমনটি করতে গেল ? তবে কোচবিহারের মহারাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের কথা তুলে কেউ যদি তাঁর কাছে কেশবের নিন্দে করতো, তাহলে তাকে তিনি বুঝিয়ে বলতেন, 'কেন, নিন্দের কি করেছে কেশব ? সে সংসারী লোক, নিজের ছেলেমেয়ের যাতে কল্যাণ হয় তা সে করবে বৈকি ! তাছাড়া, ধর্মহানিকর কিছু তো সে করে নি ! বরং পিতার কর্তব্য পালন করেছে।' রামকৃষ্ণ অবশ্য ওদের ঝগড়ায় কোনো পক্ষাবলম্বন করেন নি ! দু'পক্ষের সঙ্গেই তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল।

অন্য পক্ষের ভার এক আকর্ষক ব্যক্তিত্ব ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। সমাজ ভাগ হবার পর তিনি হয়েছিলেন নতুন সমাজের নেতা। বিজয়কৃষ্ণ প্রায়ই রামকৃষ্ণকে দেখতে আসতেন। যার সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ হ'ত তাকেই বলতেন যে, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সাধক রামকৃষ্ণ। চোখ থাকতেও যারা অন্ধ তাদের জন্যে প্রায়ই আক্ষেপ করতেন। রামকৃষ্ণকে বলতেন, 'কলকাতার কত কাছে দক্ষিণেশ্বর, তাই গাড়ি ক'রে হোক, নৌকা করে হোক আপনার কাছে আমরা আসতে পারি। আমাদের এত কাছে আছেন বলেই আপনাকে চিনলুম না। যদি পাহাড়ের চূড়ায় বসে থাকতেন, মাইলের পর মাইল অভুক্ত থেকে পায়ে হেঁটে, পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে, যদি আপনার কাছে পেঁছিতে হ'ত—গাছের শেকড়বাকড় ধরে ঝুলতে হ'ত, তবেই বোধহয় বুঝতে পারতুম আপনি কি অমূল্যধন। সাধারণত সবাই আমরা ভাবি যাঁরা দূরে থাকেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁদের পেছনেই ছুটে মরি আর নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়ি।'

বিজয়কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি বল-তেন, 'বিজয় প্রায় পেঁছে গেছে—সে এখন আসল ঘরের পাশের ঘরটিতে রয়েছে আর ঢুকবে ব'লে দরজায় ঘা দিচ্ছে।'

দলাদলির আগে কেশব আর বিজয় একেবারে অভিন্ন ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁদের মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত ছিল না। তবে এঁরা দু'জনেই রামকৃষ্ণের কাছে আসতেন ব'লে তিনি ধরে

নিয়েছিলেন যে, একদিন না একদিন এঁদের বিরোধ মিটে যাবেই। তাই হলো। শ্রীম সেই ঘটনাটিই বর্ণনা করেছেন। ১৮৮২ সালের ২৭শে অক্টোবরের ঘটনা। রামকৃষ্ণের ঘরে বিজয় বসে আছেন। বিকেলবেলা। কেশব তাঁর দলবল নিয়ে এসে হাজির। একটা স্টীমার ভাড়া ক'রে এনেছেন। মন্দির চত্বরের ঠিক উল্টোদিকে নোঙর ক'রে রাখা আছে সেটি। রামকৃষ্ণ কি যাবেন? নিশ্চয়ই যাবেন, তবে একা নয়; বিজয়কেও সঙ্গে নেবেন। সেদিন দলবলের সঙ্গে বিজয়ও, জলবিহার করেছিলেন। অবশ্য স্বেচ্ছায় না চাপে পড়ে তা আমরা বলতে পারবো না।

কেশব ও বিজয়ের এই মুখোমুখি সাক্ষাৎ দু'জনার পক্ষেই সংকোচের কারণ হতে পারতো। কিন্তু রামকৃষ্ণ সে সুযোগ দিলেন না। স্টীমারে চড়ার আগেই হঠাৎ সমাধিস্থ হ'য়ে গেলেন। সে এক মহা ব্যাপার! কি ক'রে স্টীমারে তোলা হবে? ইতিমধ্যে অর্ধবাহ্যভাব হয়েছে—পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে খানিকটা চেতনা এসেছে। কিন্তু শরীর অবশ, শক্ত। চলাফেরা যন্ত্রবৎ। কোনোক্রমে একতলার কেবিনে তাঁকে নিয়ে আসা হলো। একটা চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হলো। কাউকেই তখন চিনতে পারছেন না। কেশব আর বিজয় মুখোমুখি ব'সে। ছোট্ট কেবিন ঘরটিতে ঠাসাঠাসি ক'রে ভক্তের দল—কেউ মেঝেতে দাঁড়িয়ে, কেউ ব'সে। দরজা জানালাগুলোও মানুষের চাপে বন্ধ হয়ে গেছে। ঘরের ভেতরে গুমোট ভ্যাপসা গরম। আর এত সব সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে কেশব ও বিজয় একা মুখোমুখি হ'য়ে বসে আছেন। সবাই উদ্‌গ্রীব—যেন দু'জনের মধ্যে যুদ্ধ বাধে বাধে, এমনি অবস্থা। সেদিন কিন্তু আশ্চর্য সংযম দেখিয়ে দু'জনেই শান্তভাবে কথাবার্তা বলছিলেন।

ক্রমে রামকৃষ্ণের সমাধিভঙ্গ হলো। আপনা আপনি অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, 'মা, আমায় এখানে আনলি কেন? ওরা তো বেড়ার ভেতর বন্দী—মুক্ত নয়। আমি কি ওদের মুক্তি দিতে পারবো?' একজন ব্রাহ্মভক্ত তখন আর একজন যোগীর কথা বললেন। তারা সবাই নাকি যোগীকে দর্শন করে এসেছে। ভক্তটি বললেন, 'বাবা! সেই যোগী নিজের ঘরে আপনার ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন।' রামকৃষ্ণ মৃদু হেসে নিজের দেহের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'খোলটা!' রামকৃষ্ণের তখন পূর্ণ বাহ্যাবস্থা। একসঙ্গে অনেকগুলি ভাবনা ভিড় করে এসেছে মনে। পূর্ণজ্ঞানীর মতন তিনি ভক্তের হৃদয়ের কথা বললেন! বললেন, ভগবান অন্তর্যামী। ভক্তের 'হৃদয় মধ্যেই' তাঁর আসন। বললেন, 'ভক্তের হৃদয় হ'লো ভগবানের বৈঠকখানা'—সেই তাঁর আবাসস্থান। স্বপ্নের কথা বললেন—সেটিই নাকি আমাদের জীবন। আর বললেন মায়ের লীলার কথা। বললেন, জগৎ যখন নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী সংসারের যাবতীয় জিনিস তুলে রাখে, ঠিক তেমনি। এরপর রামকৃষ্ণ ইংরেজী পড়া লোকের কথা নকল করতে লাগলেন। ফুট্-ফাট্, ইট্-মিট। খানিক পরে প্রেমোন্মত্ত হ'য়ে দুর্গা কালীর গান ধরলেন। সবাই বিভোর—আত্মহারা। মনে মনে ভাবছেন এমন আনন্দের হাট যেন ভেঙে না যায়। কেশবও তেমনি। স্টীমারের ক্যাপ্টেনকে আরও খানিক বেড়িয়ে আনতে বললেন। সবাই আনন্দ করছে—সেই সঙ্গে মুড়ি নারকেল খাওয়া চলছে।

তবুও যেন কেশব ও বিজয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হচ্ছে না—দু'জনেই সংকুচিত হয়ে বসে আছেন। সব দেখে শুনে রামকৃষ্ণ কেশবকে বললেন, 'ওগো! এই দেখ, বিজয়!' 'তোমাদের

দু'জনের ঝগড়া বিবাদ, যেন শিব ও রামের যুদ্ধ। রামের গুরু শিব। যুদ্ধ হলো আবার ভাবও হলো। কিন্তু শিবের ভূত প্রেত আর রামের বানরগুলোর মধ্যে ঝগড়া কিচিরমিচির আর যেন মেটে না। তোমার একটি সমাজ আছে; বিজয় ভাবছে, তারও একটি দরকার। তা এমনটি হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ তো স্বয়ং ভগবান! বৃন্দাবনের গোপিনীদের সঙ্গে নিজেই লীলা করছেন। তা সেখানে আবার জটীলে-কুটীলের কী দরকার? দরকার আছে বৈ কি! জটীলে কুটীলে না থাকলে যে রগড় হয় না! লীলা পোষ্টাই হয় না!' রামকৃষ্ণের কথার ধরনে সবাই উচ্চহাস্য করে উঠলো। কিন্তু রামকৃষ্ণের ব্যঙ্গ সত্ত্বেও কেশবের 'ভূতপ্রেত' আর বিজয়ের 'বানরগুলোর' মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ দীর্ঘদিন ধরেই চলেছিল।

কোচবিহার-সংক্রান্ত ঘটনা নিয়ে লোকের নিন্দা কুৎসা থেকে একটি সুফল লাভ হয়েছিল: পার্থিব জীবনের অহঙ্কার আর গর্ববোধ যে তুচ্ছ, তা বুঝতে পেরে কেশবের মন ধীরে ধীরে অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। হিন্দুধর্মের নানা খুঁটিনাটি আচারবিচার যেমন যাগযজ্ঞ, পূজা, পুণ্যস্নান, গেরুয়া-ধারণ, মস্তক-মুণ্ডন ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো তাঁর কাছে চিরকালই অর্থহীন ছিল। এখন রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে সেগুলি মানার দিকেই যেন তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকে। ঠিক দু বছরের মধ্যেই কেশব নতুন এক ধর্মমত প্রবর্তন করলেন। নাম দিলেন 'নববিধান।' রামকৃষ্ণকে তিনি ঠিক যতটুকু বুঝেছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে কেশব তাঁর 'নববিধান' দেশকে দান করলেন। কেশবকে যা আকর্ষণ করেছিল তা হলো রামকৃষ্ণের বিশ্বজনীনতা। বিশেষ করে নাজারেথের অধিবাসী যীশুখ্রীস্টের দর্শন লাভ করার পর থেকেই রামকৃষ্ণ যেন তাঁর সর্বধর্ম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এক জীবন্ত অস্তিত্ব হ'য়ে কেশবের সামনে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাই এরপর কেশব যেদিন দক্ষিণেশ্বরে এলেন সেদিনই রামকৃষ্ণের পায়ের কাছটিতে ব'সে ঠাকুরের পদরজ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলে উঠেছিলেন, 'জয় বিধানের জয়।' বলতে গেলে কেশবই রামকৃষ্ণকে সর্বপ্রথম সাধারণ মানুষের দরবারে পেঁছে দেন।

কেশবের এই আধ্যাত্মিক উচ্চভাবটি দেখে রামকৃষ্ণ সেদিন পরম প্রীত হয়েছিলেন। কোনো-রকম পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই তিনি এরপর সমাজে চলে আসতেন—ভক্তদের সঙ্গে কীর্তনানন্দ করতেন। স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মভক্তেরা উৎসাহ পেত। খুশি হ'য়ে তারা ভাবতো বুঝি তিনি তাদেরই লোক। তাদের ধর্ম বিশ্বাসে আকৃষ্ট হ'য়ে ছুটে এসেছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণকে তারা কেউ বোঝে নি। তাঁর ঈশ্বরপ্রেমই যে তাঁকে যে কোনো ধর্মানুষ্ঠানে উপস্থিত হ'তে প্রেরণা দিত সে বোধ সমাজের অনেকেরই ছিল না।

রামকৃষ্ণ চাইতেন যে উগ্র সমাজ সংস্কারের পথ থেকে ব্রাহ্মরা সরে আসুক আর ঈশ্বরলাভই তাদের ধ্যানজ্ঞান হোক। কিন্তু তিনি মানুষের স্বভাব জানতেন, তাই বেশী আশা করতেন না। তিনি বলতেন, 'আমি যা-হয় বলে দিলাম, তোমরা ওর ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে যতটা পার নিও।' পরবর্তীকালে শিষ্যদের কাছে ব্রাহ্মসভার একটি চমৎকার কৌতুককর বিবরণ দিয়েছিলেন। সেটি উদ্ধৃত করছি। 'কেশবের ওখানে গিয়েছিলাম। তাদের উপাসনা দেখলাম। ওদের বক্তা অনেকক্ষণ ধরে ভগবানের ঐশ্বর্যের কথা ব'লে ঘোষণা করল, "আমরা এবার ধ্যান করবো।" ভাবলাম, না জানি কতক্ষণ ধ্যান করবে! ওমা! দু'মিনিট চোক বুজতে না বুজতেই ধ্যান হয়ে গেল! তা এইরকম ধ্যান ক'রে কি ভগবান পাওয়া যায়? যখন তারা

ধ্যান করছিল, আমি তাদের সবাইয়ের মুখের দিকে চেয়েছিলাম।

পরে কেশবকে বললাম, "তোমাদের অনেকের ধ্যান দেখলাম ; কি মনে হ'লো জানো দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলায় যখন তখন হনুমানের পাল চুপ ক'রে বসে থাকে। যেন কত ভালো, কত নিরীহ, কিছু জানে না। কিন্তু তা নয় ; তারা তখন বসে বসে ভাবছে—কোন্ গৃহস্থের চালে লাউ-কুমড়োটা আছে, কিংবা কার বাগানে কলা-বেগুন আছে। খানিক পরেই উপ্ শব্দ ক'রে সেখানে গিয়ে সব ছিঁড়ে উদরপূর্তি করবে। তা অনেকের ধ্যান দেখলাম ঠিক সেই রকমটি।" সেদিন রামকৃষ্ণের কথা শুনে সবাই হাসতে লাগল।'

ব্রাহ্মদের ধ্যানের ধরনটি রামকৃষ্ণ শুধরে দেবার চেষ্টা করতেন। ওদের বলতেন, 'তোমরা সবসময়েই ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের কথা অত বল কেন? ছেলে কি বাপের পাশে বসে তাঁর কত বাড়ি, কত ঘোড়া, কত গরু, কত সম্পত্তি, এইসব বলে? তার বাবা কত আপনার, তাকে কত ভালবাসে এই ভেবেই সে খুশি। ছেলেকে বাপ খেতে পরতে দেয়, সুখে রাখে, তাতে আর কি হয়েছে? তাহলে ভগবানই বা দেবে না কেন? আমরা তো তাঁরই সন্তান! যথার্থ ভক্ত তাই ওই সব না ভেবে ভগবানকে নিজের লোক মনে করে ; তাঁর ওপর আবদার করে, অভিমান কবে, জোর করে ; বলে, তার প্রার্থনা মেটাতেই হবে। তাকে দেখা দিতেই হবে। অত ক'রে ভগবানের ঐশ্বর্যের কথা বললে তাঁকে খুব আপনার ব'লে জোর করা যায় না। তিনি কত মহান, আমাদের থেকে কত দূরে—এইরকম সব ভাব আসে। তাঁকে আপনার ক'রে ভাব—তবেই না তাঁকে পাবে!'

রামকৃষ্ণ অন্তত একটি বিষয়ে অনেকখানি সফল হয়েছিলেন—ব্রাহ্মভক্তদের মন থেকে মূর্তি পূজার অকারণ ভয় অনেকখানি কাটিয়ে দিতে পেরেছিলেন। কিছু লোক এটুকু বুঝেছিলেন যে, 'ভগবানকে অন্তত সাকার-নিরাকারের তত্ত্ব দিয়ে বোঝা যায় না—ভগবান সাকার-নিরাকার দুইই।'

রামকৃষ্ণ নিজে ধর্মসংস্কারক ছিলেন না। ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির উপর পাশ্চাত্য ধর্মসংস্কৃতির প্রভাবের কথা ভেবে তাঁর কোনো অকারণ উৎকণ্ঠা হতো না। কারণ, রামকৃষ্ণ জানতেন যে জগন্মাতার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছু ঘটে না। ঘটবেও না। কিন্তু রামকৃষ্ণের শিষ্যদের উপর এবং পরে মিশনের কার্যাবলীর উপরেও ব্রাহ্মসমাজ ও তার আন্দোলনের প্রভাবটি যে প্রত্যক্ষ ভাবে পড়েছিল সে কথা ঠিক।

১৪

শিষ্যেরা দক্ষিণেশ্বরে এলেন

আমরা জানি যে ব্রাহ্মদের কাছ থেকে রামকৃষ্ণ নতুন কিছু আশা করতেন না ; কারণ, নিয়মের যে বাঁধাবাঁধিব মধ্যে বাস ক'রে তারা তাদের জীবন ও মানসিকতা গড়ে নিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরে আসা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রামকৃষ্ণের তখন দরকার ছিল বেশ কিছু সমর্পিত-প্রাণ যুবক ভক্তের, যাদের তিনি যথার্থভাবে তাঁর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করতে পারেন—সংসারের যাবতীয় সুখ-ঐশ্বর্যের মোহ থেকে যারা বেরিয়ে আসতে পারে। তিনি জানতেন যে, অন্যেরা আধ্যাত্মিকভাব-গ্রহণে অসমর্থ—তাদের যা শেখানো হয় তোতা পাখির মতন তারা সেই শেখানো বুলি আওড়ায়।

সেই সময়কার কথা স্মরণ করতে গিয়ে তিনি বলতেন, 'সেই দিনগুলিতে আমার ব্যাকুলতার যেন শেষ ছিল না। দিনের বেলা যা-হয় ক'রে কাটাতাম। যদিও সংসাবী মানুষদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় মন খুব ক্লিস্ট হ'ত। যাদের সঙ্গ চাইতাম তারা কখন আসবে সেই ভাবনাতেই প্রাণ ব্যাকুল হ'ত। প্রাণ খুলে কথা বলার জন্য মন আকুলি-বিকুলি করতো। যে ঘটনাই ঘটুক না কেন তাদের কথা মনে হ'ত। মনে মনে জল্পনা করতাম কাকে কি বলবো, কি দেব। তারপর সন্ধ্যে এলে আর যেন নিজেকে চেপে রাখতে পারতাম না। কেবলই মনে হ'ত আরও একটা দিন চলে গেল, অথচ তারা কেউ এলো না। সন্ধ্যের সময় যখন মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজত, ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি হ'ত, দীপ জেবলে গৃহপূজা করা হ'ত, তখন সিঁড়ি বেয়ে কুঠির ছাদে উঠে যেতাম আর অস্থির হয়ে কাঁদতে কাঁদতে চীৎকার ক'রে ডাকতাম, "ওরে তোরা আয়, আর দূরে থাকিস না। আমি যে তোদের পথ চেয়ে ব'সে আছি!" ছেলেব জন্যে যেমন মায়ের প্রাণ কাঁদে, বন্ধুর জন্যে বন্ধুর, প্রিয়ার জন্যে প্রেমিকের—আমার তখনকার ব্যাকুলতা যেন তার থেকেও তীব্র আর তার থেকেও গভীর ছিল। তাকে প্রকাশ করি সে ক্ষমতা আমার নেই। তবে, তারপর থেকেই ত্যাগী ভক্তেবা আমার কাছে আসতে শুরু করে।'

বলতে গেলে ব্রাহ্মসমাজই নানা উপায়ে সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্তদের রামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে আসে। প্রভাবটি ইতি ও নেতিবাচক, উভয়তই। অনেকে ছিলেন যাঁরা কেশব সেনের বক্তৃতা শুনে আর তাঁর রচনাবলী পাঠ ক'রে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে একটি মতামত গড়ে নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ আসতেন সমাজ সম্পর্কে হতাশ হ'য়ে। রামকৃষ্ণের কাছে তাঁরা ছুটে আসতেন সেই আধ্যাত্মিক আশ্বাসটি ফিরে পেতে যা সমাজ তাদের দিতে পারে নি।

রামচন্দ্র দত্ত আর তাঁর সম্পর্কিত ভাই মনোমোহন মিত্র কেশবের 'সুলভ সমাচার' পাঠ ক'রেই রামকৃষ্ণ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারেন। রামচন্দ্র ছিলেন পেশায় ডাক্তার—মনোমোহন ছিলেন ব্যবসায়ী। এঁরা দু'জনেই ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। তবে এঁদের অজ্ঞাবাদ ছিল প্রায় নাস্তিকতার সামিল। ফলে তাঁদের অবিশ্বাস থেকে এমন এক অস্থিরতা এসেছিল যা ঠিক আত্মতুষ্টি নয়। কিন্তু এর ফলে তাঁদের মনে এক উন্নাসিক কৌতূহল গড়ে ওঠে।

তাঁরা স্থির করেন যে দক্ষিণেশ্বরে আসবেন এবং কেশব বর্ণিত সাধু রামকৃষ্ণ ঠিক কতখানি খাঁটি, তা নিজের চোখে দেখবেন। ঘটনাটি ঘটে ১৮৭৯ সালের শেষাশেষি।

দু'ভাই দক্ষিণেশ্বরে এলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন একজন খেয়ালী এবং সম্ভবত ভণ্ডকে দেখতে পাবেন। অতি সাধারণ পোষাক পরা একজন লোক এসে দরজা খুলে দিলেন। এত সাধারণ চেহারার একজন মানুষকে দেখে তাঁরা রীতিমত হতাশ; চুলে জটা নেই, দেহ ভস্মাচ্ছাদিত নয়। এমন কি চেহারার মধ্যেও সাধু-সাধু ভাব নেই। তবুও ইনিই হলেন রামকৃষ্ণ; আর দরজা খুলে তাঁদের দেখেই এমনভাবে অভ্যর্থনা করলেন যেন এঁদেরই অপেক্ষায় এতক্ষণ ব'সে ছিলেন। দেখা মাত্রই তাঁদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু করে দিলেন রামকৃষ্ণ। যখন শুনলেন যে রামবাবু একজন ডাক্তার তখনই অসুস্থ হৃদয়কে ডেকে বললেন, 'হৃদু, আয়রে—একজন ডাক্তারবাবু এয়েছেন; ওঁকে দিয়ে নাড়িটা দেখিয়ে নে।' রামকৃষ্ণের সরল অকপট আন্তরিকতা দেখে রামবাবু আর মনোমোহন, দু'জনেই মুগ্ধ। রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁরা এমন সহজ ব্যবহার করতে লাগলেন যে, কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে সে খেয়ালই ছিল না। যাবার আগে রামকৃষ্ণ তাঁদের মিষ্টান্ন খাওয়ালেন—আবার আসতে বললেন।

সেদিন রামচন্দ্র আর মনোমোহন তাঁদের সহজাত জ্ঞান থেকেই বুঝেছিলেন যে, তাঁরা আধ্যাত্মিক জগতের এক মহান সাধকের সামনাসামনি এসে পড়েছেন। ফলে ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে এক মানসিকতা বদলের কাজ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। পার্থিব বস্তুর আকর্ষণ থেকে তাঁরা ক্রমেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন। সংসার সম্পর্কে এই নির্লিপ্ততার ভাবটুকু অলক্ষিত থাকলো না। নিকটতম আত্মীয়বর্গ মনে মনে বিলক্ষণ আতঙ্কিত। সেই অবস্থায় একদিন মনোমোহন যখন দক্ষিণেশ্বরে আসবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন, তখন তাঁর এক ঘনিষ্ঠা আত্মীয়া সকলের সামনেই মনোমোহনকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে নিষেধ করলেন। মনোমোহন অবশ্য তাঁর বারণ না শুনে রামচন্দ্রের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন যে, বিষণ্ণ মনে রামকৃষ্ণ বিছানার উপর বসে আছেন। তাঁদের দেখে বললেন, 'দ্যাখো হে, একজন ভক্ত আমার কাছে আসতে চায়, কিন্তু তার খুড়ি তাকে আসতে দেয় না। সেই থেকেই মনটা খারাপ; হয়ত ভক্তটি কোনোদিন তার খুড়ির কথা শুনে আমার কাছে আসা বন্ধই করে দেবে।' মনোমোহন এবং রামচন্দ্র বিস্মিত—যেন রামকৃষ্ণ দিব্যদৃষ্টিতে সমস্তটিই দর্শন করেছেন। কিছুদিন পরে মনোমোহনের পত্নীও স্বামীকে দক্ষিণেশ্বর আসতে নিষেধ করেন; সেবারও রামকৃষ্ণ অনুরূপ আচরণ করেছিলেন।

রামবাবু একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা! ভগবান কি সত্যিই আছেন?' রামকৃষ্ণ বললেন, 'নিশ্চয়ই আছেন। দিনের বেলা আকাশের তারা দেখা যায় না—তার অর্থ কি তারা নেই? দুধে মাখন থাকে। কিন্তু দুধের দিকে চাইলেই তা বোঝা যায় না। মাখন পেতে হলে ঠাণ্ডা জায়গায় দুধ মন্থন করতে হবে। তেমনি ঈশ্বরের দর্শন পেতে হ'লে তোমায় কিছু সংযম অভ্যেস করতে হবে—মনে করলাম আর ভগবান দর্শন হলো—এমনটি হয় না।'

রামবাবুরা বৈষ্ণব। শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা তাঁর ভালোমতই জানা ছিল। একদিন সন্ধ্যে-বেলা রামকৃষ্ণ তাঁর ঘরে একলা বসে আছেন—সঙ্গে ছিলেন কেবল রামবাবু। রামকৃষ্ণ হঠাৎ

রামবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দেখছেন আমার মুখের দিকে চেয়ে ?'

'আপনাকে দেখছি।'

'কি দেখলেন ?' রামবাবু ঠায় চেয়ে থাকতে থাকতে বললেন, 'মনে হয় আপনিই চৈতন্য।' বেশ খানিকক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে রইলেন দু'জন। তারপর শান্তস্বরে রামকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ, ভৈরবীও সে কথা প্রায়ই বলত বটে!'

তখন রামবাবুর পরিপূর্ণ বিশ্বাস। কিন্তু পরে যেন অবিশ্বাসের কাঁটাটি আবার বিঁধতে লাগল। রামকৃষ্ণ কি সত্যিই ভগবান দর্শন করেছেন, নাকি অসাধারণ কিছু সিদ্ধাই পেয়ে নিজেকে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন ? কিছুতেই যেন তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না।

একদিন রাত্তিরে রামবাবু স্বপ্ন দেখলেন—রামকৃষ্ণ যেন তাঁকে একটি মন্ত্র দিলেন। তারপর প্রতিদিন বহুবার সেটি জপ করতে বললেন। পরদিন সকালেই দক্ষিণেশ্বরে ছুটে এলেন রামবাবু। রামকৃষ্ণ সব শুনলেন। খানিকপরে রামবাবুকে আশ্বস্ত করে জানালেন যে, স্বপ্নের লক্ষণটি বড় শুভ। কিন্তু রামকৃষ্ণের সামনে থেকে যেমনি চলে এসেছেন অমনি রামবাবুর মনে হলো যে, স্বপ্ন স্বপ্নই—তার কোনো আলাদা মানে হয় না।

ক'টা দিন পর। এক বন্ধুর সঙ্গে গোলদীঘির মধ্যে দাঁড়িয়ে রামচন্দ্র কথা বলছিলেন। দু'জনের মধ্যে এই সংশয় নিয়েই কথা হচ্ছিল। হঠাৎ তাঁদের পাশে কালোপানা একজন মানুষ এসে দাঁড়ালো। রামবাবুর দিকে চেয়ে লোকটি বলল, 'নিরাশ হও কেন ? ধৈর্য ধর।' কথাটি বলেই লোকটি যেন কোথায় হারিয়ে গেল। সেদিন দুজন বন্ধুই লোকটিকে দেখেছিলেন। পরে রামকৃষ্ণকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ গো! ওরকম এখন প্রায়ই দেখবে!'

কিন্তু রামবাবুর সংশয় যেন কিছুতেই কাটে না। গোঁ ধরে বসে আছেন—আর সন্দেহ যত বাড়ছে তত্ই যেন মনের অশান্তিও বাড়ছে। জগৎ সংসারের উপর ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ছুটে এলেন। মনের এই ভাবটি রামকৃষ্ণ কাটিয়ে দিন। কিন্তু রামবাবুকে দেখেই রামকৃষ্ণ চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন, 'তা আমি কি করবো ? এ-সবই ভগবানের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে।' 'কিন্তু', রামবাবু যেন কেঁদে উঠলেন, 'আমি যে আপনার কাছেই সাহায্য চাইতে ছুটে এসেছি। যদি সাহায্য না করেন, তবে আমি কি করবো ? আপনার কাছ থেকে আমি আর কিছু চাই না।' সব শুনে কিছুটা উদাসীনের মতন রামকৃষ্ণ বললেন, 'বেশ তো, আসতে চাও এস!' ঠিক এমনি নির্মম একটি উত্তরের দরকার ছিল রামবাবুর। চকিতে বেরিয়ে গেলেন তিনি। মনে মনে স্থির করলেন এ দেহ রাখবেন না। গঙ্গায় বিসর্জন দেবেন। কিন্তু একটু চিন্তা করতেই তাঁর বিবেক বলল যে, রামকৃষ্ণ নয়—তাঁকেই চেষ্টা ক'রে মনের সংশয় দূর করতে হবে। ফিরে এলেন রামবাবু। তারপর রামকৃষ্ণের ঘরের বাইরের বারান্দায় শুয়ে স্বপ্নে শেখানো মন্ত্রটি জপ করতে লাগলেন। মাঝরাত নাগাদ ঘরের দরজা খুলে রামকৃষ্ণ বেরোলেন তারপর রামবাবুকে বললেন, 'ঠাকুরের ভক্তদের সেবা কর্, তবেই মনে শান্তি পাবি।' কথাটি ব'লে রামকৃষ্ণ আবার ঘরের মধ্যে ফিরে গেলেন।

স্বভাব-কৃপণ রামবাবুর কাছে রামকৃষ্ণের উপদেশটি মনের মতন হলো না, কারণ ভক্তসেবার

অর্থই হলো অকুণ্ঠ ব্যয়। সুতরাং প্রথম প্রথম রামবাবু বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। কিন্তু দিনকয়েক পরেই রামকৃষ্ণ সংবাদ পাঠালেন যে, সাঙ্গোপাঙ্গসহ তিনি রামবাবুর অতিথি হবেন। রামবাবু বাধ্য হয়েই সকলের উপযুক্ত অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করলেন। এ কাজটি সম্পন্ন ক'রে রামবাবু যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছিলেন। সেবা পরিচর্যা দ্বারা যে আনন্দলাভ হয় সে অধিকার রামকৃষ্ণই তাঁকে দিলেন।

পরদিনই রামবাবু দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণ মহাখুশি। ঘটা ক'রে রামবাবুকে আপ্যায়ন করলেন। দু'জনের মধ্যে আলাপসালাপে রাত দশটা বেজে গেল। সেটি ছিল কৃষ্ণপক্ষের রাত। রামকৃষ্ণের কাছে বিদায় নিয়ে রামবাবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ দেখলেন, পায়ে পায়ে রামকৃষ্ণ তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। সামনে এসে একেবারে মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণ বললেন, 'কি চাস্ বল্ ?' সেই মুহূর্তে রামবাবুর মনে হলো তিনি মহাশক্তিধর এমন একজনের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছেন, যাঁর কাছে ভরসা ক'রে অনেক কিছুই চাওয়া যায়। উত্তর দিতে গিয়ে আবেগে তাঁর গলা কেঁপে উঠল। কোনোরকমে বললেন, 'ঠাকুর, আমি জানি না কি চাই। আপনিই ঠিক ক'রে দিন।' রামকৃষ্ণ হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'স্বপ্নে তোকে যে মন্ত্রটা দিয়েছিলাম সেটা ফিরিয়ে দে।' কথাটি বলেই রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হ'য়ে গেলেন। আর সেই ভাবাবিষ্ট মূর্তিব পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বারবার মন্ত্রটি জপ করতে লাগলেন রামবাবু। তখন সেই আবিষ্ট অবস্থায় রামকৃষ্ণ তাঁর ডান পায়ের আঙুল রামবাবুর মাথায় ছোঁয়ালেন। দীর্ঘক্ষণ সেই অবস্থায় কেটে গেল। তারপর রামকৃষ্ণ যখন পা সরিয়ে নিলেন, রামবাবু তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। রামকৃষ্ণ বললেন, 'কিছু যদি দেখতে চাস, আমার দিকে তাকা।' রামবাবু তাকালেন। দেখলেন, তাঁর মানস-লোকের ঠাকুর যেন রামকৃষ্ণের শরীরে মূর্ত হ'য়ে সশরীরে নেমে এসেছেন। অপার বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন রামবাবু। রামকৃষ্ণ বললেন, 'আর তোকে অধ্যাত্ম সাধনা করতে হবে না। শুধু এখানে এসে যখন তখন আমায় দেখবি। সঙ্গে ক'রে যা হ'ক একটু পুজো আনিস।'

সেইদিন থেকেই রামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন রামচন্দ্র দত্ত। শুধু ভক্ত হওয়াই নয়, রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যদের সব প্রয়োজনের সার্থক যোগানদারও হয়ে উঠলেন তিনি।

রামবাবুর জ্ঞাতিভাই মনোমোহনের সমস্যাটি ছিল অন্যরকম। আধ্যাত্মিক সাধনায় ইতিমধ্যেই তাঁর অল্পস্বল্প খ্যাতিলাভ হয়েছে। তার জন্যে মনে মনে কিঞ্চিৎ গর্ববোধও ছিল। তাই অন্য কারও প্রশংসা শুনলে সইতে পারতেন না। সেদিন ঠিক এমনটিই ঘটলো। সকলের সাক্ষাতে সুরেন্দ্রনাথ মিত্তিরের একনিষ্ঠ ভক্তির প্রশংসা করলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, সুরেনের ভক্তির তুলনা হয় না। মনোমোহন ভাবলেন যে সুরেনকে আরও উচ্চাবস্থায় বসালেন রামকৃষ্ণ। মনোমোহন এত আহত হলেন যে, তখনই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে আর কখনও ফিরবেন না। এদিকে, যে মানুষটা প্রতি রবিবার আসতেন তিনি যখন আসা বন্ধ করে দিলেন, তখন ঘটনাটি রামকৃষ্ণের কাছে অলক্ষিত থাকলো না। রামবাবুর ওপর আদেশ হলো মনোমোহনের সন্ধান করার। মনোমোহনের এই

অকারণ ঈর্ষাবোধ রামবাবুরও মনঃপূত হয় নি। কিন্তু রামকৃষ্ণকে তিনি কি বলবেন? মনোমোহনের শারীরিক অসুস্থতা ছাড়া আর কিছু বলবার নেই। এদিকে, মনোমোহনের মানসিক অবস্থা এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, সাধারণভাবে তা পাগলামি বলে মনে হতে পারে। মনে মনে তিনি রামকৃষ্ণকে বলতেন, 'বেশ তো ভক্ত নিয়ে দিন কাটছে! আমাকে তোমার দরকার কি!' নিজের মনকে বুঝিয়েছিলেন যে, রামকৃষ্ণই তাঁকে দক্ষিণেশ্বর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ যখন তাঁকে ধরে আনার জন্য নিয়মিত লোক পাঠাতে লাগলেন তখন কিছুদিনের জন্য মনোমোহন কোন্নগরে গিয়ে অজ্ঞাতবাস শুরু করলেন। কোন্নগর থেকে আপিসে আসতেন ট্রেনে চড়ে। ক্রমে ক্রমে মনের দিক থেকে মনোমোহন খুবই অসুখী হয়ে পড়লেন। তাঁর চিন্তায় ধ্যানে সর্বক্ষণই রামকৃষ্ণ উপস্থিত হতেন। শেষ পর্যন্ত মনোমোহন বুঝতে পেরেছিলেন যে, রামকৃষ্ণকে তিনি তীব্রভাবে ভালবাসেন, ঘৃণা করেন না।

মনোমোহন একদিন গঙ্গায় স্নান করতে গেছেন। রামকৃষ্ণ প্রায়ই গঙ্গার পবিত্রতার কথা বলতেন। সে কথা মনে হতেই মনোমোহনের চোখের সামনে রামকৃষ্ণের মূর্তি ভেসে উঠল। জলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। দেখলেন একটি নৌকায় চড়ে দু'জন মানুষ এই দিকেই আসছেন। নৌকা কাছে এলে দেখলেন একজন স্বয়ং রামকৃষ্ণ, অন্যজন নিরঞ্জন। (রামকৃষ্ণের এই বালক-শিষ্যের কথা সতেরো অধ্যায়ে উল্লেখ করবো।) কল্পনার এমন বাস্তবরূপ দেখে মনোমোহন স্তম্ভিত। নৌকার ওপর থেকে তখন নিরঞ্জন হেঁকে উঠল, 'কি! দক্ষিণেশ্বরে আসা হচ্ছে না কেন? ঠাকুর যে দুশ্চিন্তা করেন!' সেদিন বেজায় গরম। একখানা হাত পাখা নিয়ে রামকৃষ্ণ হাওয়া খাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেই অবস্থায় সমাধিস্থ হ'য়ে গেলেন। নৌকাও ঘাটের প্রায় কাছে এসে পড়ল। মনোমোহনের মনে তখন খুব ক্ষোভ। 'আমিই ওঁকে ব্যথা দিয়েছি; আমার জন্যেই ওঁর এই কষ্ট!'—এইসব ভাবতে ভাবতে কি যেন হ'ন। দু'চোখ জলে ভরে উঠলো। মনে হলো বুঝি গঙ্গায় পড়ে যাবেন। তখনই নৌকা থেকে লাফিয়ে নেমে নিরঞ্জন তাঁকে ধরে ফেলল। এদিকে রামকৃষ্ণেরও বাহ্যজ্ঞান ফিরে এসেছে। ইশারায় মনোমোহনকে নৌকায় তুলে নিতে বললেন! তারপর মনোমোহনের কাছে এসে স্নেহপূর্ণ স্বরে বললেন, 'তোর জন্য এত দুশ্চিন্তা হয়েছিল; তাই তো আসতে হলো!' মনোমোহন ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ের ওপর, তারপর আকুল হ'য়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'এর সবই যে আমার অহঙ্কারের জন্যে, বাবা!' নিরঞ্জন তখন নৌকার মুখ দক্ষিণেশ্বরের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

মনোমোহনের ঈর্ষার পাত্র সুরেন মিত্র একটি বিদেশী হৌসে কাজ করতেন—বেশ ভালো রোজগার। অবস্থাও স্বচ্ছল। রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে ধর্মবিষয়ে কোনো কৌতূহলই ছিল না। যেমন পানভোজন করতেন, তেমনি নির্বিচার ছিল তাঁর যৌন আসক্তি। আবার দানধ্যানেও মুক্তহস্ত ছিলেন।

ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও বন্ধু রামচন্দ্রের অনুরোধে সুরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসতে রাজী হয়েছিলেন। তবে শর্তসাপেক্ষে। বন্ধুকে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার কথায় যাচ্ছি। কিন্তু গিয়ে যদি দেখি মানুষটা ভণ্ড, তাহলে কান ধরে হিড়হিড় ক'রে টেনে আনবো।' দুই বন্ধু যখন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন ঘর ভর্তি লোক। সুরেন্দ্র মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন যে, ভাবে ভঙ্গিতে তিনি নিরপেক্ষ থাকবেন। কোনোরকম দুর্বলতা বা ছিটেফোঁটা

শ্রদ্ধাও দেখাবেন না। সুতরাং দম্ভভরেই সোজা গিয়ে এক জায়গায় বসে পড়লেন। রামকৃষ্ণ তখন ভক্তদের কাছে গল্পচ্ছলে মানুষের বিচিত্র স্বভাবের কথা বোঝাচ্ছিলেন; তিনি বললেন, 'মানুষ স্বভাবে কেন বাঁদর ছানার মতন হয়, আর কেনই বা বিড়াল ছানার মতন হয় না, তা জান? বাঁদর শিশু নিজের চেষ্টায় তার মায়ের গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে। কিন্তু বিড়ালছানা এক জায়গায় দাঁড়িয়েই মিউমিউ করে, যতক্ষণ না তার মা বাচ্চার ঘাড় কামড়ে তাকে অন্যত্র নিয়ে যায়। মুঠি আলগা হলেই বাঁদরছানা পড়ে যায়, চোট পায়। কিন্তু বিড়াল শিশুর তেমন আশঙ্কা থাকে না। তার মা তাকে নিয়ে যত্রতত্র বেড়ায়। নিজের ক্ষমতায় কিছু করা আর ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার মধ্যে এইটুকুই তফাত।' সেদিন সুরেনের মনের উপর এই নীতিকথার ছাপটি স্পষ্ট হ'য়ে পড়েছিল ব'লেই, জীবনের ভুলটি তিনি ধরতে পেরেছিলেন। তিনি ভাবলেন, 'বাঁদরছানার মতোই আমার স্বভাব; ভাবি, নিজেই সব করেছি। আমার কষ্টের কারণ ওখানেই। এখন থেকে মা আমায় যেভাবে রাখবেন, সেই ভাবেই আমি খুশি থাকার চেষ্টা করবো।' এই কথা ভেবেই অনেকখানি মানসিক শান্তি পেয়ে গেলেন সুরেন্দ্র। যখন উঠবেন মনে করছেন, রামকৃষ্ণ বললেন, 'আবার এস!' রামকৃষ্ণের কথায় কি যাদু ছিল কে জানে। সুরেন্দ্র তাঁর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লেন। ফেরার সময় তাঁর মনে পরম শান্তি। নিজের মনেই বলছেন, 'আঃ! পাশার দানটি কেমন ঘুরিয়ে দিলেন! যেন আমারই কান মলে দিলেন। উনি যে এমন তা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতুম! আমার মনের সবটুকুই উনি পড়ে ফেলেছেন। এখন থেকে অন্তত বুঝছি যে জীবনের একটা মানে আছে।'

সুরেনের উদার স্বভাব অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ঈশ্বর-ভক্তিতে পরিণত হলো। রামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনটি থেকেই এই পরিবর্তনটি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। পতিতালয়ে গেলেও, সম্ভোগ-ইচ্ছা কেটে গেলে মনে মনে লজ্জিত হতেন। দক্ষিণেশ্বরের দিকে যেতে চাইতেন না। বলে বেড়াতেন যে কাজের খাতিরে ক'লকাতার বাইরে গেছেন। সাধুসঙ্গ যারা করে, তাদের মধ্যেও এমন মানুষের সংখ্যা বিরল নয়, যারা খুঁটিনাটি সব ব্যাপারই ওপরওলার কর্ণগোচর করে—এমনই দু একজনের কথায় রামকৃষ্ণ সত্য ঘটনাটি জানতে পারলেন। কিন্তু একটুও বিরক্ত হলেন না। শুধু বললেন, 'হ্যাঁ, সুরেনের আসক্তি এখনো প্রবল। আরও কিছু-দিন ও ভোগ করুক। ভোগ কেটে গেলে ও ঠিক খাঁটি হয়ে যাবে।' রামকৃষ্ণের মনের কথাটি জানতে পেরে পরের রবিবার সুরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে এলেন। কিন্তু চট ক'রে রামকৃষ্ণের সামনে এসে দাঁড়ালেন না। ঘরের এক কোণে চুপ ক'রে বসে রইলেন। রামকৃষ্ণ তাঁকে দেখেই সস্নেহে কাছে ডাকলেন। তখন তাঁর অর্ধচেতন ভাব। সেই অবস্থায় একজন ভক্তের দিকে চেয়ে বললেন, 'যখন কেউ কুস্থানে যায় তখন মা-কে স্মরণ করে না কেন? মা তাহলে তাকে সব রকম কুকাজ থেকে রক্ষা করবেন।' সুরেনের অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে তার পাপ। কেবলই ভয়—সবার সামনেই রামকৃষ্ণ না তাঁর পাপের স্বভাবের কথা বলে বসেন! কিন্তু রামকৃষ্ণ কিছুই বললেন না। তবে তাঁর সেদিনের উপদেশটি সুরেনের খুব কাজে লেগেছিল। যখনই প্রবৃত্তির তাড়না আসত, মনে মনে মাকে স্মরণ করতেন।

সুরেনের পানাভ্যাসের স্পৃহাও এতটুকু কমে নি। রামচন্দ্র তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু জোর করতেন না। তাঁর আশঙ্কা ছিল, জানাজানি হ'লে লোকে রামকৃষ্ণের নিন্দা করবে—বলবে, ওঁর একজন শিষ্য ঘোর মাতাল। সুরেন্দ্র নিজেও বন্ধুর উপদেশের তোয়াক্কা

করতেন না। তাঁর ধারণা হয়েছিল, মন্দ ভাবলে রামকৃষ্ণ নিজেই তাঁকে নিষেধ করতেন। বলতেনও সে কথা, 'ঠাকুর তো সবই জানেন। দোষের মনে করলে তিনি কি আমায় সতর্ক করে দিতেন না?' বারবার সে কথা শুনতে শুনতে রামচন্দ্র একদিন বললেন, 'ঠিক আছে; চলো তাঁর কাছেই যাই। আমি নিশ্চিত জানি, সবকথা শুনে তিনি তোমায় বারণ করবেন।' সুরেন্দ্র রাজী—তবে বন্ধুকে সাবধান করে বললেন যে, রামচন্দ্র যেন আগবাড়া হ'য়ে প্রসঙ্গটি না তোলেন। বললেন, 'ঠাকুর যদি কথাটা তোলেন আর আমায় নিষেধ করেন, তবে কথা দিচ্ছি, মদ খাওয়া ছেড়ে দেব।'

শর্তমত তাঁরা দু'জনে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। একটি গাছের তলায় ব'সে রামকৃষ্ণ তখন ধ্যান করছিলেন। এ'রা দু'জন এসে প্রণাম করতেই, রামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, মনে হচ্ছিল পূর্বালোচনার জের ধরেই কথা বলছেন, 'আচ্ছা সুরেন! তুমি যখন মদ খাও তখন মদ ব'লে খাও কেন? মা-র নামে উৎসর্গ ক'রে খেতে পার না? তাই করবে। এমন খাবে না যাতে পা টলে বা মাথা ভারি হ'য়ে যায়। যেভাবে বললাম তেমনি ভাবে খেয়ে দেখো—দেখবে এক দিব্য আনন্দে তোমার মন ভরে উঠছে।' সেদিন থেকেই তিনি রামকৃষ্ণের উপদেশটি মেনে চলেছিলেন। মদ্যপানের আগে সামান্য পরিমাণ মা-র নামে উৎসর্গ করতেন। তারপর প্রসাদী সেই কারণবারি পান করতেন। সেই থেকেই তাঁর মনে ভক্তির সঞ্চার হয়েছিল। শেষের দিকে মদ খেয়ে কাঁদতেন—মা-র সঙ্গে কথা বলতে চাইতেন, কখনও বা গভীর ভাবে ধ্যানমগ্ন হতেন। কিন্তু আর কখনও মাতাল হন নি।

আরও অনেক ভক্ত ছিলেন—বিভিন্ন স্বাদ-গুণের মানুষ তাঁরা; রামকৃষ্ণের কাছে সবাই আসতেন। এ'দের মধ্যে ছিলেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। খুব পণ্ডিত ও জ্ঞানী। নবব্রতীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল; রামকৃষ্ণ নিজে সবাইকে শিক্ষা দিতে পারতেন না। আসতেন দানশীল মহারাজা যতীন্দ্রমোহন। ছিলেন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক কেষ্টদাস পাল। কেষ্টদাস বলতেন যে, রামকৃষ্ণের ত্যাগের বাণীগুলি হলো পলায়নী মনোভাব। মানুষের কর্তব্য হ'লো জগতের কল্যাণ করা, উপকার করা। রামকৃষ্ণ তাঁকে ভৎসনা করতেন। বুঝিয়ে দিতেন উপকার আর সেবার পার্থক্যটি কোথায়। উপকার হলো আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা; সেবায় আছে আত্মভাবের বিলোপ। বলতেন, 'হ্যাঁগা, তুমি কে? কার কি উপকার করবে? আগে আত্মভাব ত্যাগ কর—তবে না মা ভবতারিণী তোমায় উপকার করতে দেবেন!'

আর একজন ভক্ত ছিলেন, মহিমাচরণ—মহিমাচরণ চক্রবর্তী। বেশ কয়েকবছর ধরেই মহিমাচরণ দক্ষিণেশ্বরে আসতেন—আধ্যাত্মিক সাধনায় অনেকখানি এগিয়ে ছিলেন, তবে সাধনায় খুব আড়ম্বর ছিল। তোতাপুরীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। প্রচার করে বেড়াতেন যে, জ্ঞানমার্গের সাধক ব'লে তোতাপুরী তাঁকে নাকি সংসারে থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। মানুষটির বিচিত্র মানসিকতা—লোকমান্য হবার লালসায় এমন সব উদ্ভট কাজ করতেন যার জন্যে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হতেন। একবার এক অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলে তার নাম রাখলেন, 'প্রাচ্য-আর্য শিক্ষাকাণ্ড পরিষৎ'। একমাত্র ছেলের নাম রেখেছিলেন 'মৃগাঙ্কমৌলী'। নিজস্ব একখানি গ্রন্থাগার ছিল—ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় নানা বিষয়ের গ্রন্থ

ছিল সেখানে। একবার রামকৃষ্ণের যুবক ভক্তেরা তাঁর গ্রন্থাগার দেখতে আসেন। বইগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে তাঁরা জিজ্ঞেস করেন—'চক্রবর্তীমশাই কি সব বইগুলি পড়েছেন?' মহিমাচরণ বিদ্বানের বিনয় নিয়ে উত্তর করলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ'। তখন একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখছি অনেকগুলো বইয়ের পাতা কাটা হয় নি।' মহিমাচরণ একটুও অপ্রস্তুত না হ'য়ে বললেন, 'কি জানো ভায়া, আমার পড়া হয়ে গেলে অনেকেই বই নিয়ে যায় কিন্তু ফেরত দেয় না। সেইসব বইগুলি আবার কিনে এনে স্বস্থানে রেখে দিই। আজকাল সেই-জন্যে আর কাউকে বই নিয়ে যেতে দিই না।' মহিমাচরণের সেদিনের ব্যাখ্যাটি কেউ বিশ্বাস করেন নি। তাদের অবিশ্বাস যে ঠিক, অল্পদিনেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। সবাই পরে আবিষ্কার করেছিলেন যে, মহিমাচরণের গ্রন্থাগারের বেশীর ভাগ বইয়েরই পাতা কাটা ছিল না।

আর একজন বিচিত্র ভক্ত হলেন প্রতাপ চন্দ্র হাজরা। দক্ষিণেশ্বরে সবরকম গোল সৃষ্টিরই কারণ তিনি। হাজরার স্বভাবটি ছিল নীচ, বিদ্বেষভরা। তবে রামকৃষ্ণ তাকে সইতেন—বলতেন, জটীলে কুটীলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না। অন্য ভক্তরাও হাজরার স্পষ্ট কথা শুনতে ভালবাসতেন। এঁর সম্বন্ধে পরে অনেক কথা লিখতে হবে।

যে সব ত্যাগী ভক্তদের জন্য রামকৃষ্ণ ব্যাকুল হয়েছিলেন এবার তাঁদের কথা বলবো। এঁদের মধ্যে যে তিনজন প্রথম এসেছিলেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে লাটু, গোপাল ঘোষ আর রাখাল।

রামকৃষ্ণের কাছে প্রথম এসেছিলেন রাখতুরাম। রামকৃষ্ণের দেওয়া লাটু নামেই লোকে তাঁকে জানতো। বিহারের এক নগণ্য গ্রামে রাখতুর জন্ম। ছেলেবেলাতেই বাপ-মা হারান। কাকার হাতেই মানুষ। একটু বড় হলেই কাকা তাঁকে নিয়ে চাকরির খোঁজে কলকাতায় এলেন। কলকাতায় এসে বালক লাটু গৃহভৃত্যের চাকরি পেলেন। তাঁর প্রথম মনিব হলেন রামচন্দ্র দত্ত। কি অদ্ভুত যোগাযোগ এবং ভাগ্যের মোচড়! রামকৃষ্ণের উত্তরসাধকদের অনেকেই ঘটনার আবর্তে এমনি ক'রে তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। সে সব কথায় পরে আসছি।

সৎ কর্মঠ ব'লে লাটুর খ্যাতি ছিল। আবার স্পষ্টবক্তা মুখফোঁড় ব'লে অখ্যাতিও ছিল। তাঁর স্পষ্ট আচরণে অনেক ভদ্র মানুষ ক্ষুণ্ণ হলেও, লাটু কখনও তাঁর স্বভাব বদলান নি। একটা ঘটনা বলি। একবার রামচন্দ্রের বন্ধুস্থানীয় একজন লাটুর সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করে। লাটু তাকে ভাঙা বাঙলায় স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দেয়, 'হাম নোকর আছে, লেকিন চোর নহি!' এমন দৃপ্ত মর্যাদার সঙ্গে লাটু তাঁকে জবাবটি দিয়েছিলেন যে, অভিযোগকারী কোনো উত্তরই দিতে পারে নি। পরে অবশ্য রামচন্দ্রের কাছে লাটুর অসৈরণ কথাবার্তা নিয়ে সে নালিশ করে—কিন্তু রামচন্দ্র বন্ধুর কথায় কান দেন নি, লাটুকে অবিশ্বাসও করেন নি।

লাটু যখন এলেন রামচন্দ্র তখন রামকৃষ্ণের ভক্ত হয়ে গেছেন। পরিবারের সবাই ঈশ্বরীয় কথা বলতে ভালবাসেন। রামচন্দ্র সবাইকে রামকৃষ্ণের বাণী শোনান। বলেন, 'মন দিয়ে চাইলেই ভগবানকে পাওয়া যায়।' কখনও বলেন, 'আড়ালে গিয়ে তাঁর জন্যে কাঁদতে হবে

—তাঁকে স্মরণ করতে হবে ; তবেই তিনি দেখা দেবেন।' সেসব কথা লাটু শুনতেন—উপদেশগুলি যেন তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। প্রায়ই দেখা যেত, সারা শরীর কম্বলে ঢেকে তিনি নিঃশব্দে কাঁদছেন আর চোখের জল মুছছেন। রামবাবুর বাড়ির মেয়েরা ভাবতো, বুঝি বা দেশের কথা ভেবে, কাকার কথা ভেবে তাঁর মন খারাপ হয়, তাই তিনি কাঁদেন। লাটু কিন্তু কখনও তাঁর হৃদয়টি খুলে দেখান নি—বলতে গেলে, চিরদিনই লাটু সকলের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

রামচন্দ্রের মুখ থেকে রামকৃষ্ণের কথা অহরহ শুনতে শুনতে লাটু তাঁকে দেখবার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠেছিলেন। অচিরেই দক্ষিণেশ্বরে যাবার সুযোগ এলো এবং রামকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে মন আনন্দে ভরে উঠল। দ্বিতীয়বার লাটু যখন দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছলেন, তখন রামকৃষ্ণ সবে মধ্যাহ্নভোজে বসেছেন। লাটুর জন্যেও অন্নের ব্যবস্থা হলো। কিন্তু লাটুর অনেক বাহানা। বিহারের আর পাঁচজন মানুষের মতন তাঁরও অনেক গোঁড়ামি। অগত্যা রামকৃষ্ণ তাঁর জন্য গঙ্গাজল আর কলাপাতার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাতেও লাটুর আপত্তি। রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, 'গঙ্গাজলে রান্না করা মায়ের এ অন্নভোগ—তাও খাবে না?' অপ্রস্তুত লাটু ভাঙা বাংলায় বললেন, 'হামাকে ক্ষোমা করিয়ে দিন, হামি খেতে পারবে না।' রামকৃষ্ণ তবুও জোর করতে লাগলেন। হঠাৎ যেন অঘটন ঘটে গেল। রামকৃষ্ণকে অবাক ক'রে লাটু বলে উঠলেন, 'ঠিক্ হ্যায়, অগর আপকো পরসাদ মিলি তো হম্ খায়!'

ক্রমে রামকৃষ্ণের ওপর তাঁর অনুরাগ এত বেড়ে গেল যে, রামচন্দ্রের ঘরের কাজে লাটু আর তেমন উৎসাহ পেতেন না। তাঁর একমাত্র উৎসাহ ছিল রামকৃষ্ণের জন্য মিষ্টান্ন ব'য়ে নিয়ে যাওয়া। রামবাবুর পরিবারের মেয়েরাও লাটুর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু লাটুকে তাঁরা ভালবাসতেন—তাঁরা বুঝেছিলেন কেন এই পরিবর্তন। তাই লাটুর ওপর কোনো লাঞ্ছনা হয় নি।

সেবার (১৮৮০) রামকৃষ্ণকে কিছুদিনের জন্যে কামারপুকুর যেতে হ'লো। হতভাগ্য লাটুর দিন যেন আর কাটে না। দক্ষিণেশ্বরে এসে একা একা ঘুরে বেড়ান আর সর্বক্ষণই রামকৃষ্ণের অভাবটি বোধ করেন। তাঁর তখনকার মানসিক অবস্থাটি কেমন ছিল, সে কথা নিজেই বলেছেন; 'সে যে কী দিন গেছে ভাবতেই পারবে না তোমরা। একবার তাঁর ঘরে যাই, একবার বাগানে ঘুরে বেড়াই—কিন্তু সবই বিস্বাদ লাগে। বুকটা ভারি হয়ে থাকতো। তখন মাঝে মাঝে হালকা হবার জন্যে কাঁদতুম। শুধু রামবাবু আমার সেদিনকার যন্ত্রণা কিছুটা বুঝেছিলেন। আমার হাতে ঠাকুরের একটা ফটো দিয়েছিলেন।'

কামারপুকুর থেকে ফেরার পর রামকৃষ্ণের একজন ব্যক্তিগত পরিচারকের দরকার হ'য়ে পড়ল। লাটুর কথাই তাঁর সবার আগে মনে পড়ল। রামবাবুর কাছে কথাটি পাড়লেন। রামবাবুও রাজী। লাটু তাঁর সেবক নিযুক্ত হলেন—সেই পরিচয়েই শুরু হলো লাটুর আধ্যাত্মিক জীবন। গুরুর সেবা করা, তাঁর আদেশ মানা—এটিই ছিল লাটুর ভগবদ্দর্শনের পথ। আর এই পথেই লাটু সিদ্ধকাম হ'তে চেয়েছিলেন। একদিন সন্ধ্যে নাগাদ লাটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন; রামকৃষ্ণ মৃদু ভর্ৎসনা ক'রে তাঁকে বললেন, 'যদি ঘুমিয়েই কাটাবি তো ধ্যান করবি কখন?' সেদিন রামকৃষ্ণের তিরস্কার শুনে লাটু খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন

এবং রাত্রে ঘুমানো প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। দিনের বেলা কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করতেন—বাকী সময় ধ্যান করতেন। অশিক্ষিত লাটুর চরিত্রটি ছিল খাঁটি। রামকৃষ্ণ নিজেও কিছু বিদ্বজ্জন ছিলেন না। তবুও লাটুর অক্ষর পরিচয় করাতে নিজেই চেষ্টা করতেন। কিন্তু লাটুর কোনোদিনই অক্ষরজ্ঞান হয় নি। পাঠকালে লাটুর বিচিত্র হিন্দী উচ্চারণ শুনে রামকৃষ্ণ হাসতেন। শেষ পর্যন্ত হতাশ হ'য়ে দু'জনেই পঠনপাঠন ত্যাগ করেছিলেন।

রামকৃষ্ণের দেহান্তের পর যখন সন্ন্যাসী ভক্তদের আশ্রম-নামকরণ করা হলো, তখন লাটু হলেন অদ্ভুতানন্দ। ১৯২০ সাল পর্যন্ত লাটু জীবিত ছিলেন। যদ্দিন বেঁচেছিলেন, তাঁর হিন্দী উচ্চারণ আর শিশুসুলভ স্বভাবটি বজায় রেখেছিলেন। রামকৃষ্ণ বলতেন যে, সরলতা হলো চরিত্রের এক মাধুর্য—এসব গুণ থাকলে ভগবান পাওয়া সহজ হয়। পরবর্তীকালে যখন শিষ্যেরা তাঁর কাছে উপদেশ নিতে আসত, লাটু তাদের ভগবানের নামজপ করতে বলতেন। একবার একজন শিষ্য কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে বলেছিল, 'যাঁকে দেখিনি কি ক'রে তাঁর নামজপ করবো?' লাটু জবাব দিয়েছিলেন, 'ভওয়ানকে দেখো নি তো কি হয়েছে! তুম্ তো তাঁর নাম জানো! দপ্তরমে কাম করতে গেলে দরখাস্ত ভেজতে হোয়। যাঁর নামে দরখাস্ত্ লিখবে তাঁকে তো পহচানো না। তব! ওহি মতলবমে ভওয়ানকে নাম মে দরখাস্ত্ ছোড় দো। উন্‌কা কৃপা জরুর মিলবে।' রামকৃষ্ণের সেবা-পরিচর্যার পর ধ্যান করার সময় কখন পেতেন, এ প্রশ্ন তাঁকে অনেকেই করেছেন। লাটু তাঁদের বলতেন 'ঠাকুরের সেবাই হলো হামার ধ্যান।'

আশ্রমের সবাই লাটুকে ভালবাসতেন। নরেন তো বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। নরেন তাঁকে ডাকতেন 'লাটু-ভাই' ব'লে; আর লাটু ডাকতেন 'লোরেন' ব'লে। নরেন প্রায়ই বলতেন যে, 'লাটু হলো রামকৃষ্ণের সব থেকে বড় সৃষ্টি। শুধু তাঁর ছোঁয়া পেয়েই নিরক্ষর লাটুর গভীর প্রজ্ঞার উন্মেষ হয়েছে।'

সন্ন্যাসীদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন গোপাল ঘোষ। রামকৃষ্ণের চেয়েও তিনি কয়েক বছর বড় ছিলেন। স্ত্রী বিয়োগের পরই তাঁর বৈরাগ্য আসে। একজন বন্ধুর পরামর্শ শুনে তিনি রামকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসার পর থেকেই তাঁর মন থেকে মৃতা পত্নীর স্মৃতি ধীরে ধীরে ম্লান হ'য়ে যায়। স্বভাবে গোপাল ছিলেন বেশ ছিম-ছাম, পরিচ্ছন্ন আর সুশৃঙ্খল। রামকৃষ্ণ তাঁকে বলতেন, 'বুড়ো গোপাল' বা ওভারসীয়র। অন্য সন্ন্যাসীরা বলতেন, 'গোপালদা'। ইনিই স্বামী অদ্বৈতানন্দরূপে আমাদের কাছে পরিচিত।

লাটুর মতন রাখালও (রাখাল চন্দ্র ঘোষ) রামকৃষ্ণের কাছে ছেলেবেলাতেই আসেন। রাখালের জন্ম হয় কলকাতার কাছেই শিকড়া গ্রামের এক সম্পন্ন জমিদারের ঘরে—১৮৬৩ সালে। মা ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। তাই ছেলের নাম রাখলেন 'রাখাল'। রাখালের বয়স যখন বারো, তখন তাঁকে কলকাতার এক ইংরেজী ইস্কুলে পড়তে পাঠানো হলো। সেই ইস্কুলের ব্যায়ামাগারেই নরেনের সঙ্গে তাঁর আলাপ। দু'জনেই ব্যায়াম করতে আসতেন। রাখালের স্বভাবটি ছিল ধীর, স্থির, কোমল—নরেন ছিলেন নির্ভীক, উদ্ধত। এই বিরোধী স্বভাবের

দর়ুন দ়ু'জনেই দ়ু'জনের ওপর আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। উত্তরজীবনে এঁরা উভয়েই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রচারের ক্ষেত্রে যথার্থ নেতৃত্ব দেন। সব থেকে আশ্চর্য হলো যে, রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই এঁরা পরস্পরের বন্ধ়ু হ'য়ে উঠেছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে নাম লেখানোর সময় রাখালকেও সঙ্গে নেন নরেন। দ়ু'জনেই সই ক'রে অঙ্গীকার করলেন যে, নিরাকার ব্রহ্ম ছাড়া সাকার ঈশ্বর প়ুজা করবেন না। এই সময় নাগাদ রাখালের ভাব়ুক মন জন্ম-ম়ৃত্যুর অনেক গ়ুঢ়তত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। ফলে পাঠ্য-প়ুস্তকে মনোনিবেশ অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। সংসারের অন্য কাজেও ঘোর বিতৃষ্ণা। রাখালের পিতৃদেব ভাবলেন যে,'ছেলের বিয়ে দিয়ে তাঁর মন সংসারম়ুখী করে দেবেন। শান্ত, কোমল রাখালের পক্ষে পিতার আদেশ লঙ্ঘন করা সম্ভব হলো না। ফলে মাত্র ষোলো বছর বয়সেই বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে রাখালের বিয়ে হ'য়ে গেল। রাখালের পিতৃদেব ভেবেছিলেন যে, বিয়ের পর ছেলের মন ধীরে ধীরে সংসারী হবে। কিন্তু ঘটনা ঘটলো বিপরীত। কারণ, মনোমোহন মিত্র ছিলেন বিশ্বেশ্বরীর বড় ভাই এবং এই মনোমোহনই ১৮৮০ সালের প্রথম দিকে রাখালকে রামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে আসেন।

ঘটনা থেকে একট়ু পিছিয়ে যাচ্ছি। রাখাল আসার আগে মা জগদম্বার কাছে রামকৃষ্ণ কাঁদতেন আর বলতেন, 'মা, আমাকে একজনকে সঙ্গী করে দে ; ঠিক আমার মতন সরল শ়ুদ্ধপ্রাণ আর তোর ভক্ত।' দিন কয়েক পরেই রামকৃষ্ণের দৈবদর্শন হলো ; দেখলেন, মন্দিরের বাগানে বট গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটি বালক। ক'দিন পরে আবার দর্শন। এবার দেখলেন মা জগদম্বা যেন তাঁর কোলের উপর একটি ছেলেকে বসিয়ে দিলেন। ঠিক আগের দিনের মতন দেখতে—বয়সে কিছ়ু ছোট। তারপর বললেন,'এই নে তোর ছেলে।' প্রথমটায় রামকৃষ্ণ খ়ুব ভয় পেয়েছিলেন। তবে কি তাঁকে রতিক্রিয়ায় আসক্ত হতে হবে, তবে ছেলে পাবেন ? কিন্তু মা যেন তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন, 'এ হলো তোর মানসপ়ুত্র।' ঠিক তখনই রাখালকে সঙ্গে নিয়ে মনোমোহন দক্ষিণেশ্বরে আসছিলেন। রামকৃষ্ণের তৃতীয়বার দর্শন হলো। তিনি দেখলেন যে, গঙ্গাবক্ষে প্রস্ফ়ুটিত পদ্মের উপর দ়ুটি বালক নাচছে। একটি বালগোপাল, অন্যটি স্বপ্নে দেখা সেই ছেলেটি।

নৌকা ঘাটে এসে দাঁড়াল। পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে মনোমোহন আর রাখাল। রামকৃষ্ণ চিনতে পারলেন ছেলেটিকে—এ সেই স্বপ্নের বালক। স্তব্ধ বিস্ময়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। পরে মনোমোহনের দিকে ফিরে বললেন, 'এর মধ্যে আশ্চর্য সম্ভাবনা!' সবশেষে রাখালের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন, যেন তাঁদের কতদিনের পরিচয়।

রাখালকে দেখে রামকৃষ্ণের মাতৃভাবের উন্মেষ হ'ত। সেভাব মাতা যশোদার ভাব। এ এমন এক নিগ়ুঢ় সম্বন্ধ যা আমাদের ব়ুদ্ধির অগোচর। যেন অন্য এক জীবনের মধ়ুর সম্বন্ধটি নতুন ক'রে রাঙানো। সব থেকে যা বিস্ময়কর তা হলো, ইস্কুলে পাঠরত রাখালও যেন রামকৃষ্ণের সঙ্গে এই সম্বন্ধটি মেনে নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আর এক জীবনে যে সম্বন্ধটি গড়ে উঠেছিল, সেই স়ুত্র ধরে এই জীবনেও তাঁরা উভয়ে উভয়কে চিনতে পেরে-ছিলেন। এ ছাড়া আর কি র়ুপেই বা আমরা বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারি ?

রাখাল সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'তখন রাখালের এমন ভাব ছিল যেন তিন চার বছরের ছেলে। আমাকে ঠিক মায়ের মতন দেখতো। থেকে থেকে কোত্থেকে দৌড়ে এসে আমার

কোলে ব'সে পড়ত। এখান থেকে কোথাও এক পা নড়তে চাইত না। পাছে তার বাপ আসতে না দেয়, তাই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এক একবার তাকে বাড়িতে পাঠাতাম। বাবা জমিদার, অগাধ পয়সা কিন্তু বড় কৃপণ। প্রথম প্রথম নানাভাবে চেষ্টা করেছিল—যাতে ছেলে এখানে না আসে। কিন্তু পরে যখন দেখলো এখানে ধনী বিদ্বান সবাই আসছে, তখন আর আপত্তি করতো না। তারপর থেকে ছেলের জন্যে প্রায়ই আসতো। সে এলে রাখালের কথা ভেবে তার বাপকে বিশেষভাবে যত্নআত্তি করতাম। সেও খুব সন্তুষ্ট হ'ত।

'রাখালের শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকে তার এখানে আসা নিয়ে খুব আপত্তি ওঠে নি। কারণ মনোমোহনের মা, স্ত্রী, বোনেরা—সকলেরই এখানে যাওয়া-আসা ছিল। রাখাল এখানে আসবার কিছুদিন পরে তার শাশুড়ি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে একদিন এখানে এলো। রাখালের বালিকা বধূ বিশ্বেশ্বরীকে দেখে আমার আশঙ্কা হয়েছিল! ভাবলাম, রাখালের ঈশ্বর-ভক্তির কোনো হানি হবে না তো? এই ভেবে বধূকে কাছে ডেকে তার শরীরের গড়ন তন্ন তন্ন ক'রে দেখে বুঝলাম যে, ভয়ের কারণ নেই। মেয়েটি সাক্ষাৎ দেবীশক্তি। তখন সন্তুষ্ট হ'য়ে নহবতে সারদার কাছে ব'লে পাঠালাম, যেন টাকা দিয়ে বৌমার মুখ দেখে। (ঘোমটা তুলে বধূমাতার মুখ দেখার পর তাঁর হাতে আশীর্বাদী একটি টাকা দেওয়া এখানকার সনাতন রীতি। রাখাল তাঁদের মানসপুত্র, সেই সূত্রে বিশ্বেশ্বরী তাঁদের পুত্রবধূ।)

'রাখালের কি আশ্চর্য বালকভাবের আবেশ হ'ত তা বুঝিয়ে বলা যায় না। আমিও ভাবা-বিষ্ট হ'য়ে তাকে ক্ষীর-ননী সর খাওয়াতাম, খেলা দিতাম। কত সময় কাঁধে ক'রে বেড়িয়েছি। দোষ করলে বকতাম। শাসন করতাম। একদিন কালীঘর থেকে প্রসাদী মাখন এনে নিজে খেয়ে নিয়েছিল। সেদিন ভারি বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, "তুই তো খুব লোভী; এখানে এসে কোথায় লোভ ত্যাগ করতে শিখবি, তা না নিজেই লোভী হয়ে উঠেছিস!" সেদিন ভয়ে জড়সড় হ'য়ে উঠেছিল সে—আর কখনও এমন কাজ করে নি।......তার মনে বালকের মতন হিংসেও ছিল। তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসলে সে সহ্য করতে পারত না। মা যাদের এখানে আনতেন, ওদের ওপর হিংসা ক'রে পাছে তার অকল্যাণ হয় এ-ভয় আমার প্রায়ই হ'ত।'

দক্ষিণেশ্বরে আসার তিনবছর পরে রাখাল বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ তখন ব্যাকুল হয়েছিলেন। কারণ, ইতিমধ্যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে রাখাল সত্যিই ব্রজের রাখাল, কৃষ্ণসখা। তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল, ব্রজধামে গিয়ে পূর্বকথা স্মরণ ক'রে যদি সে শরীর ত্যাগ ক'রে! তাই মা জগদম্বার কাছে রাখালের জন্যে কাতর প্রার্থনা করেছিলেন। রাখাল নিরাপদে ফিরে এসেছিল।

রামকৃষ্ণ বলতেন, 'রাখালের সম্বন্ধে মা আমাকে অনেক কিছুই দেখিয়েছেন। তার অনেক কথাই বলা বারণ।'

রামকৃষ্ণের সেবক হ'য়ে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে এসেছিল ১৮৬৫ তে। তারপর তো কত বছর কেটে গেছে। হৃদয় বড় হয়েছে। বিশ্বস্ত দাসের মতন প্রেম আর ভালবাসা দিয়ে সে রাম-কৃষ্ণের সেবা করে গেছে। যৌবনের কিছু কিছু চরিত্রদোষ তারও ছিল। অবশ্য সেগুলি খুবই তুচ্ছ। ছেলেমানুষী প্রবৃত্তি। কিন্তু বয়স যত বাড়তে থাকল, ততই তাঁর স্বভাবটি

হয়ে উঠল কঠিন, নিষ্ঠুর। চাকুরিতে পা দেবার পর তার স্বভাব একেবারে বদলে গেল। আগে ছিল রামকৃষ্ণের সহযোগী, তাঁর সেবক বন্ধু। এখন তার স্বভাব হ'লো অত্যাচারী, নিষ্ঠুর কারারক্ষীর মতন। রামকৃষ্ণের সঙ্গে যারা দেখা করতে আসত, হৃদয় তাদের কাছ থেকে উৎকোচ নিত। যারা ঘুষ দিতে চাইত না, তাদের ভাগ্যে রামকৃষ্ণ-দর্শন হ'ত না। রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে হৃদয়কে ভর্ৎসনা করতেন বটে, কিন্তু হৃদয়ের স্বভাব একটুও বদলায় নি। বরং দিনদিন আরও উদ্ধত অসংযত হ'য়ে সে এমনভাবে প্রচার ক'রে বেড়াত, যেন মনে হ'ত রামকৃষ্ণ তারই আশ্রয়ে আছেন। সকলের সামনেই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সে রামকৃষ্ণের সঙ্গে কলহ করতো। জোর ক'রে তাঁকে দিয়ে তাঁর মতের বিরুদ্ধে কাজ করিয়ে নিত। কখনও রামকৃষ্ণের মতন ভাবাবিষ্ট হবার ভান করতো—তাঁর ভাবভঙ্গী নকল করতো, নাচতো, গাইতো। লোকে হাসাহাসি করতো বটে কিন্তু আর দু'জন অত্যাচারী ব'লে মুখের ওপর কিছু বলতে সাহস করতো না।

একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। রামকৃষ্ণ একবার বেজায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। একদিন তাঁকে দেখতে কয়েকজন ভক্ত এসেছে। হৃদয় তখন সেখানে উপস্থিত ছিল না। রামকৃষ্ণের সেবার জন্য ভক্তেরা একটি ফুলকপি সঙ্গে ক'রে এনেছে। রামকৃষ্ণ খুব খুশি। কিন্তু তখনই সবাইকে সতর্ক ক'রে দিয়ে বললেন, 'ওটা লুকিয়ে ফেল, হৃদুকে দেখিয়ো না। ও দেখলে আবার রাগারাগি করবে।' কিন্তু ভক্তেরা পাছে কিছু মনে করে, তা ভেবে রামকৃষ্ণ বললেন, 'অবিশ্যি আমাদের হৃদু খুব সৎ ; ও আমার জন্যে খুব করেচে। তাই মা ওকে দু'হাত ভরে দিয়েচেন। ধন-ঐশ্বর্য, জমিজমা, ভক্তি-সম্মান। মন্দিরের মধ্যে ও একজন কেউকেটা লোক ; সবাই খাতির করে। ওর এখন অনেক টাকা—লোককেও টাকা ধার দিতে পারে।' বলতে বলতেই হৃদয় এসে হাজির। ঘরে ঢুকেই ফুলকপির দিকে তার নজর পড়লো। রামকৃষ্ণ ভয় পেলেন—অপরাধীর মতন ঢোক গিলে বললেন, 'বিশ্বেস কর্ হৃদু ; আমি মোটেই এসব চাই নি। ওরা নিজেরাই নিয়ে এসেচে।' কিন্তু কে শোনে কার কথা! ক্রুদ্ধ হৃদয় তখন তর্জন-গর্জন ক'রে রামকৃষ্ণকে শাসন করছে আর বলছে যে, ডাক্তারের নিষেধ না মানার শাস্তি তাঁকে পেতেই হবে। (হৃদয়ের উত্তেজনার যথার্থ কারণ অন্যত্র। দর্শনপ্রার্থীরা তার অনুমতি ছাড়াই রামকৃষ্ণের ঘরে প্রবেশ করেছিল ব'লেই তার এই উষ্মা।) লজ্জায়, দুঃখে তখন রামকৃষ্ণের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছে। মায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে আকুল হ'য়ে বললেন, 'মা, তুই আমাকে সব লোভ সব বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছিস ; তবুও হৃদু আমাকে অপমান করে!' কিন্তু নালিশের কথাটি বলেই তাঁর মনোভাব বদলে গেল। (দুঃখ-বেদনার অনুভূতিগুলি এমনি ভাবেই ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মনের ভাব বদলে দিত।) মৃদু হেসে বললেন, 'হৃদু আমায় ভালবাসে বলেই বকাঝকা করে। ও এখনো অর্বাচীন। কি করছে কিছুই বোঝে না। তুই যেন ওর ওপর রাগ করিস নি, মা।' সেদিন কথাকটি বলেই রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন।

হৃদয় কিন্তু উদ্ধত ব্যবহারের জন্যে শত্রুসংখ্যা বাড়িয়েই যাচ্ছিল। সবাই অপেক্ষা করছিল, কবে তার পতন হয়! রামকৃষ্ণ তা জানতেন। তাই তাকে সতর্ক ক'রে দিতেন যাতে সে সংযত হয়। সেবার ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। দেশ থেকে সারদাদেবী স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে তিনি অপ্রার্থিত ব'লে হৃদয় তাঁকে ফিরিয়ে

দিল। দেবীও বিনাবাক্যব্যয়ে সেদিনই জয়রামবাটী ফিরে গেলেন। রামকৃষ্ণ কিছুই জানতে পারেন নি। পরে সব কথা জানবার পর তিনি হৃদয়কে বলেছিলেন, 'আমাকে অপমান করলে মা তোকে রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু খবরদার, সারদাকে অপমান করিস নি। ওর মধ্যে সাক্ষাৎ দেবীভাব। ওকে অপমান করলে স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এসেও তোকে রক্ষা করতে পারবেন না।'

এই ঘটনার পরই হৃদয়ের পতন হ'লো। কিন্তু ঠিক যে পথে আশা করা গিয়েছিল সে পথে নয়।

সেই বছরের মে মাসের শেষ নাগাদ, মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসের বাৎসরিক উৎসবে যোগ দিতে মথুরের ছেলে ত্রৈলোক্যনাথ, তার স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ত্রৈলোক্যের আট বছরের মেয়েটি সেদিন একা একা কালীঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল। ঘরের মধ্যে হৃদয় পূজার কাজে ব্যস্ত। ফুটফুটে মেয়েটিকে দেখেই হৃদয়ের কুমারী পূজা করতে ইচ্ছা হলো। কুমারী পূজা বিধিবহির্ভূত নয়। যে সব বালিকার যৌবন-উন্মেষ হয় নি, তাদের দিয়ে জগন্মাতার পূজা করার রীতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। (অবশ্য সারদাদেবীকে দিয়ে রামকৃষ্ণ যে ষোড়শী পূজা করেছিলেন, সেটি ছিল শাস্ত্রবিরুদ্ধ রীতি—কারণ সারদা-দেবী তখন পূর্ণ যুবতী।) বালিকাকে সে কথা জিজ্ঞেস করায় সেও ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিল। হৃদয় তখন তাকে সামনে বসিয়ে ফুল দিয়ে তার পূজা করলো। তার পা দু'খানি চন্দন দিয়ে সাজিয়ে দিল। এই চন্দনচর্চিত পা দু'খানি দেখেই ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যায়। ত্রৈলোক্যনাথের স্ত্রী যারপরনাই ভীতা হয়ে পড়লেন। সংস্কারকে কে না ভয় পায়! সবাই জানে যে ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রা মেয়ের পূজা করে, তবে বিবাহের পরেই সে মেয়ে বিধবা হয়। হৃদয় নিশ্চয়ই একথা জানতো—সুতরাং অনুমান হয় জেনেশুনেই এবং ত্রৈলোক্যকে অবজ্ঞা করতেই সে এ-কাজ করেছে। কিন্তু ত্রৈলোক্যও সাধারণ মানুষ—তিনিও সংস্কার-মুক্ত নন। সুতরাং তিনিও ভীত হ'লেন এবং এত ক্রুদ্ধ হ'লেন যে তখনই মন্দির-চত্বর থেকে হৃদয়কে বেরিয়ে যেতে বললেন।

সে আদেশ শুনে হৃদয় ছুটে এলো রামকৃষ্ণের কাছে। তাঁকে বললো, 'তুমিও আমার সঙ্গে এস। এখানে থাকলে ওরা তোমাকেও অপমান করবে।' রামকৃষ্ণ অবাক। বললেন, 'আমি কেন যাব? আমি যাব না। এখানে থাকব।' এদিকে ক্রোধের বশে ত্রৈলোক্য যে তাঁর সম্বন্ধে দু একটি কটু মন্তব্য করেছিল, রামকৃষ্ণ তা জানতেন না। মন্দিরের একজন কর্মচারী এসে তাঁকে সেকথা বলতেই, রামকৃষ্ণ তাঁর গামছাখানি কাঁধে ফেলে, ছাব্বিশ বছর ধরে বাস করা ঘরখানি ছেড়ে বিনা প্রতিবাদে বেরিয়ে গেলেন। ভয় নেই, অসন্তোষ নেই—একেবারে নির্বিকার ভাব। প্রায় মন্দিরের ফটকের কাছাকাছি এসে পড়েছেন, তখনি ছুটতে ছুটতে ত্রৈলোক্য এসে হাজির। 'বাবা! আপনি কেন যাচ্ছেন?' বলতে বলতে কেঁদে ফেললো ত্রৈলোক্য। 'কিন্তু তুমিই তো আমাকে যেতে বলেছ?' নিরপরাধ রামকৃষ্ণ সরলভাবে জিজ্ঞেস করলেন। 'না বাবা! ওরা আমার কথা ভুল বুঝেছে। আমি কখনই তা বলি নি। আমায় ক্ষমা করুন বাবা। ফিরে আসুন।' রামকৃষ্ণ মৃদু হাসলেন। তারপর একটিও কথা না ব'লে সোজা নিজের ঘরে এসে বসলেন। ঘরে তখনও ভক্তেরা ব'সে। রামকৃষ্ণ আবার তাদের সঙ্গে আলাপ-সালাপে এমনভাবে মগ্ন হয়ে গেলেন, যেন কোনো কিছুই ঘটে নি।

মন্দির থেকে বহিষ্কৃত হলেও দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে হৃদয় তখনই চলে গেল না। পাশেই যদু-মল্লিকের বাগানবাড়ি। হৃদয় সেখানেই এসে উঠল। তবে কালীবাগানে প্রবেশ করার হুকুম তার ছিল না। ফলে তার অত্যাচার আর সমস্ত ব্যাপারে অকারণ হস্তক্ষেপের অশান্তি থেকে রামকৃষ্ণ মুক্তি পেলেন। মন্দির থেকে হৃদয়কে এমনভাবে নির্বাসিত না করলে, রামকৃষ্ণের কাছে যাঁরা আসতে শুরু করেছিলেন, সেইসব নবীন ভক্তদের অনেকেই আসতেন না আর রামকৃষ্ণও তাঁদের ঠিক মতন শিক্ষা দিতে পারতেন না।

এই ঘটনার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত হৃদয় রামকৃষ্ণের পিছনে লেগে ছিল। হৃদয় চেয়েছিল দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে রামকৃষ্ণ অন্য কোনো কালীমন্দিরে চলে যান। কিন্তু রামকৃষ্ণ রাজী হন নি। অগত্যা বিফলমনোরথ হ'য়ে হৃদয় নিজেই একদিন যদুমল্লিকের বাগান থেকে দেশের বাড়িতে ফিরে গেল। দেশে থেকেই সে চাষ-আবাদ করতো। কদাচিৎ কলকাতায় আসতো। তবে যখনই আসতো রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতো।

এই রকমই এক ঘটনার কথা শ্রীম বলেছেন। ঘটনাকাল ১৮৮৪ সালের ২৬শে অক্টোবর। সেদিন বিকেলে অনেক ভক্ত এসেছেন। রামকৃষ্ণকে ঘিরে বসেছেন সবাই। এমন সময় একজন এসে খবর দিল যে, রামকৃষ্ণের সঙ্গে হৃদয় দেখা করতে এসেছে। যদু মল্লিকের বাগানের ফটকের কাছে সে দাঁড়িয়ে আছে। রামকৃষ্ণ একটুও ইতস্তত করলেন না। ভক্তদের বললেন, 'হৃদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি, তোমরা ব'স।' এই ব'লে কালো বার্ণিশ করা চটি জুতাটি পরে মাস্টারকে (শ্রীম) সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। লাল সুরকির উদ্যান পথ পেরিয়ে যদু মল্লিকের বাগানের ফটকের কাছে এসে দেখলেন, কৃতাঞ্জলিপুটে হৃদয় দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে দেখেই সে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। রামকৃষ্ণ তাকে উঠতে বললেন। হৃদয় উঠে দাঁড়াল। বালকের মতন সে তখন কাঁদছিল। কি আশ্চর্য! রামকৃষ্ণও কাঁদছেন। যে হৃদয় তাঁকে কত যন্ত্রণা দিয়েছে তার জন্যে ছুটে এসেছেন—কাঁদছেন! শ্রীম অবাক।

রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন—কেন এলি?

হৃদয় কাঁদতে কাঁদতে বললো—তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আমার দুঃখু আর কার কাছে বলবো?

রামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, 'সংসারে এরকম দুঃখু আছে। সংসার করতে সুখদুঃখ আছে।' তারপর শ্রীমকে দেখিয়ে বললেন, 'এঁরা তাই এক একবার আসেন; ঈশ্বরীয় দুটো কথা শোনেন। মনে শান্তি হয়। তা তোর কিসের দুঃখ?'

হৃদয় কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'তোমার সঙ্গ ছাড়া। তাই দুঃখু!'

রামকৃষ্ণ—কিন্তু তুই না বলেছিলি তোমার ভাব তোমাতে থাক, আমার ভাব আমাতে!

হৃদয়—হ্যাঁ বলেছিলাম। বোকার মতন বলেছিলাম।

রামকৃষ্ণ—এখন তবে আয়। আর একদিন এলে কথা বলবো। আজ রবিবার অনেক লোক এয়েছেন। তাঁরা বসে। এবার দেশে ধানটান কেমন হয়েছে?

হৃদয়—হ্যাঁ, তা এক রকম। মন্দ নয়।

রামকৃষ্ণ—আজ তবে আয়। আর একদিন আসিস।

ফেরার সময় শ্রীমকে রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমার সেবাও যত করেছে তেমনি যন্ত্রণাও দিয়েছে! আমি যখন পেটের ব্যারামে দু'খানা হাড় হয়ে গেছি—কিছু খেতে পারতাম না, তখন এক-

দিন আমায় বললে, "এই দ্যাখো, আমি কেমন খাই। তোমার মনের গুণে খেতে পারো না!" আর একদিন বলেছিল, "বোকা, আমি না থাকলে তোমার সাধুগিরি বেরিয়ে যেত।" একদিন এমন যন্ত্রণা দিলে যে পোস্তার উপর দাঁড়িয়ে জোয়ারের জলে দেহত্যাগ করতে গিয়েছিলুম! তবুও অনেকদিন ধ'রে ও আমার সেবা করেছে।' খানিক পরে শ্রীমকে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা! অত সেবা করতো—তবে ওর এমন কেন হলো? ছেলেকে যেমন মানুষ করে সেই রকম আমায় দেখতো। আমি তো রাতদিন বেহুঁশ হয়ে থাকতুম—তার ওপর আবার অনেক দিন ধ'রে ব্যারামে ভুগেছি—ও যেমন ক'রে রাখতো তেমন করে থাকতুম। আমি ওর হাতধরা হ'য়ে গিয়েছিলুম।'

১৫

নরেন

ক'লকাতার এক বিখ্যাত কায়স্থ পরিবারে ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী নরেন্দ্রনাথ দত্ত (ডাক নাম নরেন) জন্মগ্রহণ করেন। সনাতন গুণকর্মবিভাগ মতে ক্ষত্রিয় হলো যোদ্ধৃজাতি —প্রশাসন ও জননেতৃত্বই এই জাতির উপযুক্ত বৃত্তি। নরেনও যদি সেই ভাবে শিক্ষালাভ করতেন, তাহলে তাঁর কর্মধারা বৃত্তিগত হ'ত। কিন্তু ক'লকাতার দত্তেরা ধনে-মানে, বিদ্যা-গৌরবে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন।

নরেনের পিতামহের নাম দুর্গাচরণ; ছেলেবেলা থেকেই সন্ন্যাসীর জীবন যাপনের প্রতি দুর্গাচরণের আকর্ষণ ছিল। তবে সংসারে আঁট না থাকলেও গৃহী জীবনের কর্তব্যের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না। শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষা করতে দুর্গাচরণ বিবাহ করেন এবং পুত্রমুখ দর্শন ক'রে চিরদিনের মতন সংসার ত্যাগ করেন। দুর্গাচরণের গৃহত্যাগের কয়েক বছর পরে তাঁর সহধর্মিণী একবার কাশী যান। একদিন তিনি বিশ্বনাথ দর্শন ক'রে ফিরছেন—একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই পথ পিছল। সেই পিছল পথে দুর্গাচরণের সহধর্মিণী হঠাৎ পড়ে গেলেন। পথ দিয়ে একজন সন্ন্যাসী যাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মহিলার হাত ধরে তাঁকে মন্দিরের সোপানে যত্ন ক'রে বসিয়ে দিলেন। তারপর আঘাত পরীক্ষা করতে হেঁট হলেন। মহিলাও সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়েছিলেন। সহসা চার চক্ষুর মিলন হলো! মুহূর্তেরও ভগ্নাংশ। তাতেই হা হা ক'রে উঠল নারীর মন। এই তো তিনি! দুর্গাচরণও পত্নীকে চিনেছিলেন এবং ওই সময়টুকুর মধ্যেই মনস্থির ক'রে ফেলেছিলেন। দ্বিতীয়বার আর সহধর্মিণীর দিকে ফিরে তাকালেন না। দ্রুতপায়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

শাস্ত্রে বিধি আছে যে প্রব্রজ্যা গ্রহণের বার বছর পরে সন্ন্যাসীদের একবার জন্মস্থান পরিদর্শনে আসতে হয়। সুতরাং দুর্গাচরণও কলকাতায় এলেন। তবে আগমনের সংবাদটি গোপন রাখতে এক বন্ধুর বাড়িতে এসে উঠলেন। কিন্তু শুভ ভেবেই বন্ধুটি তাঁর আসার খবরটি দুর্গাচরণের পরিবারে জানিয়ে দেন। ফলে পরিবারের লোকেরা সদলবলে এসে দুর্গাচরণকে স্বগৃহে নিয়ে গেল। বাধ্য হয়ে দুর্গাচরণ ঘরের মধ্যে তিনদিন তিনরাত মৌনী হয়ে ছিলেন। সে এক দুঃসহ অবস্থা! আহার নিদ্রা নেই, আমৃত্যু অনশনের মতন সে ব্রত যেমন কঠিন, তেমনি নির্মম। আত্মীয়রা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি বন্ধদ্বার খুলে দেওয়া হলো। পরদিন দেখা গেল দুর্গাচরণ নেই, আবার কোথায় হারিয়ে গেছেন।

কিন্তু দুর্গাচরণের একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথ ছিলেন একেবারে অন্য ধাতের। রুচিতে নাস্তিক ও স্বভাবে সংসারী এই মানুষটির ধর্ম নিয়ে কোনো ব্যসন ছিল না। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অপক্ষপাত বিশ্বনাথের দৃষ্টিভঙ্গিকে ঝরঝরে করে তুলেছিল। ধর্ম নিয়ে তিনি পরিচ্ছন্ন কৌতুক করতেন। ক'লকাতা হাইকোর্টে মোক্তারি ক'রে বিশ্বনাথ একদিকে যেমন প্রভূত

উপার্জন করেছেন তেমনি দানধ্যানও করেছেন। ভ্রমণ বিলাসিতা যেমন ছিল তেমনি ছিল আহার বিলাসিতা। ইংরেজী এবং ফার্সী—দুই ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল। মূল ভাষায় কাব্যপাঠ করে আনন্দ পেতেন, আনন্দ পেতেন সঙ্গীত চর্চা করে। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তবে সংসারী হলেও সাধারণ গৃহস্থের মতন তাঁর মন ধনগত ছিল না। পরদিনের কথা ভেবে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি তাঁর কখনও হয় নি। মুক্তহস্তে দান করতেন—পাত্রাপাত্র বিচার করতেন না। আত্মীয়বর্গ তাঁর এই উদারতার সুযোগ নিত। টাকা নিয়ে তারা নেশা করতো। বড় হ'য়ে নরেনের চোখেও ব্যাপারটি দৃষ্টিকটু ঠেকেছিল। মাঝে মাঝে তাই পিতাকে মৃদু ভর্ৎসনাও করতেন। বিশ্বনাথ কিন্তু ক্ষুব্ধ হতেন না। তিনি বলেছিলেন, বড় হয়ে নরেন নিশ্চয়ই বুঝবে কেন মানুষ নেশা করে ; মানুষের জীবন বড় দুঃখময় আর সেই দুঃখ ভুলতেই মানুষ নেশা করে। যেদিন সেকথাটি নরেন বুঝবে সেদিন আর সে এদের উপর রাগ করতে পারবে না। বিশ্বনাথ কখনো কঠোর তিরস্কার ক'রে কাউকে শুধরে দিতে চাইতেন না। সংশোধনের নানা অভিনব পন্থা ছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটি বোঝা যাবে। একবার নরেন তাঁর মায়ের সঙ্গে বিবাদ করেছিলেন। তা শুনে বিশ্বনাথ কাঠকয়লা দিয়ে নরেনের ঘরের দরজার পাল্লায় বড় বড় করে লিখলেন, 'নরেন আজ তার মা-কে এইসব কথা বলেছে।' খানিক পরে বন্ধুবান্ধব নিয়ে নরেন ঘরে ঢুকতে যাবেন—লেখাটির ওপর নজর পড়ল। বন্ধুরাও সবাই দেখলো। সেদিন বন্ধুদের সামনে নরেন লজ্জায় এতটুকু হয়ে গিয়েছিলেন !

আর একবার—নরেন অপ্রিয়ভাবে বিশ্বনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আমার জন্যে এতদিন কি করেছেন ?' বিশ্বনাথ একটুও উত্তেজিত না হ'য়ে বললেন, 'যাও, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও, তাহলেই বুঝবে কি করেছি !' তবে সাধারণভাবে নরেন তাঁর বাবাকে ভালবাসতেন। তাঁর মতামতের ওপর নরেনের শ্রদ্ধা ছিল। বিশ্বনাথকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সংসারে আমার ব্যবহার কি রকম হবে ?' ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন শিক্ষিত ইংরেজ তাঁর ছেলেকে যে উত্তরটি দিতেন ঠিক সেই উত্তরই বিশ্বনাথ নরেনকেও দিলেন। বললেন, 'সংসারে যাই দেখ না কেন কখনো বিস্ময় প্রকাশ করো না।' উত্তরজীবনে নরেন তাঁর এই উপদেশটি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন। তবে দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গির একটু তফাৎ ছিল। বিশ্বনাথ ছিলেন উদাসীন, নরেন স্থিতপ্রজ্ঞ। যে সুস্থিত মন নিয়ে পরবর্তীকালে তাঁকে নানারকম দুঃসময় ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে, তা হলো যুক্তিবাদী সন্ন্যাসীর নিষ্কাম নৈরপেক্ষ্য, সংসার অনভিজ্ঞ গৃহীর উদাসীনতা নয়।

নরেনের মা ভুবনেশ্বরী ছিলেন মহীয়সী এবং অসাধারণ রূপবতী। দেবদ্বিজেও তাঁর গভীর ভক্তি। সাধারণভাবে শিক্ষিতা এই মহীয়সী নারীর মেধা ছিল অসাধারণ তীক্ষ্ণ—বিবেচনা শক্তি জাগ্রত। লোকের মুখে মুখে যা শুনতেন তা এমনভাবে স্মৃতিতে ধারণ ক'রে রাখতেন যে, কথাবার্তার সময় তাঁকে যথেষ্ট শিক্ষিত ব'লে মনে হ'ত। বড় সংসারের সব ভার তাঁর ওপর ছিল। কিন্তু সুচারুভাবে এবং অবলীলায় তা পালন করতেন। মোট সাত ছেলেমেয়ের জননী। প্রথম তিনটি হলো পুত্র—পরের চারজন কন্যা। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হলেন নরেন। চার মেয়ের মধ্যে দু'জনার অকালমৃত্যু হয়।

শারীরিক গঠনে নরেন ছিলেন ঠাকুরদাদার মতন। মনের দিক থেকেও পিতামহ দুর্গা-

চরণের সঙ্গে তাঁর ভাবানুষঙ্গ ছিল। ছেলেবেলা থেকেই সাধুসন্ন্যাসীদের সম্পর্কে নরেনের টান ছিল। তাদের দেখলেই বালক নরেন চঞ্চল হ'য়ে উঠতেন। গেরস্থালীর জিনিষপত্তর যা সামনে পেতেন, এমনকি মায়ের কাপড়চোপড় পর্যন্ত, সন্ন্যাসীদের দিকে ছুঁড়ে দিতেন। তাই প্রায়ই তাঁকে ঘরের মধ্যে বন্ধ ক'রে রাখা হ'ত। যখন তাঁর চার পাঁচ বছর বয়স তখন থেকেই তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক ধ্যানানুরাগ লক্ষ্য করা গেছে। মেলা থেকে দেবদেবীর মাটির মূর্তি কিনে এনে তাদের সামনে চোখ বন্ধ ক'রে ধ্যানে বসতেন। পুরাণের গল্প শুনে ভাবতেন, ধ্যানে বসলে ঋষিদের মতন তাঁরও চুল জটাজুট হ'য়ে বটগাছের ঝুরির মতন একদিন মাটিতে গেঁথে যাবে।

'ছেলেবেলা থেকেই নবেনের মন এক অনন্যসাধারণ অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকত। পরবর্তীকালে সেই অভিজ্ঞতাটি তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

'ছেলেবেলা থেকেই, আমার মনে আছে, ঘুমাবার সময় চোখ বন্ধ করলেই দুই ভুরুর মধ্যে এক অপূর্ব জ্যোতির্বিন্দু দেখতে পেতাম এবং একমনে সেই বিন্দুর নানারূপের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে থাকতাম। দেখবার সুবিধে হবে ব'লে লোকে যেভাবে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে, আমি সেইভাবে শয্যায় শুতাম। ওই আশ্চর্য বিন্দু নানা রঙে রাঙিন হতে হতে আকারেও বাড়তে বাড়তে একটি বলের আকার ধারণ করতো ; পরে ওই অপূর্ব বস্তুটি ফেটে যেত আর আমার আপাদমস্তক সাদা তরল জ্যোতিতে ঢেকে ফেলতো। এর পরেই আমার চেতনা লুপ্ত হ'ত—আমি ঘুমের কোলে ঢলে পড়তাম। বহুকাল অব্দি আমি জানতাম লোকে ওইভাবেই নিদ্রাভিভূত হয়। বড় হ'য়ে যখন ধ্যানাভ্যাস করতে আরম্ভ করলাম তখন চোখ বুজলেই ওই জ্যোতির্বিন্দু প্রথমেই আমার সামনে এসে উপস্থিত হ'ত এবং ঐ বিন্দুতেই আমার মন একাগ্র করতাম। সেই সময় নাগাদ বন্ধুদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশমতো ধ্যান করতাম। ধ্যান করার সময় আমাদের যেমন যেমন উপলব্ধি হ'ত পরস্পরকে জানাতাম, আলোচনা করতাম। তখন তাদের কথা থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম যে নিদ্রাভিভূত হবার আগে আর কারও অমন জ্যোতির্বিন্দু দর্শন হয় নি।'

ছেলেবেলায় নরেন প্রায়ই রাগে আত্মহারা হ'য়ে উঠতেন ; তখন ঘরের আসবাবপত্র ভেঙেচুরে তছনছ ক'রে দিতেন। ছেলেকে শান্ত করতে ভুবনেশ্বরী তখন ছেলের মাথায় গঙ্গাজল ঢেলে শিব শিব বলতেন। একবার বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে খেলতে নরেন সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়লেন। বাঁ চোখের ঠিক ওপরে কপালের খানিকটা কেটে গেল। সেই থেকে কপালে একটি ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি হলো। পরবর্তীকালে যখন রামকৃষ্ণের কাছে ঘটনাটি বলা হয় তখন তিনি বলেন, 'খানিকটা রক্তপাত হ'য়ে ভালোই হয়েছিল। নইলে নরেন হয়ত তার প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে পৃথিবীটা ওলটপালট ক'রে দিত।' নরেনও বলতেন, রামকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেই তিনি তাঁর ক্রোধ আয়ত্তে এনেছিলেন।

সমবয়সীদের মধ্যে নরেন ছিলেন নেতা—সবাই তাঁর নেতৃত্ব মেনে চলত। সদানন্দময় এই উৎসাহী ছেলেটিকে কেউ কখনও বিমর্ষ হতে দেখে নি। সব কাজেই তাঁর জিদ ছিল প্রবল, কিন্তু তার থেকেও প্রবল ছিল আত্মসংযম। তাই ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির তাড়নায় নরেন কখনও

বিপথগামী হন নি। সাঁতার কাটা, কুস্তি করা, মুষ্টিযুদ্ধ, ঘোড়ায় চড়া, সব খেলাতেই নরেন ছিলেন অগ্রণী। নাচ গান অভিনয়কলাতেও সমান পারদর্শী, নিপুণ। এ ছাড়াও ছিল নানা উদ্ভাবনী বিদ্যায় দক্ষতা। গ্যাস তৈরির কারখানার নক্সা বানানো থেকে শুরু ক'রে রন্ধনবিদ্যা শেখা, ইত্যাদি সব কাজেই তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। একটা নাটুকে দলও খুলেছিলেন নরেন। দেহখানি ছিল সুদৃঢ়—বয়সকালে ঈষৎ স্থূলবপু হলেও আশ্চর্য রকমের চটপটে এবং ক্ষিপ্রগতি ছিলেন নরেন। শরীরের গড়নটি ছিল প্রাংশুবিশেষ, উন্নত-কায়; দেহসৌন্দর্য ছিল অনুপম ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন। এই অপরূপ দেহসুষমা তাঁর ব্যক্তিত্বেরই বিকাশ ব'লে অনেকে মনে ক'রত।

নরেন প্রায় শ্রুতিধর ছিলেন। মায়ের চেয়েও বিস্ময়জনক ভাবে প্রখর ছিল তাঁর স্মৃতি-শক্তি। পাঠ্য বইয়ের আধেয় বিষয়বস্তু একবার চোখ বুলিয়েই আয়ত্ত করে নিতেন। মাস্টার-মশাইরা তাঁর মধ্যে এক আশ্চর্য মেধাবী ছাত্র আবিষ্কার করেছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁর এই অসাধারণ মেধা তাঁকে আরও যুক্তিবাদী ও বিচারমুখী ক'রে তোলে। নরেন ছিলেন মূলত সংশয়বাদী। তবে ক্ষুদ্র অর্থে নয়—যে অর্থে জীবনকে সাগ্রহে জানা যায়, সেই অর্থে। কোনো নতুন ভাবনা বা বিশ্বাসকে যাচাই না ক'রে তিনি মেনে নিতেন না। ছেলে-বেলার একটি ঘটনার কথা বলি। তিনি তখন খুবই ছোট। এক গাছের মালিক ব'লে বেড়াত যে ভূতেরা সেই গাছটি পাহারা দেয়। একদিন সেই গাছে চড়ে নরেন বন্ধুদের কাছে প্রমাণ করলেন যে লোকটি যা বলেছে তা মিথ্যে। নরেনের কাছে সত্যের চেয়ে মহৎ ও পবিত্র আর কিছু ছিল না। তাই সত্যকে তিনি কখনও লঘুভাবে দেখেন নি, তাকে নিয়ে তাচ্ছিল্যও করতেন না। যারা কথার ছল ক'রে সত্যকে এড়িয়ে যেত, অতিশয়োক্তি ক'রে বিষয়কে পরিহার করতো, তাদের প্রতি তাঁর ঘৃণা আর বিদ্বেষ চিরকালই বর্ষিত হয়েছে।

আগের পরিচ্ছেদে একটি ব্যায়ামাগারের কথা বলেছি; এই আখড়াতেই নরেনের সঙ্গে রাখালের আলাপ হয়। একদিনের ঘটনা। নরেন সেদিন তার দলবল নিয়ে ট্রাপিজ্ খাটাবার জন্য একটা কাঠের ফ্রেম খাড়া করবার চেষ্টা করছিলেন। রাস্তায় তখন বেশ ভিড় হয়ে গেছে, সবাই দেখছে। কিন্তু ছেলেদের সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসছিল না। জনতার মধ্যে একজন ইংরেজ নাবিকও ছিল। লোকটাকে বেশ জোয়ান আর শক্তসমর্থ দেখে নরেন তার সাহায্য চাইলেন। ইংরেজ নাবিকটি সানন্দে ছেলেদের সঙ্গে হাত লাগাল। ছেলেরা তখন ট্রাপিজের মাথায় দড়ি বেঁধে ওপর দিকে টেনে তুলতে লাগল আর সাহেব কাঠের ফ্রেমের পায়া দুটি গর্তের মধ্যে ধীরে ধীরে ঢোকাতে লাগল। ফ্রেমটি যখন বেশ খানিক উঁচুতে উঠে গেছে তখন হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে ফ্রেমটি মাটিতে পড়ল আর তার একটি পায়ার ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ল সাহেব। মাটিতে পড়েই সাহেব অজ্ঞান। তার কপাল কেটে গিয়ে গলগল ক'রে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা! অজ্ঞান অচৈতন্য সাহেব মৃতের মতন পড়ে—রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে তার শরীর। যারা দাঁড়িয়ে দেখছিল তারা সবাই পুলিশ হাঙ্গামার ভয়ে সেখান থেকে তখন চলে গেছে। তাদের দেখাদেখি অন্য ছেলেরাও পালাল। দাঁড়িয়ে ছিলেন শুধু নরেন আর তার দু'একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেদিন নরেন একটুও বিমূঢ় হন নি। তাড়াতাড়ি পরনের কাপড় থেকে খানিকটা ছিঁড়ে সেটি জলে ভিজিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিলেন, তারপর অনবরত মাথায় মুখে জল ছিটিয়ে পাখার বাতাস করতে লাগলেন।

খানিক পরেই লোকটির জ্ঞান ফিরে এলে, সবাই মিলে ধরাধরি করে কাছের একটি ইস্কুল ঘরে এনে শুইয়ে দিল। একজন ছুটে গেল ডাক্তার আনতে। ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে জানালেন যে আঘাত গুরুতর নয়। তবে হপ্তাখানেক সেবাশুশ্রূষা দরকার, তাহলেই সে আরোগ্য হবে। নরেনই তখন সাহেবের সেবাশুশ্রূষা আর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তার-পর সাহেব সেরে উঠলে, নরেন নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে তার জন্যে কিছু পাথেয় সংগ্রহ ক'রে সাহেবের হাতে দিয়েছিলেন।

চিন্তা আর কর্মের মধ্যে সাযুজ্য আনতে পারেন এমন মানুষ অল্পই জন্মান। নরেন ছিলেন সেইরকম একজন মানুষ। পুরোনো দিনের কথা স্মরণ করতে গিয়ে নরেন বলতেন, 'সে সময় রোজ রাত্তিরে যখন শুতে যেতাম তখন দুটি কল্পনা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠতো। একটাতে দেখতাম আমি যেন মহা ঐশ্বর্যবান হয়েছি। কত ধন-জন-সম্পদ আমার চারপাশে, কত ক্ষমতা আমার। সংসারে বড় মানুষ বলতে যা বোঝায় আমি তাদের অগ্রগণ্য। শুধু তাই নয়, মনে হ'ত এমনটি হবার শক্তি আমার মধ্যে আছে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখতাম বিপরীত একটা ছবি। যেন সংসারের সব ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে আমি সন্ন্যাসী হয়েছি। আমার পরনে কৌপীন সার ; আহার্য যা পাই তাই খাই ; বৃক্ষতলে শুয়ে রাত কাটাচ্ছি আর এই-ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে জীবনকে নিবেদন করেছি। এ ক্ষেত্রেও মনে হ'ত, ইচ্ছা করলে আমি ওইভাবে মুনিঋষিদের মতন জীবনযাপনে সমর্থ। এমনি ক'রে দু'ভাবেই জীবনকে গড়ে নেবার ছবি আমার কল্পনায় ফুটে উঠতো। কিন্তু শেষের ছবিটিই আমার হৃদয় অধি-কার করতো। ভাবতাম, এই পথেই মানব পরমানন্দ লাভ করতে পারে আর আমিও তাই করবো। অমন একটি জীবনের সুখের কথা ভাবতে ভাবতেই মন ঈশ্বরভাবনায় নিবিষ্ট হ'ত আর আমি ঘুমিয়ে পড়তাম।'

•

নরেনের বয়স যখন বছর পনেরো তখন তাঁর পিতৃদেব বিশ্বনাথ বিষয়কর্মোপলক্ষে কিছু-দিন মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে ছিলেন। বেশ কিছুকাল সেখানে থাকতে হবে অনুমান ক'রে তিনি পরিবারবর্গকে রায়পুরে নিয়ে আসার কথা ভাবলেন। এ কাজটি করার ভার পড়লো নরেনের ওপর। সে যুগে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে কোনো রেল যোগাযোগ ছিল না। তাই যাত্রা-পথের অনেকটা গরুর গাড়িতে যেতে হয়েছিল। প্রায় দু সপ্তাহ ধরে শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় নরেন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, বহুদিন পর্যন্ত তা তিনি ভুলতে পারেন নি। তাঁর নিজের কথাতেই সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছি। 'বনমধ্যগত পথ দিয়া যাইতে যাইতে ঐকালে যাহা দেখিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, তাহা স্মৃতিপত্রে চির-কালের জন্য দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। বিশেষত একদিনের কথা। উন্নতশীর্ষ বিন্ধ্যগিরির পাদদেশ দিয়া সেদিন আমাদিগকে যাইতে হইয়াছিল। পথের দুই পার্শ্বেই গিরিশৃঙ্গসকল গগন স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান ; নানাজাতীয় বৃক্ষলতা ফলপুষ্প সম্ভারে অবনত হইয়া পর্বত-পৃষ্ঠের অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিয়া রহিয়াছে ; মধুর কাকলিতে দিক পূর্ণ করিয়া নানাবর্ণের বিহঙ্গকুল কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে গমন অথবা আহার অন্বেষণে কখনো কখনো ভূমিতে অবতরণ করিতেছে ;—ঐ সকল বিষয় দেখিতে দেখিতে মনে একটা অপূর্ব শান্তি অনুভব করিতেছিলাম। ধীর-মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে গো-যান সকল ক্রমে ক্রমে এমন

একস্থলে উপস্থিত হইল যেখানে পর্বতশৃঙ্গদ্বয় যেন পরম প্রেমে অগ্রসর হইয়া বনপথকে একাকালে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। তখন তাহাদের পৃষ্ঠদেশ বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখি যে, এক পার্শ্বের পর্বতগাত্রে, মস্তক হইতে পাদদেশ পর্যন্ত, বিস্তৃত একটি সুবৃহৎ ফাটল রহিয়াছে এবং ঐ অন্তরালকে পূর্ণ করিয়া মক্ষিকাকুলের যুগযুগান্তের পরিশ্রমের নিদর্শন-স্বরূপ একখানি প্রকান্ড মধুচক্র লম্বিত রহিয়াছে! তখন বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া সেই মক্ষিকা-রাজ্যের আদি-অন্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে মন ত্রিজগৎ-নিয়ন্তা ঈশ্বরের অনন্ত, শক্তির উপলব্ধিতে এমনভাবে তলাইয়া গেল যে, কিছুকালের নিমিত্ত বাহ্যসংজ্ঞার একাকালে লোপ হইল। কতক্ষণ ঐভাবে গো-যানে পড়িয়াছিলাম স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল তখন দেখিলাম উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। গোযানে একাকী ছিলাম বলিয়া ওই কথা কেহ জানিতে পারে নাই।'

পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে নরেনের সঙ্গে পরিবারের সকলে ক'লকাতায় ফিরে এলেন। ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে প্রথমে ক'লকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং একবছর পরে জেনারেল এ্যাসেমব্লিশ ইন্সটিটিউশনে ভর্তি হলেন। নরেনের প্রিয় পাঠ্য বিষয় ছিল ইতিহাস। কলেজে ঢুকেই যথেষ্ট পড়াশুনা করে ফেলে-ছিলেন তিনি। পাশ্চাত্য দর্শন এবং লজিক ছাড়াও য়ুরোপের প্রতিটি দেশের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস তিনি পড়ে ফেলেছিলেন।

নরেনের সহপাঠী ছিলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত, এবং শিক্ষাবিদ ব্রজেন্দ্র-নাথ শীল। নরেন সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন: 'নরেন ছিল অসাধারণ ঐশীক্ষমতাসম্পন্ন একজন মুক্ত মনের যুবক। সামাজিক মেলামেশা এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহার-আচরণে সে ছিল লৌকিকতাবর্জিত এবং সহজ। চমৎকার গানের গলা—সব রকম দলের সেই ছিল মধ্যমণি। অসাধারণ ছিল তার আলাপ করার, মেশার ক্ষমতা। কথাও বলতো তেমনি—যাকে বাকপটু বলে তাই ছিল নরেন। তবে কথাবার্তায় ধার থাকত—বেশ তিক্ত কষায় স্বাদ থাকত তার কথার। বিশেষত যখন ব্যঙ্গের হুল ফুটিয়ে ধর্মকর্মের লোক দেখানো আচার আর ভণ্ডামিকে নরেন আঘাত করতো তখন খুব নির্মম হতো সে আঘাত। কিন্তু তার অবজ্ঞার আড়ালে ঢাকা থাকতো একটি দরদী মন। সব মিলিয়ে এক বেপরোয়া ছন্নছাড়া ভাব ছিল তার। তবে ছন্নছাড়ার মতন মনে হলেও নরেনের চরিত্রে এমন একটি জিনিস দেখেছি যা ছন্নছাড়াদের চরিত্রে নেই। সেটি হলো তার লৌহকঠিন ইচ্ছাশক্তি—'

সাময়িক ভাবে নরেন তখন জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার ইত্যাদিদের গোঁড়া ভক্ত হয়ে-ছেন এবং নিজেকে নাস্তিক ব'লে প্রচার করতে শুরু করেছেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কঠোর নিরামিষাশী। মেঝেয় শোয়া, একটির বেশি কম্বল ব্যবহার না করা, এসব কৃচ্ছ্রতাও চলছে। সংকল্প করেছেন চিরকুমার থাকবেন। তাই বাবা মা যখন বিয়ের প্রস্তাব আনলেন তখন সরাসরি না বললেন। পাত্রীপক্ষ তাঁকে লণ্ডনে রেখে আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য তৈরি করাতে চাইলেও নরেন রাজী হন নি! সম্ভবত নরেন নিজেও জানতেন না, কেন এমন আত্মপীড়ন করছেন। অবশ্য স্বাভাবিক জ্ঞান থেকে নরেন এটুকু বুঝেছিলেন, যে কোনো এক মহৎ কাজে নিজেকে সঁপে দেবার জন্য তিনি ভিতরে ভিতরে তৈরি হচ্ছিলেন। তবে কী সে কাজ নরেন তা জানতেন না।

যাচাই না ক'রে নরেনের বিচারশীল মন তখন কোনো কিছুই গ্রহণ করত না। তিনি অবশ্য অখণ্ডভাবে সব কিছু মেনে নিতে চাইতেন ; কিন্তু বিশ্বাসের বুনিয়াদ ঠিকমত গড়ে ওঠে নি ব'লে পারতেন না। কেতাবে যে ঈশ্বরজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে সেগুলি তাঁর অসার মনে হ'ত। এ ব্যাপারে যাঁদের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ নয় তাঁদের কথাও শুনতে ভালো লাগত না। একদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য দেবেন্দ্রনাথকে সরাসরি জিজ্ঞেস ক'রে বসলেন, 'আপনি ঈশ্বর-দর্শন করেছেন?' ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ যুবক নরেনকে ঠকাতে চান নি। নরেনের চোখে চোখ রেখে তিনি বললেন, 'তোমার তো যোগীর চোখ। তুমি ধ্যান করা অভ্যাস কর।' আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি যে নরেনের উৎসাহেই রাখাল ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলেন। নরেন তখন নিয়মিত সমাজের প্রার্থনা সভা আর উপাসনা সঙ্গীতেও যোগ দিতেন। কিন্তু অল্পদিনেই বুঝলেন, যে প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম অনুভূতির জন্যে তাঁর মন ব্যাকুল হয়, সেটি তিনি সমাজ থেকে পাবেন না।

তখন জেনারেল এ্যাসেম্বলিজ ইন্সটিটিউশনের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন ইংরেজ—ডবলু. ডবলু. হেস্‌টী। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মের কথাটি হেস্‌টী সাহেব বুঝতেন। এই মহান সংস্কৃতির একজন ভক্ত ছিলেন তিনি। এই সাধক শিক্ষককে ভারতীয় মাত্রেই শ্রদ্ধা করতেন, ভালো-বাসতেন। হেস্‌টী সাহেবই নরেনের মধ্যে এক বিস্ময়কর প্রতিভা খুঁজে পেয়েছিলেন। নরেনের কথা উঠলেই বলতেন, 'ওর মতন প্রতিভা আমি আর কোনো ছাত্রের মধ্যে দেখি নি।' কখনও বা এমন কথাও বলতেন যা শুনে অবাক মানতে হ'ত। বলতেন, 'জার্মানীর বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে যারা দর্শন নিয়ে পড়ছে তারাও নরেনের মতন প্রতিভাবান নয়।' শুধু তাই নয়, যে গুটিকয় বিদেশী রামকৃষ্ণকে দর্শন ক'রে ধন্য হয়েছিলেন, হেস্‌টী ছিলেন তাঁদেরই একজন। হেস্‌টী একদিন সাহিত্যের ক্লাসে ওয়াডর্সওয়ার্থের দি এক্স্‌কারশন (The Excursion) কবিতাটি পড়াতে গিয়ে কবির 'প্রকৃতিতত্ত্বের' কথা বোঝাচ্ছিলেন। নরেনও সে ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন। এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের আলোচনা কালে নিবিড় ধ্যানময়তার বিভিন্ন অবস্থার কথাও এসে গেল। অধ্যাপক বললেন, তেমন অবস্থা মানব-জ্ঞানের অতীত। সাধকের যখন তেমন সমাধিভাব হয় তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবশ্য এমন অবস্থা যে সচরাচর হয় না সে কথাও বললেন ; কারণ অখণ্ড এবং শুদ্ধসত্ত্ব মনোনিবেশ বর্তমান যুগে দুর্লভ। তারপরই বললেন, 'এ যুগে এমন একজন সাধককেই আমি দেখেছি যিনি পূর্ণজ্ঞানে সেই সচ্চিদানন্দ অবস্থায় পৌঁছতে পারেন। তিনি হলেন দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ। তোমরা যদি সেই মহাসাধককে দর্শন কর তাহলেই আমার কথা ভালোভাবে বুঝতে পারবে।'

কিন্তু রামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেনের মিলনের হেতু হেস্‌টী সাহেব নন—রাখালও নন। নরেনের মনে তখনও সেই দ্বিধা—'যদি সাধ না মেটে, যদি নিরাশ হই!' এই দ্বিধা নিয়েই কেটে যাচ্ছিল নরেনের দিন। সিদ্ধান্ত নেবার কারণও ঘটে নি। অবশেষে জীবনের সেই পরম মুহূর্ত উপস্থিত হলো। সারদানন্দ বলছেন, সেটি ১৮৮১ সালের নভেম্বর মাসের কোনো একটি দিন। সুরেন মিত্রমশাই এক ঘরোয়া সভায় নরেনকে গান গাইতে নেমন্তন্ন করলেন। কিছু অতিথি-অভ্যাগত আসবেন ; আর আসবেন রামকৃষ্ণ।

একবার দেখেই নরেন সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের তীব্র আগ্রহ হলো। নরেন তখন ভজন গাইছেন।

তাড়াতাড়ি সুরেন মিত্র আর রামচন্দ্র দত্তকে কাছে ডেকে খ‍ুঁটিয়ে খ‍ুঁটিয়ে নরেনের সব কিছু জেনে নিলেন রামকৃষ্ণ। তারপর নরেনের গান শেষ হ'লে তাকেও ডেকে পাঠালেন। দু' একটি কথা বললেন। যতক্ষণ কথা বলছিলেন নিবিষ্টভাবে নরেনের মুখের দিকে চেয়েছিলেন। নরেনের শরীরের লক্ষণগুলি মিলিয়ে নিচ্ছিলেন, যাতে সুনিশ্চিত হ'তে পারেন যে যাকে তিনি খ‍ুঁজছিলেন এ সেই। পরে নরেনকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসতে বললেন রামকৃষ্ণ। নরেন রাজী হলেন।

এই ঘটনার পর বেশ ক'টি সপ্তাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন নরেন। ঘরেও বিবাদ চলছিল। নরেনকে পাত্রীস্থ করতে বিশ্বনাথ শেষ চেষ্টা করলেন। শহরের এক নামজাদা ধনীর শ্যামবর্ণা মেয়ের সঙ্গে নরেনের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। মেয়ে শ্যামবর্ণা, তাই মেয়ের বাবা পর্যাপ্ত যৌতুক দিতেও রাজী। কিন্তু নরেন অটল। কিছুতেই বিবাহ করবেন না। দূরসম্পর্কের আত্মীয় রামদত্তও নরেনকে রাজী করাতে পারলেন না। রামদত্ত যখন নরেনের সঙ্গে কথাবার্তার পর সুনিশ্চিত হলেন যে, ধর্মভাবের উদ্দীপন হয়েছে বলেই নরেন বিবাহ করতে রাজী নন, তখন তিনি বললেন, 'বেশ! যদি ধর্মলাভের বাসনা। হয়ে থাকে তাহলে রামকৃষ্ণের কাছে চল; তিনিই তোমায় পথের সন্ধান ব'লে দিতে পারবেন। ব্রাহ্মসমাজ তোমায় কিছু দিতে পারবে না।' নরেন সম্মত। স্থির হলো একখানা গাড়ি ভাড়া ক'রে রামচন্দ্র দত্তই নরেনকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবেন—সঙ্গে থাকবেন নরেনের দু-তিনজন বন্ধু।

সেদিন নরেনকে দেখে রামকৃষ্ণের মনে কি ভাবের উদয় হয়েছিল সে কথা যখন লোকে জানতে চাইত তখন রামকৃষ্ণ বলতেন, 'পশ্চিমের গঙ্গার দিকের দরজা দিয়ে নরেন প্রথম দিন এই ঘরে ঢুকেছিল। দেখলাম, নিজের শরীরের দিকে নজর নেই; মাথার চুল এলোমেলো। দেখলাম, বেশভূষার কোনোরকম পারিপাট্য নেই। যেন বাইরের কোনো বিষয়েই তার আঁট নেই। চোখ দুটি দেখে মনে হলো তার মনটি যেন কে জোর করে অন্তরের দিকে সর্বক্ষণ টেনে রেখেছে। দেখে আশ্চর্য হ'য়ে মনে মনে ভাবলাম, "সংসারী আর বিষয়ী মানুষের আবাস এই ক'লকাতায় এতবড় সত্ত্বগুণী আধার কেমন ক'রে থাকা সম্ভব!"

'মেঝেতে মাদুর পাতা ছিল, বসতে বললাম। যেখানে গঙ্গাজলের জালাটি রয়েছে ও তার পাশেই বসল। ওর সঙ্গে আরও দু'চারজন ছোকরা বন্ধু ছিল। চেয়েই বুঝলাম তাদের স্বভাব একেবারে বিপরীত—বিষয়ী মন, ভোগেই দৃষ্টি।

'গানের কথা তুললাম। দু'চারটি মাত্র বাঙলা গান জানে বললে। তাই গাইতে বললাম। নরেন একটা ব্রহ্মসঙ্গীত গাইলে:

মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে?

'এমন মনপ্রাণ ঢেলে গানটি গাইল যেন মনে হলো ও ধ্যানস্থ হয়েছে। শুনে নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। ভাবাবিষ্ট হ'য়ে পড়লাম।'

সেদিনকার ঘটনা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ ওইটুকুই বলেছিলেন। তারপর আশ্চর্যরকম নীরব হ'য়ে

গিয়েছিলেন। সম্ভবত, সেদিন তাঁর মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল তা এত তীব্র যে, পরের ঘটনাটি মনে করার চেষ্টা তিনি করেন নি। কিন্তু ঠিক পরের সেই বিস্ময়কর ঘটনার কথা নরেন নিজেই বর্ণনা করেছেন।

"গান তো গাইলাম, তার পরেই ঠাকুর দাঁড়িয়ে উঠে আমার হাত ধরে ঘরের উত্তরে যে বারান্দা আছে সেখানে নিয়ে গেলেন। শীতকাল। উত্তুরে হাওয়া আটকাবার জন্য থামের অন্তরাল-গুলি ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা ছিল। তাই ওখানে ঢুকে ঘরের দরজাটি বন্ধ করে দিলে ঘরের ভিতরের বা বাইরের কাউকে দেখা যেত না। বারান্দায় এসে ঠাকুর দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। ভাবলাম বুঝি বা আমায় নির্জনে কিছু উপদেশ দেবেন। কিন্তু যা করলেন, তা একেবারে কল্পনাতীত। হঠাৎ আমার হাত ধরলেন তারপর দরদর ধারায় আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। যেন কত চেনা, এমনভাবে পরম স্নেহে আমায় বলতে লাগলেন, 'এতদিন পরে আসতে হয়? আমি তোর জন্যে কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি তা কি একবারও ভাবতে নেই? বিষয়ী মানুষের কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝলসে যাবার উপক্রম হয়েছে। প্রাণের কথা কাউকে বলতে না পেরে আমার পেট ফুলে উঠেছে!' এইভাবে কত কথা বলেন আর কাঁদতে থাকেন। হঠাৎ আমার সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আমায় উদ্দেশ ক'রে বলতে লাগলেন, 'জানি প্রভু তুমি কে। তুমি সেই প্রাচীন ঋষি, নররূপী নারায়ণ; জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে আবার শরীর ধারণ করেছ।" ওঁর আচরণ দেখে আমি একেবারে নির্বাক, স্তম্ভিত। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, 'এ কেমন মানুষ? এ তো একেবারে উন্মাদ! নইলে আমাকে এসব কথা বলে কেন? আমি ওর কে? আমি তো বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে? যাহোক, চুপ ক'রে থাকলাম। আশ্চর্য পাগল মানুষটি যা খুশি ব'লে যেতে লাগলেন। খানিক পরে আমায় বারান্দায় দাঁড় করিয়ে উনি ভিতরে চলে গেলেন। তারপর মাখন মিছরি আর কিছু সন্দেশ এনে নিজের হাতে আমায় খাওয়াতে লাগলেন। আমি যত বলতে লাগলাম আমাকে খাবারগুলি দিন আমি বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ ক'রে খাই। উনি তা শুনলেন না। বললেন, 'ওরা খাবে'খন—তুমি খাও।' যতক্ষণ না সবকটি খেলাম ততক্ষণ নিরস্ত হলেন না। পরে আমার হাত ধরে বললেন, 'বলো, আবার তুমি আসবে? এবার একা আসবে। 'আমি তাঁর একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে অগত্যা বললাম, 'আসবো।' তাঁকে আশ্বস্ত ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকে বন্ধুদের পাশে গিয়ে বসলাম।"

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, কলেজে পড়া আঠারো বছর বয়সের একজন যুক্তিবাদী যুবকের কাছে সেদিনের ঘটনাটি ছিল এক অন্বেষণের অভিজ্ঞতা, এবং যুবক নরেনের পরিণত বিচার বুদ্ধির প্রমাণ। কারণ, তখনই তিনি দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যান নি। ইচ্ছা করলেই নরেন সেদিন চলে যেতে পারতেন—রামকৃষ্ণের কাছে আবার ফিরে আসার প্রতিজ্ঞাটি ভঙ্গ করতে পারতেন। কিন্তু নরেন তা করেন নি, বরং ঘরে ব'সে রামকৃষ্ণকে মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। খানিক আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই মানুষটিরই চালচলন কথাবার্তার সঙ্গে এখনকার চালচলন কথাবার্তার কোনো মিলই নেই। রামকৃষ্ণ এখন দিব্যি স্বাভাবিক। কোথাও এতটুকু আলগা ভাব নেই। সহজবোধ্য সুন্দর করে রামকৃষ্ণ তখন ত্যাগের কথা বলছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে নরেন বলেছেন, "তাঁকে দেখতে দেখতে মনে হলো মানুষটি যথার্থই সর্বস্বত্যাগী। যা বলছেন তা স্বয়ং পালন করেছেন। ঈশ্বরার্থে সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন।"

আমাদের বললেন, 'ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। ঠিক যেমনটি তোমাদের দেখছি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু কে তা করতে চায়? লোকে স্ত্রীপুত্রের শোকে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে। বিষয় বা টাকার জন্যেও অমনটি করে। কিন্তু ঈশ্বরকে পেলাম না ব'লে কে কাঁদে? তাঁকে পেলাম না ব'লে যদি কেউ ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকে, তিনি নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন।"

'যখন তাঁর মুখ থেকে কথাগুলি শুনছিলাম তখন একবারও মনে হয় নি যে, অন্য প্রচারকদের মতন তিনি কাব্য করছেন—কল্পনার ভাষায় কথা বলছেন ; বরং মনে হচ্ছিল, সত্যিই পূর্ণ-প্রাণে তিনি ঈশ্বরকে ডেকেছেন এবং যা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই বলছেন। আমি ভাবলাম, "উন্মাদ হ'লেও ঈশ্বরের জন্যে এমন ত্যাগ জগতে অল্প ব্যক্তিই করতে পারেন। হ্যাঁ, হয়ত ইনি উন্মাদ! কিন্তু কী অসম্ভব শুদ্ধতা! কী ত্যাগ! এমন মানুষই তো সকলের শ্রদ্ধা আর পূজা পাবার উপযুক্ত!" এই কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর চরণ বন্দনা ক'রে সেদিন ক'লকাতায় ফিরে এসেছিলাম।'

২

কিন্তু তবুও মাসাধিককাল নরেন দক্ষিণেশ্বরে আসতে পারেন নি। অবশ্য সারদানন্দ এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু দেখেন নি। তাঁর ধারণা, নরেন্দ্র দ্বিধা করেছিলেন কারণ তাঁর (নরেন্দ্র) ভয় হয়েছিল যে সাক্ষাতের পর রামকৃষ্ণের প্রভাবটি তিনি এড়িয়ে যেতে পারবেন না। সহজ বুদ্ধি দিয়েই নরেন্দ্র বুঝেছিলেন যে, রামকৃষ্ণ হলেন তাঁর চিন্তাধারার একেবারে বিপরীত। একথা ঠিক যে অধ্যাত্ম-জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকার প্রতি নরেনের এতটুকু আস্থা ছিল না ; কিন্তু সমাজের সংস্কারমূলক কাজকর্মের প্রতি নরেনের যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। সেদিক থেকে বরং হিন্দুধর্মের সনাতন আচার বিচার, যেগুলি রামকৃষ্ণ শাশ্বত ব'লে মানতেন, তাদের প্রতি নরেনের এতটুকু পক্ষপাতও ছিল না। নরেন জানতেন যে তিনি যুক্তি মানেন, ভাব নয় ; তাঁর কাম্য জ্ঞান, ভক্তি নয়। তাই রামকৃষ্ণের ভাবোল্লাস দেখে তিনি হতবুদ্ধি হয়েছিলেন। কিছুতেই ভাবতে পারছিলেন না, কেমন ক'রে মন্দিরের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে শুধু পূজা আর ধ্যান করেই জীবন কাটাবেন। না না এ অসম্ভব। তাঁর চঞ্চল মন সুদূরের পিয়াসী। সেই বিপুল সুদূরের হাতছানি তিনি সদাই পেয়ে চলেছেন—সদাই তাঁর সংগ্রামী মন সমাজ সংস্কারের কাজে ব্রতী হ'তে ব্যগ্র হচ্ছে।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনাটি নরেনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। নিজের মনের কাছে নরেন বারবার বলেছেন, যে মানুষটিকে তিনি দেখে এসেছেন, তিনি উন্মাদ। তবুও এই আশ্চর্য মানুষটিকে নরেন ভালবেসে ফেলেছিলেন—কে জানে হয়ত বা তাঁর ডাকে সাড়াও দিয়ে ফেলতেন। কিন্তু না, এ অসম্ভব! একজন উন্মাদের অনুগামী হ'তে নরেন পারবেন না। হ্যাঁ, উন্মাদই তো তিনি! রামকৃষ্ণ উন্মাদ—তাঁকে উন্মাদ হতেই হবে। তিনি স্বাভাবিক, সহজ—এ যে ভয়ঙ্কর চিন্তা! রামকৃষ্ণকে স্বাভাবিক বললে জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, এদের উন্মাদ বলতে হয়—উন্মাদ বলতে হয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারকদের ; সারা পৃথিবীর সব মানুষকেই তাহলে উন্মাদ বলতে হয়। রামকৃষ্ণ যদি সুস্থ স্বাভাবিক হতেন, তাহলে পৃথিবী এতদিন ধরে যা কিছু শিখিয়েছে, বিশ্বাস করতে বলেছে, সেসব বিশৃঙ্খল বিপর্যস্ত হয়ে যেত। এমনকি নরেনের মধ্যেও বিপরীত ভাবটি প্রকট হয়ে উঠতো।

রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এই তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বই নরেনকে মহৎ করেছে। যা আংশিক, যা খণ্ড তেমনি কিছু নরেন কখনও মেনে নিতে পারতেন না। তাঁর কাছে সংশয়ের বিকল্প হলো পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। অনেক বছর পরের কথা, নরেন তখন বিবেকানন্দ হয়েছেন। সে সময় অবিশ্বাস ও সংশয়ের অস্থির দোলায় আন্দোলিত ও বন্ধুদের কাছে উপস্থিত একজন পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাকে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'ওদের বিশ্বাস করানো যাবে না ব'লে দুঃখ করো না। ঠাকুরের সঙ্গে দীর্ঘ ছ'বছর আমি তর্ক করেছি, তবে সব জেনেছি।'

দক্ষিণেশ্বরে তাঁর দ্বিতীয়বার আগমনের বর্ণনাটি নরেনের নিজেব ভাষাতেই বলছি। সেবার সারাটি পথ তিনি পায়ে হেঁটে এসেছিলেন।

'ক'লকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি যে এত দূর পথ তা সেবার গাড়ি ক'রে একটিবার যাবার সময় বুঝতে পারি নি। যাহোক, জিজ্ঞেস করতে করতে কোনোরকমে দক্ষিণেশ্বরে পেঁছিলাম। সোজা ঠাকুরের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, শয্যাপার্শ্বে রাখা ছোট তক্তপোশখানির উপর নিজের মধ্যে ডুবে চুপ করে বসে আছেন। সেদিন ঘরে কেউ ছিল না। আমায় দেখা মাত্রই আহ্লাদে কাছে ডেকে শয্যার একপাশে বসালেন। কেমন একরকমভাবে যেন আবিষ্ট হয়ে আছেন। অস্পষ্টভাবে নিজের মনে কি বলছেন, বুঝলাম না। আমার দিকে শক্ত দৃষ্টিতে একবার তাকালেন তারপর কাছে সরে এলেন। ভাবলাম, আবার না সেদিনের মতন পাগলামি শুরু হয়। অমনটি ভাবতে না ভাবতেই তিনি সহসা ডান পা-টি আমার দেহের উপর রাখলেন। সে স্পর্শে চকিতে আমার মধ্যে এক আশ্চর্য উপলব্ধি উপস্থিত হলো। চোখ দুটি খুলে গেল। দেখতে লাগলাম দেয়ালগুলির সঙ্গে ঘরের সমস্ত কিছু বেগে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে, আর সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হ'তে ছুটে চলেছে। এই আত্মসত্তার বিনাশ মানেই মৃত্যু। আমার মনে হলো সেই মৃত্যু আমার একেবারে সামনে, অতি নিকটে। নিজেকে সামলাতে না পেরে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলাম, "ওগো! তুমি আমার একি করলে, আমার যে বাপ মা আছেন!" ওই কথা শুনে হা হা ক'রে হেসে উঠলেন ঠাকুর। তারপর হাত দিয়ে আমার বুক ছুঁয়ে বললেন, "তবে এখন থাক্। একবারে সব হ'য়ে কাজ নেই। সময়ে ঠিক হবে।" আশ্চর্যের বিষয়, সেই অপূর্ব অসাধারণ দৃশ্য যেমনি এসেছিল তেমনি চলেও গেল। আমি আবার প্রকৃতিস্থ হলাম; দেখলাম ঘরের ভিতরের ও বাইরের বস্তুসকল ঠিক যেমনটি ছিল তেমনটি আছে।

'ঘটনাটি বর্ণনা করতে এত সময় লাগলেও ঘটনাটি ঘটেছিল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। তবুও ওই মুহূর্তের ঘটনা আমার সমস্ত চিন্তাধারা বদলে দিয়েছিল। স্তব্ধ হ'যে ভাববার চেষ্টা করছিলাম কেন এমনটি হলো। দেখতে পেলাম, ওই অদ্ভুত মানুষটির ইচ্ছানুসারে আশ্চর্যভাবে ঘটনাটি ঘটল, আবার সহসাই লোপ পেয়ে গেল। বইয়েতে সম্মোহনবিদ্যার কথা পড়েছিলাম। ভাবতে লাগলাম হয়ত বা এটিও তেমন কিছু। কিন্তু অমন এক সিদ্ধান্ত নিতে মন সায় দিল না। কারণ, দুর্বল মনের মানুষের উপর প্রভাব খাটিয়ে প্রবল ইচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন লোকেরা এই ভাবটি আনেন। কিন্তু আমি দুর্বল মনের মানুষ নই; বরং

এতদিন পর্যন্ত নিজেকে বুদ্ধিমান ও মনোবলসম্পন্ন মনে ক'রে এসেছি। সুতরাং এই মানুষটি আমাকে মোহিত ক'রে তার হাতের ক্রীড়াপুত্তলি করতে পারে না। বরং যখন প্রথম দেখি তখনই এঁকে উন্মাদ ব'লে আমার মনে হয়েছে। তবে হঠাৎ আমার এমন অবস্থা হলো কেন? এই ব্যাপারটিই আমার কাছে রহস্যজনক মনে হয়েছে। মনে মনে তখন সংকল্প করলাম, এমনভাবে আত্মরক্ষা করবো যাতে আমার মনের উপর ওই মানুষটির কোনো প্রভাব পড়তে না পারে।'

সেই দর্শনের পর পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হ'য়ে নরেন যেন রামকৃষ্ণের আরও কাছাকাছি এসে গেলেন। রামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে রঙ্গ পরিহাস ক'রে, আদর ভালবাসা দিয়ে, খাইয়ে এমন সহজ-ভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন যে নরেন বিমূঢ়। তারপর সন্ধ্যা সমাগত দেখে রামকৃষ্ণের কাছে নরেন যখন বিদায় চাইতে গেলেন, তখন রামকৃষ্ণ বেশ ক্ষুণ্ণ। তবুও আবার আসার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নরেনকে বিদায় দিলেন।

হপ্তাখানেক পরেই নরেন আবার এলেন। এবার নরেন মনে মনে স্থির করেছিলেন কোনো-ভাবেই রামকৃষ্ণের প্রভাবটি তাঁর উপর পড়তে দেবেন না। সেদিন দক্ষিণেশ্বরে অনেক ভক্ত এসেছেন। নরেনকে সঙ্গে নিয়ে রামকৃষ্ণ বাইরে এলেন। মন্দিরের দক্ষিণদিকে এক প্রতিবেশীর বাগানে নিরিবিলি বেড়ানোর প্রস্তাব করলেন। এটি সেই বাগানবাড়ি, যার বসবার ঘরে যীশু-কোলে-মেরীর ছবিটি দেখেই রামকৃষ্ণের ভাবসমাধি হয়েছিল। সেই ঘরেই দু'জনে এসে বসলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। রামকৃষ্ণের সেই অবস্থাটি বসে বসে দেখতে লাগলেন নরেন। হঠাৎ আগের দিনের মতোই নরেনের অঙ্গস্পর্শ করলেন রামকৃষ্ণ। নরেন প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে রামকৃষ্ণের প্রভাবটি দমন করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সফল হলেন না। একসময় নরেনের বাহ্যচেতনা সম্পূর্ণ লুপ্ত হলো। যখন আবার চেতনা ফিরে এলো দেখলেন, রামকৃষ্ণ তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর দিকে শান্তভাবে চেয়ে মধুর হাসছেন। সেদিন নরেনের কি হয়েছিল নরেন তা জানতেন না।

কিন্তু রামকৃষ্ণ জানতেন নরেনের কি হয়েছিল। পরবর্তীকালে অন্য শিষ্যদের কাছে রামকৃষ্ণ সে কথা বলেছেন: 'ওর বাহ্যসংজ্ঞার লোপ হ'লে নরেনকে সেদিন নানা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম—কে সে, কোথা থেকে এসেছে। কেন এসেছে, কতদিন পৃথিবীতে থাকবে ইত্যাদি। সেও তেমনি ভাবাবিষ্ট অবস্থার অন্তর্গত হ'য়ে আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছিল। তার সম্বন্ধে কি ভেবেছি, কি দেখেছি, নরেনের উত্তরগুলিও তা সপ্রমাণ করবে। সে সব কথা বলা বারণ। তবে একথা বলতে পারি যে নরেন যেদিন জানতে পারবে সে কে, সেদিন সে আর ইহলোকে থাকবে না। দৃঢ়সংকল্প ক'রে যোগমার্গে তৎক্ষণাৎ শরীর ত্যাগ করবে। নরেন ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ।'

রামকৃষ্ণ নিজেই একটি দর্শনের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, নরেনের দেওয়া উত্তর-গুলি সুন্দরভাবে একটি দৃশ্যের সঙ্গে মিলে যায়। তিনি বলছেন যেন দেখলেন, সমাধিমগ্ন অবস্থায় তাঁর মন স্থূলবস্তুজগৎ থেকে আরোহণ ক'রে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবেশ করল। সেখানে এক জ্যোতির্ময় বেড়া—এপাশ থেকে ওপাশে প্রসারিত থেকে খণ্ড ও অখণ্ডরাজ্যকে আলাদা ক'রে দিয়েছে। এই ব্যবধান ডিঙিয়ে দেবদেবীদের দিব্যদেহ অখণ্ডরাজ্যে প্রবেশ করতে পারছে না। কারণ সে রাজ্যে কোনো কিছুই আকার গ্রহণ করে না। তবুও সেই

অখণ্ডের রাজ্যে দিব্যজ্যোতিসম্পন্ন এবং পূর্ণচেতনাবিশিষ্ট সাতজন প্রবীন ঋষির সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হলো। সপ্তঋষি সমাধিস্থ হ'য়ে বসে আছেন; এঁদের মহত্ব যেন দেবতাদেরও অতিক্রম ক'রে গেছে। রামকৃষ্ণ যখন অবাক হয়ে এঁদের দিকে তাকিয়ে আছেন তখন দেখলেন, সেই অখণ্ড জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ যেন এক দেবশিশুর মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। সেই দেবশিশু তখন সপ্তঋষির একজনের কাছে নেমে এলো, তারপর গভীর প্রেমে একজন ঋষির গলা জড়িয়ে তাঁকে সমাধি থেকে উত্থিত করতে চেষ্টা করতে লাগল। ঋষির সমাধিভঙ্গ হলো—দেবশিশুকে দেখে ঋষির মুখ আনন্দোজ্জ্বল হলো। রামকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন যে এঁরা অবতারদের চিরদিনের সাথী। ঋষির প্রসন্ন মুখের দিকে চেয়ে দেবশিশু বলল, 'আমি ওখানে যাচ্ছি, তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।' ঋষি জবাব দিলেন না। কিন্তু তাঁর চোখ দুটি হ্যাঁ বললো। ঋষি আবার সমাধিস্থ হলেন। তখন রামকৃষ্ণ অবাক হয়ে দেখলেন যে সেই ঋষির শরীর মনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে ধরাধামে নেমে এলো। পরে শিষ্যদের কাছে রামকৃষ্ণ স্বীকার করেছিলেন, 'নরেনকে প্রথম দিন দেখেই বুঝেছিলাম যে এ সেই ঋষি।' সেদিন শিষ্যেরা তাঁর পরিচয়টিও জানতে চেয়েছিল। রামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে বলেছিলেন যে তিনিই সেই দেবশিশু।

হিন্দুর অবতারবাদ নিয়ে ইতিমধ্যেই (অষ্টম অধ্যায়) আলোচনা করেছি। অবতারবাদের সঙ্গে 'চিরন্তন সাথী'র দর্শনটিও এখন আলোচনা হওয়া দরকার। হিন্দু দর্শন বলে যে, অবতারের সঙ্গে তাঁদের সাথীরাও থাকেন। মর্ত্যে মানবরূপ পরিগ্রহণের সময় অবতার তাঁর সাথীকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন। (হিন্দু বিশ্বাস করে যে ভগবদ্‌বাণী প্রচারের জন্য মর্ত্যে প্রেরিত যীশুর বারোজন শিষ্যও হলেন যীশুর 'চিরন্তন সাথী') সুতরাং নরেনের কাছে 'সে কে' এই উপলব্ধির অর্থ হলো রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর চিরন্তন সম্বন্ধটি স্মরণ করা। মহাকালের এই সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে তাঁদের কয়েকটি বছরের একত্র অবস্থানের কাহিনী নিতান্তই তুচ্ছ। রামকৃষ্ণের এইরকম আর একজন সাথী হলেন রাখাল। মানসপুত্র রাখালের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্রের।

দ্বিতীয়বার ভাবান্তর হবার পর নরেন মনে প্রাণে অনুভব করেছিলেন যে, এমন ঐশী শক্তির কাছে তাঁর ইচ্ছাশক্তি নেহাতই তুচ্ছ। কিন্তু তবু, কোনো উচ্চতর শক্তির কাছেও এমনভাবে আত্মনিবেদন করা যায় না। অন্ধবিশ্বাস নিয়ে গুরুকে অনুসরণ করার যে পূর্বাগত সংস্কার আছে, নরেন তার অস্তিত্ব মানতেন না। তিনি তখনও মনে করতেন যে, চিন্তাস্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে অন্যের ইচ্ছার কাছে আত্মনিবেদন করা মানে, মজ্জাগত ধ্যানধারণাকেই প্রশ্রয় দেওয়া। মহামানব রামকৃষ্ণের আদর্শ ও শিক্ষা যে সকলেরই অনুসরণ করা উচিত, তা কে অস্বীকার করে! কিন্তু রামকৃষ্ণ যে শিক্ষাই দিন না কেন, তাকে সরাসরি গ্রহণ করার আগে নরেনের সংশয়ী মন সেটি যাচাই করতে চাইতো। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই নরেনের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ না হয়ে পারি না। কারণ, একথা ঠিক যে, নরেনের এই সংশয় ও জিজ্ঞাসাই রামকৃষ্ণকে জগতের কাছে বিশ্বস্তভাবে মহামানবরূপে চিহ্নিত করেছে।

১৬

নরেনের শিক্ষা

কলেজে পড়া নরেন্দ্রনাথ দত্তকে রামকৃষ্ণ যে তাঁর অন্যতম এক 'নিত্য সাথী'র দেহান্বিত মূর্তিরূপ বলে মনে করতেন, সে কথা আমরা আগের অধ্যায়ে জেনেছি। এখন প্রশ্ন হলো, সব জেনেশুনেও নরেনের ভবিষ্যৎ নিয়ে রামকৃষ্ণ এত উদ্বিগ্ন হতেন কেন ? এমন মানুষের আধ্যাত্মিক স্খলন কি সম্ভব ? সারদানন্দ ব্যাপারটি অন্য দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। তিনি মনে করেন যে, অবতারও যখন মানবরূপ পরিগ্রহ ক'রে মায়ামণ্ডলে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি মলিন হয়ে যায়। রামকৃষ্ণ নিজেও তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শনের সত্যতা নিয়ে মাঝে মাঝে সংশয় প্রকাশ করতেন। হয়ত এ তাঁর ভ্রান্তি। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই নরেন সম্পর্কে প্রায়ই তাঁর উৎকণ্ঠা হ'ত ; আর সেইজন্যেই নানাভাবে তিনি নরেনকে যাচাই করেছেন।

রামকৃষ্ণ বলতেন, মানুষের মধ্যে সাধারণত আঠারোটি শক্তির বিকাশ হতে পারে। এর যে কোনো একটি বা দু'টি শক্তির যথার্থ উৎকর্ষ হলেই মানুষ জগৎশ্রেষ্ঠ হয়। নরেনের মধ্যে রামকৃষ্ণ এই আঠারোটি শক্তিরই পূর্ণ বিকাশ দেখেছিলেন। তাই উদ্বেগের মুহূর্তে রামকৃষ্ণের আশঙ্কা হ'ত, যদি নরেন এই শক্তির অপব্যবহার ক'রে ! যদি সে ঈশ্বরের খণ্ড উপলব্ধিতেই নিমগ্ন হয়—যদি সে নতুন ধর্মমতের কথা ব'লে আর পাঁচজন সাধারণ প্রচারকের মতন, অনুচর পরিবৃত হ'য়ে তুচ্ছ ঐহিক যশোলিপ্সা বাড়ায় ! রামকৃষ্ণের সারা জীবনের সাধনা হলো সবরকম একদেশদর্শী সংস্কার ও ধর্মগত কিংবা সম্প্রদায়গত গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা—স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যে দলমত নির্বিশেষে সবাই মুক্তির পথ, ঈশ্বর-উপলব্ধির পথ দেখাতে পারে। সুতরাং নরেন সম্পর্কে তিনি উদ্বিগ্ন নাও হতে পারতেন। কারণ, পরবর্তী জীবনে বিবেকানন্দ রূপে নানাভাবে বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদির মধ্যে রামকৃষ্ণের সমন্বয় শিক্ষাটি কতটুকু সফল ভাবে তিনি আয়ত্ব করেছেন, তার প্রমাণ নরেনকে দিতে হয়েছিল। বিবেকানন্দ বলেছেন : 'অতীতের সব ধর্মমতই আমি মেনে নিয়েছি এবং সব ধর্মের মানুষের সঙ্গে বসেই আমি ঈশ্বরের আরাধনা করি। ঈশ্বরের নির্দেশপত্র কি শেষ হ'য়ে যেতে পারে ? তাঁকে জানার, তাঁকে উপলব্ধি করার পথের কি শেষ আছে ? মত-পার্থক্য থাকবেই, কারণ তা হলো মানুষের চিন্তাশীলতার প্রথম লক্ষণ। তবে আমার কামনা হলো যত মত তত পথ থাকুক।'

নরেনের উপর রামকৃষ্ণের আকর্ষণ দেখে সবাই খুব অবাক হ'ত। নরেন দক্ষিণেশ্বরে এলেই তাঁকে দেখে রামকৃষ্ণ চেঁচিয়ে উঠতেন, 'ওই তো ন—' এবং সঙ্গে সঙ্গেই সমাধিস্থ হতেন। বাকী শব্দগুলি উচ্চারণ করার অবকাশ পেতেন না। দিন কয়েকের জন্য অনুপস্থিত হ'লেও নরেনের জন্য রামকৃষ্ণ ব্যাকুল হতেন। কাঁদতেন আর বলতেন, 'ওকে দেখতে না পেলে সইতে পারি না।', বালক ভক্তদের কাছে আরও বলতেন, 'কত কেঁদেছি, তবুও নরেন এলো না। ওর

জন্যে আমি কত কষ্ট পাই তা ও একটুও বোঝে না···আমার মতন একজন বুড়ো মিনসে ওর মতন একটা ছোঁড়ার জন্যে হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে দেখে লোকেই বা কি ভাববে! তোমাদের কথা বলছি না। তোমরা আমার বড় আপনার। কিন্তু অন্যেরা কি ভাবে ব'ল তো? কিন্তু তবুও নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারি না—'

এটি আশা করা যায় না যে নরেন তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে সবাইকে খুশি করেছিলেন। রামকৃষ্ণের মতন অন্তর্দৃষ্টি এইসব ভক্তদের অনেকেরই ছিল না। সকলের শ্রদ্ধাস্পদ ঠাকুরের সঙ্গে নরেনের মতন স্বাধীনচেতা উদ্ধত যুবকের নিঃসংকোচ ব্যবহারটিই তাদের কাছে অত্যন্ত অর্বাচীন ও অমার্জিত মনে হ'ত। সারদানন্দের মনে আছে যে, নরেনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত আলাপের আগে নরেনের জনৈক প্রতিবেশী নরেন সম্বন্ধে তাঁকে কি বলেছিল। প্রতিবেশীটি বলেছিল. 'এই বাড়িতে একটি ছেলে আছে—এমন অকালপক্ক ছেলে আমি আর দেখি না। বি. এ. পাশ করেছে বলে ধরাকে সরা দেখে। বাপখুড়োর সামনেই তবলায় চাঁটি দিয়ে গান ধরে—বয়োজ্যেষ্ঠদের নাকের ওপর দিয়ে চুরুট খেতে খেতে চলে যায়।'

রামকৃষ্ণ ও নরেনের মতন দুই আশ্চর্য রহস্যময় সত্তার মধ্যে যে তরল কৌতুকের সূক্ষ্ম ধারা বইতো, তার হদিস বাইরের কোনো মানুষের স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ত না। বাহ্য আচরণের মধ্য দিয়ে ব'য়ে যেত সাঙ্কেতিক আদান-প্রদানের ফল্গুধারা। এর দ্বারাই একে অপরকে চিনতেন, খুঁজে নিতেন। একদিনের ঘটনা বলছি। সেদিন কেশব সেন ও বিজয় গোস্বামী দু'জনেই দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে কিছু ব্রাহ্ম ভক্তও ছিলেন। খানিক-ক্ষণ আলাপের পর কেশব ও বিজয় চলে গেলেন। ব্রাহ্ম ভক্তরা তখনও ব'সে; তাঁদের দিকে চেয়ে রামকৃষ্ণ বললেন, 'কেশব আর বিজয়ের মধ্যে যে জ্ঞানালোকের আগুন জ্বলতে দেখলাম তা অনেকটা দীপশিখার মতন। কিন্তু নরেনের মধ্যে সেই আগুন যেন জ্বলন্ত সূর্য!' পরে একদিন রামকৃষ্ণের এই মতামতের বিরুদ্ধে নরেন আপত্তি জানিয়েছিলেন, 'এসব আপনি কি ব'লে বেড়িয়েছেন! এমন কথা শুনলে লোকে আপনাকে ঠিক পাগল বলবে। কেশব জগদ্বিখ্যাত আর বিজয় গোস্বামী একজন সাধু। আমি সেখানে কোন্ ছার। আপনি এঁদের সঙ্গে আমার তুলনা করলেন কি ক'রে? দয়া ক'রে এমন কথা আর কাউকে বলবেন না!'

উত্তরে রামকৃষ্ণ মধুর হেসে বলেছিলেন, 'কিন্তু কি করবো বল্! কখনো ভাবিস নি যে ওসব কথা আমি বলেছি! মা যে আমাকে সত্যি কথাটি বলতে বললেন—তাই তো অমনটি বলেছি! মা আমাকে কখনও মিথ্যে বলেন না।'

নরেন এবারও আপত্তি করলেন, বললেন, 'মা বলেছেন কি ক'রে বুঝলেন? আমার তো মনে হয় নিজের খেয়ালেই এ-সব কথা বলেছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রমাণ করেছে যে মানুষ যখন একটা কিছু বিশ্বাস করার জন্যে ব্যগ্র হয়, তখন তার ইন্দ্রিয়াদি তার সঙ্গে প্রতারণা করে। আপনি আমায় স্নেহ করেন, সব ব্যাপারেই আমাকে বড় মনে করেন, তাই আপনার এমন সব দর্শন হয়।'

রামকৃষ্ণের মন যখন উচ্চ ভাবভূমিতে থাকতো তখন নরেনের সংশয় দেখে তিনি বেশ কৌতুক বোধ করতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন তাঁর মন বিভ্রান্ত হ'ত, তখন জগন্মাতার কাছে মীমাংসার জন্য গিয়ে দাঁড়াতেন। মা তাঁকে আশ্বস্ত করে বলতেন, 'নরেনের কথা

শুনিস কেন ? কিছুদিন পরেই ও তোর সব কথা সত্য বলে মানবে।'

একবার বেশ কিছুদিন নরেন দক্ষিণেশ্বরে আসছিলেন না। রামকৃষ্ণের দুশ্চিন্তা, কেমন ক'রে নরেনকে দেখবেন। সেটি এক রোববার। রামকৃষ্ণ জানতেন সোজা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে গেলেই নরেনের দেখা পাবেন। রবিবার দিন নরেন সেখানে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে যান। কেশব এবং কিছু ব্রাহ্ম প্রচারকদের সঙ্গে তাঁর স্নেহমধুর সম্পর্কের কথা ভেবে রামকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, সমাজ-মন্দিরে তাঁর অনাদর হবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে কেশব ও বিজয়ের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে সমাজের নেতৃস্থানীয় বেশ কিছু ব্রাহ্ম যে দক্ষিণেশ্বরে আসা ছেড়ে দিয়েছিলেন সে কথা রামকৃষ্ণ জানতেন না।

রামকৃষ্ণ যখন এসে পেঁছিলেন তখন উপাসনার ঠিক মাঝামাঝি সময়। তিনি আসতেই সকল ভক্তদের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। অনেকে তাঁকে দেখবার জন্য বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়াল। সে এক মহা বিশৃঙ্খল অবস্থা। নেতৃস্থানীয়রা রীতিমত রুষ্ট। বিশেষত সেদিনের যিনি আচার্য তিনি মাঝপথেই তাঁর উপাসনা বন্ধ ক'রে দিলেন। রামকৃষ্ণের কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। কোনো দিকে না তাকিয়ে তিনি সোজা বেদীর কাছে পেঁছেই সমাধিস্থ হ'য়ে গেলেন। রামকৃষ্ণের এই সমাধিভাব দেখবার জন্য আর একবার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। গোলমাল আরও বেড়ে গেল। নেতারাও তখন বিশৃঙ্খলা নিবারণ করতে পারছিলেন না। অনন্যোপায় হ'য়ে নেতারা তখন মন্দিরগৃহের সব গ্যাসবাতি নিভিয়ে দিলেন, যাতে জনসাধারণ মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। অন্ধকারে ছত্রভঙ্গ জনসাধারণ তখন দরজা খুঁজে বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছে। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তটি খুবই স্থূলবুদ্ধির কাজ হয়েছিল। বেদীর উপর নরেনও ছিলেন এবং সমস্ত ঘটনাটিই লক্ষ্য করেছিলেন। অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে নরেন তাই হাতড়ে হাতড়ে রামকৃষ্ণের কাছে এসে পেঁছিলেন, তারপর কোনো-রকমে তাঁকে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে এনে একখানি গাড়িতে চড়িয়ে সোজা দক্ষিণেশ্বরে পেঁছে দিয়ে এলেন।

পরে নরেন বলেছিলেন, 'সেদিন আমার জন্যেই ঠাকুরের এই অশ্রদ্ধা, অপমান। যখনই সে কথা মনে হ'ত মনে বড় কষ্ট পেতাম। আমার প্রতি তাঁর এই দুর্বলতার জন্য তাঁকে যৎপরোনাস্তি কুবাক্য বলেছি। একটুও কুণ্ঠিত হই নি। কিন্তু তার জন্যে রামকৃষ্ণের মনে কোনো ক্ষোভ হতে দেখি নি। আমাকে তাঁর সঙ্গে পেয়েছেন তাতেই খুশি। একদিন তাঁকে বললাম, "দেখুন, পুরাণে আছে যে ভরত রাজা তাঁর প্রিয় হরিণটার কথা ভাবতে ভাবতে মরে গিয়ে হরিণ হয়েছিল। একথা যদি সত্য হয় তাহলে আমার জন্যে অত দুশ্চিন্তার পরিণামের কথা আপনার ভাবা উচিত।" ঠাকুর তো, ছেলেমানুষের মতন সরল! আমার কথার আক্ষরিক মানে ধরে নিয়ে বিষণ্ণ হ'য়ে বললেন, "ঠিক বলেছিস—তাই তো তাহলে কি হবে? আমি তো তোকে না দেখে মোটে থাকতে পারি না?" দারুণ বিমর্ষ হ'য়ে ঠাকুর তখন মা-কে জিজ্ঞেস করতে গেলেন। খানিক পরে আনন্দে হাসতে হাসতে ফিরে এসে বললেন, "যা শালা, আমি তোর কথা শুনবো না। মা বললেন: "তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ ব'লে জানিস তাই ভালবাসিস। যেদিন ওর ভিতরে তুই নারায়ণকে দেখতে পাবি না, সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি না!"

দক্ষিণেশ্বরে আসা শুরু ক'রে নরেন দেখলেন যে, ভক্তদের মধ্যে রাখালও আছেন। নরেন তাই খুব খুশি। কিন্তু দিন কয়েক রাখালের সঙ্গে মেলামেশা করেই বুঝলেন যে রাখাল অনেক বদলে গেছেন। ব্রাহ্ম সমাজের অঙ্গীকার ভেঙে রাখাল এখন সাকার বিশ্বাসী হয়েছেন। রামকৃষ্ণের প্রভাবটি রাখালের উপর বেশ দৃঢ়ভাবেই পড়েছিল। মূর্তিপূজায় নরেনের তখনও ঘোর অবিশ্বাস। মূর্তি দেখলেই তার সামনে মাথা নোয়ানোর অভ্যাসটির জন্য রাখালকে সরাসরি ভর্ৎসনা করতেন। ভালোমানুষ রাখাল মুখে প্রতিবাদ না জানালেও মনে মনে আহত হতেন। ক্রমে ক্রমে নরেনকে তিনি এড়িয়ে চলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণের কানেও কথাটি গেল। তিনি দু'জনকে ডেকে বিবাদ মিটিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু রাখালেব সাকার বিশ্বাস নিয়ে কোনো রকম অসম্মান দেখাতে নরেনকে নিষেধও ক'বে দিলেন।

ইতিমধ্যে নবেনকে বেদান্ত শিক্ষা দেবার কথা ভাবছিলেন রামকৃষ্ণ। বেদান্তর শিক্ষা হলো ব্রহ্ম ও আত্মাকে অভিন্ন দেখা। অদ্বৈতবাদ নিয়ে লেখা বেশ কিছু গ্রন্থ তিনি নবেনকে পড়তে দিয়েছিলেন। পাঠ শেষ ক'রে নরেন দেখলেন তত্ত্বটি রীতিমত উদ্ধত—নির্লজ্জ ঈশ্বর-নিন্দায় মুখর। এমন কি রাখালের সাকার বিশ্বাসের চেয়েও হীন। একদিন রামকৃষ্ণের কাছে এসে ব্যাখ্যা চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন 'নাস্তিক্যবাদের সঙ্গে এর তফাৎ কোথায়? সৃষ্টজীব নিজেকে স্রষ্টা ব'লে ভাববে! এর চেয়ে বড় পাপ আর কি হ'তে পারে? এসব তো অযুক্তির কথা! আমি তুমি সবাই ঈশ্বর—এমনকি জন্ম-মরণশীল যাবতীয় বস্তু, সবাই ঈশ্বর? উন্মাদ না হ'লে এসব কথা কেউ লিখতে পাবে?' রামকৃষ্ণ সব শুনে মধুর হেসে বললেন, 'তা তুই এসব কথা এখন নাই বা নিলি? কিন্তু মুনিঋষিদেব নিন্দে করবি কেন? ঈশ্বরীয় রূপের অনেক রকম প্রকাশ। সে প্রকাশকে তুই ইতি করে দিতে চাস? ঈশ্বরকে তুই ডেকে যা। তিনিই সত্যস্বরূপ। তারপর তোর কাছে তিনি যেমন ভাবে প্রকাশ হবেন সেটাই বিশ্বাস করবি।'

সেই মুহূর্তে নরেনের একটুও বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু ঠিক পনেরো বছর পরে আমেরিকায় থাকাকালীন খ্রীস্টানদের এক সভায় নরেন যে কথাগুলি ঘোষণা করেছিলেন তা শুনে হয়ত তিনি নিজেই স্তম্ভিত হতেন। সেদিন সমাগত খ্রীস্টানদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, 'কীট আর দেবদূতের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। প্রতিটি কীটকে নাজারেথবাসীর ভাই মনে করবে।' বলা বাহুল্য, সেদিন আতঙ্কে স্তব্ধ হ'য়ে শ্রোতারা তাঁর কথা শুনেছিল।

১৪ অধ্যায়ে প্রতাপ হাজরার কথা বলেছি। এই মানুষটিকে নিয়ে রামকৃষ্ণ ও নরেনের মধ্যে যথেষ্ট মতবিবাদ ছিল। এমনি এক কথোপকথনের নমুনা শ্রীম আমাদের জানিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৮৫র ২৪শে এপ্রিল তারিখে।

নরেন : হাজরা এখন ভালো হয়েছে।

রামকৃষ্ণ : তুই জানিস না। এমন লোক আছে, বগলে ইঁট মুখে রাম রাম বলে।

নরেন : আজ্ঞে না। তার নামে লোকে যা বলে সব জিজ্ঞেস করলুম। তা সে বললো সব মিথ্যে।

রামকৃষ্ণ : আমি মা-কে বলেছিলুম, 'মা, হাজরা যদি ছল হয়, এখান থেকে সরিয়ে দাও।

ওকে সে কথা বলেছিলাম। ও কিছুদিন পরে এসে বলে, দেখলে আমি এখনো রয়েছি।...' তা নয়। তুই লোক চিনিস না, তাই তোকে বলছি। আমি হাজরাকে কিরকম জানি, জানিস? আমি জানি, যেমন সাধুরূপী নারায়ণ, তেমনি ছলরূপী নারায়ণ, আবার লুচ্চারূপী নারায়ণ!

হাজরার মুখে সব সময় বড় বড় দর্শন আর উচ্চভাবের কথা লেগে থাকত। লোককে দেখিয়ে জপ করত। মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণের প্রতি এমন অতিরিক্ত ভক্তির ভাব দেখাত যেটি ভেক ব'লে মনে হ'ত। একবার রামকৃষ্ণের পায়ের কাছে গড় হ'য়ে পায়ের ধুলো নিতে গিয়েছিল; কিন্তু হাজরার ছোঁয়া পেয়েই রামকৃষ্ণ যেন কুঁকড়ে গেলেন। হাজরার মতন এমন কপটী মানুষের অঙ্গস্পর্শ থেকে স্বেচ্ছায় নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

কিন্তু হাজরার রসবোধ আর বাক্‌চাতুর্য নরেনকে খুব আকর্ষণ করত। তার কথাবার্তা শুনে নরেন খুব কৌতুক বোধ করতেন। একদিন নরেন বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে হাজরাকে বললেন, 'এমন কি হ'তে পারে যে ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যা দেখছি সবই ঈশ্বর?' ব্যঙ্গ করতে করতে নরেন হা হা ক'রে উঠলেন। হাজরাও চাটুকারের মতন সে হাসিতে যোগ দিল। দু'জনের মধ্যে যখন হাস্য পরিহাস চলছে তখন রামকৃষ্ণ ওদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর স্নেহপূর্ণ চোখে নরেনের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোরা কি কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিস রে?' কথা শেষে জবাবের অপেক্ষা না ক'রে নরেনকে স্পর্শ করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

তাঁর তখনকার অবস্থার কথা নরেন পরবর্তীকালে এইভাবে বলেছেন; 'ঠাকুরের সেদিনকার অদ্ভুত ছোঁয়ায় মুহূর্তমধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হলো। স্তম্ভিত হ'য়ে সত্য সত্যই দেখলাম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর ভিন্ন কিছু নেই। নীরব হয়ে রইলাম, ভাবলাম দেখি কতক্ষণ এই ভাবটি থাকে। কিন্তু সেই ঘোর একটুও কমলো না। বাড়িতে ফিরলাম, সেখানেও তাই। যাই-ই দেখি না কেন সবেতেই তিনি। খেতে বসেছি, দেখি অন্ন, থালা, আমার মা এমন কি আমি নিজেও ঈশ্বর ভিন্ন কিছু নই। দু'এক গ্রাস খেয়েই চুপ ক'রে বসে রইলাম। কোমল স্বরে মা বললেন, "বসে আছিস কেন রে, খা না—" মার কথায় হুঁশ হলো। আবার খেতে শুরু করলাম। সেই থেকে খাওয়া, শোওয়া, বেড়ানো, বসে থাকা, কলেজে পড়তে যাওয়া—সব অবস্থাতেই ওই অভিজ্ঞতা হতে থাকলো। সর্বদাই কেমন যেন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকতে লাগলাম, যা বর্ণনা করতে পারবো না। রাস্তা পার হচ্ছি, দেখছি গাড়ি আসছে—কিন্তু ভয়ে সরে যেতাম না। নিজেকে বলতাম, "গাড়ি যা আমিও তাই!" হাতে পায়ে তখন কোনো সাড় থাকত না। আহারে প্রবৃত্তি হ'ত না। মনে হ'ত যেন অপর কেউ আহার করছে। খেতে খেতে শুয়ে পড়তাম, পরে আবার উঠে খেতাম। এইভাবে এক একদিন অধিক খেয়ে ফেলতাম। কিন্তু তার জন্য কোনো অসুখ হ'ত না। মা ভয় পেতেন, ভাবতেন আমার বোধহয় কোনো বড় অসুখ করেছে। কখনো বলতেন, "ও আর বাঁচবে না!" আচ্ছন্ন ভাবটা যখন কেটে যেত তখন জগতটাকে স্বপ্ন ব'লে মনে হ'ত। হেদুয়া পার্কে (আজাদহিন্দ বাগ) বেড়াতে বেড়াতে পার্কের চারপাশের লোহার রেলিংএ মাথা ঠুকে দেখতাম, যা দেখছি তা স্বপ্ন না বাস্তব। হাত পায়ের অসাড়তার জন্য মনে হ'ত পক্ষাঘাত

হয়েছে। পরে যখন হ্ঁশ ফিরে এলো তখন ব্ঝেছিলাম আমার এই ঘোর-লাগা ভাবটিই প্রকৃত অদ্বৈত উপলব্ধি। তখন মনে হয়েছিল শাস্ত্রে যা লেখা আছে তা মিথ্যে নয়। সেই থেকে অদ্বৈতবাদের উপর আর কখনও সন্দিহান হতে পারি নি।'

হঠাৎ একদিন নরেন সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের আচরণ বদলে গেল। কোথায় গেল সেই সদানন্দ ভাব—ক্ষণে ক্ষণে আঁখিজল বিসর্জন! সেদিন সকালবেলা নরেন এসে দাঁড়িয়েছেন। রামকৃষ্ণ একবার তাকালেন মাত্র; কিন্তু খ্শি হবার সামান্যতম লক্ষণও দেখা গেল না। কুশল সংবাদ নেবার বদলে চুপ ক'রে রইলেন। নরেন ভাবলেন ঠাকুর নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক উচ্চভাবে রয়েছেন, তাই এমন নীরব। নরেন তাই খানিক অপেক্ষা ক'রে ঘরের বাইরে এসে হাজরার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। খানিক পরে অন্য ভক্তদের সঙ্গে রামকৃষ্ণের কথাবার্তার শব্দ শ্নে আবার তাঁর ঘরে গেলেন। শয্যায় শ্য়ে ছিলেন রামকৃষ্ণ। নরেনকে দেখে ম্খ ঘ্রিয়ে নিলেন। সন্ধ্যে হলো। নরেনকে এবার ফিরতে হবে। ভক্তিভরে রামকৃষ্ণের চরণবন্দনা ক'রে নরেন কলকাতায় ফিরে এলেন। রামকৃষ্ণ তখনও নীরব।

সপ্তাহ না প্রতেই নরেন আবার দক্ষিণেশ্বরে এলেন। রামকৃষ্ণ সেবারও তেমনি উদাসীন। তব্ও রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নরেনের শ্রদ্ধাহানি হলো না। দক্ষিণেশ্বরে আসা বন্ধও করলেন না তিনি। অবহেলা উপেক্ষা যেমনই হোক নরেন আসতেন। হাজরা বা অন্য ভক্তদের সঙ্গে আলাপ করতেন তারপর ক'লকাতায় ফিরে যেতেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের এই বাহ্য উপেক্ষা যত তীব্রই হোক না কেন নরেনের খোঁজ খবর তিনি ঠিকই নিচ্ছিলেন। ছেলেদের দিয়ে গোপনে খোঁজ নিতেন নরেন কি করে, কোথায় যায় ইত্যাদি। নরেন অবশ্য তা জানতে পারতেন না।

সারদানন্দ এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একদিন, প্রায় মাসাধিককাল পরের কথা। নরেন এসে দাঁড়াতেই রামকৃষ্ণ তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'আমি তোর সঙ্গে কথা বলি না জেনেও রোজ তুই এখানে কেন আসিস?' নরেনের উত্তর যেন ম্খেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন: 'আপনি কি মনে করেন আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আসি? কেন আসি জানেন? আপনাকে ভালবাসি তাই দেখতে আসি।' সেদিন নরেনের জবাব শ্নে আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'ওরে! আমি যে তোকে পরীক্ষা করছিল্ম! দেখছিল্ম অবহেলা অনাদর সত্ত্বেও তুই এখানে আসা বন্ধ করিস কি না! তোর মতন এমন উচ্চআধার না হলে, এমন ব্যাকুলতা না থাকলে, যে কেউ অনেক আগেই আমাকে ত্যাগ করতো।'

আর একবারের কথা বলি। রামকৃষ্ণ সেবার সম্প্র্ণ অন্যভাবে পরীক্ষা করলেন। একদিন নরেনকে তিনি পঞ্চবটীতে নিয়ে গেলেন, তারপর বললেন, 'দ্যাখ্! কৃচ্ছ্রসাধন করে আমি অনেক রকম অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছি। কিন্তু আমার মতন মান্ষ অত ক্ষমতা নিয়ে কি করবে? আমি তো কোমরে একখানা কাপড়ও জড়িয়ে রাখতে পারি না! তা ভাবছি মা-কে জিজ্ঞেস ক'রে তোকে সে সব ক্ষমতা দিয়ে দোব। মা বলেছেন, তোর মতন উচ্চ আধার দরকার মতন সে ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে। তা তুই কি বলিস?'

সব শুনে নরেন বললেন, 'সে ক্ষমতা দিয়ে কি ভগবান পাব?' রামকৃষ্ণ বললেন, 'না; তা পাবি না। তবে ভগবান পাবার পর ওই ক্ষমতা দিয়ে তাঁর কাজ করতে পারবি।' নরেন বললেন, 'তাহলে আগে ভগবান পাই তারপর ভেবে দেখবার অনেক সময় পাব যে, সে ক্ষমতার দরকার হবে কি না। এখন যদি ওইসব আশ্চর্য ক্ষমতা পেয়ে যাই, তাহলে আত্ম-গরিমা বেড়ে যাবে। তখন আসল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে সংসারের স্থূল কামনা মেটাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ব। এই ক্ষমতার মোহ থেকেই আমার পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে।'

নরেন প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে এসে সারা রাত ধ'রে ধ্যান করতেন। পাশেই পাটকল। শেষরাতে পাটকলের বাঁশির শব্দ ধ্যানরত নরেনকে প্রায়ই বিমনা করতো। পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, এই পাটকলের বাঁশি শুনেই চন্দ্রা ভাবতেন বুঝি বা স্বর্গে শঙ্খধ্বনি হচ্ছে। রামকৃষ্ণ তাঁকে (নরেন) কলের বাঁশির শব্দতেই মন একাগ্র করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। নরেন সেইভাবেই ধ্যান করতেন আর তাতেই তিনি আশ্চর্য ফল পান। কলের বাঁশি আর তাঁকে বিমনা করত না। আর একবার—নরেন অভিযোগ করলেন ধ্যানরত অবস্থায় কিছুতেই দেহসত্তা ভুলতে পারছেন না। অথচ দেহসত্তা না ভুললে মনকে ঊর্ধ্বগামী করবেন কি করে? অনেক বছর আগে তোতাপুরী যা করেছিলেন, রামকৃষ্ণও তাই করলেন। নিজের হাতের নখটি নরেনের দুই ভ্রূর মধ্যে তিনি নির্মমভাবে গেঁথে দিলেন, তারপর সেই যন্ত্রণার মধ্যে নরেন্‌কে মনঃসংযোগ করতে বললেন। এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে অভ্যাসের পর নরেন বাহ্য চেতনা ভুলে মনকে সমাহিত করতে পেরেছিলেন।

মোট কথা, সংযমী জীবনযাপনের উপর রামকৃষ্ণ অধিক জোর দিতেন। তিনি নরেনকে বলেছিলেন যে, কোনো মানুষ যদি অবিচ্ছিন্নভাবে বারো বছর সংযম পালন করেন তাহলে তার চিত্ত কলুষমুক্ত হয় এবং ঈশ্বর দর্শনের পথ প্রশস্ত হয়। এদিকে নরেনের পিতৃদেব (বিশ্বনাথ) ও অন্যান্যেরা তখনও নরেনের উপর চাপ দিয়ে চলেছেন, যাতে তিনি বিবাহে রাজী হন। একদিন নরেনের ঘরে বসে রামকৃষ্ণ শুদ্ধ জীবনযাপনের উপদেশ দিচ্ছিলেন। নরেনের পিতামহী আড়াল থেকে সে কথা শুনে ফেলেন। সেই থেকে ভক্তি সত্ত্বেও রামকৃষ্ণের উপর পরিবারের লোকেরা বিরূপ হ'য়ে ওঠেন। অবশ্য নরেন যা ভালো মনে করতেন তা করতেন; ফলে তাঁর দক্ষিণেশ্বরে আসা কেউ বন্ধ করতে পারে নি।

রামকৃষ্ণ বলতেন, 'পোদ্দার যেমন টাকা পয়সা বাজিয়ে গুণে নেয়, তেমনি তুইও আমায় বাজিয়ে নিবি। যতক্ষণ না তুই পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হচ্ছিস ততক্ষণ পর্যন্ত আমায় মেনে নিস না।' একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে নরেন শুনলেন যে রামকৃষ্ণ কলকাতা গেছেন। সেদিন ঘরে তিনি একাই ছিলেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো টাকা পয়সার উপর রামকৃষ্ণের ঘৃণা খাঁটি কিনা তা বাজিয়ে নেবেন। এই ভেবে রামকৃষ্ণের শয্যায় পাতা তোষকের নিচে একটি গোল টাকা লুকিয়ে রেখে পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে গেলেন। রামকৃষ্ণ ঘরে ঢুকলেন, তারপর শয্যায় হাত দিয়েই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন পিছিয়ে এলেন। সত্যি, তাঁর হাতটি তখন বেদনায় টনটন করছিল। বিহ্বল বিমূঢ় রামকৃষ্ণ তখন এদিক-ওদিক চাইছেন। ঠিক কি কারণে তাঁর এমন অভিজ্ঞতাটি হলো তা যেন বুঝতে পারছিলেন না। ইতিমধ্যে নরেনও নিঃশব্দে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন। একটিও কথা না বলে তিনি রামকৃষ্ণকে লক্ষ্য করছিলেন। রামকৃষ্ণ তখন

একজন পরিচারককে ডেকে শয্যাটি পরীক্ষা করতে বললেন। একটি গোল টাকা তোষকের তলা থেকে পাওয়া গেল। নরেন তখন ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলায় রামকৃষ্ণ খুশি মনেই তা মেনে নেন।

১৮৮৪-র প্রথম দিকে নরেনের পিতৃবিয়োগ হয়। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হ'য়ে বিশ্বনাথ দত্ত দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর মুহূর্তটিতে নরেন উপস্থিত ছিলেন না—এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলেন। মৃত্যু সংবাদ পেয়েই নরেন ছুটে এলেন এবং শেষকৃত্যাদি সম্পন্ন করলেন। শোকের তীব্রতা একটু কমলে পিতৃসম্পত্তির হিসাব করে দেখলেন যে আয়ের অধিক ব্যয় ক'রে পিতৃদেব বাজারে কিছু ঋণ রেখে গেছেন। এদিকে আত্মীয়রা মামলা দায়ের ক'রে বসতবাটীর উপরেও দাবি রাখবার চেষ্টা করছিলেন। অবশ্য মামলা টেঁকে নি; কিন্তু সংসারের বড় ব'লে বিধবা মা ও ভাইদের ভরণপোষণের সব দায়িত্ব নরেনকেই নিতে হলো। বলা বাহুল্য এমন ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে পূর্বে কখনও তাঁকে পড়তে হয় নি।

তখনকার অবস্থাটি বর্ণনা করতে গিয়ে নরেন বলতেন, 'অশৌচকাল শেষ হবার আগে থেকেই চাকরির সন্ধানে আমায় ফিরতে হয়েছিল। অনাহারে নগ্নপদে চাকরির দরখাস্ত হাতে নিয়ে আপিসে আপিসে ঘুরে বেড়াতাম। প্রখর রোদে এমন ক'রে ঘুরে বেড়াতাম, তাই মাথা ঘুরতো। যেখানে যেতাম সেখানেই বিফল মনোরথ হতাম। সংসারের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়ে বিশেষভাবে বুঝেছিলাম যে, জগতে নিঃস্বার্থ সহানুভূতি যথার্থই বিরল। দুর্বলের, দরিদ্রের স্থান এখানে নেই। দেখতাম, দু'দিন আগেও যারা আমাকে কোনোভাবে সাহায্য করবার সুযোগ পেলে ধন্য মনে করতো, তারাই এখন আমাকে দেখে মুখ বাঁকাচ্ছে; ক্ষমতা থাকলেও সাহায্য করতে পশ্চাৎপদ হচ্ছে। যাহোক, একদিন এমনি রোদে ঘুরতে ঘুরতে পায়ের তলায় ফোস্কা হলো। সেদিন বেজায় পরিশ্রান্ত হয়ে গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের ছায়ায় ব'সে পড়েছিলাম। যে বন্ধুটি সেদিন আমার সঙ্গে ছিল, সান্ত্বনা দেবার জন্য সেদিন সে গেয়েছিল:

'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে' ইত্যাদি।

কিন্তু গান শুনে সেদিন মনে হয়েছিল কেউ বুঝি মাথায় গুরুতর আঘাত করছে। মা ও ভাইদের অসহায় অবস্থার কথা মনে হওয়া মাত্র ক্ষোভে নিরাশায় বলে উঠেছিলাম, "চুপ কর্‌! ক্ষিদের জ্বালায় যাদের প্রিয়জনদের কষ্ট পেতে হয় না—যারা ক্ষিদে কি তা জানে না, তাদেরই এসব মধুর কল্পনা মানায়। ছেলেবেলায় আমারও এসব খুব মধুর লাগতো। কিন্তু এখন দেখছি জীবন কল্পনা নয়, কঠোর সত্য। এসব গান তাই এখন মিথ্যের বাণ্ডিল ব'লে মনে হয়।"

'সেদিন আমার ব্যঙ্গ শুনে বন্ধু খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের কি কঠোর চাপে সেদিন আমার মুখ থেকে কথাগুলি বেরিয়েছিল তা সে কেমন করে জানবে! এক একদিন সকালে উঠেই বুঝতে পারতাম, ঘরে সকলের মতন যথেষ্ট আহার্য নেই। সেদিন মা-কে বলতাম "বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন"; রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। পকেটে পয়সা থাকত না ব'লে সারাটা দিন অনশনেই কাটাতাম। বাইরের লোকের কাছে সেসব কথা অভিমানে

প্রকাশ করতাম না। ধনী মানুষরা আগের মতোই মাঝে মাঝে গানবাজনার আসরে আমাকে ডেকে নিয়ে যেতেন। আমি যেতাম, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে কখনও তাঁরা জানতে চাইতেন না, কি করে আমাদের দিন চলছে। এঁদের মধ্যে বিরল দু-একজন কখনো কখনো বলতেন, "তোকে আজ এত বিষণ্ণ, দুর্বল দেখাচ্ছে কেন রে?" কেবল একজন মানুষ আমাদের ঠিক অবস্থাটি জেনে আমার মা-কে বেনামে টাকা পাঠিয়ে সাহায্য করতেন। সেই মানুষটি আমায় চিরঋণে আবদ্ধ করে গেছেন।'

কিন্তু এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও নরেনের ঈশ্বর বিশ্বাসে এতটুকু সংশয় দেখা দেয় নি। ময়দানের মাঠে বন্ধুকে সেদিন যাই বলুন না কেন, ঈশ্বর যে মঙ্গলময়, একথায় তাঁর সন্দেহ হয় নি। নিদ্রাভঙ্গ হলে আগে ঈশ্বরকে স্মরণ করতেন, পরে শয্যাত্যাগ করতেন। একদিন ওইভাবে ঈশ্বরের নাম জপ করছেন, পাশের ঘর থেকে নরেনের মা বিরক্ত হ'য়ে বললেন, 'চুপ কর্ ছোঁড়া, ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান ভগবান—ভগবান তো সব করলেন!' মায়ের মুখ থেকে ওই কথাগুলি শুনে নরেন সেদিন খুব আহত হয়েছিলেন। মাকে চিরদিনই ভক্তিমতী ভাবতেন। তবুও ও কথা তিনি কেন বললেন? তবে কি ভগবান নেই? তিনি থাকলে ভক্তের সকরুণ প্রার্থনা কি শুনতে পেতেন না? তিনি যদি মঙ্গলময় হন, তবে তাঁর রাজত্বে এত অমঙ্গল কেন?

নরেন আরও বলেছেন, 'গোপনে কোনো কাজ করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। ছেলেবেলা থেকে কখনো এমন কাজ করা দূরে থাকুক, মনের ভাবটি পর্যন্ত ভয়ে বা আর কোনো কারণে কারও কাছে লুকোবার অভ্যাস করি নি। সুতরাং ঈশ্বর নেই, অথবা যদি থাকেন তবে তাঁকে ডেকে কোনো ফল হয় না, একথা যে লোক ডেকে বলে বেড়াব তাতে আর আশ্চর্য কি! ফলে অল্প দিনেই রব উঠলো যে আমি নাস্তিক হয়ে গেছি এবং দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে মিশে অস্থানে কুস্থানে যাতায়াত করছি। এই সব মিথ্যা যত রটনা হ'তে লাগলো, ততই যেন আমার চরিত্র আরও একরোখা হতে থাকলো। আমি সকলের কাছে বলে বেড়াতে লাগলাম যে, সংসারে কিছুক্ষণ দুঃখকষ্ট ভুলে থাকবার জন্যে কেউ যদি মদ্যপান করে বা বেশ্যালয়ে যায় তাহলেও দোষ হয় না। শুধু তাই নয়, যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারবো যে ক্ষণিক সুখভোগ আমিও পেতে পারি, তাহলে অমন কাজ করতে আমিও পশ্চাৎপদ হবো না।'

(এই স্বীকারোক্তি ক'রে নরেন যেন নিজের প্রতি অবিচারই করেছিলেন। বলতে গেলে, এমন কঠিন দারিদ্র্য দুঃখের মধ্যে বাস ক'রেও নরেনের চারিত্রিক শুচিতার এতটুকু স্খলন হয় নি। সেই সময় অন্তত এমন দুজন রমণী তাঁর জীবনে এসেছিল যারা ছল ক'রে নরেন-কে ভালবাসায় ভোলাতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গেই নরেন তাদের হীন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।)

'কথা কানে হাঁটে। আমার ওই কথাগুলি নানাভাবে বিকৃত হ'য়ে ঠাকুরের কাছে এবং তাঁর ভক্তদের কাছে পৌঁছতে দেরী হলো না। কেউ কেউ স্বচক্ষে অবস্থাটি দেখতে এসেছিলেন এবং যা রটেছে তা পুরোপুরি না হ'লেও অন্তত অংশত সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়ে-ছিলেন। ওরা যে আমাকে এত হীন ভাবতে পারেন তা জেনে তখন আমার দারুণ অভিমান হয়েছিল। নরকের ভয়ে ভগবানে বিশ্বাসের ব্যাপারটিই আমার কাছে কাপুরুষতা মনে হ'ত।

আর ওঁদের কাছে আমার সেই ধারণা প্রতিপন্ন করার জন্যে হিউম, বেন্, মিল, কোঁতে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতামত উদ্ধৃত ক'রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করতে তর্ক জুড়ে দিয়েছিলাম। ওঁরাও আমার অধঃপতন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'য়ে চলে গিয়েছিলেন। ওঁরা চলে যাবার পর আমার মনটি লঘু হয়ে যায়। কিন্তু সহসা একটি দুশ্চিন্তা আমায় পীড়া দিতে লাগল। মনে ভাবলাম এদের মুখে শুনে হয়ত ঠাকুরও এসব বিশ্বাস করবেন। তখনি মনে হলো, "যদি তা বিশ্বাস করেন তো উপায় কি। মানুষের ভালমন্দ মতামতের মূল্য যখন এতই অল্প তখন কি আসে যায়!" পরে যা শুনেছিলাম তা আমায় স্তম্ভিত করে-ছিল। আমার সম্বন্ধে মিথ্যাগুলি শুনে ঠাকুর প্রথমে হ্যাঁ বা না কিছুই বলেন নি। পরে একজন ভক্ত মায়াকান্না কেঁদে যখন বললেন, 'নরেন যে এত নিচে নেমে যাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি!'—তখন উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ঠাকুর চীৎকার ক'রে বলে উঠেছিলেন, "চুপ কর্ শালারা! মা আমায় বলেছেন সে কখনও অমন কাজ করতে পারে না। আর কখনও যদি ওসব কথা তুলবি তবে আমি তোদের মুখ দেখবো না"।

'কিন্তু আমার নাস্তিকতার স্বরূপটি কী? অভিমান আর দম্ভ ছাড়া আর কি! ছেলে-বেলা থেকে, বিশেষত ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে জীবনে যে সব উজ্জ্বল বর্ণময় অনুভূতির উদয় হয়েছিল তা থেকেই ভাবতাম আর মনে মনে বলতাম, "ভগবান নিশ্চয়ই আছেন—নইলে, জীবন কি, তার দামই বা কী? যেমন ক'রে হো'ক তাঁকে পাবার পথটি খুঁজে পেতেই হবে, যত দুঃখকষ্টই আসুক না কেন সে খোঁজায়।"

'গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা এলো। আগের মতোই কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই। একদিনের ঘটনা বলি। রাত্তিরে কাক ভেজা হ'য়ে ফিরছিলাম। সারাটা দিন অনাহারে কেটেছে। শরীর যেন আর বইছিল না। কিন্তু শরীরের চেয়েও মনের ক্লান্তি যেন আরও দুর্বহ। শেষ পর্যন্ত মনে হলো বোধহয় এক পা-ও আর হাঁটতে পারবো না। তাই হলো। রাস্তার ধারের এক-জনের বাড়ির রোয়াকের ওপর একখণ্ড কাঠের মতন আছড়ে পড়লাম। বোধহয় কিছুক্ষণের জন্য আমার চেতনার লোপ হ'য়েছিল। সেই ঘোর-লাগা অবস্থায় মনের পরদায় নানা বর্ণের চিন্তা ও ছবি পর পর ভেসে উঠছিল। কোনো এক বিশেষ চিন্তা বা ছবিতে যে মনকে আবদ্ধ রাখবো সে সামর্থ্য ছিল না। হঠাৎ উপলব্ধি হলো যেন একের পর এক পরদা উঠতে লাগল, আর যে সব সমস্যার সামঞ্জস্য করতে না পেরে মন পীড়িত হ'ত, সেগুলির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখতে পেলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল আমার মন। শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফেরার সময় বুঝতে পারলাম, শরীরে এক বিন্দু ক্লান্তি নেই। অমিত বল আর শান্তিতে মন পূর্ণ। রাত শেষ হবার আর বিশেষ দেরি ছিল না।

'সংসারের নিন্দা প্রশংসায় ক্রমেই উদাসীন হয়ে উঠতে লাগলাম। বুঝতে পারছিলাম যে, আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতন অর্থোপার্জন করে পরিবার পালন করা বা ভোগসুখে কালযাপন করবার জন্য আমার জন্ম হয় নি। গোপনে, ঠাকুরদাদার মতন সংসার ত্যাগের জন্য তৈরি হতে লাগলাম। অবশেষে সেই পরম দিনটি এসে গেল। সন্ন্যাসী হবার সঙ্কল্প মনে মনে পাকা করে ফেললাম। শুনলাম সেই দিনই কলকাতায় তাঁর এক ভক্তের বাড়িতে ঠাকুর আসছেন। ভাবলাম, ভালই হলো—গুরুদর্শন ক'রে চিরকালের মতন সংসার ত্যাগ করবো। কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র তিনি বললেন, "তোকে আজ আমার সঙ্গে

দক্ষিণেশ্বরে যেতে হবে।" নানা ওজর করলাম। ঠাকুর কিছুতেই ছাড়লেন না। অগত্যা তাঁর সঙ্গে চললাম। গাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে বিশেষ কথা হলো না। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে ঠাকুরের ঘরেই কিছুক্ষণ বসলাম। আরও অনেকে ছিলেন। এমন সময়ে ঠাকুরের ভাবাবেশ হলো। হঠাৎ তিনি আমার কাছটিতে এসে সজল চোখে আমার হাত দুটি ধরে গেয়ে উঠলেন :

কথা কহিতে ডরাই
না কহিতেও ডরাই,
আমার মনে সন্দ হয়
বুঝি তোমায় হারাই, হারাই—

এতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের প্রবল উচ্ছ্বাস কোনোরকমে রুদ্ধ রেখেছিলাম ; কিন্তু সেই প্রবল বেগ আর সম্বরণ করতে পারলাম না। ঠাকুরের মতন আমারও চোখের জল বন্যার মতন ঝরতে লাগল। আমার স্থির বিশ্বাস হলো যে ঠাকুর সব জানতেন। অন্য সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে আমাদের আচরণ দেখছিল। ঠাকুরের বাহ্য চেতনা ফিরে এলে একজন ভক্ত ব্যাপারটি জানতে চাইল। ঠাকুর মৃদু একটু হেসে বললেন, "আমাদের ও একটা হ'য়ে গেল।" পরে রাত্রে অন্য সবাইকে সরিয়ে আমাকে কাছে ডেকে বললেন, "আমি জানি, তুই মা'র কাজের জন্যে এসেছিস ; সংসারে কিছুতেই থাকতে পারবি না। কিন্তু কথা দে, যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন আমার জন্যে তুই সংসারে থাকবি।" নরেন কথা দিলেন। রামকৃষ্ণ যেমনটি চেয়েছিলেন নরেন তাই করবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা করলেন। নতুন উদ্যম নিয়ে চাকরির সন্ধান করতে লাগলেন। এটর্নি-অফিসে একটি চাকরি পেয়েও গেলেন। কয়েকখানি বই অনুবাদ ক'রে কিছু রোজগারও হলো। কিন্তু এ সবই অস্থায়ী ব্যবস্থা। মা ও ভাইদের ভরণপোষণের কোনো পাকাপাকি ব্যবস্থা সেগুলি ছিল না। নরেন তাই স্থির করলেন মা ও ভাইদের অন্ন সংস্থানের জন্য রামকৃষ্ণকে মায়ের কাছে চাইতে বলবেন। রামকৃষ্ণ কিন্তু নরেনকেই চাইতে বললেন। আরও বললেন, নরেন যেন তাঁর দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে জগন্মাতাকে মেনে নেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার। মার কাছে খুব পুণ্য দিন। আজ রাত্তিরে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম ক'রে যা চাইবি, মা তোকে তাই দেবেন।'

ব্রাহ্মসমাজ থেকে নরেন যে সব সংস্কারগুলি সঙ্গে করে এনেছিলেন সেগুলি একে একে দূর হয়ে গেছে। নরেন এখন সম্পূর্ণ ভারমুক্ত। তাছাড়া পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন যে, রামকৃষ্ণের কথার উপর পূর্ণ ভরসা করা যায়। সুতরাং তাঁর কথামত কাজ করতে নরেন ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। সাগ্রহে রাত্রির অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাত ন'টা নাগাদ নরেনকে কালীঘরে পাঠিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণ। যাবার সময় কেমন এক গাঢ় নেশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছিলেন নরেন। পা টলছে, বনবন ক'রে মাথা ঘুরছে। কালীঘরে ঢুকেই নরেন বিহ্বল—তাঁর সামনে আনন্দরূপিনী চিন্ময়ী মা সত্যই জীবিতা! বিহ্বল নরেন মা'র পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বারবার চীৎকার ক'রে বলতে লাগলেন, 'মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাতে তোমার অবাধ-দর্শন নিত্য লাভ করি তেমনি ক'রে দাও।' মন শান্তিতে ছেয়ে গেল। জগৎসংসার নিঃশেষ হয়ে হারিয়ে গেল। একমাত্র মা-ই তাঁর হৃদয় পূর্ণ করে রইলেন।

কালীঘর থেকে ফিরে আসতেই রামকৃষ্ণ জানতে চাইলেন যে অভাবের কথা ব'লে নরেন

মা-র কাছে কিছু চেয়েছে কি না। নরেন অবাক ; তাই তো, কিছুই তো চাওয়া হয় নি! সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁকে আবার কালীঘরে গিয়ে চাইতে বললেন। নরেন তাই করলেন। এবারও সুধারস পান ক'রে তাঁর মন আপ্লুত। কালীঘরে ঢুকে যা চাইলেন তা বৈরাগ্য, ভক্তি ও জ্ঞান। অভাবের কথা এবারও মনে হলো না। সব শুনে রামকৃষ্ণ বললেন, 'বোকা ছেলে! নিজেকে একটু সামলাতে পারিস না! যা চাইবি তা মনে করতে পারিস না? ফের যা ; মাকে গিয়ে বল্ কি তুই চাস।' যাবার পথে নরেনের অন্যরকম অভিজ্ঞতা হলো। চাওয়ার বস্তুটি যথাযথই মনে ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু কালীঘরে ঢোকামাত্রই দারুণ লজ্জায় তাঁর মন পেয়ে বসলো। ভাবলেন, মা-র কাছে এ কি তুচ্ছ বস্তু চাইবেন! 'এ যেন' —তখনকার মনের ভাবটি বোঝাতে গিয়ে পরবর্তীকালে বলেছেন, 'রাজার কৃপাধন্য হবার পর তাঁর কাছে লাউ-কুমড়ো চাওয়া।' সুতরাং এবারও মার কাছে জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্যই চাইলেন। কিন্তু কালীঘর থেকে ফিরে আসার পর নরেনের মনে হলো এসব বোধহয় ঠাকুরের ছলনা। রামকৃষ্ণের কাছে এসে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি জানি আপনিই আমায় ভুলিয়ে দিয়েছেন। এখন আপনাকেই মা-র কাছে আমার মা আর ভাইদের অভাব দূর করার কথা বলতে হবে।' নরেনের অভিযোগ শুনে রামকৃষ্ণ সস্নেহে বললেন, 'ওরে, আমি যে কারও জন্য অমন চাইতে পারি না। আমার মুখ দিয়ে যে ওসব বেরোয় না। তোকে বললুম, মা-র কাছে যা চাইবি তাই পাবি ; তুই চাইতে পারলি নে। তোর অদেষ্টে সংসারসুখ নেই, তা আমি কি ক'রবো?' কিন্তু নরেনও জিদ করে বসে থাকলেন, বললেন, 'তা হবে না। আমার জন্য আপনাকে বলতেই হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি বললে তাদের আর কোনো কষ্ট থাকবে না।' অগত্যা রামকৃষ্ণ রাজী হলেন ; বললেন, 'আচ্ছা যা, ওদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখনো অভাব হবে না।' রামকৃষ্ণের এই উক্তি সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

নরেনের এই সাকার বিশ্বাস তাঁর জীবনের এক বিশেষ ঘটনা। পরবর্তীকালে তাঁকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত, 'রামকৃষ্ণ ছিলেন অন্তরে জ্ঞানী, বাইরে ভক্ত। কিন্তু আমি হলাম অন্তরে ভক্ত আর বাইরে জ্ঞানী।' সাধারণভাবে বলতে হয়, বিবেকানন্দরূপে নরেনের উপদেশ ছিল ভক্তির বদলে জ্ঞান। একবার বিবেকানন্দ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের ভাষায় একজন মার্কিন মহিলাকে লিখেছিলেন, 'কালীর ধ্যান আমার এক বিশেষ খেয়াল।' তবে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বিবেকানন্দ জেনেছিলেন যে, জগন্মাতা কালীর মূর্তিরূপ পাশ্চাত্য ভক্তদের কাছে কোনোদিনই আরাধ্য হবে না ; তাই তাঁর বিদেশের বক্তৃতায় কালীর উল্লেখ বড় একটা থাকতো না।

বৈকুণ্ঠ নাথ সান্যাল নামে রামকৃষ্ণের একজন যুবক ভক্ত ছিলেন। একই আপিসের সহকর্মীরূপে নরেনকেও তিনি অল্পস্বল্প চিনতেন। বৈকুণ্ঠ একদিন সকালবেলাই দক্ষিণেশ্বরে এলেন। দেখলেন, ঘরের মধ্যে রামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আর বাইরের বারান্দায় শুয়ে নরেন ঘুমোচ্ছেন। রামকৃষ্ণের মুখখানি আনন্দে জ্বলজ্বল করছিল। সেদিন বৈকুণ্ঠ যা দেখেছিলেন তা এইরকম :

'কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেই ঠাকুর বললেন, "ওরে দেখ, ছেলেটি বড় ভালো। ওর

নাম নরেন্দ্র। আগে মানতো না। কাল মেনেছে। কষ্টে পড়েছে, তাই মার কাছে টাকা-কড়ি চাইবার কথা বলে দিয়েছিলাম। কিন্তু চাইতে পারলে না, বললে, লজ্জা করলো! মন্দির থেকে ফিরে এসে আমায় মার গান শিখিয়ে দিতে বললো। আমি, 'মা ত্বং হি তারা,' গানটি শিখিয়ে দিলাম। কাল সারারাত ওই গানটা গেয়েছে। তাই এখন ঘুমুচ্ছে।" তারপর আহ্লাদে হাসতে হাসতে ঠাকুর বললেন, "নরেন কালী মেনেছে,—বেশ হয়েছে—না?" ঠাকুরকে অমন বালকের মতন আমোদ করতে দেখে আমি বললুম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশ হয়েছে।" খানিক পরে ঠাকুর আবার হাসতে হাসতে বললেন, "নরেন্দ্র মাকে মেনেছে। বেশ হয়েছে—কেমন?" এমনি করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঠাকুর বারবার একই কথা বলে যেতে লাগলেন।

'বেলা চারটে নাগাদ নরেনের ঘুম ভাঙলো। ঘরে এসে নরেন ঠাকুরের পাশে বসলেন। মনে হলো এবার ঠাকুরের কাছে বিদায় নিয়ে নরেন কলকাতায় ফিরবেন। ঠাকুর কিন্তু নরেনকে দেখেই তাঁর গা ঘেঁষে বসলেন। ঠাকুরের তখন ভাবাবিষ্ট অবস্থা। সেই অবস্থাতেই একবার নিজের দিকে পরে নরেনের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, "কি দেখছি জানিস? এটা আমি আবার ওটাও আমি! সত্যি বলছি, কোনো ভেদ বুঝছি না। যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেললে দুটো ভাগ দেখায়—কিন্তু সত্যি সত্যি কোনো ভাগাভাগি নেই। একটাই জল, তেমনি! বুঝতে পাচ্ছিস? তা মা ছাড়া আর কি আছে বল্! তাই না? ঠাকুর হঠাৎ বললেন, "তামাক খাব।" তাড়াতাড়ি তামাক সেজে এনে হুঁকাটি তাঁর হাতে দিলাম। দু'এক টান দিয়েই বললেন, "কলকেতে খাব।" আবার কলকেতে দু'চার টান দিয়ে সেটি নরেনের মুখের কাছে ধরে বললেন, "খা, আমার হাতেই খা।" নরেন ইতস্তত করছেন দেখে বললেন, "তোর তো ভারি হীন বুদ্ধি! তুই আমি কি আলাদা? এটাও আমি ওটাও আমি।" এই কথা ব'লে নরেনের মুখের কাছে নিজের হাত দু'খানি এগিয়ে দিলেন। অগত্যা ঠাকুরের হাতে মুখ লাগিয়ে নরেন দু'চারবার তামাক টেনে নিরস্ত হলেন। এরপর ঠাকুরকে আবার কলকে হাতে নিয়ে তামাক খেতে উদ্যত দেখে নরেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'ওকি করছেন? হাতটা ধুয়ে খান!" কিন্তু সে কথা শোনে কে। "দূর শালা, তোর তো ভারি ভেদবুদ্ধি!" এই কথা ব'লে নরেনের মুখলাগা হাতেই তামাক খেতে খেতে অনেক উচ্চভাবের কথা বলতে লাগলেন। সাধারণত অপরের ভুক্তাবশেষ ঠাকুর খেতে পারতেন না। কিন্তু নরেন সম্বন্ধে তাঁর অমন আচরণ দেখে সেদিন আমি স্তম্ভিত হয়ে ভেবেছিলাম যে, এঁরা দু'জনে কত আপনার হয়ে গেছেন।'

জীবনব্যাপী নরেন্দ্র বারবার বলে এসেছেন, 'সেই প্রথম দেখা দিনটি থেকে একা ঠাকুরই কেবল সমানভাবে আমাকে বিশ্বাস করে এসেছেন, আর কেউ নয়; এমনকি নিজের মা ভাইরাও এমনভাবে আমায় বিশ্বাস করে নি। ঠাকুরের এই বিশ্বাস আর ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মতন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। শুধু তিনিই ভালবাসতে জানতেন ও ভালবাসতে পারতেন। সংসারের আর সবাই স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেবল ভালবাসার ছল করে পড়ে থাকে।'

১৭

নবীন সন্ন্যাসীরা

কাহিনীর এই অংশের কথা বলতে গিয়ে আমাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ঘটনার কালানুক্রম এড়িয়ে যেতে হয়েছে। ইতিমধ্যেই সমকালের অনেক ঘটনা বাদ দিয়ে, ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত নরেনের অধ্যাত্ম সাধনার ধারাটি অনুসরণ করেছি—নরেন, রাখাল, লাটু ও গোপাল ঘোষের কথা বলেছি। আমার মনে হয় রামকৃষ্ণের সঙ্গে যাঁরা পরে অন্তরঙ্গ তাঁদের সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করে সন্ন্যাসীদের নামের তালিকাটি পূর্ণ করি। অন্যথায়, দক্ষিণেশ্বরে তাঁদের আগমনের তারিখ মিলিয়ে দু'তিনজন করে পৃথকভাবে যদি তাঁদের কথা বলতাম, তাহলে অনেক অসম্পৃক্ত ঘটনা ও মানুষের ভিড়ে তাঁরা হারিয়ে যেতেন। অল্প কথায় প্রত্যেক ব্যক্তি-চরিত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীচিত্র আঁকবার চেষ্টা করেছি; ভবিষ্যতের গর্ভে অনেকদূর পর্যন্ত তাঁরা আমাদের নিয়ে যাবেন। এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে তুলনামূলকভাবে একে অপরের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়েছি, যাতে পাঠকের মনে তাঁরা অনেকদিন বেঁচে থাকেন। তা না করে, যদি রামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠদের সমষ্টিগতভাবে দেখাতাম, তা হ'লে ব্যক্তিত্ব বিচারের মূল্যায়নে তাঁরা কেউ একক হতে পারতেন না—আলাদা করে তাঁদের চেনাও যেত না, এবং সবাইকে একরকম মনে হ'ত।

সম্পূর্ণতার স্বাদ আনতে আমাকে রামকৃষ্ণের ষোলজন ভক্তশিষ্যের নামই উল্লেখ করতে হবে। যাঁদের কথা আগে বলেছি তাঁরাও এই তালিকায় থাকবেন। প্রথমে এঁদের পূর্বাশ্রম নাম ও পরে ব্রহ্মচারী নামগুলি বলবো। (ব্রহ্মচারী নামের শেষে সর্বক্ষেত্রেই 'আনন্দ' প্রত্যয়টি যুক্ত আছে। অর্থাৎ, 'যিনি আনন্দময়'। যেমন বিবেকানন্দ—অর্থাৎ জ্ঞানবিচারের ক্ষেত্রে যিনি আনন্দময়) প্রত্যেক সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচারী নামকরণ করেন স্বয়ং বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ তাঁদের সম্বন্ধে যেমনটি বলেছেন তারই অনুসরণে এই নামকরণ করা হয়। ১৮৮৬ সালে রামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর নবীন ভক্তদের সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করে নামকরণগুলি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় পরিচয় গোপন রাখতে নরেনকে অনেকগুলি ব্রহ্মচারী নাম নিতে হয়েছিল। সেগুলি আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। ১৮৯৩ সালের আগে তিনি বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন নি। কোন্ অবস্থায় তিনি এই নামটি গ্রহণ করেছিলেন সে কথা শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত—বিবেকানন্দ
'বিবেক'

গোপাল ঘোষ—অদ্বৈতানন্দ
'অদ্বৈতবাদ'

রাখালচন্দ্র ঘোষ—ব্রহ্মানন্দ
'ব্রহ্ম'

বাবুরাম ঘোষ—প্রেমানন্দ
'প্রেম'

লাটু—অদ্ভুতানন্দ
'আশ্চর্য'

নিত্যরঞ্জন ঘোষ—নিরঞ্জনানন্দ
'নিষ্কলুষ'

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী—যোগানন্দ
'যোগ'
শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী—সারদানন্দ
'পুণ্য সাধিকা জননী সারদা'
শশীভূষণ চক্রবর্তী—রামকৃষ্ণানন্দ
'রামকৃষ্ণ'
তারকনাথ ঘোষাল—শিবানন্দ
'শিব'
হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়—তুরীয়ানন্দ
'সমাধির চতুর্থভূমি'

সারদাপ্রসন্ন মিত্র—ত্রিগুণাতীতানন্দ
'ত্রিগুণের অতীত'
সুবোধচন্দ্র ঘোষ—সুবোধানন্দ
'জ্ঞান'
গঙ্গাধর পাঠক—অখণ্ডানন্দ
'অখণ্ড, অসীম'
হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—বিজ্ঞানানন্দ
'বিশেষ জ্ঞান'
কালীপ্রসাদ চন্দ্র—অভেদানন্দ
'যাঁর ভেদবুদ্ধি নেই'

বাবুরাম ঘোষ (প্রেমানন্দ)—হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে ১৮৬১ সালে বাবুরামের জন্ম। পিতামাতা উভয়েই পুণ্যপ্রাণ ছিলেন। তাই ছেলেবেলা থেকেই বাবুরামের মধ্যে উচ্চধর্মভাব দেখা যায়। একথা আগে বলেছি যে, নানা অসাধারণ ঘটনা-সংঘাত কিংবা ভাগ্যের মোচড়ে ভক্তেরা রামকৃষ্ণের কাছাকাছি এসেছেন। বাবুরামের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। বাবুরামের এক ভগ্নীর সঙ্গে ধনী বলরাম বসুর বিবাহ হয়। রামকৃষ্ণের শেষ জীবনে বলরাম বসু এক বিশিষ্ট ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। (দ্রঃ অধ্যায় ১৮) কলকাতার যে হাইস্কুলে বাবুরাম পড়াশুনা করতেন সেখানকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। বাবুরামের সতীর্থ ছিলেন রাখাল। এই রাখালই তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসেন। সেটি শরৎকাল ১৮৮২ সাল।

রামকৃষ্ণ সব নবাগতদেরই দৈহিক লক্ষণ পরীক্ষা করতেন। বাবুরামেরও করলেন। রামকৃষ্ণ মনে করতেন যে, দৈহিক লক্ষণ দেখেই একজন মানুষের আধ্যাত্মিক চরিত্রটি বোঝা যায়। যেমন রামকৃষ্ণ বলতেন, পদ্মপাতার মতন যাদের চোখ তাদের অন্তরে সাধুভাব থাকে। যাদের চক্ষু বৃষের মতন তাদের কামভাব প্রবল হয়। যোগীর চক্ষু হয় ঊর্ধ্বদৃষ্টিসম্পন্ন ও রক্তিমাভ। কথাবার্তার ফাঁকে ক্ষণে ক্ষণে যারা আঁখির কোণে চায়, সাধারণ মানুষের চেয়ে তারা বুদ্ধিমান। যাদের চরিত্রের মূলভাব ভক্তি, তাদের শরীর কোমল হয় আর গ্রন্থিগুলি হয় নমনীয়। কৃশ হলেও তাদের গ্রন্থিগুলি কোনাবিশিষ্ট হয় না। রামকৃষ্ণ কনুই থেকে হাতের ওজন পরীক্ষা করতেন। লঘু হ'লে বলতেন এর বোধশক্তি হিতকর। রামকৃষ্ণ বাবুরামেরও কনুই থেকে হাতের ওজন পরীক্ষা করলেন তারপর বললেন, বেশ। সেদিন বাবুরামের শুদ্ধ দেহমনের নির্মল ভাবটি দেখে রামকৃষ্ণ খুব খুশি হয়েছিলেন। বাবুরামকে আবার আসতে বললেন। অল্প যে ক'জনকে রামকৃষ্ণ তাঁর দিব্যদেহ স্পর্শ করার অধিকার দিয়েছিলেন বাবুরাম তাঁদের অন্যতম। বাবুরামকে বছর দুই পরে রামকৃষ্ণ তাঁর সহগামী হতে বললেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমকে বলেছিলেন, 'বাবুরামকে বললাম, 'এখানে চলে আয় না!' বাবুরাম বললো, "যাতে আসি তার ব্যবস্থা করে দিন না কেন?" তারপর রাখালের দিকে চেয়ে সে কাঁদতে লাগলো, বললে, "রাখাল এখানে বেশ সুখে আছে।" বাবুরাম তো আসতেই চান! কিন্তু ইতস্তত করেন পাছে তাঁর জননী অসুখী হন। কিন্তু সে বাধাও দূর হলো। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে বাবুরামের মা একদিন নিজেই এলেন।

তাঁর কাছে বাবুরামকে চেয়ে বসলেন রামকৃষ্ণ। বাবুরামের জননীও রামকৃষ্ণের ভক্ত। তাই তিনি রাজী হলেন—তবে শুধু একটিই তাঁর শর্ত। যতদিন বেঁচে থাকবেন, যেন ঈশ্বরে মতি থাকে—আর সন্তানের মৃত্যু দেখার জন্য যেন তাঁকে দীর্ঘজীবি না হতে হয়।

নিম্নভূমিতে ভাবাবিষ্ট হতে বাবুরাম একদিন রামকৃষ্ণকে ধরে বসলেন। জগন্মাতার কাছে রামকৃষ্ণ বাবুরামের জন্য বলতে গেলেন, যাতে বাবুরামের একটু ভাব হয়। কিন্তু জগন্মাতা বললেন বাবুরামের ভাব হবে না। ওর জ্ঞান হবে—অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান।

বাবুরামের ভারি মিষ্টি স্বভাব। সবাই তাঁকে ভালবাসে। রামকৃষ্ণ বলতেন ওর 'প্রকৃতি' ভাব। আরও বলতেন, 'ও একেবারে নতুন আধার'। দুধ রাখলে টঁকে যাবে না। তবুও এই আত্মবিস্মৃত যুবকটিই ১৯০২ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠের প্রধান, স্বামী প্রেমানন্দরূপে অগণিত শিক্ষানবীশ ভক্তদের লোকশিক্ষা দিয়ে গেছেন। এর দু'বছর পরেই তাঁর দেহান্ত হয়। ভক্তদের প্রতি প্রেমানন্দের ভালবাসা ছিল অফুরন্ত। নবাগতদের যত ত্রুটিই থাকুক না কেন, প্রেমানন্দ তা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতেন। তবুও তিনি ভক্তদের বলতেন, 'তোদের কি আমি যথার্থ ভালবাসি? না—কারণ তেমন ক'রে ভালবাসতে পারলে তোদের আমি চিরকালের জন্য বেঁধে রাখতুম। ঠাকুর আমাদের কত্তই না ভালবাসতেন। তাঁর ভালবাসার শতাংশের একাংশও তোদের আমি দিতে পারি নি।'

নিত্য নিরঞ্জন ঘোষ (নিরঞ্জনানন্দ)—নিত্যনিরঞ্জন যখন প্রথম রামকৃষ্ণের কাছে এলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো। কলকাতায় কাকার কাছে থাকতেন। বেশ বড়সড় চেহারা, চমৎকার স্বাস্থ্য আর অপরূপ ছিল নিরঞ্জনের দেহসৌন্দর্য। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর অতীন্দ্রিয় দর্শন-ক্ষমতা ছিল। ফলে যারা প্রেতচর্চা করতো তাদের অনেকেই তাঁকে মাধ্যমরূপে পেতে চাইত। ব্যাধি উপশমের ব্যাপারেও নিরঞ্জনের অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। একবার একজন ধনী মানুষ অনিদ্রারোগ সারাতে তাঁর কাছে আসেন। রোগ নিবারণ হোক না হোক, নিরঞ্জনের মনে হয়েছিল যে ঐশ্বর্য সত্ত্বেও মানুষ যখন রোগ যাতনা পায় তখন কত না তুচ্ছ এই ঐশ্বর্য।

শোনা যায় যে প্রেতচর্চায় উৎসাহী একজন বন্ধুর সঙ্গে নিরঞ্জন প্রথমবার দক্ষিণেশ্বরে আসেন। বন্ধুটি রামকৃষ্ণকে মাধ্যম করতে চেয়েছিল। রামকৃষ্ণও নাকি সরল বিশ্বাসে এই পরীক্ষায় উৎসাহ দেখান। কিন্তু পরে তাঁর সন্দেহ হয় হয়ত এদের উদ্দেশ্য সাধু নয়। রামকৃষ্ণ তাই নিজেকে আর লিপ্ত করলেন না। কিন্তু নিরঞ্জনকে ভর্ৎসনা করলেন। বললেন, 'ও সব প্রেতচর্চা ভালো নয়। ওতে মনের মধ্যে ভূত প্রেতের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। তার চেয়ে ঈশ্বরে মনোনিবেশ কর্। তাতে মন ঈশ্বরময় হয়ে উঠবে। এখন কি করবি বল্?'

নিরঞ্জনের সরলতার প্রশংসা করতেন রামকৃষ্ণ। শ্রীম আমাদের সে কথা বলেছেন। রামকৃষ্ণ প্রায়ই বলতেন, 'নিরঞ্জন বড় সরল। ওর মনে দোষ স্পর্শায় নি।' নিরঞ্জন যখন চাকরি নিলেন তখন রামকৃষ্ণ ভারি দুঃখ পেয়েছিলেন। একদিন ডেকে বললেন, তোর মুখে যেন কালো একটা ছায়া পড়েছে।' কিন্তু পরে যখন জানলেন যে, মায়ের দরকারেই নিরঞ্জন চাকরি নিয়েছেন তখন খুশি হয়েছিলেন। অবশ্য সাধারণভাবে তিনি সবাইকে সাবধান করে দিয়ে বলতেন যে, সন্ন্যাসীদের ঈশ্বর ছাড়া আর কাউকে সেবা করা উচিত নয়।

ভালমানুষ হলেও নিরঞ্জনের ক্রোধ ছিল উগ্র। একদিন খেয়া নৌকায় চড়ে নিরঞ্জন দক্ষিণেশ্বরে আসছেন। সঙ্গে আরও অনেক যাত্রী। তারা সবাই অকারণে রামকৃষ্ণের নিন্দেমন্দ করছিল। বলাবলি করছিল যে রামকৃষ্ণ ত্যাগী নন; এ নাকি তাঁর এক ঢং। ভালো খাচ্ছেন, গদিতে শুচ্ছেন আর ধর্মের ভান ক'রে ইস্কুলের ছেলেদের মাথা খাচ্ছেন। এমন অকারণ নিন্দামন্দ শুনে নিরঞ্জন প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু কেউ নিরস্ত হলো না দেখে, ক্রোধে আত্মহারা হয়ে নৌকাটি মাঝ নদীতে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। বলিষ্ঠ নিরঞ্জন দক্ষ সাঁতারু। সুতরাং নৌকাটি ডুবে গেলেও সাঁতার কেটে তীরে আসতে তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। কিন্তু নৌকার অন্য আরোহীরা নিরঞ্জনের ক্রোধদৃপ্ত মূর্তি দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে কোনোক্রমে সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিল।

রামকৃষ্ণ সে কথা জানতে পেরে নিরঞ্জনকে সেদিন যথেষ্ট তিরস্কার করলেন, 'ক্রোধ চণ্ডাল; ক্রোধের বশীভূত হতে আছে? যারা সৎ মানুষ তাদের রাগ জলের দাগের মতন, হ'য়েই মিলিয়ে যায়। হীনবুদ্ধি লোকে কত কি অন্যায় কথা বলে; তা নিয়ে বিবাদ করতে গেলে সারা জীবনটা তাতেই কাটাতে হয়! এমন অবস্থায় ভাববি লোক না পোক্ (কীট) এবং তাদের কথা উপেক্ষা করবি। ক্রোধের বশে কি অন্যায় করতে যাচ্ছিলি বল্ দেখি! দাঁড়ি-মাঝিরা তোর কি অপরাধ করেছিল যে সেই গরিবদের ওপরেও অত্যাচার করতে গিয়েছিলি!'

রামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর যাঁরা তাঁর দেহভস্ম ও অন্য স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে সাধন-ভজন করতেন, নিরঞ্জন তাঁদের একজন ছিলেন। নিরঞ্জন সারদা মারও ভক্ত ছিলেন। ১৯০৪ সালে বিসূচিকা রোগে তাঁর দেহান্ত হয়।

রামকৃষ্ণের শিক্ষাপ্রণালী ছিল খুবই কৌতুককর। যে কারণের জন্য তিনি নিরঞ্জনকে তিরস্কার করেছিলেন, ঠিক সেই কারণেই আর এক নবীন সন্ন্যাসী যোগানন্দকেও তিনি ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু দুটি তিরস্কারের প্রকৃতি ছিল দু'রকমের। যোগানন্দ অর্থাৎ যোগীন চৌধুরীরও এই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনিও খেয়া নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে আসছিলেন। নৌকার অন্য যাত্রীরা রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক কিছু কিছু মন্তব্য করেন। সেগুলি কানে আসতে যোগীনও প্রথমে ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন। ভেবেছিলেন নিন্দাকারীদের দু'চারটি কথা শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু স্বভাবে শান্ত ব'লে তাঁর মনে হয়েছিল যে, নিন্দাকারীরা সাধারণ মানুষ; রামকৃষ্ণকে তারা ঠিকমতন বোঝে না বলেই তাঁর বিরুদ্ধে বিপরীত ধারণা করে বসে। এক্ষেত্রে তাঁর কি করার আছে! এইসব ভেবে যোগীন্দ্র প্রতিবাদ না ক'রে মৌনাবলম্বন করে রইলেন।

পরে কথাপ্রসঙ্গে যোগীন্দ্র যখন রামকৃষ্ণের কাছে ঘটনাটি বললেন, তখন রামকৃষ্ণ যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি যোগীন্দ্রকে বললেন, 'অযথা আমার নিন্দে করলো আর তুই কিনা চুপ ক'রে শুনে এলি! শাস্ত্রে কি আছে জানিস? গুরু নিন্দাকারীর মাথা কেটে ফেলবে নয়তো সে স্থান ত্যাগ করবে। আর তুই মিথ্যে রটনার একটা প্রতিবাদও করলি না!'

আর একবারের কথা। রামকৃষ্ণ আবিষ্কার করলেন যে তাঁর জামা কাপড়ের পেঁটরার মধ্যে আরশোলার উপদ্রব হয়েছে। তাই যোগীন্দ্রকে পেঁটরা খুলে জামাকাপড় বের ক'রে আরশোলাগুলি মেরে ফেলতে বললেন। কোমলপ্রাণ যোগীন্দ্র জামাকাপড় ঝেড়ে পরিষ্কার করলেন,

তারপর আরশোলাগুলি বাইরে বাগানে ছেড়ে দিয়ে এলেন। যোগীন্দ্র ভাবতে পারেন নি যে এমন তুচ্ছ ব্যাপারটি রামকৃষ্ণ মনে ক'রে রাখবেন। তাই রামকৃষ্ণ যখন জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলেন যে যোগীন্দ্র তাঁর আদেশ পালন করেন নি, তখন তাঁকে বলেছিলেন, 'যেমনটি বলবো ঠিক তেমনটি করবি; নয়ত ভবিষ্যতে গুরুতর বিষয় নিজের মতে করতে গেলে তোকে পশ্চাত্তাপ করতে হবে।'

আর একবারের কথা; বাজার থেকে একটি লোহার কড়াই কিনতে গেছেন যোগীন্দ্র। দোকানী তাঁর ধর্মালোচনা শুনে মুগ্ধ। দাম দিয়ে কড়াই কিনে ফিরে এসে তিনি দেখলেন যে, কড়াইটি ফাটা। সেবারও যোগীনকে রামকৃষ্ণ তিরস্কার করেছিলেন। 'কি—বড়াখানা না দেখেই নিয়ে এলি? দোকানী কি দোকান ফেঁদে ধর্ম করতে বসেছে যে তুই তার কথায় বিশ্বাস করে না দেখেই নিয়ে এলি? অযথা বিশ্বাস করে কখনও এমনভাবে ঠকবি না। ভক্ত হয়েছিস ব'লে কি তুই বোকা হবি!'

যোগীন্দ্র যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি। তাঁর পরিবারের লোকজন রামকৃষ্ণকে অনেক দিন ধরে চিনতেন বটে, কিন্তু তেমন পছন্দ করতেন না। তাঁদের ধারণা ছিল যে, বদ্ধ উন্মাদ না হ'লেও রামকৃষ্ণ একটু খামখেয়ালী। যোগীন তাই লুকিয়ে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। পরিবারের লোকজন জেনে ফেললেও যোগীনকে তারা নিরস্ত করতে পারে নি। শান্ত যোগীন্দ্রের চরিত্রের আর একটি দিক ছিল; তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, তাঁর মনোবল ছিল দুর্জয়।

চরিত্রের এই স্বাধীনভাবের জন্যেই যোগীন অনেক বিষয়েই সন্দেহ-প্রবণ ছিলেন। এমনকি রামকৃষ্ণকেও তিনি মাঝে মাঝে সন্দেহ করতেন। একদিন রাত্রে রামকৃষ্ণের ঘরে নিদ্রা যাচ্ছেন। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন দোর খোলা—শয্যায় রামকৃষ্ণ নেই। উঠে এদিক-ওদিক তাকালেন কিন্তু রামকৃষ্ণকে দেখতে পেলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে সেই দারুণ সন্দেহটি দেখা দিল। তবে কি ঠাকুর নহবতে সহবাস করতে গেছেন? তবে কি তাঁর ধর্মভাব ভান? মুখে যা বলেন কাজে তার বিপরীত করেন? তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন যোগীন্দ্র, তারপর নহবতের পাশে এক জায়গায় অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। যোগীন যখন এইরকম গুপ্তভাবে অপেক্ষা করছিলেন তখন হঠাৎ পঞ্চবটীর দিক থেকে এসে রামকৃষ্ণ তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। সেদিন লজ্জা ও ভয়ে জড়সড় হ'য়ে গিয়েছিলেন যোগীন। রামকৃষ্ণ কিন্তু একটুও অপরাধ নেন নি। শুধু বলেছিলেন, 'বেশ, বেশ; সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি।'

রামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর রামকৃষ্ণ মহামণ্ডল গড়ে ওঠে। যোগীন্ তখন স্বামী যোগানন্দ। সে সময় প্রায়ই বিবেকানন্দের মতাদর্শ নিয়ে যোগানন্দ বিরূপ সমালোচনা করতেন, যদিও উভয়ের মধ্যে যথেষ্টই প্রণয় ছিল। শেষ জীবনে যোগানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের সেবা কাজে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকতেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

রামকৃষ্ণ অনেকবার অনেক অবস্থায় বলেছেন যে, তাঁর অনেক ভক্তদের মধ্যে মাত্র ছয়জনই বিশেষ ভক্ত। এঁরা হলেন ঈশ্বরকোটী ভক্ত। কর্মবন্ধন থেকে এঁরা চিরকালের জন্য মুক্তি পেয়েছেন। এঁরা পুনর্জন্ম নিয়েছেন মানুষের সেবা করতে। একজন ঈশ্বরকোটী ভক্তের মধ্যে কিছু কিছু অবতারত্বের বিশেষ গুণ বিদ্যমান।

এই ছয়জন ঈশ্বরকোটী ভক্ত হলেন যথাক্রমে নরেন, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র এবং পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

পূর্ণকে আমরা সন্ন্যাসীর তালিকায় রাখি নি, কারণ পূর্ণ সন্ন্যাস নেন নি। ১৮৮৫ সালে তিনি প্রথম রামকৃষ্ণকে দেখেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো। যোগীন্দ্রের মতনই লুকিয়ে লুকিয়ে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের দিন রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'আমাকে তোর কি মনে হয় ?' প্রণোদিত পূর্ণ দ্বিধাহীনভাবে তখনি জবাব দিলেন, 'আপনি ভগবান—সাক্ষাৎ ঈশ্বর। দেহাশ্রয়ে পৃথিবীতে এসেছেন!' আহা, বালকের কি বিশ্বাস! রামকৃষ্ণ তো আহলাদে আটখানা। তেমনি অবাকও হয়েছিলেন। আগের জন্ম থেকে অধ্যাত্ম জ্ঞান না পেলে এমন বিশ্বাস গড়ে ওঠে না। বিবাহিত হলেও সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পূর্ণর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। এঁরা সবাই তাঁর অধ্যাত্ম বিশ্বাসের জন্য পূর্ণকে সমাদর করতেন।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (সারদানন্দ)—নিকটাত্মীয় শশীভূষণ চক্রবর্তীর সঙ্গে শরৎচন্দ্র যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এলেন, তখন তাঁর বয়স আঠারো আর শশীর কুড়ি। সময়টি অক্টোবর মাস, ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দ। শরতের বাবা ছিলেন এক ওষুধের দোকানের মালিক। বাপ চেয়েছিলেন শরৎ ডাক্তারি পড়ুক। শরতেরও আপত্তি ছিল না, বিশেষ নরেন যখন সম্মতি দিলেন। সুতরাং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে শরৎ পড়াশোনা করছিলেন। সেই সময় রামকৃষ্ণ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কঠিন ব্যাধি, জীবন-মরণ সমস্যা। শোনা মাত্রই পড়াশোনায় ইতি ক'রে ঠাকুরের সেবায় শরৎ আত্মনিয়োগ করলেন। আর ফেরেন নি, এবং রামকৃষ্ণের সেবা কাজে থাকতে থাকতেই তিনি সন্ন্যাস নেন। সেই থেকে আর্তের সেবাই তাঁর মুখ্য ধর্ম হয়ে উঠেছিল। ব্যাধি যত দূষিতই হোক না কেন শরৎ নির্ভয়ে সেবাধর্ম পালন করতেন।

এই নির্ভয়-চিত্ততাই ছিল শরতের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যখনই বিপদ এসেছে যথার্থ যোগীর মতো শান্তভাবে তা গ্রহণ করেছেন। একটি ঘটনার উল্লেখ করি। কাশ্মীর উপত্যকায় ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে বেড়াতে বেড়াতে একবার এক দুর্ঘটনা হলো। ঘোড়াটি হঠাৎ ভয় পেয়ে ঢালু খাদের পথে গড়াতে থাকে এবং সেই অবস্থায় গাড়িটি এক গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থমকে যায়। মুহূর্তেরও ভগ্নাংশ। সেই সময়টুকুর মধ্যেই মনস্থির করে সারদানন্দ গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েন। পর মুহূর্তেই একখন্ড বড় পাথর ঘোড়ার গায়ের উপর গড়িয়ে পড়ল এবং ঘোড়াটিকে মেরে ফেলল। তখনকার মানসিক অবস্থার কথা বলতে গিয়ে সারদানন্দ স্বীকার করেছিলেন যে, সেই মুহূর্তে বাস্তব বিষয় থেকে তাঁর মন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং অখন্ড মনোযোগ দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ ঘটনাটি লক্ষ্য করছিলেন। আর একবারের কথা। নৌকায় চড়ে আসছেন। সঙ্গে আর একজন ভক্ত ছিলেন। হঠাৎ ঝড় উঠলো। এমন অবস্থা হলো যে নৌকা বুঝি জলমগ্ন হয়। সারদানন্দের কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। দিব্যি হুঁকা টানছেন। কিন্তু এই নিরুত্তাপ আত্মমগ্নতা দেখে সঙ্গের ভক্তটির ধৈর্যচ্যুতি হলো। সারদানন্দের হাত থেকে হুঁকাটি টেনে নিয়ে তিনি জলে ফেলে দিয়েছিলেন।

১৮৯৩ সালে বিবেকানন্দ প্রথমবার আমেরিকায় যান। সেবার য়ুরোপ ও আমেরিকার

বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা উপলক্ষ্যে তাঁকে তিন বছরের অধিক সময় থাকতে হয়েছিল। (এই সময়কার কথা শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।) ১৮৯৬ সালে সারদানন্দকে তিনি য়ুরোপে প্রচারের কাজে ডেকে পাঠালেন। লন্ডন শহরে বক্তৃতারত অবস্থায় সারদানন্দের সঙ্গে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হয়। বিবেকানন্দের তখন দেশে ফেরার পালা। সারদানন্দ গেলেন আমেরিকায়। সেখানকার বেদান্ত সোসাইটির প্রধানরূপে বছর দুই নিউইয়র্কে ছিলেন। ভারতে ফিরলেন ১৮৯৮ সালে। এখানে এসে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের প্রধান সম্পাদকরূপে একটানা ১৯২৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ আমৃত্যুকাল এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

সারদানন্দের কৃত্যকর্ম বহুবিধ। একটি হলো বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদনা। ১৯০৮ সাল নাগাদ সারদানন্দ শ্রীশ্রীসারদা মা'র নামে একটি ভবন প্রতিষ্ঠার সংকল্প করলেন। স্থির হলো ভবনের এক অংশে থাকবেন শ্রীশ্রীসারদা মা অন্য অংশটি হবে উদ্বোধন কার্যালয়। ভবন নির্মাণ হলো বটে কিন্তু ব্যায়াধিক্যতার দরুন কিছু ঋণও হলো। সেই ঋণ মেটাতেই সারদানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গের রচনাগুলি লিখতে শুরু করেছিলেন। মহৎ ও বিরাট এই কাজটি শেষ করতে সারদানন্দ কোনো নিভৃতির অবকাশ খুঁজতেন না। ছোট্ট একটি ডেস্কের সামনে দু'পা মুড়ে ব'সে একমনে লিখে যেতেন। তাঁর চারপাশে অসংখ্য ভক্ত দর্শক ভিড় করে থাকতো। তাদের অকারণ গালগল্পের গুঞ্জন সত্ত্বেও সারদানন্দের অখণ্ড একাগ্রতায় কোনো ছেদ পড়ত না। শুধু প্রশাসনিক কাজের জন্য লেখা থেকে তিনি মাঝে মাঝে অবসর নিতেন।

১৯০৯ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধচারিতার অপরাধে অভিযুক্ত দু'জন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী, রামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসী-সঙ্ঘে প্রবেশানুমতি চান। তাঁরা শপথ নেন যে বিপ্লবী জীবন থেকে তাঁরা সরে আসবেন এবং পরিপূর্ণভাবে সঙ্ঘের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। সারদানন্দ তাঁদের বিশ্বাস করে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁর এই কাজের যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছিল ; কারণ অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন যে, এর ফলে রাজশক্তির সঙ্গে অকারণ বিবাদের সূত্রপাত হবে। সারদানন্দ অবশ্য কলকাতায় আরক্ষা বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে দেখা করে, ব্যক্তিগত চুক্তিতে এই দু'জন সম্পর্কে পূর্ণ দায়িত্ব নেবার অঙ্গীকার করেন। মানুষ চিনতে সারদানন্দের ভুল হয় নি। এই দুই বিপ্লবী তাঁদের শপথ রক্ষা করে-ছিলেন—সঙ্ঘের কাজে তাঁরা প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন।

শ্রীশ্রীমা'র দেহাবসান হয় ১৯২০ সালে। ততদিন পর্যন্ত সারদানন্দ নিয়মিতভাবে রামকৃষ্ণের জীবনী রচনার কাজ করে গেছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমা'র দেহাবসানের পর সারদানন্দের আর কোনো আগ্রহ থাকল না। রামকৃষ্ণের শেষজীবনের অনেক ঘটনারই উল্লেখ লীলাপ্রসঙ্গে নেই। জীবনী রচনার কাজ থেকে অবসর নিয়ে সারদানন্দ তখন জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রী মায়ের নামে একটি মন্দিরভবন নির্মাণ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মন্দিরটি ১৯২৩ সালে মায়ের নামে উৎসর্গ করা হয়।

শশীভূষণ চক্রবর্তীকে (রামকৃষ্ণানন্দ) সবাই নিরঞ্জনানন্দের মতো একজন পরমভক্ত মনে করতেন। রামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর তিনিই তাঁর পবিত্র অভিজ্ঞান চিহ্নগুলি নিয়ে একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করেন। শশী কখনও এগুলি ছেড়ে কোথাও যেতেন না। এমন কি,

তীর্থ দর্শনের চেয়েও এই তত্ত্বাবধানের কাজটি তিনি পবিত্র মনে করতেন।

রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর শশী সব সন্ন্যাসী ভাইদের মায়ের মতন দেখাশোনা করতেন। প্রয়োজনে ভিক্ষা ক'রেও সন্ন্যাসী ভাইদের ভরণপোষণ করতেন। নরেন যখন সন্ন্যাসী ভাইদের সন্ন্যাসাশ্রম নামকরণ করেছিলেন, তখন শশীর আগ্রহেই তাঁর 'রামকৃষ্ণানন্দ' নামকরণ করা হয়।

১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ মিশনটি প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনিই এই মিশনের প্রধান হ'য়ে কাজ করে গেছেন। ১৯১১ সালে তাঁর দেহান্ত হয়। ছেলেবেলা থেকেই শশী তীক্ষ্ম মেধাবী ছিলেন। ঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য অল্পবয়সেই তাঁকে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়েছিল; তাহলেও বিদ্যাচর্চা কখনও শিথিল করেন নি। বিশেষ, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। গণিতের জটিল বিষয়গুলি নিয়ে তিনি ভাবতেন এবং সেগুলি সমাধান করে আনন্দ পেতেন। মাদ্রাজের ভক্তেরা তাঁর কৃতকর্মের আয়তন দেখে আশ্চর্য হতো। শশী বলতেন যে, দেহকাণ্ড হলো যন্ত্রবিশেষ; নিষ্ক্রিয়। যেমন চালাবে তেমনি চলবে। যেমন কলমের ক্লান্তি নেই সে লিখেই চলে, তেমনি। যদি আমরা উপলব্ধি করি যে দেহযন্ত্রকে কোনো প্রবলতর শক্তি পরিচালিত করছে, তবে দেহ ক্লান্ত হয় না। রামকৃষ্ণানন্দ নিজেও দেহকে যন্ত্রবিশেষ ব'লে ভাবতেন। লোকশিক্ষার জন্য রামকৃষ্ণানন্দকে প্রায়ই লেকচার দিতে হ'ত। কিন্তু আত্মভাবটি যাতে প্রকট না হয় তার জন্য ঠাকুরের নিকট নিয়ত প্রার্থনা করতেন। রামকৃষ্ণানন্দের কথনভঙ্গি সরস ছিল না। একবার লোকশিক্ষার ক্লাসে একজন ছাত্রও উপস্থিত হয় নি। রামকৃষ্ণানন্দ ফাঁকা ঘরে যথারীতি বক্তৃতা দিলেন। এই প্রসঙ্গের উল্লেখে পরে বলেছিলেন, 'আমি লোকশিক্ষার জন্য বক্তৃতা দিই না। এই আমার কর্ম ও ধর্ম। এই কর্মদ্বারাই আমি ঈশ্বরের সেবা করি। কেউ শুনুক আর না শুনুক আমায় কর্তব্যকর্ম করে যেতেই হবে।'

মাদ্রাজে যারা নবব্রতী হয়ে আসতো কিংবা যারা গৃহীভক্ত, তাদের সম্বন্ধে রামকৃষ্ণানন্দ কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রচলন করেছিলেন। দর্শক ভক্তেরা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ঢুকলে স্বামীজী বিরক্ত হতেন। বলতেন, 'ওসব সরিয়ে রাখ। এখানে এসে শুধু ভগবানের কথাই ভাববে।' একবার মহারাজার এক কর্মচারী অন্য এক ভক্তের সঙ্গে রাজসভা নিয়ে আলাপ করছিল। রামকৃষ্ণানন্দ তাঁর চেয়ারে নড়ে চড়ে বসলেন। আলাপরত দু'জনেই মনে করলেন রামকৃষ্ণানন্দ বোধহয় অসুস্থ। সে কথা জিজ্ঞাসা করতেই রামকৃষ্ণানন্দ বললেন, 'আমি বেশ সুস্থ আছি হে; কিন্তু বাপু, তোমাদের কথাবার্তা আমার ভালো লাগছে না।' আর একবার একজন শিক্ষাব্রতী স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে রামকৃষ্ণানন্দের সমাজসেবা আর জনকল্যাণকর নানা কাজের ভূয়সী প্রশংসা করছিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ খানিকক্ষণ আত্মপ্রশংসা শুনলেন, তারপর শান্তভাবে বললেন, 'না জানি আপনার জন্মের আগে ভগবান আরও কত কাজ করেছেন।'

তারকনাথ ঘোষালের (শিবানন্দ) পিতৃদেব ছিলেন রাণী রাসমণির আইন উপদেষ্টা। ১৮৫০-এর শেষের দিকে বেশ কয়েকবার তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে রামকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তারক তাঁর (রামকৃষ্ণ) দর্শনলাভ করেন ১৮৮০ সালে। তাঁর বয়স তখন ছাব্বিশ। রামচন্দ্র দত্তের বাড়ি গিয়েছিলেন তারক। সেখানে গিয়ে দেখলেন ঠাকুর সমাধিস্থ ঠাকুরকে

সেই অবস্থাতেই তাঁর প্রথম দর্শনলাভ হয়। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই তারক দক্ষিণেশ্বরে এলেন। তারক তখন ঘোর ব্রাহ্ম। নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাসী। একদিন রামকৃষ্ণ তাঁকে নিয়ে কালীঘরে এলেন, তারপব দেবীর সামনে সাষ্টাঙ্গ হলেন। খানিক দ্বিধার পর তারকও সাষ্টাঙ্গ হলেন। তাবক পরে আত্মবিচার করে নিজেকে বলেছিলেন,'আমার এসব সংস্কার কেন ? ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন ; এমনকি এই মূর্তির মধ্যেও তিনি আছেন।' তারক যে তাঁর পরীক্ষা বিধিতে সাড়া দিয়েছেন তার জন্য রামকৃষ্ণ ভারি খুশি। তাই খুশি মনেই তারককে শিষ্য করলেন। শিষ্য করার পর একদিন তাঁকে কাছে ডেকে রামকৃষ্ণ বললেন, 'দেখো বাপু! সন্ন্যাসীদের পূর্বাশ্রমের কথা আমি জানতে চাই না। কিন্তু তোমায় দেখেই মনে হয়েছে তুমি আমাদেরই লোক। তা, তোমার ঘরবাড়ি সংসারের কথা বলো, শুনি।' তারকের পিতৃপরিচয় জেনে রামকৃষ্ণ অবাক। তারককে বললেন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসতে। তাই তো তারকের বাবা দ্বিতীয়বার রামকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন। শুধু আসা নয়, দেখা মাত্রই রামকৃষ্ণের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়েছিলেন তিনি। সেদিন রামকৃষ্ণ তাঁর শ্রীপদখানি তারকের পিতার মাথার উপর স্থাপন ক'রেই সমাধিস্থ হয়ে যান।

পারিবারিক কারণে বাধ্য হয়েই তারক বিবাহে রাজী হন। কিন্তু বিধিমতে বিবাহ পূর্ণ হবার আগেই নববধূ গত হন। পত্নীর হঠাৎ মৃত্যুই তারককে সংসার ত্যাগে প্রণোদিত করে। এ কাজে তিনি পিতৃদেবের পূর্ণ আশীর্বাদ পেয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর তারকের ব্রহ্মচারী নামকরণ হয় 'শিবানন্দ'। সন্ন্যাস নেবার পর বেশ কিছু দিন ধরে তিনি ভারতপথিক হয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তখন মন চাইত সঙ্গরাহিত্য, নিভৃতি—যাতে নিবিড়ভাবে ধ্যানময় থাকতে পারেন। কিন্তু মঠ ও মিশন থেকে কর্তব্যের ডাক এলে তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন না। ১৯০২ সালে কাশীতে একটি আশ্রমের তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২২ সালে ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের পর তিনিই (তারক) হয়েছিলেন সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভাপতি। বড় বড় চিন্তাবিদদের মতন শিবানন্দও প্রয়োজনে ব্যবহারিক দায়িত্বশীলতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। ভগ্নস্বাস্থ্যের উৎপাত সত্ত্বেও শিবানন্দ সবাইকে আনন্দময় রাখতে জানতেন। তাঁর একটি প্রিয় পোষা কুকুর ছিল। মাঝে মাঝে সারমেয় ও নিজেকে নিয়ে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করতেন। কুকুরকে দেখিয়ে বলতেন, 'ও আমার পোষা।' তারপর রামকৃষ্ণের ছবির দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'আমি ওঁর পোষা!'

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একজন ভক্ত বলেছিলেন যে, একদিন সন্ধ্যা নাগাদ নিজের ঘরে ব'সে নবব্রতীদের উচ্চহাসির শব্দ শুনতে পেলেন শিবানন্দ। ওদের হাসির শব্দ শুনে আপন মনেই বলে উঠলেন, 'ওরা আনন্দময় ব'লেই হাসছে। ঘর সংসার ছেড়ে এসেছে আনন্দ পাবে ব'লে। ঠাকুর, ওদের আনন্দ দিও!'

১৯৩৪এর ফেব্রুয়ারীতে শিবানন্দ দেহ রাখেন।

হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় (তুরীয়ানন্দ)—উত্তর কলকাতার এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে হরিনাথের জন্ম—১৮৬৩ সালে। ছেলেবেলা থেকেই কঠোরতার সঙ্গে নানা ধর্মানুষ্ঠান করতেন। দিনে তিনবার গঙ্গাস্নান, গীতা পাঠ, শক্ত মেঝেয় শোয়া, গভীর রাত পর্যন্ত ধ্যান করা, পরিমিত আহার—ইত্যাদি কাজে শারীরিক পরিশ্রমের বহর দেখে আত্মীয়স্বজন ভয় পেতেন।

কিন্তু হরিনাথের সংকল্প ছিল নানারকম দৈহিক কষ্টের মধ্যে কৃচ্ছ্রসাধন করা, যাতে শরীর সইতে পারে। কিন্তু স্বভাবে গোঁড়া হলেও মনোভাবে যথেষ্ট উদার ছিলেন হরিনাথ। খ্রীস্টান মিশনারীদের ইস্কুলে পড়বার সময় খ্রীস্টান ছাত্রদের সঙ্গে হরিনাথ বাইবেল ক্লাস করতে যেতেন। ধর্মবিষয়ক যে কোনো গ্রন্থই তাঁকে আকর্ষণ করত।

হরির যখন চোদ্দ বছর বয়স তখনই তিনি রামকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেন। সেই তাঁর প্রথম দেখা। প্রতিবেশী বলরাম বসুর বাড়িতে রামকৃষ্ণ আসবেন। তাঁর শুভাগমনের সংবাদ পেয়ে অনেকেই এসেছেন। হরিও এসেছেন সমবয়সীদের নিয়ে। রামকৃষ্ণ তখন ব্রহ্মজ্ঞানী পরমহংস। একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ির মধ্যে রামকৃষ্ণ ও হৃদয়। আগে নামলো হৃদয়। পরবর্তীকালে হরি ঘটনাটি এইভাবে বর্ণনা করেছেন। 'হৃদয়ের শরীরটি বেশ শক্ত সবল। কপালে মস্তবড় সিঁদুরের টিপ। ডানবাহুতে সোনার তাবিজ। হৃদয়ের দিকে চাইলেই মনে হয় মানুষটি বেশ পাকাপোক্ত এবং বিষয়ী।' এরপর রামকৃষ্ণের হাত ধরে হৃদয় তাঁকে নামাল। অনেকের সঙ্গে বালক হরিও দেখলো যে মানুষটি, 'কৃশতনু। গায়ে একখানি জামা। কোমরের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা পরনের ধুতি।...... যখন নামলেন, একেবারে বাহ্যজ্ঞানহীন বেসামাল অবস্থা। যেন পানাসক্ত কোনো মানুষ টলমলে পায়ে গাড়ি থেকে নামলেন। কিন্তু নামা মাত্রই সে কি আশ্চর্য দৃশ্য! অবর্ণনীয় দীপ্তিতে ঝলমল করছে মুখখানি। আমার মনে হলো, "ইনিই কি পুরাণের মহর্ষি শুকদেব?" ইতিমধ্যে আরও ভক্ত এসে পড়েছেন। সবাই মিলে তাঁকে ওই বাড়ির দোতলার একখানি ঘরে নিয়ে গেল। আমিও সবাইকে অনুসরণ করে দোতলায় উঠলাম।' দেখলাম, পরমহংসদেবের তখন অর্ধবাহ্যদশা। সেই অবস্থায় তাকালেন। সামনের দেওয়ালে টাঙানো আছে মস্ত একখানি কালীমাতার ছবি। সেদিকে তাকিয়েই ভাবাবস্থায় মধুর স্বরে গান ধরলেন; (ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব/ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে) সেদিন গান শুনে সবার মনে যে অপূর্ব ভাবের উদয় হয়েছিল তা ভাষায় বলা যায় না। এক সময় গান শেষ হলো। পরমহংস তখন নানা আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন।'

এই ঘটনার পর দু তিন বছরের মধ্যে রামকৃষ্ণকে আর দেখেন নি হরি। তাঁর দ্বিতীয় দর্শন হলো ১৮৮০ সালে। বন্ধুবান্ধব নিয়ে হরি দক্ষিণেশ্বরে গেছেন। হরিকে দেখেই রামকৃষ্ণ চিনলেন। বুঝতে পারলেন যে এ ভক্ত হবে। শনিবারের ভিড় বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো দিন হরিকে আসতে বললেন।

হরি একদিন রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কামনা থেকে কেমন ক'রে মুক্তি পাব?' রামকৃষ্ণ বললেন, কামনা এক অপরিহার্য জীবনীশক্তি। এ শক্তি নষ্ট করা যায় না, এড়িয়ে যাওয়া যায় না, আবার উপেক্ষাও করা যায় না। এই শক্তিকে ঈশ্বরমুখী করতে হবে। আর একদিনের কথা। হরিনাথ এসে বললেন যে, মেয়েদের তিনি ভয় পান, তাই তাদের তিনি কাছে ঘেঁষতে দেন না। হরির কথা শুনেই রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুই বোকার মতন কথা বলছিস। মেয়েদের ছোট করে দেখবি না। তাদের মনে করবি মা জগদম্বার অংশ। তেমনি মনে করে তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা করবি। মন থেকে পাপ দূর হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তাদের ঘেন্না করিস, তবে ঠিক পাপবন্ধ হয়ে যাবি।'

সন্ন্যাস নেবার পর হরির ব্রহ্মচারী নামকরণ হলো তুরীয়ানন্দ। সন্ন্যাসী তুরীয়ানন্দ বেশ

কিছুকাল সারা ভারত ঘুরে বেড়ালেন। কখনও একা ; কখনও সারদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, বিবেকানন্দ সমভিব্যাহারে। মাঝে মাঝে ধ্যান করতে যেন কোথায় কোথায় চলে যেতেন। এইভাবে ভবঘুরের মতন বেড়ানোর সময় এক আশ্চর্য প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন তুরীয়ানন্দ। তাঁর মনে হয়েছিল, এই পৃথিবীতে আর সবাই কত না হিতকর কাজ করছেন। অথচ তাঁর জীবনটি পথে পথে ঘুরেই বিফল হলো। এইভাবে উদ্দেশ্যশূন্য ভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখলেন তাঁর দেহটি প্রকাণ্ড হয়ে সারা বিশ্ব ছেয়ে ফেললো। তখন হঠাৎ তিনি ভাবলেন : নিজেকে তুচ্ছ মনে করছি কেন ? কেন ভাবছি এ জীবন নিষ্ফল ? সত্যের একটি বিন্দু দিয়ে নিখিল বিশ্বের ভ্রান্তিকে ঢেকে দেওয়া যায়। সুতরাং ওঠো, জাগো। সত্যকে উপলব্ধি করো। জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম সেটিই।

মার্কিন দেশে দ্বিতীয় দফায় ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছেন বিবেকানন্দ। সেটি ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দ। বিবেকানন্দ চাইছিলেন তুরীয়ানন্দ তাঁর সঙ্গী হোক ; সত্যিকারের সন্ন্যাসীর আদর্শটি পশ্চিমের মানুষেরা দেখুক। প্রথম প্রথম তুরীয়ানন্দের ঘোর আপত্তি ছিল। তাঁর জীবনের ব্রত হলো সন্ন্যাসীর কঠোর জীবন-যাপন। সেইভাবেই অন্তরঙ্গ পরিবেশের মধ্যে তিনি থাকতে চাইতেন। কিন্তু তিনি অন্য সন্ন্যাসী ভাইদের অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। তাই যেদিন স্বয়ং বিবেকানন্দ গলা জড়িয়ে সজল চোখে তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করলেন, সেদিন সম্মত না হয়ে তুরীয়ানন্দের উপায় ছিল না।

যাত্রার উদ্যোগ শুরু হলো। নিজেকেও প্রস্তুত করতে লাগলেন তুরীয়ানন্দ। যাত্রার আগে একদিন তিনি বিবেকানন্দের শিষ্যা আয়ার্ল্যাণ্ড অধিবাসিনী ভগিনী নিবেদিতার শরণাপন্ন হলেন। তুরীয়ানন্দের ভাবনা হচ্ছিল কেমন করে মার্কিনবাসীদের আপনার করে নেবেন। তুরীয়ানন্দের সমস্যাটি নিবেদিতা বুঝলেন। চট করে একটি ছুরিকা তুলে নিলেন তিনি। তারপর অস্ত্রের দিকটি নিজে ধরে হাতলের অংশটি তুরীয়ানন্দের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'যখনই কাউকে কিছু দান করবেন তখন অপ্রীতিকর ভাগটি নিজে নেবেন, আর যে অংশটি প্রীতিসুখকর সেটি গ্রহীতাকে দেবেন।' ছোট্ট এই উপদেশটুকু শিরোধার্য ক'রে নতুন জগতের পথে পা বাড়ালেন তুরীয়ানন্দ। সেটি জুন মাস, ১৮৯৯।

বিবেকানন্দের অনুমানই ঠিক। মার্কিন দেশের ভক্তেরা যেমনটি চেয়েছিলেন সেই বিচারে তুরীয়ানন্দ ছিলেন আদর্শ সন্ন্যাসীস্বামী। নিউ ইয়র্ক শহরে তাঁরা এসে পৌঁছানোর আগেই একজন মার্কিন ভক্ত চিঠি লিখে জানান, 'সাহেবী শিক্ষাপ্রাপ্ত কোনো স্বামীজী আমরা চাই না। আমাদের দেশে চালাক চতুর এবং বক্তৃতাপটু স্বামীজীর সংখ্যা ভূরি ভূরি। আমরা একজন সাদামাটা, সরল সন্ন্যাসীকে স্বামীজীরূপে পেতে চাই।' তুরীয়ানন্দ কখনও বক্তৃতা দিয়ে কাজ করাতে চাইতেন না। কয়েকজন বাছাই করা ভক্ত নিয়ে তিনি নিজেই কাজ করতে ভালবাসতেন। ১৯০০ সালে একজন মার্কিন ভক্ত, সুদূর ক্যালিফোর্নীয়া রাজ্যে শান্তা ক্লারা কাউন্টির অন্তর্গত সান এ্যান্টনিও উপত্যকায় একটি আশ্রম স্থাপনের জন্য বিবেকানন্দকে কিছু ভূসম্পত্তি দান করলেন। বিবেকানন্দ সে দান গ্রহণ করে তুরীয়ানন্দকে আশ্রমের ভার নিতে অনুরোধ করেন। আশ্রমের নামকরণ হলো 'শান্তি আশ্রম'।

সেই বছরেরই আগস্ট মাসে দলবল নিয়ে তুরীয়ানন্দ সান ফ্রান্সিসকো থেকে রওনা হলেন। মহিলাদের নিয়ে ভক্তসংখ্যা বার-তের জন। কখনও খেয়া নৌকায়, কখনও রেল-

গাড়িতে, কখনও ঘোড়ার গাড়িতে, সেই দীর্ঘ সংকটবহুল পথ পাড়ি দিয়ে, অবশেষে তাঁরা এসে পোঁছলেন হ্যামিল্টন পাহাড়ের পাদদেশে। সেখান থেকে আশ্রমস্থলের দূরত্ব বাইশ মাইল। শেষের এই পথটুকু একসঙ্গে যাত্রা করা গেল না। ভাগাভাগি করে কেউ ঘোড়ার পিঠে, কেউ সাইকেল আরোহী হয়ে অবশেষে উপস্থিত হলেন গন্তব্যস্থলে। পাহাড়ী এলাকা; আশেপাশে অনুর্বর বন্ধ্যাভূমি। তাছাড়া তীব্র গ্রীষ্মতাপের দরুন সময়টিও প্রতিকূল। পোঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই একজন মহিলাভক্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সম্পত্তি বলতে একখানি ছোট্ট কাঠের ঘর এবং লম্বা একখানি চালা। তাই অনেককেই খোলা আকাশের তলায় রাত কাটাতে হ'ত। পানীয় জল বয়ে আনতে হ'ত দু'মাইল দূর থেকে। সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যও মজুত ছিল না। তুরীয়ানন্দের মতন কঠোরব্রত সন্ন্যাসীও সব দেখেশুনে সাময়িকভাবে ভগ্নোদ্যম হয়ে যান।

কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জীবনযাত্রা মোটামুটিভাবে সহজ হয়ে গেল। সবাই নিজেদের গুছিয়ে নিলেন। সান ফ্রান্সিসকো থেকে তাঁবু এলো, রসদ এলো। একটি ছোট্ট প্রার্থনাঘর তৈরী করা হলো। গীতা পাঠের ক্লাস শুরু হলো। ভক্তেরা আনন্দের সঙ্গে গৃহস্থালীর কাজকর্ম দেখতো—স্বামী তুরীয়ানন্দ তাদের সঙ্গী হ'য়ে কাজ করাতেন। তাঁর মুখ থেকে ভক্তেরা রামকৃষ্ণের কথা শুনতো। তুরীয়ানন্দ তাদের স্তোত্রপাঠ করাতেন—তাঁর সামনে বসে ভক্তেরা ধ্যানাভ্যাস করতো, দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাদির আলোচনা করতো। এইভাবে তুরীয়ানন্দকে কেন্দ্র করে সেখানে একটি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক সংসার গড়ে উঠেছিল। ভক্তেরা সবাই ছিল নিরামিষাশী। জীবনদর্শনে তারা ছিল অহিংস। একদিন বিষধর একটি ঝুমঝুমি সাপ (Rattle Snake) তুরীয়ানন্দের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। হত্যা না করে সবাই মিলে একটি দড়ির ফাঁসে সাপটিকে ধরে আশ্রম থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেল, তারপর গলার কাছে দড়ির ফাঁসটি কেটে সাপটিকে ছেড়ে দিয়ে এলো। পরদিন সাপটিকে আবার আশ্রমের কাছে দেখা গিয়েছিল। গলায় পরানো দড়ির ফাঁসটি তেমনি অক্ষত। আশ্রমবাসীরা বলতো, 'নেকটাই পরা সাপ।'

তুরীয়ানন্দ তাঁর ক্যালিফোর্নীয়ায় বসবাসের বেশী সময় আশ্রমেই কাটান। মাঝে মধ্যে সান ফ্রান্সিসকো শহরে বক্তৃতা এবং লোকশিক্ষা দিতে যেতেন। ১৯০২ সাল থেকে তুরীয়ানন্দের স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করল। তখন প্রায়ই বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা প্রকাশ করতেন। বিবেকানন্দ তখন দেশে ফিরে এসেছেন। যাহোক, আশ্রমবাসীরা অর্থ সংগ্রহ করে তাঁর দেশে ফেরার একটি টিকিট কিনে দিল। তাদের আশা ছিল আরোগ্যলাভ করে তুরীয়ানন্দ আবার আশ্রমে ফিরে আসবেন। কিন্তু তা হয় নি। জাহাজ রেঙ্গুনবন্দরে পোঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তুরীয়ানন্দ শুনলেন যে মাত্র দিন কয় আগে বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করেছেন। দুঃসংবাদটি শুনে তুরীয়ানন্দ মর্মাহত হয়ে যান। সেই থেকে একটানা আটটি বছর আত্মগোপন ক'রে তিনি কঠোর অধ্যাত্মসাধনা করে গেছেন। নিভৃত অধ্যাত্মসাধনা শেষ করে তুরীয়ানন্দ আবার যখন কর্মময় জীবনে ফিরে এলেন, তখন বিভিন্ন আশ্রমে নবব্রতীদের লোকশিক্ষা দিতেন। এই কাজটিই তিনি আমৃত্যু পালন করে গেছেন। অবশেষে সেই বছরটি এলো, অর্থাৎ ১৯২২ সাল, যখন দীর্ঘ রোগভোগের পর তাঁর কর্মময় সন্ন্যাসী জীবনের অবসান হয়।

সারদাপ্রসন্ন মিত্র (ত্রিগুণাতীতানন্দ)—সারদাপ্রসন্নর জন্ম হয় এক ধনী জমিদারের ঘরে, ১৮৬৫ সালে। ছেলেবেলা থেকেই বেশী আদর পেয়ে মানুষ—তাই পরের সেবা পাব - অধিকার তিনি জন্মগত ব'লে ভাবতেন। রাখাল ও বাবুরামের মতন তিনিও মাস্টার মশাইয়ের (শ্রীম) ইস্কুলে পড়তেন। মেধাবী ব'লে সবাই ধরে নিয়েছিল যে সারদার এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা ফল খুবই ভালো হবে। কিন্তু পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে তাঁর সোনার হাতঘড়িটি খোয় যাওয়ায়, তীব্র মানসিক অশান্তির মধ্যে তাঁকে অবশিষ্ট পরীক্ষাগুলি দিতে হয়। ফলপ্রকাশে সময় দেখা গেল সারদা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ফলপ্রকাশের পরবর্তী ক'দি সপ্তাহ সারদা যখন চরম হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, তখন একদিন শ্রীম পুত্রতুল্য এই প্রিয় ছাত্রটিকে সঙ্গে করে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। সারদাপ্রসন্ন চাক্ষুষ দেখলেন রামকৃষ্ণকে—রামকৃষ্ণ ওঁকে দেখলেন। সেই থেকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিত আসা যাওয়া শুরু করলেন।

এক গ্রীষ্মতপ্ত দুপুর। দলবল নিয়ে সারদা দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। তাঁকে দেখেই রামকৃষ্ণ জল এনে তাঁর পা ধুইয়ে দিতে বললেন। সারদা এগুলিকে হীনকর্ম মনে করতেন। তাই রামকৃষ্ণের আদেশ শুনে তাঁর মুখচোখ লাল হয়ে গেল। বিশেষত বন্ধুদের সামনে এমন আদেশ পালন করা তাঁর পক্ষে অবমাননাকর। কিন্তু রামকৃষ্ণ বারংবার আজ্ঞা করে চলেছেন। অবশেষে আদেশ পালন করতেই হলো। পরবর্তীকালে সারদা বলতেন যে, সেদিনের সেই ঘটনাটি থেকেই তিনি সেবামূলক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হন।

সারদা কলেজে ভর্তি হলেন বটে, কিন্তু নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য প্রায়ই ক্লাস কামাই হ'তে লাগল। বাপ মা স্থির করলেন ছেলের বিয়ে দেবেন। সে কথা শুনে সারদা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন। আবার তাঁকে ধরে আনা হলো। ইতিমধ্যে পরীক্ষা এসে গেল। কিন্তু নিয়মিত পাঠানুশীলন না হলেও পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এদিকে সারদাকে নিয়ে বড়ভায়ের উৎকণ্ঠার আর শেষ নেই। তবে কি সারদা সন্ন্যাসী হবে? অতএব অনেক অর্থব্যয় করে দু'সপ্তাহ ধরে এক বিরাট যজ্ঞ করা হলো। কিন্তু সারদার মতিব পরিবর্তন হলো না। সংসারের প্রতিও তার টান ফিরে এলো না। এত কাণ্ড সব ব্যর্থ হলো।

সন্ন্যাস নেবার পর সারদা হলেন ত্রিগুণাতীতানন্দ। তখন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালেও কলকাতাতেই অধিক সময় থাকতেন। সেবার (১৮৯৭) দিনাজপুর জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সেখানে গিয়ে পীড়িতদের সেবায় রিলিফের দল গড়লেন। ত্রিগুণাতীতানন্দের ভোজন ক্ষমতার মতন আশ্চর্য ছিল তাঁর সংযম। এমন সময় গেছে, যখন দিনের পর দিন কয়েক টুকরো ফল খেয়ে তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছেন। আবার অন্য সময় এক নাগাড়ে চারপাঁচ-জনের উপযুক্ত আহার্য অবলীলায় উদরসাৎ করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ আছে। তীর্থভ্রমণের সময় ঘটনাটি ঘটেছিল। একজন বালককে সঙ্গী করে তিনি এক ভোজনালয়ে যান। ভোজনালয়ের মালিককে তিনি বালকের খাদ্যমূল্য ঈষৎ কম করতে বললেন, কারণ তুলনামূলকভাবে বালকের ভোজন-ক্ষমতা কম। কিন্তু ভোজনালয়ের মালিক স্বামীজীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বললো যে, বালক-বৃদ্ধ সবার জন্য মূল্যতালিকা একইরকম। লোকটিকে একটু শিক্ষা দেবার জন্য ত্রিগুণাতীতানন্দ সেদিন একাই যে পরিমাণ খাদ্য উদরসাৎ করলেন, তা দেখে লোকটির চক্ষুস্থির হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে হাতজোড় করে সে বলে, 'স্বামীজী দয়া করুন। যা খেয়েছেন তার জন্য এক পয়সাও দিতে

হবে না। কিন্তু এবার থামান—আমার ভাঁড়ার শূন্য হয়ে গেছে।'

১৯০২ সালে বিবেকানন্দের জীবনাবসান হলো। আমেরিকা থেকে তুরীয়ানন্দ তখন ভারতে ফিরে এসেছেন। ব্রহ্মানন্দ জানতেন যে তুরীয়ানন্দ আর সেখানে যাবেন না। ব্রহ্মানন্দ তাই ত্রিগুণাকে সান ফ্রান্সিসকো আশ্রমের ভার নিতে অনুরোধ করলেন। সুতরাং সেই বছরেরই শেষাশেষি ত্রিগুণা আমেরিকার উদ্দেশে পাড়ি দিলেন। নিরামিষাশী ত্রিগুণা সংকল্প করেছিলেন সুদূর মার্কিন দেশে কাঁচা আনাজ পাওয়া না গেলে শুধু রুটি ও জলখেয়েই জীবনধারণ করবেন।

ত্রিগুণাতীতানন্দের পরিচালনাতেই সান ফ্রান্সিসকো শহরে মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এটিই আমেরিকার প্রথম হিন্দু মন্দির। মন্দিরটি সাধারণের উদ্দেশে ১৯০৬ সালে উৎসর্গ করা হয়। এর কয়েক বছর পরেই ভূমিকম্প ও দাবানলে অনেক কিছু ভস্মীভূত হলেও, এই গোলাকার ছাদবিশিষ্ট প্রাচ্যরীতির নয়নাভিরাম মন্দিরটি ঠিকই বেঁচে ছিল।

প্রত্যেক বছর ভক্তবৃন্দ নিয়ে ত্রিগুণা শান্তি আশ্রমে যেতেন। সেখানে সকলের সঙ্গে একত্রে বসে ধ্যান করতেন, লোকশিক্ষা দিতেন। তাঁর শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব। যেগুলি ধ্রুববাণী এবং প্রবচন, সেই বাণীগুলি বাঁধাই করে আশ্রমের দেয়ালে টাঙানোর ব্যবস্থা করতেন। ভক্তেরা প্রতি মুহূর্তে বাণীগুলি পাঠ করতো ও চর্চা করতো। বাণীগুলিও বিচিত্র ; যেমন, 'সদাসতর্ক থেকে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হয়', 'জীবনযাপন করবে ঋষির মতন, কিন্তু কর্ম করবে অশ্বের মতন', 'যা করণীয় তা এখনই কর,' 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন—কিন্তু শরীর ক্ষয় হয় না', ইত্যাদি। ভক্তবৃন্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তিনি সুর ক'রে স্তোত্র আবৃত্তি করতেন। কখনো উঁচু মন্দিরভবনের শীর্ষদেশ থেকে, কখনো বা সাগরবেলা থেকে ভেসে আসা সেই ছন্দোবদ্ধ প্রার্থনামন্ত্র যখন ভোরের আকাশে ছড়িয়ে যেত, তখন সাগরপথের উদ্দেশে পাড়ি দেওয়া নাবিক বা জেলে নৌকায় বসে থাকা ধীবরেরা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকতো তাঁদের দিকে।

১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাস—রবিবার। সামান্য অসুস্থ হলেও ত্রিগুণা ধ্যানঘরে গেছেন। হঠাৎ মন্দিরপ্রাঙ্গণে একজন যুবক ঢুকে পড়ল। এখানকার একসময়ের ছাত্র, কিন্তু মানসিক রোগগ্রস্ত। যুবকটি ধ্যানঘরে ঢুকেই স্বামীজীকে লক্ষ্য করে একটি হাতবোমা ছুঁড়ল। আগেই ফেটে যাওয়া বোমার ঘা লেগে ছেলেটি মারা গেল এবং স্বামীজী গুরুতরভাবে আহত হলেন। হাসপাতালে যাবার পথে আঘাতকারীর এমন শোচনীয় মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন স্বামীজী। কিন্তু তাঁর জীবনও শেষ হয়ে আসছিল। জানুয়ারীর গোড়াতেই স্বামীজীর জীবনান্ত হলো—ইহলোক ছেড়ে তিনি বিদায় নিলেন।

সুবোধচন্দ্র ঘোষের (সুবোধানন্দ) জন্ম হয় কলকাতার এক ভক্ত পরিবারে ১৮৬৭ সালে। সুবোধের বয়স যখন আঠারো, তখন তাঁর পিতৃদেব রামকৃষ্ণের বাণীসম্বলিত একখানি ছোট পুস্তিকা তাঁকে পড়তে দিলেন। সেই থেকে রামকৃষ্ণকে জানতে সুবোধের প্রবল আগ্রহ। সুযোগও এলো এবং প্রথম সুযোগেই দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। সুবোধের বাবা মাকে রামকৃষ্ণ জানতেন। তাই তিনি সাক্ষাৎ হতেই বালক সুবোধের হাত দুটি ধরলেন। যেন সুবোধ বড় আপনজন। তারপর মনে মনে মাকে স্মরণ করে সুবোধকে বললেন, 'মা

বললেন তোরও হবে।'

দ্বিতীয় দফায় সাক্ষাতের সময় সুবোধের জিহ্বাগ্রে রামকৃষ্ণ লিখলেন, 'জাগো, মা জাগো!' তারপর সুবোধকে ধ্যান করতে বললেন। ধ্যানময়তার মধ্যে সুবোধ অনুভব করলেন, যেন একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে মাথায় উঠছে। সারা শরীরে তখন কাঁপন। সুবোধের একাগ্রতা দেখে রামকৃষ্ণ বিস্ময়স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পরে সুবোধ তাঁকে বলেছিলেন যে, জননীর নির্দেশে তিনি বাড়িতে নিয়মিত ধ্যানাভ্যাস করে থাকেন।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে এই সাক্ষাতের পর সুবোধ তাঁর দুই ভ্রূর মধ্যে আশ্চর্য এক আলোকরেখা দেখতে শুরু করলেন। ছেলের ভাবনায় মা চিন্তিত। মায়ের ভয় না জানি এ কোন্ অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে চলেছে। ছেলেকে সাবধান করে বললেন ব্যাপারটি যেন জানাজানি না হয়। সুবোধ কিন্তু নিশ্চিন্ত। মাকে আশ্বস্ত ক'রে বললেন, 'কেন ভয় পাচ্ছ? ওই ব্যাপারটি নিয়ে আমি একটুও ভাবছি না। আমি যা চাইছি তা আলো নয়—যিনি এই আলোর উৎস, তাঁকে।'

লাটুর মতন সুবোধেরও স্পষ্টবক্তা ব'লে অখ্যাতি ছিল। রামকৃষ্ণ একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে তোর কি মনে হয়'? সুবোধ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আপনার সম্বন্ধে লোকে অনেক কথা বলে। স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া আমি ওসব বিশ্বাস করি না।' কিন্তু অচিরেই রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। শুধু তাই নয়, সেদিন সুবোধের মনে হয়েছিল যে স্বয়ং রামকৃষ্ণ যখন তাঁর ভার নিয়েছেন তখন ঘটা করে ধ্যানে বসার আর কিসের দরকার!

রামকৃষ্ণ যখন তাঁকে শ্রীম'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বললেন তখন সুবোধ সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, 'উনি তো সংসারী; ওঁর কাছ থেকে আমি ঈশ্বরের কথা কি শুনবো?' সুবোধের এই স্পষ্ট ত্যাগের ভাবটি রামকৃষ্ণের খুব ভালো লেগেছিল। তবুও বললেন, 'গিয়েই দ্যাখ্ না! ও তোকে নিজের কথা কিছু বলবে না। আমার কাছ থেকে যা শিখেছে তাই তোকে বলবে।' সুবোধ গেলেন এবং রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর যা কথাবার্তা হয়েছে তা মুখেব উপব বলে দিলেন। বিনয়ের সঙ্গে শ্রীম বললেন, 'আমি তো কেউ নই! অপারজ্ঞান ও আনন্দের যিনি সাগর, আমি সেই সাগর থেকে কলস ভরে জল তুলে রাখি। যখন কেউ আসেন আমি তাঁকে তা দিই। তিনি ছাড়া আমি কি কথা বলবো?' এই ঘটনার পর থেকে শ্রীমকে অসম্ভব ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন সুবোধ।

সুবোধের সন্ন্যাসী নাম সুবোধানন্দ হলেও বিবেকানন্দ ও অন্য সন্ন্যাসী ভায়েরা তাঁর অল্প বয়সের দরুন তাঁকে 'খোকা' বলে ডাকতেন। এমনকি জীবনের শেষদিন অব্দি সঙ্ঘের সবাই তাঁকে 'খোকা মহারাজ' বলতেন।

সব স্বামীজীরাই তাঁকে স্নেহ করতেন; কারণ সুবোধের স্বভাবটি ছিল আমুদে আর ছেলেমানুষীতে ভরা। যাঁরা তাঁর কাছাকাছি ছিলেন তাঁদের সবাইকে স্বভাবের গুণে আনন্দময় করে রাখতেন। অধ্যাত্ম-বিষয় নিয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে সুবোধ অক্লেশে বলতেন, 'আমি কি জানি? আমি তো খোকা।' তারপর প্রশ্নকারীকে অন্য অন্য স্বামীজীদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তবুও তিনি অনেক ভক্তকে দীক্ষা দিয়েছেন। এইসব নবদীক্ষিতদের মধ্যে শিশুরা ছিল, ছিল অস্পৃশ্যরাও। সুবোধ বলতেন, 'বড় হয়ে এরা বুঝবে এই দীক্ষার শক্তি কত

বিপন্ন।'

১৮৯৭। প্রথমবার পশ্চিমদেশ সফর শেষ করে বিবেকানন্দ দেশে ফিরেছেন। উৎসাহ, উদ্দীপনায় একেবারে যেন টগবগ করছেন। মিশনের উন্নয়নের কাজে তখন তাঁর বিপুল উদ্যম। এতবড় সংগঠনটি যে তাঁরই হাতে গড়া! সন্ন্যাসী ভাইদের সবাইকে ভাষণপটু হতে বলেছেন। নইলে লোকশিক্ষা হবে কেমন করে। ভাষণদানের অনুশীলন শুরু হলো। সপ্তাহান্তে সবাইকে একবার মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে হবে। একসময় সুবোধানন্দেরও পালা এলো। অনিচ্ছুক সুবোধ বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও রেহাই পেলেন না। বিবেকানন্দ অটল। তাঁর জিদের জন্য হতভাগ্য খোকাকে মঞ্চে উঠতেই হলো। কিন্তু কি বলবেন সুবোধ? সন্ন্যাসী-ভায়েরা মজা দেখবার জন্য হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু কিছু বলার আগেই বাড়ি-ঘর-দোর কাঁপতে শুরু করল। মড়মড় শব্দে গাছগুলি মাটিতে আছড়ে পড়ল। হুড়মুড় করে সবাই হলঘরের বাইরে এসে জানতে পারলেন যে ভূমিকম্প হচ্ছে। সোরগোল থেমে গেলে বিবেকানন্দ পরে বলেছিলেন, 'বক্তৃতা দিয়ে আমাদের খোকা আজ পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়েছে।'

ঋষিকেশে থাকতে সুবোধানন্দ একবার প্রবল জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। রামকৃষ্ণ তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন, তারপর সুবোধের জ্বরতপ্ত কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'হ্যাঁরে! একজন বড়মানুষ পাঠিয়ে দেব, যে তোকে সব দিতে পারবে?' সুবোধানন্দ ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না। তার চেয়ে আমায় অসুস্থ করে রাখুন। তবু তো আপনার দেখা পাব!'

ছেলেবেলা থেকেই সুবোধানন্দ চা খেতে বড় ভালবাসতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় ওঁরা তিনজন এক ঘরে ছিলেন। বিবেকানন্দ ধ্যান করছেন আর ব্রহ্মানন্দ ও সুবোধ ঘুমোচ্ছেন। ধ্যান শেষ হলে সুবোধকে জাগিয়ে বিবেকানন্দ তাঁর হুঁকাটি সেজে আনতে বললেন। সুবোধ তাই করলেন। খুশির আবেগে বিবেকানন্দ বলে উঠলেন, 'কি বর চাস বল, তাই পাবি! উত্তরে সুবোধ বললেন, 'কি চাইব বলুন। ঠাকুর তো সবই দিয়েছেন।' ব্রহ্মানন্দ পাশেই ছিলেন। বললেন, 'তা হোক খোকা! তবুও কিছু একটা চেয়ে নে।' সুবোধানন্দ বেশ খানিকক্ষণ ভেবে বললেন, 'বেশ, যদি দিতেই হয় তো এই বর দিন যেন সারা জীবনে কখনও এককাপ চায়ের অভাব আমায় না পেতে হয়। অনেক বছর পর সুবোধকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তেমন বর তিনি আদৌ পেয়েছেন কি না! সুবোধানন্দ বলেছিলেন যে শুধু বর পাওয়া নয়, ইচ্ছামাত্রই তিনি চা পেতেন—এমনকি রাত্রে শুতে যাবার আগেও তিনি চা পান করেছেন।

১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে সুবোধানন্দের দেহান্ত হয়।

গঙ্গাধর ঘটককে (অখণ্ডানন্দ) দক্ষিণেশ্বরে এনেছিলেন হরি (তুরীয়ানন্দ)। সেটি ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ। গঙ্গাধরকে নরেনের সহযোগী হয়ে কাজ করতে বলেছিলেন রামকৃষ্ণ। গঙ্গাধর সে আদেশ মেনে নেন এবং নরেনের আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে অখণ্ডানন্দরূপে তিনি বিবেকানন্দের সমাজসেবার আদর্শটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় তিনিও বলতেন, 'দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞ এবং অত্যাচারিত-রাই তোমার ঈশ্বর।' ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম রিলিফ্ সংগঠনের কাজে তিনিই ছিলেন প্রধান। দুর্ভিক্ষে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে অখণ্ডানন্দ একটি

অনাথ আশ্রম এবং একটি শিল্পবিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি তিনি এই সেবাকাজেই আত্মনিয়োগ করেছেন। কখনও দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন, কখনও শিক্ষার উন্নতির জন্য আন্দোলন করেছেন, অনাথদের পড়িয়েছেন, আবার কখনও বা কলেরা মহামারীতে আক্রান্ত রুগীদের সেবা করেছেন। ক্ষুধিত মানুষের দুর্দশা দেখে তিনি এত কষ্ট পেতেন যে, নিজেও অনেক সময় অনাহারে থাকতেন। অবশ্য ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য করতেন না, কারণ তাঁর আতঙ্ক ছিল যে, অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকেও হয়ত অন্যের সেবা নিতে হবে। অপরের কাছে প্রয়োজনহীন হয়ে পড়বেন ভেবেই তিনি আতঙ্কিত হতেন।

১৮৮৬তে সন্ন্যাসে দীক্ষা নেবার পর তাঁর নামকরণ হলো অখণ্ডানন্দ। তখন সারা হিমালয় ঘুরে বেড়িয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে এসে পেঁছিলেন তিব্বত। সেখানেই তিনবছর ছিলেন। সেইসময় 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তিনি নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখে পাঠিয়েছেন।

১৯৩৪ সালে শিবানন্দের পরলোকগমনের পর মিশন সঙ্ঘের তৃতীয় সভাপতি হয়েছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। তাঁর দেহাবসান হয় ১৯৩৭ সালে।

হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের (বিজ্ঞানানন্দ) জন্ম হয় ১৮৬৮ সালে। হরির (তুরীয়ানন্দ) মতন হরিপ্রসন্নও বালক বয়সে একজন প্রতিবেশীর বাড়িতে রামকৃষ্ণকে প্রথম প্রত্যক্ষ করেন। অবশ্য সতেরো আঠারো বছরের আগে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন নি। সতীর্থ শরতের আগ্রহাতিশয্যেই দু'জনে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। পরবর্তীকালে এই সাক্ষাতের বিবরণ বিজ্ঞানানন্দ এইভাবে দিয়েছেন :

'রামকৃষ্ণের ঘরে ঢুকেই আমার মনে হলো এখানে কি এক অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছে। ভক্তেরা আনন্দময় পরিবেশে গভীর মনোযোগ দিয়ে ঠাকুরের মুখনিঃসৃত বাণী শুনছেন। সেদিন তিনি কি বলেছিলেন আজ আমার মনে পড়ে না। তবে সেদিন যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম, সে কথা ঠিক গতকালের ঘটনার মতন মনে আছে। সেদিন অনেকক্ষণ আনন্দিত মনে বসেছিলাম ; আর অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছিলাম। তিনি আমায় কিছু বলেন নি, আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। একে একে ভক্তেরা চলে যাচ্ছেন ; হঠাৎ দেখলাম ঘরে আমি একা। আমার মনে হলো এবার ফেরা দরকার। এই ভেবে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে যেমনি উঠে দাঁড়িয়েছি, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কুস্তি লড়তে পারিস ? দেখি কেমন তুই কুস্তি করিস ?" এই বলে রামকৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালেন, তারপর আমায় যেন জাপটে ধরবেন এইরকম ভাব দেখালেন। আমি তো অবাক। মনে মনে ভাবছি, "এ আবার কেমন ধারা সাধু ?" যা হোক, উত্তরে বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ। নিশ্চয় জানি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আমার দিকে এগিয়ে এলেন ; ঠোঁটে সুধামাখা হাসি।

আমার হাত দুটি ধরে এবার তিনি আমায় ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু আমি তখন রীতিমত বলিষ্ঠ যুবক—আমার সঙ্গে পারবেন কেন! আমি অনায়াসে তাঁকে দেয়াল অব্দি ঠেলে নিয়ে গেলাম। তখনও তিনি শক্ত করে আমার হাতদুটি জড়িয়ে ধরে তেমনি মিটি-মিটি হাসছেন। ক্রমে আমার মনে হলো, যেন এক বিদ্যুৎ তরঙ্গ তাঁর হাত থেকে প্রবাহিত হয়ে আমার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছে। সব দৈহিক শক্তি তখন আমার হারিয়ে গেছে।

নিজেকে অত্যন্ত অসহায় লাগছে। তাঁর ছোঁয়ায় সারা শরীরে যেন আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। সে এক আশ্চর্য মধুর অভিজ্ঞতা। এবার শ্রীরামকৃষ্ণ আমায় ছেড়ে দিলেন, তারপর মধুর হেসে বললেন, "শেষ পর্যন্ত তুইই জিতলি।" কথা-ক'টা ব'লে খাটের ওপর বসে পড়লেন। আমি তখন বাক্যহীন, স্তম্ভিত। আনন্দের বন্যায় আমার সারা চেতনা যেন গ্রাস করে ফেলেছে। আমার সেই অবস্থায় রামকৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালেন তারপর আমার পিঠে মৃদু করাঘাত ক'রে বললেন, "এখানে আসবি, প্রায়ই আসবি।" আমায় একটু প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ খেয়ে সেদিন আমি ক'লকাতায় ফিরে আসি। বেশ কিছুদিন ধরেই একটা মধুর নেশার মতন সেই আনন্দের অনুভূতিটি নিজের মধ্যে বয়ে বেড়ালাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম যে সেদিন তিনি স্পর্শদ্বারা আমার মধ্যে অধ্যাত্ম শক্তি সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন।'

আর একদিন সাক্ষাতের সময় হরিপ্রসন্ন অনুযোগ করে বললেন যে, ধ্যানে ঠিকমতন মনো-নিবেশ করতে পারছেন না। সেদিন হরিপ্রসন্নর জিভের ডগা ছুঁয়ে রামকৃষ্ণ তাঁকে পঞ্চ-বটীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আশ্চর্য, সেখানে ধ্যানে বসা মাত্রই সব বাহ্যচেতনা যেন হারিয়ে গিয়েছিল তাঁর। রামকৃষ্ণ পরে বলেছিলেন, 'এখন থেকে তোর ধ্যান গভীর হবে।'

রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বারবার সাক্ষাৎ হয় নি; কারণ পরিবারের লোকজনের সঙ্গে তাঁকে পাটনা-বাঁকিপুরে চলে যেতে হয়েছিল। সেখান থেকে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে তিনি পুণায় গেলেন। পুণেতে থাকতে একদিন রামকৃষ্ণকে দর্শন করলেন—যেন চোখের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। পরদিনই শুনলেন যে রামকৃষ্ণ দেহরক্ষা করেছেন। লেখাপড়া শেষ ক'রে সরকারী চাকরি সূত্রে অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। কর্মস্থলে মর্যাদা, আধিপত্য বেড়েছে —ডিস্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনীয়ারের পদে উন্নীত হয়েছেন। কিন্তু তবুও সংসারে তেমন আঁট ছিল না। সন্ন্যাসীর জীবন তাঁকে অহরহ টানতো। অবশেষে ১৮৯৬ সালে বিধবা মায়ের প্রতি-পালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে তিনি রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলে যোগ দিলেন। তাঁর বাস্তুবিদ্যা-বিষয়ক কারিগরী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তখন সঙ্ঘের পক্ষে খুব প্রয়োজন ছিল। বিজ্ঞানানন্দ-রূপে তিনি বেলুড় মঠ ও গঙ্গার পোস্তা নির্মাণ এবং সেগুলির তত্ত্বাবধানের কাজটির দায়িত্ব নেন। বিবেকানন্দের সহযোগী হয়ে তিনি বেলুড় মন্দিরের পরিকল্পনাটিও প্রস্তুত করেন। মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯৩৫ সালে। সেই থেকে শুরু করে মন্দির ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি বেলুড়েই ছিলেন। বেলুড় মন্দিরটি ১৯৩৮ সালে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। বাংলাভাষায় তিনি দুটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। একটি জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক, অন্যটি ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ক। তা ছাড়া সংস্কৃত থেকে বেশ কিছু অনুবাদ কর্মের জন্যও তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তাই অখণ্ডানন্দের দেহাবসানের অব্যবহিত পরেই তিনি মহা-মণ্ডলের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই গুরুভার গ্রহণের ঠিক একবছর পরেই অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে তিনি শরীরত্যাগ করেন।

কালীপ্রসাদ চন্দ্র (অভেদানন্দ)—ছেলেবেলা থেকেই বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যে কালীপ্রসাদ পরিণত হয়ে উঠেছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা ক'রে একদিকে তিনি যেমন প্রাচ্যদর্শন আয়ত্ত

করেছেন, তেমনি পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও তিনি জ্ঞানঋদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। ফলে কোনো ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো একপেশে সংস্কার গড়ে ওঠে নি। খোলা মন নিয়েই তিনি সবকিছু দেখতেন, বিচার করতেন। পতঞ্জলীর যোগসূত্র সম্বন্ধে তাঁর অনেক দিনের কৌতূহল ছিল। এমন একজনকে খুঁজছিলেন যিনি সূত্রের নির্দেশিকা মেনে যোগধ্যানের প্রণালীগুলি তাঁকে শিখিয়ে দিতে পারেন। এই সময় একজন সতীর্থ তাঁকে রামকৃষ্ণের কথা বললেন। তাঁর কথা শুনে কালীপ্রসাদ একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন।

বালক কালীর দিকে চেয়েই রামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, 'আগের জন্মে তুই মস্তবড় যোগী ছিলি। এটাই তোর শেষ জন্ম। আমি তোকে যোগধ্যান শেখাব।' সেই থেকে কালী প্রায় প্রত্যহই দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। রামকৃষ্ণের অসুস্থতার সময় নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর সেবা করেছেন। অবশেষে রামকৃষ্ণের তিরোধানের পর তিনি সন্ন্যাসীসঙ্ঘে যোগ দিলেন। তাঁর নামকরণ হলো 'অভেদানন্দ'।

১৮৯৬। বিবেকানন্দ তখন লণ্ডন শহরে। সেখান থেকেই তিনি অভেদানন্দকে ডেকে পাঠালেন। লণ্ডনে পৌঁছে অভেদানন্দ দেখলেন যে, বিবেকানন্দ একটি বক্তৃতার আয়োজন করেছেন। প্রধান বক্তা স্বয়ং তিনি (অভেদানন্দ)। এর আগে জনসমক্ষে তিনি কখনও বক্তৃতা করেন নি। কিন্তু বিবেকানন্দের বিচারবোধের উপর তাঁর এমন অগাধ আস্থা ছিল যে, মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে তিনি একটুও কুণ্ঠিত হলেন না। কানায় কানায় ভরা হলো ঘরের প্রতিটি মানুষ সেদিন তাঁর দৃপ্ত ভাষণ শুনে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। বিবেকানন্দ নিজেও সেদিন চমৎকৃত হয়েছিলেন। দেশে ফেরার আগে তিনি এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলেন, যে দায়িত্বভার তিনি অভেদানন্দকে দিয়ে গেলেন, তিনি তার অমর্যাদা করবেন না। অভেদানন্দ মাত্র একটি বছর ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। ঠিক একবছর পরে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ তাঁকে নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটির দায়িত্বভার নিতে বলেন। এ কাজেও অভেদানন্দ সফল হন। অন্যান্য সন্ন্যাসী ভাইদের চেয়ে মার্কিন দেশেই তিনি অধিক সহজভাবে থাকতেন। মাত্র একটিবার (১৯০৬) অল্প কয়েক দিনের জন্য ভারতবর্ষে ফিরে আসা ছাড়া ওই দেশেই লোকশিক্ষার কাজে ১৯২১ পর্যন্ত বাস ক'রে গেছেন।

অভেদানন্দ চিরকালই প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। কলকাতায় ফিরে তিনি একটি পৃথক বেদান্ত-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বেলুড় মঠের প্রভাব থেকে সেটিকে মুক্ত রাখেন। অবশ্য বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও দুই প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের মধ্যে সম্প্রদায়গত কোনো মলিনতা ছিল না। ১৯৩৯ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন। তখন পর্যন্ত রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র তিনিই জীবিত ছিলেন।

•

বলা বাহুল্য, সেদিন আরও যুবক ভক্তেরা দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিত এসেছেন এবং রামকৃষ্ণের সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছেন। এঁদের কারও কারও সম্পর্কে রামকৃষ্ণ নিজেও যথেষ্ট উচ্চধারণা পোষণ করতেন। এঁদের শুদ্ধভাব ও ত্যাগের প্রেরণা রামকৃষ্ণকেও সেদিন অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, এঁরা সবাই সেদিন রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলে যোগদান করেন নি। তার অর্থ এই নয় যে, পরবর্তী জীবনে রামকৃষ্ণের প্রভাবমুক্ত হয়ে এঁরা আটপৌরে সংসারী জীবন যাপন করেছেন। কাহিনী সংক্ষেপ করার জন্যই পৃথকভাবে

এঁদের উল্লেখ থেকে আমি বিরত হয়েছি। রামকৃষ্ণের শেষের দিনগুলিতে তাঁর অনুগামী ভক্তশিষ্যের ভিড়ে রঙ্গমঞ্চ পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেই নিবিড় ভক্তসমাগমের মধ্যে রামকৃষ্ণ সেদিন নিজেই যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, ইতিমধ্যেই রামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের শিক্ষাধারার একটি চিত্রপট আমি পাঠকদের উপহার দিতে পেরেছি।

১৮

কয়েকজন মহান ভক্ত

বলরাম বসু ছিলেন এক বিশিষ্ট বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান। উড়িষ্যায় তাঁদের প্রকাণ্ড জমিদারী। তা সত্ত্বেও ভগবদ্‌ভক্তি ও সৎকাজের জন্য এই পরিবারটির বিশেষ খ্যাতি ছিল। পরিবারের এই সহজ ভক্তির পরিবেশেই বলরাম বসুর বিকাশ হয়েছে। তাই যুবক বয়স থেকেই বলরাম তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বেশীরভাগ সময় কেটেছে নির্জনে, ধ্যানাদি কাজে। জমিদারী দেখাশোনা ও কাজকর্মের ভার ছিল খুড়তুতো ভাইদের উপর। শুধু সামান্য কিছু মাসোহারা বরাদ্দ ছিল তাঁর জন্য। বাবুরাম ঘোষের (স্বামী প্রেমানন্দ) ভগিনীর সঙ্গে বলরামের বিবাহ হয়। তাঁদের তিনটি সন্তান ছিল।

কেশব সেনের 'সুলভ সমাচার' পড়ে বলরাম রামকৃষ্ণের কথা জানতে পারেন। ১৮৮২ সালে বড় মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে বলরাম কলকাতায় এলেন। তখন তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ভাবলেন, এই অবসরে দক্ষিণেশ্বর দর্শন কাজটি সেরে যাবেন। তাই হলো; পরদিনই সারা পথ পায়ে হেঁটে চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। বলা বাহুল্য, তাঁর মতন অকৃত্রিম ভক্তিগত মানুষের পক্ষে এটিই স্বাভাবিক। এসে দেখলেন, রামকৃষ্ণের ঘর ভক্তদের ভিড়ে ঠাসা। নিজের কোনো পরিচয় না দিয়ে ঘরের এক কোণে চুপ ক'রে বসে রইলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় হলো। একে একে সবাই উঠে যাবার পর রামকৃষ্ণ তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি কি আমায় কিছু জিজ্ঞেস করবেন?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ। ভগবান কি সত্যি আছেন?' রামকৃষ্ণ বললেন, 'নিশ্চয়ই আছেন'। আবও বললেন, যে সব ভক্ত তাঁকে আপনজন মনে করেন ভগবান শুধু তাঁদেরই দেখা দেন। বলরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে আমায় কেন তিনি দেখা দিচ্ছেন না? আমি তো তাঁকে কত ডাকি!' মৃদু হেসে রামকৃষ্ণ বললেন, 'ভগবানকে কি তুমি নিজের ছেলে-মেয়ের মতন আপনার মনে করো?' বলরাম স্বীকার করলেন যে ভগবানকে তিনি সেই-রকমটি আপনার মনে করেন না। পরদিন সকালে বলরাম আবার দক্ষিণেশ্বরে এলেন। এবারও পায়ে হেঁটে। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করে রামকৃষ্ণ খুবই খুশি হয়েছিলেন।

সঙ্গসুখের দিনগুলিতে রামকৃষ্ণ বলরামকে আচার-বিচার নিয়ে অকারণ গোঁড়ামি করতে নিষেধ করতেন। বৈষ্ণব বলরামের অহিংসা বিচার এত উগ্র ছিল যে, ধ্যানের সময় মশককুল দ্বারা আক্রান্ত হলেও, তাদের হত্যা করা অপরাধ ভাবতেন! কিন্তু দু তিন বছর রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে পুরনো সংস্কারগুলি সম্বন্ধে বলরামের মনে সংশয় দেখা দিল। তাঁর মনে হলো ধ্যানের সময় মনকে অবশ্যই ঈশ্বরমুখী করতে হবে। কিন্তু মশকের উৎপাত থাকলে কোনো সাধকের পক্ষেই মনকে একাগ্রভাবে ঈশ্বরমুখী করা সম্ভব নয়। বলরাম তাই স্থির করলেন রামকৃষ্ণের কাছে এই ব্যাপারটির বিধান চেয়ে নেবেন।

দক্ষিণেশ্বরে যাবার পথেও বলরামের আত্মচিন্তার অবসান হলো না। তাঁর মনে হলো, রামকৃষ্ণকে কখনও মশকের উৎপাতে অস্থির হয়ে তাদের মারতে দেখেন নি। বরং অপরের

কষ্ট দেখে তাঁর করুণাময় মন বেদনায় ছটফট করেছে। একটি ঘটনার কথা বলরামের মনে পড়ল। একদিন তিনি ও রামকৃষ্ণ দেখতে পেলেন যে, একজন মানুষ নিষ্ঠুরের মতন মাঠের উপর সদ্য ওঠা কচি ঘাস মাড়িয়ে চলেছেন। সেই দৃশ্য দেখে রামকৃষ্ণের বুক ব্যথায় টনটন করে উঠেছিল। মনে হয়েছিল লোকটা যেন তাঁর শীর্ণ বুকের উপর কোনো গুরুভার বস্তু দিয়ে আঘাত করছে। সুতরাং, বলরাম ভাবলেন উত্তর তিনি পেয়েই গেছেন। নতুন করে এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন না করলেও চলবে। তবুও তিনি ভাবলেন, রামকৃষ্ণকে একবার দর্শন করে আসবেন। দেখাই যাক না তিনি কি বলেন!

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে পেঁছে রামকৃষ্ণের ঘরে ঢুকে বলরামের যুক্তিতর্ক সব বিপরীত হয়ে গেল। অবাক হয়ে তিনি দেখলেন যে, নিবিষ্ট মনে রামকৃষ্ণ শয্যাকীট বধ করছেন। বলরাম গিয়ে প্রণাম করতেই বিষয়ী মানুষের মতন রামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, 'বালিশের মধ্যে এরা শ'য়ে শ'য়ে জন্মাচ্ছে। রাতদিন এদের কামড়ে অস্থির হয়ে যাই। ঘুমুতে পারি না। তাই এদের মারছি।' সেই মুহূর্তেই বলরাম তাঁর সংশয়ের জবাব পেয়ে গেলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে আপন হিতের জন্যই রামকৃষ্ণ শয্যাকীট বধ করছেন। অকারণ প্রাণীহত্যা তাঁর নিছক অভ্যাস নয়। তেমনটি হলে বলরাম নিশ্চয়ই জানতে পারতেন, কারণ যখন-তখন তিনি এসেছেন এবং রামকৃষ্ণকে নানা অবস্থায় দর্শন করেছেন। বলরাম ভাবলেন, 'তবে কি শিক্ষাটুকু দেবার জন্যই আমার জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন?'

রামকৃষ্ণের সঙ্গে বলরামের প্রথম সাক্ষাতের কয়েক দিনের মধ্যেই খুড়তুতো ভাইয়েরা বলরামের নামে বাগবাজার অঞ্চলে একটি বসতবাটী কিনলেন। কলকাতায় বাড়ি কেনার পিছনে এক গূঢ় কারণ ছিল। বলরামের পিতৃদেব ও অন্যান্য ভাইরা চাইছিলেন না যে, বলরাম শ্রীক্ষেত্রে ফিরে যান। তাঁদের আশঙ্কা হচ্ছিল, পুণ্যতীর্থ জগন্নাথধামে বেশীদিন বাস করলে বলরাম হয়ত সংসার ত্যাগ করে একদিন সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। তাই সুকৌশলে বলরামকে কলকাতায় স্থিতু করতে তাঁরা উঠে পড়ে লেগেছিলেন। প্রথম প্রথম বলরাম ক্ষুণ্ণই হয়েছিলেন। পুরীধামে ফিরে যেতে মন ব্যাকুল হত। কিন্তু কলকাতায় কিছুদিন থাকতে থাকতেই রামকৃষ্ণের মধ্যে নতুন করে প্রেরণা পেয়ে তিনি খুশিই হলেন। যখন-তখন রামকৃষ্ণের দর্শন পাওয়াই শুধু নয়, দলবলসহ ঠাকুরকে অন্নসেবা করানোর সৌভাগ্যও তিনি অর্জন করলেন। পরবর্তী দিনগুলিতে রামকৃষ্ণ তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে যখনই কলকাতায় এসেছেন, বলরামের ভবনেই মধ্যাহ্ন ভোজ করেছেন। তাছাড়া যখন ঠাকুরসেবা হ'ত কিংবা সন্ধ্যায় ভক্তদের মজলিশ বসতো, তখনও এসেছেন। এমনি করে বলরামও ধীরে ধীরে মথুর, শম্ভুমল্লিক, সুরেন্দ্র মিত্তিরদের মতন রামকৃষ্ণের একজন রসদ্দার হয়ে তাঁর সেবাধিকার পান। রামকৃষ্ণ বলতেন, 'বলরামের শুদ্ধ অন্ন—পুরুষানুক্রমে ওর ঠাকুর সেবা, অতিথি সেবার পুণ্য অর্জন করেছে। ওর অন্ন আমি খুব খেতে পারি, মুখে দিলে আপনা হতেই নেমে যায়।'

স্নেহবশে রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে বলরামের কৃপণতা নিয়ে রঙ্গ করতেন। সাধু বলরামের চরিত্রে এটিই ছিল একমাত্র ত্রুটি। শ্রীম লিখেছেন, বলরামের বাড়িতে যন্ত্র ছাড়াই গান হ'ত। এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের উক্তি উদ্ধৃত ক'রে শ্রীম লিখেছেন, 'কি রকমটি জানো? যেন, কেপ্পন বামুনের গরু, খাবে কম দুধ দেবে বেশী। তোমরা যে যেমন পার গাও, খোল বাজাও—এই

হলো বলরামের বন্দোবস্ত !' ঠাকুর আরও বলতেন,'বলরাম একবার গাড়ি ক'রে দিয়েছিল। কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বর। বার আনা ভাড়া। আমি বললাম, "বারো আনায় যাবে ?" বলরাম বললে,"ও অমন হয়।" দক্ষিণেশ্বর যেতে সেই গাড়ি রাস্তায় একবার ভেঙে পড়ল। খানিক চলার পর ঘোড়া মাঝে মাঝে থেমেও গেল। কোনো মতে চলে না। গাড়োয়ান এক একবার খুব পেটায়, আর ঘোড়া তখন খুব দৌড়ায়! কিন্তু কয়েক পা গিয়েই আবার থেমে যায়।'

তা সত্ত্বেও বলরামের খুব প্রশংসা করতেন রামকৃষ্ণ। বলতেন,'আহা! কি স্বভাব বলরামের! কি ভক্তি!' আর শ্রীম লিখেছেন, 'ভক্তেরা যখন বারান্দায় ব'সে প্রসাদ পেতেন,বলরাম তখন দাসের মতন দাঁড়িয়ে থাকতেন ; দেখলে মনেই হ'ত না যে, তিনিই এ বাড়ির কর্তা।'

১৮৮৩-র শেষের দিক। কেশব সেন গুরুতর রকমের পীড়িত। তাঁর সেরে ওঠা সম্বন্ধে সবাই একরকম হতাশ। রামকৃষ্ণ সেদিনই কেশব সেনকে দেখতে গেলেন। দিনটি ২৮শে নভেম্বর। কেশবকে সেই তাঁর শেষবারের মতন দেখতে যাওয়া।

শ্রীম সমস্ত ঘটনাটির যে বিবরণ দিয়েছেন তা এইরকম। 'কমলকুটীরে' ঠাকুরের গাড়ি এসে উপস্থিত হলো—সঙ্গে রাখাল, লাটু ও আর দু'একটি ভক্ত। কেশবের বাড়ির লোকেরা ঠাকুরকে ওপরে নিয়ে গেলেন। বৈঠকখানার দক্ষিণের বারান্দায় একখানি তক্তপোশ পাতা ছিল। সবাই সেখানে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কেশবের সঙ্কটাপন্ন পীড়ার কথা ঠাকুর শুনেছেন। তিনি তাই ভিতরে গিয়ে কেশবকে দেখতে চাইছিলেন। কেশবের আসা মানেই তো অকারণ পরিশ্রম করা! কিন্তু কেশবের ভক্তেরা কিছুতেই তাঁকে ঘরে নিয়ে যেতে চাইছিলেন না। তাঁরা ভেবেছিলেন কেশব নিজেই এসে এমন মান্য অতিথির অভ্যর্থনা করবেন। এই সময় কেশবের একজন ভক্ত রামকৃষ্ণকে বললেন, 'তিনি এখন একেবারে অন্য মানুষ। আপনার মতন মা-র সঙ্গে কথা ক'ন।' কেশব মা-র সঙ্গে কথা ক'ন, হাসেন—কাঁদেন—এ কথা শুনেই রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হচ্ছিলেন। তারপর দেখতে দেখতেই সমাধিস্থ।

অপেক্ষা আর অপেক্ষা—রামকৃষ্ণকে নিয়ে সবাই অপেক্ষা করে চলেছেন। বাইরে বেশ ঘন আঁধার ঘনিয়ে এলো। বৈঠকখানা ঘরে আলো জেলে দেওয়া হলো। সবাই মিলে ধরাধরি করে রামকৃষ্ণকে বারান্দা থেকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন। একটু একটু করে তখন তাঁর বাহ্য চেতনা ফিরে আসছে। ঘরে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর আসবাব। রামকৃষ্ণ যেন নিজেকে শোনাতেই বললেন, 'আগে এ-সবের দরকার ছিল। এখন আর কি দরকার!' হঠাৎ রাখালকে চিনতে পারলেন ; অবাক হয়ে বললেন, 'ও তুমি এখানে!' তারপর কৌচের ওপর বসেই আবার বাহ্যজ্ঞানশূন্য, ভাবাবিষ্ট। জগন্মাতার দর্শন পেয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন ; মনে হচ্ছে যেন রাখালের সঙ্গে কথা বলছেন। 'এই যে মা এসেছ! আবার জমকাল বেনারসী শাড়ি প'রে কি ভাব দেখাও! বসো গো বসো!' তারপর ভাবাবস্থায় বলতে লাগলেন, 'দেহ আর আত্মা। দেহ হয়েছে আবার যাবে। আত্মার মৃত্যু নাই। যেমন সুপুরি —পাকা সুপুরি ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে। কাঁচা অবস্থায় ফল থেকে ছাল আলাদা করা বড় শক্ত। তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে দেহবুদ্ধি যায়। তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোধহয়।'

এই সময় ধীরে ধীরে কেশব ঘরে ঢুকলেন। সত্যি একেবারে অন্য মানুষ। যেন অস্থি-চর্মসার মূর্তি। কেশব দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। দেয়াল ধরে ধরে এগোচ্ছেন। রামকৃষ্ণ তখন কৌচ ছেড়ে মাটিতে নেমে বসেছেন। অনেক কষ্টে কেশব ঠাকুরের পায়ের কাছটিতে বসলেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন, তারপর ঠাকুরের একখানি হাত ধরে বললেন, 'আমি এসেছি, আমি এসেছি।'

খানিক পরে রামকৃষ্ণ একটু যেন প্রকৃতিস্থ হলেন। ধীরে ধীরে বাহ্যচেতনা ফিরে এলো। কেশবের সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। শ্রীম বলছেন, রামকৃষ্ণ তখন কেবল ঈশ্বরের কথা বলছিলেন। কেশবের শরীর স্বাস্থ্যের কথা একবারও তুললেন না। অবশেষে একসময় বললেন, 'তোমার কেন অসুখ হয়েছে, জানো? তোমার শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক আধ্যাত্মিক ভাব চলে গেছে, তাই এমনটি হয়েছে।……আমি দেখেছি, বড় জাহাজ যখন গঙ্গা দিয়ে চলে গেল তখনই কিছু টের পাওয়া গেল না। ওমা! খানিক পরে দেখি কিনারার কাছে জল ধপাস ধপাস করছে আর তোলপাড় করে দিচ্ছে।'

রামকৃষ্ণ তারপর ঈশ্বরজ্ঞানকে আগুন লাগার সঙ্গে তুলনা করলেন। বললেন, 'জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কাম, ক্রোধ—এইসব রিপু নাশ করে। সবশেষে দেহ তোলপাড় করে দেয়।' খানিক পরে রূপালঙ্কার বদলে দিয়ে তিনি জ্ঞানার্জনকে হাসপাতালের চিকিৎসার সঙ্গে তুলনা করলেন। বললেন, কেশবের এই দৈহিক ব্যাধি হলো একরকমের আধ্যাত্মিক রূপান্তর। 'কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকী থাকে ততক্ষণ তোমারও মুক্তি হবে না। যদি তুমি হাসপাতালে নাম লেখাও, আর চলে আসার জো নেই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে, ততক্ষণ ডাক্তারবাবু তোমায় চলে আসতে দেবে না। তুমি নাম লেখালে কেন?' কেশবের কাছে সব ব্যাপারটিই কৌতুককর মনে হচ্ছিল। তিনি বারবার হাসতে লাগলেন।

পরে কেশবের সঙ্গে বসরাই গোলাপের তুলনা করলেন রামকৃষ্ণ। শিশির পাবে ব'লে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড়সুদ্ধ তুলে নেয়। এই তুলনা করে কেশবের দিকে চেয়ে বললেন, 'তাই তোমায় শিকড়সুদ্ধ তুলে দিচ্ছে, যাতে ফিরে ফিরতি একটা বড় কাণ্ড করতে পার।'

কেশবকে বললেন যে তাঁর অসুখের খবর শুনে আগেরবার তিনি যত ব্যাকুল হয়েছিলেন এবার তত ব্যাকুল হন নি। শুধু দু'তিনদিন একটু উতলা হয়েছিলেন, কিন্তু আগেরবারের মতন নয়। সবাই সে কথা শুনে আশ্বস্ত হলেন। এই সময় কেশবের জননী এসে দাঁড়ালেন। রামকৃষ্ণকে বললেন কেশবকে আশীর্বাদ করতে। রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমার কি সাধ্য! তিনিই আশীর্বাদ করবেন।' আর বললেন, 'তিনি (ঈশ্বর) দু'বার হাসেন। একবার হাসেন যখন দু'ভাই দড়ি মেপে জমি বখরা করে আর বলে, "এ দিকটা আমার, ও দিকটা তোমার!" তিনি এই ভেবে হাসেন, "জগৎ আমার; আর তার খানিকটা জমি নিয়ে এ বলছে আমার ও বলছে আমার!" তিনি আর একবার হাসেন। ছেলের সংকটাপন্ন পীড়া। মা কাঁদছেন, বৈদ্য এসে বললো, "ভয় কি মা, আমি ভালো করবো।" বৈদ্য জানে না ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে।'

সবাই স্তব্ধ। নিষ্ঠুর হলেও এ তো অনিবার্য সত্য! কেশবের তখন হঠাৎ একটা কাশির ধমক এলো। অনেকক্ষণ ধরে তিনি কাশতে লাগলেন। সে কাশি আর থামে না। কাশির ধমক

দেখে সবার কষ্ট হচ্ছে। অসহায় হয়ে পড়েছেন কেশব। কথা বলতে পারছেন না। অনেক-ক্ষণ পর কাশি একটু কমলো। কিন্তু কথা বলতে পারছেন না। সেই অবস্থায় রামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হয়ে আর একবার প্রণাম করলেন ! তারপর অনেক কষ্টে দেয়াল ধরেধরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

১৮৮৪-র জানুয়ারী—কেশব শরীর ত্যাগ করলেন। রামকৃষ্ণ যখন শুনলেন তখন স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কারো সঙ্গে কথা বলেন নি ; তিনদিন ধরে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। পরে বলে-ছিলেন, 'কেশবের মৃত্যুর খবর শুনে আমার মনে হয়েছিল যেন একটা অঙ্গ অবশ হয়ে গেছে।' আরও বলেছিলেন, 'ওর সঙ্গসুখে কত আনন্দ পেয়েছি ! কত গেয়েছি, কত নেচেছি !'

সারা জীবনে কেশবের কথা তিনি বারবারই বলেছেন। কখনও খুঁটিনাটির বিচার করেছেন, কখনও তাঁকে সহাস্যে মেনে নিয়েছেন ; কিন্তু কখনও অবজ্ঞা করেন নি।

কেশবের শরীর ত্যাগের কয়েক দিনের মধ্যেই ঝাউবাগানে বেড়াতে বেড়াতে রামকৃষ্ণ ভাবা-বিষ্ট হয়ে পড়লেন। সেদিন সঙ্গে কেউ ছিল না, তাই ভাবাবিষ্ট অবস্থায় পড়ে গিয়ে তাঁর বাম হাতের হাড় সরে যায়। এর ক'দিন পরে ২রা ফেব্রুয়ারী শ্রীম তাঁকে দর্শন করতে গিয়ে-ছিলেন। গিয়ে দেখলেন বালকের মতন জগন্মাতাকে কেঁদে কেঁদে বলছেন, 'আমায় এমন কেন কর্‌লি ? আমার হাতে বড় লাগ্‌ছে।' তারপর রাখাল প্রভৃতি ভক্তদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ভালো হবে তো ?' ভক্তেরা ছোট ছেলেকে যেমন বোঝায় তেমনি বুঝিয়ে দিলেন ঠাকুরকে।……কিন্তু একটু পরেই ঠাকুর একেবারে অন্য মানুষ। যেমন বেশী অসুখ হলেও বালক এক একবার হেসে খেলে বেড়ায়, তেমনি। ভক্তদের তিনি তখন বোঝাচ্ছিলেন কি করে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়, বলছিলেন, 'ব্যাকুল হও' ! যেন তাঁর কিছুই হয় নি। সত্যি কি তিনি ব্যথা পাচ্ছিলেন ? কেউ জানে না সেকথা। এমনকি ডাক্তার যখন হাতের ভাঙা জায়গাটি প্যাড, ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে দিচ্ছেন, ঠাকুর তখনও হাসছেন, রঙ্গ করছেন।

রামকৃষ্ণের আর একজন অসাধারণ ভক্ত হলেন নাগমশাই। রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে নাগমশাই কলকাতার একজন প্রথম সারির হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ছিলেন। যশ প্রতিপত্তির মতন অর্থাগমও তাঁর জীবনে সহজ হতে পারতো, যদি চিকিৎসকের আচরণীয় বিধিনিয়ম-গুলি তিনি অত কঠোরভাবে মেনে না চলতেন। তাঁর চিকিৎসাধীন গরিব রোগীদের কাছ থেকে তিনি কোনো পারিশ্রমিকই নিতেন না। বরং নানাভাবে তাদের সাহায্য করতেন। পারিশ্রমিক নিতেন শুধু ধনী রোগীদের কাছ থেকে। তবে চাইতেন না ; যে যেমন দিত তাই নিতেন।

কিন্তু মানুষের সেবার মধ্যেই তিনি খুশি থাকতে পারেন নি। তাঁর কামনা ছিল ঈশ্বর লাভ ; তাই সময় পেলেই তিনি ঈশ্বরীয় আলোচনায় অংশ নিতেন। একদিন এক ব্রাহ্মবন্ধু তাঁর কাছে দক্ষিণেশ্বরের এক সাধুর কথা বললেন। তখন দু'জনে যুক্তি করে তাঁরা সেই সাধুকে (রামকৃষ্ণ) দর্শন করতে গেলেন।

দর্শন করতেই নাগমশাই সুনিশ্চিত হলেন যে রামকৃষ্ণ শুধু সাধক নন, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। অন্য একদিনের কথা ; ঘরে সেদিন আর কেউ ছিলেন না। নাগমশাইকে দেখে রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি তো ডাক্তার—আমার পা দু'খানা পরীক্ষা করে দেখ তো কি হয়েছে ?' নাগমশাই মন দিয়ে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু কোনো ব্যাধির লক্ষণ দেখলেন না। রামকৃষ্ণ আবার পরীক্ষা করতে বললেন ; বললেন, 'মন দিয়ে দেখ।' নাগমশাইয়ের তখন হঠাৎ উপলব্ধি হলো যে, রামকৃষ্ণ এইভাবে তাঁর পুণ্য পা দু'খানি তাঁকে স্পর্শ করবার অধিকার দিলেন। নাগমশাই পরবর্তীকালে বলতেন, 'রামকৃষ্ণের কাছে কিছু চাইতে হ'ত না। ভক্তদের মনের ইচ্ছা জেনে তিনি তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতেন।'

রামকৃষ্ণ যা বলতেন, এমনকি তাঁর পরিহাসের কথাও, সত্য বলে মনে করতেন নাগমশাই। একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে নাগমশাই দেখলেন যে, রামকৃষ্ণ ভক্তদের উপদেশ দিচ্ছেন। কথায় কথায় তিনি বললেন, 'ডাক্তার, মোক্তার আর দালালদের ঈশ্বরজ্ঞান হয় না।······যে মন ওষুধের দানার মধ্যে নিবিষ্ট থাকে সে মন অসীমকে কল্পনা করবে কেমন করে ?' সেই রাত্রেই ডাক্তারি শাস্ত্রের যাবতীয় গ্রন্থ আর ওষুধসমেত বাক্সটি গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন তিনি এবং জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অধ্যাত্ম সাধনাতেই কাটাবেন স্থির করলেন। পরদিনই রামকৃষ্ণের কাছে ছুটে গেলেন। সন্ন্যাসী হতে চাইলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ তাঁকে সংসারে থেকেই সাধনা করতে উপদেশ দেন। বলেন, 'তোমার সাধনা যেন সংসারী লোকদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়।'

সেই থেকে সস্ত্রীক নাগমশাই নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মানুশীলন করে গেছেন। রামকৃষ্ণ তাঁদের সংসারে থেকে সাধুসঙ্গ করতে বলেছিলেন। নাগমশাই প্রশ্ন করেন, 'কেমন করে চিনতে পারবো কে সাধু ?' উত্তরে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'তারা নিজেরাই তোমার কাছে আসবে।'

রামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর সস্ত্রীক নাগমশাই ঢাকা শহরের অনতিদূরে দেওভোগ গ্রামে তাঁদের দেশের বাড়িতে ফিরে যান। এখানে আসাব পর তাঁরা রামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্‌বাণী বর্ণে বর্ণে ফলে যেতে দেখলেন, কারণ ফকির সাধু যাঁরাই অতিথি হয়ে আসতেন তাঁদের সেবা করেই তাঁরা ভগবান সেবার আনন্দ পেতেন। অতিথিদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে কোনোরকম আত্মত্যাগই তাঁদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিত না। তখন নাগমশাইয়ের নিদারুণ অর্থকষ্ট চলছে। যৎসামান্য আহার ক'রে তিনি তখন জীবনধারণ করছিলেন। অম্লশূলের বেদনায় মাঝে মাঝে কাতর হয়ে পড়তেন। তবুও তিনি কারও সেবা নিতেন না এবং অতিথি সৎকারের ব্যাপারে কোনোরকম কৃপণতা করতেন না। একবারের কথা বলি। ঘরে অতিথি এসেছেন অথচ এমন জ্বালানি নেই যে রান্না চড়ান। তখন বাধ্য হয়ে ঠেক্‌নো দেওয়া কাঠের একটি খুঁটি কেটে জ্বালানি করলেন। কখনো কখনো তাঁর বিনীত আপ্যায়ন অতিথিদের পক্ষে ভীতিপ্রদ হয়ে উঠতো। একবার দু'জন যুবক সন্ন্যাসী নাগমশাইয়ের অতিথি সেবার বহর দেখে যত শীঘ্র পারেন পালিয়ে রেহাই পান। নাগমশাই জোর করে তাঁদের সঙ্গে স্টেশনে এলেন। ট্রেনে সেদিন মেলা যাত্রী। কোনো কামরাতেই সন্ন্যাসীরা একটু স্থান করে নিতে পারছিলেন না। যাত্রীরাও প্রথমে তেমন উৎসাহ দেখায় নি। কিন্তু যাত্রীদের স্বার্থপরতা দেখে নাগমশাই সেদিন আক্ষেপে কপাল চাপড়াতে লাগলেন। তাই দেখে লজ্জিত যাত্রীরা সন্ন্যাসী দু'জনের জায়গা করে দেন। আর একবারের কথা। নাগমশাইয়ের স্ত্রী ঘর মেরা-

মতির জন্য একজন ছুতোর মিস্ত্রী ডাকিয়ে আনান। নাগমশাই অতিথিজ্ঞানে তাঁকে ঘরে বসিয়ে, পাখার বাতাস করে সেবা করেন।। নাগমশাই যখন নৌকা যোগে কোথাও যেতেন তখন নিজেই দাঁড় বাইতেন। সেইজন্যে তিনি যে নৌকায় উঠতেন সে নৌকায় অন্য যাত্রী উঠতে চাইতো না।

রামকৃষ্ণের মতন নাগমশাইও সবরকম সংস্কার থেকে মুক্ত ছিলেন। হিন্দু মুসলমান বা খ্রীস্টানের মধ্যে তিনি কোনো মৌল তফাৎ দেখতে পেতেন না। মসজিদে ঢুকে তিনি যেমন আল্লাকে স্মরণ করতেন তেমনি গির্জায় গিয়ে যীশুরও উপাসনা করতেন। রামকৃষ্ণের তিরোধানের পর তিনি অনেকবারই দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, কিন্তু ঠাকুরের ঘরটিতে একবারই মাত্র ঢুকেছিলেন। সেদিন ঘরে ঢুকে নাগমশাই এত মানসিক কষ্ট পেয়েছিলেন যে বলার নয়। সেই থেকে যখনই দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন দূর থেকে ঠাকুরের ঘরটির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে ফিরে গেছেন। দক্ষিণেশ্বরে এলে তিনি শ্রী শ্রীমা এবং আলমবাজারের মঠটি দর্শন করতে যেতেন। কিন্তু মঠে কখনও রাত্রিবাস করেন নি, কারণ রামকৃষ্ণ তাঁকে সংসারে থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এইভাবে ঠাকুরের দেওয়া প্রতিটি নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নাগমশাই দেহরক্ষা করেন। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই সারা বাংলার মানুষ তাঁকে পরম ভক্তরূপে মান্য করতো।

গিরিশ চন্দ্র ঘোষের জন্ম হয় কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে, ১৮৪৪ সালে। ছেলেবেলা থেকেই গিরিশ পিতৃমাতৃহীন। বিয়ে হয় অল্পবয়সেই, কিন্তু বিবাহ গিরিশের চরিত্র নিয়ন্ত্রিত করতে পারে নি। গিরিশের মধ্যে প্রবল ও স্বাধীন দুই বিপরীত শক্তির সংঘর্ষ প্রায়ই হতো : ফলে একদিকে যেমন সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার বিকাশে গিরিশ নাটক লিখেছেন, গীত রচনা করেছেন, অভিনয় করেছেন, অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য ভাবনার প্রশ্রয়-পুষ্ট তাঁর সংশয়বাদ ও স্বেচ্ছাচার দুর্বার হয়ে উঠেছে। জীবন শুরু করেছিলেন ক্লান্তিকর কেরাণীর চাকরি দিয়ে। তখন সময় পেলেই হয় লিখেছেন, অভিনয় করেছেন, নয়ত নষ্টবুদ্ধি আচরণ করেছেন, নানারকম ব্যাভিচারে লিপ্ত থেকেছেন। যখন ব্যাভিচার করতেন তখন দুর্দমনীয় হ'ত তাঁর প্রকৃতি—বিবেকতাড়িত হয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হতেন, তারপরই আবার ঝাঁপিয়ে পড়তেন প্রবৃত্তির মধ্যে। আসলে গিরিশের স্বভাবটি ছিল ছন্নছাড়া, স্বাধীন। সেই সময়কার (ঊনবিংশ শতক) ইওরোপীয় শহরগুলিতে নাট্যকার অভিনেতাদের মধ্যে যে বিশেষ টাইপটি দেখা যেত, গিরিশ ছিলেন অনেকটা তেমনি। তবে ইউরোপের শহুরে সমাজে এই স্বেচ্ছাচার মানিয়ে গেলেও, কলকাতার হিন্দু সমাজে তাঁর এমন চালচলন ভ্রষ্টাচার ব'লে নিন্দিত হয়েছে। কারণ, পাশ্চাত্য যুগধর্মের প্রভাব যত উগ্রই হোক না কেন, কলকাতার বৃহত্তর সমাজমানসে তার ছাপ তেমন পড়ে নি। সে সমাজ তখনও, আচরণ-অভ্যাসে না হলেও, মানসিকতার দিক থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে হিন্দু রক্ষণশীলতা মেনে চলতো।

গিরিশের মধ্যে প্রতিভা ও স্বেচ্ছাচার পাশাপাশি থেকে ধীরে ধীরে এক মানানসই সহাবস্থান গড়ে নিয়েছিল। তাই একদিকে যেমন প্রবৃত্তির টানে তিনি নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি প্রতিভা তাঁকে দিয়ে জোর করে লিখিয়েছে, অভিনয় করিয়েছে। যখন

তাঁর বয়স মাত্র তিরিশ, তখনই বাংলার আধুনিক নাট্যধারার পথিকৃতের সম্মান তিনি পেয়েছেন। কয়েক শতাব্দী ধরেই বাংলা নাটকের যে অবক্ষয় চলছিল, গিরিশ এসে সে অবসন্নতা কাটিয়ে দিলেন। প্রচুর নাটক তিনি লিখেছেন—ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক, পারিবারিক—লিখেছেন শেক্সপীয়রের কাঠামো অনুসরণ করে কাব্যনাটক। একদিকে নাটক লিখেছেন—অন্যদিকে অভিনয় শিক্ষা দিয়েছেন ও নিজে অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনয়-প্রতিভা এমন বহুমুখী ছিল যে অনেক সময় একই নাটকে তিনি একাধিক চরিত্রেব রূপদান করেছেন। ১৮৮৩ সালে প্রধানত গিরিশেরই অর্থসহায়ে এবং প্রত্যক্ষ উদ্যোগে স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার আধুনিক নাট্যধারার সূচনা করলো এই স্টার থিয়েটার।

ইত্যবসরে গিরিশের চরিত্রে অন্য দুই বিপরীত শক্তির সংঘর্ষও চলছিল। একদিকে ঈশ্বর-মুখী ভক্তিবাদ, অন্যদিকে সংশয়বাদিতা ও জিজ্ঞাসা। এই সংঘর্ষ অনেকদিন ধরেই চলছিল কিন্তু মীমাংসা খুঁজে পাচ্ছিল না। তাঁর তখনকার সেই আস্থাহীন মানসিকতার কথা পরবর্তীকালের একটি ছোট্ট নিবন্ধে গিরিশ বুঝিয়ে দিয়েছেন। যে সময়কার কথা তিনি বলেছেন, তখনও রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি :

সেই সঙ্কটকালে আমি ভাবতাম, 'ভগবান কি আছেন ? তিনি কি মানুষের কাতর ডাকে সাড়া দেন ? তিনি কি মানুষকে আঁধার থেকে আলোর পথ দেখান ?' আমার মন বলতো, 'হ্যাঁ, তিনি আছেন।' তখনই চোখ বন্ধ করে ভগবানকে ডাকতাম, 'ভগবান, যদি তুমি থাক তাহলে আমায় পার করে নিয়ে যাও। আমায় ঠাঁই দাও। আমার যে কেউ নেই !'

······ভগবানকে ডাকতাম আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে সংশয়ও হ'ত। মনে মনে নিজের সঙ্গে তর্ক করতুম, বলতুম, 'ভগবান নেই।' আবার সংশয় হ'ত। কিন্তু সাহস ক'রে লোককে বলতে পারতুম না যে, 'ভগবান নেই।'

তখন যাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি তারা সবাই একবাক্যে বলেছে যে, গুরুর উপদেশ ছাড়া আমার গতি নেই, আধ্যাত্মিক জীবনের কোনো ফলই আমি পাব না। কিন্তু সবাই বললেও আমার যুক্তিবাদী মন আমায় বাধা দিত। মানুষকে গুরুর পদে বসানো আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছিল না।

ঠিক কবে নাগাদ গিরিশ-রামকৃষ্ণের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল তা জানা যায় না। তবে সে যাই হোক, প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতাটি গিরিশের পক্ষে আদৌ মনোরম হয় নি। খবরের কাগজ পড়ে গিরিশ জানতে পারেন যে দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস এসেছেন। কেশব সেন দলবল নিয়ে প্রায়ই নাকি তাঁকে দর্শন করতে যান। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মান্দোলনের ব্যাপারটি গিরিশ চিরকালই সন্দেহের চোখে দেখতেন। সুতরাং তাদের প্রচার করা পরমহংস যে জাল গিরিশ তা নিশ্চিতই জানতেন। তাহলেও গিরিশ যখন শুনলেন যে, প্রতিবেশী এক এ্যাটর্নির বাড়িতে রামকৃষ্ণ পরমহংস আসছেন, তখন তাঁকে নিজের চোখে দেখতে গেলেন। তখন সন্ধ্যা সবে উতরেছে। চাকরেরা বসবার ঘরে সেজবাতি জেলে দিয়ে গেল। রামকৃষ্ণ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি সন্ধ্যে ?' একবার নয়, বারবারই এই কথাটি তিনি জিজ্ঞেস করে যেতে লাগলেন। এর পূর্বে গিরিশ কোনো মানুষের সমাধিভাব দেখেন নি। তেমন অবস্থায় রামকৃষ্ণের যে বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়, সে কথাও গিরিশ জানতেন না। তিনি

শ্ধু দেখলেন, একজন অদ্ভুত চেহারার মানুষ আলোর সামনে বসেও ক্রমাগত ‘এখন কি সন্ধ্যে ?’ ব’লে সবাইকে বিরক্ত করে চলেছে। সব দেখে শুনে মানুষটি সম্বন্ধে স্বাভাবিক ভাবেই গিরিশ সন্দিগ্ধ হলেন—কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধাও হলো। মনে ভাবলেন, এ আবার কি ধরনের ন্যাকামি ! তারপরই সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন।

১৮৮৪—সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিক। অর্থাৎ সেই ঘটনার পর বছরখানেক কেটে গেছে। গিরিশ আবার রামকৃষ্ণকে দেখলেন—এবার বলরাম বসুর বাড়িতে। তাঁর এবারের অভিজ্ঞতা ততখানি অপ্রীতিকর হলো না। গিয়ে যা দেখলেন তা তাঁর ধারণার বিপরীত। তিনি আশা করেছিলেন অন্যান্য সাধুবাবাজীদের মতন রামকৃষ্ণও উচ্চাসনে ব’সে, সামান্য তফাতে বসে থাকা শিষ্যদের দিকে তূষ্ণীম্ভাব নিয়ে চেয়ে থাকবেন। কিন্তু রামকৃষ্ণকে একেবারেই তেমনটি দেখলেন না। অতিথি অভ্যাগত যারা আসছেন, আভূমি মাথা নুইয়ে তাদের তিনি আপ্যায়ন করছেন। তাঁর পাশে বসে বিধু নর্তকী ভক্তিগীতি শোনাচ্ছে। গিরিশের এক পুরনো ইয়ার, এইসময় তাঁর কাছে এসে কানে কানে বিদ্রূপ করে বললো, রামকৃষ্ণ আর বিধু যেমন হেসে হেসে কথা বলছে আর ঢলাঢলি করছে, তাতে মনে হয় ওদের মধ্যে পীরিত আছে। বন্ধুর বিদ্রূপ শুনে গিরিশ সেদিন আহত হয়েছিলেন ; এমনটি যে হতে পারে তা তিনি বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না। আবার এই লোকটিকেই পরমহংস ব’লে মানতেও মন চাইছিল না। তাই গিরিশের আর এক অবিশ্বাসী বন্ধু যেমন বললো, ‘চল্ চল্ ; ওসব ঢঙ ঢের দেখেছি,’ তখনই বন্ধুর সঙ্গে তিনি বেরিয়ে এলেন। সেদিন গিরিশ আরও খানিকক্ষণ থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিজের মনের কাছেও সে ইচ্ছাটি লজ্জায় প্রকাশ করতে পারেন নি।

এর কয়েকদিন পরের কথা। ওই সেপ্টেম্বর মাসেরই ঘটনা। একুশে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪।

সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে রামকৃষ্ণ স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখতে এসেছেন। রঙ্গমঞ্চের বাইরে ঘেরা জায়গাটিতে গিরিশ তখন পায়চারি করছিলেন। একজন ভক্ত এসে খবর দিল রামকৃষ্ণ এসেছেন। বললো, ‘ঠাকুর আপনার থিয়েটার দেখতে এসেছেন। আপনি পাশ দিলে ভালো হয় ; নয়তো উনি টিকিট কিনে দেখবেন।’ গিরিশ তখুনি ব্যবস্থা করলেন, রামকৃষ্ণের জন্যে পাশ আর অন্যদের জন্যে টিকিট। তারপর নিজে তাঁকে আপ্যায়ন ক’রে আনতে গেলেন। কিন্তু নত হয়ে রামকৃষ্ণকে অভিবাদন করার আগেই, রামকৃষ্ণ গিরিশকে অভিবাদন করলেন। এদিকে গিরিশ যত অভিবাদন করেন, রামকৃষ্ণও তাঁকে প্রত্যভিবাদন করেন। গিরিশের ভয় হলো এ বুঝি আর শেষ হবে না। তখন মনে মনে রামকৃষ্ণকে প্রণাম করে, তাঁকে নিয়ে রঙ্গালয়ের দোতলায় একটি বক্সে বসিয়ে দিলেন। সেদিন গিরিশের শরীর বিশেষ ভালো ছিল না। তাই রামকৃষ্ণকে বসিয়েই তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। অভিনয় দেখতে দেখতে সেদিন রামকৃষ্ণের অনেকবার উদ্দীপন হয়েছিল। কখনও প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেছেন, কখনও সমাধিস্থ হয়েছেন, আবার কত কি ভাবের কথা বলেছেন। গিরিশের সে সব শোনা হয় নি, দেখাও হয় নি। পরে একজন ভক্ত তাঁকে অভিনয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ‘আসল-নকল এক দেখলাম।’

দিন তিনেক পরের কথা। এক বন্ধুর বাড়ির বারান্দায় বসে আছেন গিরিশ। পথ দিয়ে রামকৃষ্ণ যাচ্ছেন। দু’জনের চোখে চোখে কি যেন কথা হলো। গিরিশের সাধ হচ্ছিল তখনই

ছুটে যান। কিন্তু পারলেন না। খানিক পরে একজন ভক্ত ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। গিরিশকে ঠাকুর ডেকেছেন। গিরিশের সব সঙ্কোচ কেটে গেল। বলরাম মন্দিরে তখনই এসে হাজির। রামকৃষ্ণের তখন অর্ধবাহ্যদশা চলছে। গিরিশ পৌঁছানো মাত্রই রামকৃষ্ণ যেন পূর্বের সংশয়কে ধরে নাড়া দিলেন! অনুচস্বরে বললেন, 'না রে এ ঢঙ্ নয়!' তখনই রামকৃষ্ণের চেতনা ফিরে এলো। গিরিশের অনেকদিনের সাধ একজন ভালো গুরুর সন্ধান পান, যদিও আমরা জানি যে মানুষকে গুরুর পদে বসাতে তাঁর আপত্তি হ'ত। মানুষ গুরু হলে দু'জন মানুষের সম্পর্কটা কি দাঁড়ায় তা তো তিনি জানেন! তবুও, রামকৃষ্ণের বাহ্য-দশা ফিরে আসতেই গিরিশ জিজ্ঞেস করলেন, 'গুরু কি?' রামকৃষ্ণ বললেন, 'গুরু যেন সখী। যতদিন না প্রেমাস্পদের (শ্রীকৃষ্ণ) সঙ্গে প্রেমিকার (শ্রীরাধা) মিলন হয়, ততদিন সখীর কাজের বিরাম নেই। তেমনি যতদিন না ইষ্টের সঙ্গে সাধকের মিলন হয় ততদিন গুরুরও কাজের শেষ নেই।' তারপর বললেন, 'তবে তোমার অত কিসের ভাবনা? তোমার গুরু ঠিক হয়েই আছে।'

কথায় কথায় থিয়েটারের প্রসঙ্গ এসে পড়ল। রামকৃষ্ণ বললেন, 'বাঃ! তুমি বেশ লিখেছ! জ্ঞানসূর্য তোমার ওপর আলো ফেলতে শুরু করেছে। অচিরেই তোমার মনের অন্ধকার ভাবগুলো পুড়ে তুমি শুদ্ধ হয়ে যাবে। তখন শুদ্ধভক্তিতে তোমার জীবন আনন্দে মধুর হয়ে উঠবে।' গিরিশের রাগ হচ্ছিল। এতসব প্রসংশার তিনি কি যোগ্য? রামকৃষ্ণকে সরাসরি বললেন, 'আমি টাকার জন্যে লিখি। যা লিখি তার ধারণাই হয় নি।' রামকৃষ্ণ চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'আমায় আর একখানা বই দেখাবে?' গিরিশ তখনই রাজী। জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে যাবেন, বলুন?' রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমি কিন্তু দাম দেব।' 'বেশ তো! দেবেন আট আনা। সব থেকে খারাপ সীট। 'খুব গোলমাল হয়। কিন্তু আপনাকে সেখানে বসতে হবে না। আপনি বক্সে বসবেন।' 'তবে একটাকা নাও।' 'বেশ, তাই হোক।' খানিকক্ষণ এমনি হাল্কা কথাবার্তার পর গিরিশ সেদিন চলে আসেন। যে বন্ধুটি সঙ্গে ছিল সে গিরিশকে জিজ্ঞেস করলো, 'রামকৃষ্ণকে কি মনে হয় তোমার?' বন্ধুর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে গিরিশ যেন অন্যমনস্ক। একসময় ছোট্ট করে জবাব দিলেন, 'ভারি ভক্ত।' গিরিশের মন তখন আনন্দে ভরপুর। সব সংশয়, সব বাধা কেটে গেছে। আবার কি! থেকে থেকে মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠছে সেই আশ্বাস বাণীটি। 'তোমার গুরু ঠিক হয়ে গেছে—তোমার গুরু ঠিক হয়ে গেছে!'

কিন্তু গিরিশের স্বভাবটি ছিল জটিল। যেমন সঙ্কোচ তেমনি রোখ, যেমন বিনয় তেমনি ঔদ্ধত্য। এক মনে রামকৃষ্ণকে গুরু ব'লে ভক্তি করছেন, অন্য মনে জিদ ক'রে সেই ভাবটিকে যেন দু'হাতে সরিয়ে দিতে চাইছেন। একদিনের ঘটনা। ১৪ই ডিসেম্বর। শীতের রাত। সাজঘরে বিশ্রাম করছিলেন গিরিশ। একজন ভক্ত এসে জানাল যে একখানা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে রামকৃষ্ণ এসেছেন। গিরিশ উদ্ধত স্বরে বললেন, 'এসেছেন ঠিক আছে। ওপরে নিয়ে গিয়ে বক্সে বসিয়ে দাও।' 'তাঁকে আনতে আপনি নিজে যাবেন না?' গিরিশ বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন, 'আমাকে তাঁর কি দরকার?' কিন্তু তবুও ভক্তটির সঙ্গে পায়ে পায়ে নাট্যা-লয়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সহাস্য মুখে রামকৃষ্ণ তখন সেখানে দাঁড়িয়ে। তাঁকে দেখেই গিরিশের মনের সেই রূঢ় ভাবটি যেন কোথায় চলে গেল। অনুতপ্ত গিরিশ তাঁর পায়ে হাত

দিয়ে প্রণাম করলেন, তারপর সঙ্গে করে দোতলায় এনে রামকৃষ্ণের হাতে একটি ফুল দিলেন। রামকৃষ্ণ ফুলটি হাতে করে নিলেন বটে, আবার তখনই গিরিশকে সেটি ফেরত দিয়ে বললেন, 'ফুলের আমার কি দরকার ? ফুলের দরকার ভগবানের আর ফুলবাবুর।'

সেদিন 'ভক্ত প্রহ্লাদ চরিত্র' পালা। বালক প্রহ্লাদ বিষ্ণুর ভক্ত। বিষ্ণুই তার আরাধ্য। তার রাক্ষস বাপ হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুকে ঘৃণা করে। তাই বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের উপর তার অত্যাচারের যেন সীমা নেই। পালা দেখতে দেখতে কতবার সমাধিস্থ হচ্ছেন রামকৃষ্ণ। অভিনয় শেষ হলে গিরিশের খুব প্রশংসা করলেন। গিরিশ সবিনয়ে বললেন, ধারণা নেই, শুধুই লিখেছেন। রামকৃষ্ণ কিন্তু গিরিশের কথা মানতে পারলেন না। বললেন, 'না, না, তোমার বেশ ধারণা। ভেতরে ভক্তি না থাকলে অমন সুন্দর চালচিত্র আঁকা যায় না। কথাপ্রসঙ্গে গিরিশ বললেন, 'ভাবছি, আর থিয়েটার করা কেন!' রামকৃষ্ণ জবাবে বললেন, 'না না, ও থাক—ওতে লোকশিক্ষা হয়।'

এক বেশ্যাবাড়িতে দুই বন্ধুর সঙ্গে আমোদ করতে করতে গিরিশের হঠাৎ রামকৃষ্ণের কথা মনে পড়ে গেল। একে মধ্যরাত তায় ঘোর মাতাল অবস্থা। তবুও একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে সোজা এসে দক্ষিণেশ্বরে পেঁছিলেন। মন্দিরের সবাই নিদ্রিত। টলতে টলতে রামকৃষ্ণের ঘরে ঢুকলেন গিরিশ, সঙ্গে তাঁর দুই বন্ধু। গিরিশকে দেখে রামকৃষ্ণ খুব খুশি। মাতাল গিরিশের হাতদুটি ধরে ভগবদানন্দে রামকৃষ্ণ উদ্দাম হয়ে নাচতে নাচতে গান ধরলেন, 'সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয়কালী ব'লে/আমার মন-মাতালে মাতাল করে, যত মদ-মাতালে মাতাল বলে।' (রামকৃষ্ণ এর আগেও এমন ভগবদানন্দে মাতাল হয়েছেন। একবার কাশীপুরের রাস্তার ধারে একদল মাতাল দেখে রামকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়েছিল।

মাতাল হ'লে গিরিশের আচরণ সব সময় শোভন থাকতো না। একবার মত্ত অবস্থায় গিরিশ রঙ্গালয়ের মধ্যেই রামকৃষ্ণকে কুভাষায় গালিগালাজ করেন। সেদিন রামকৃষ্ণের অন্য ভক্তেরা গিরিশের ব্যবহারে কুপিত হয়ে যান। সবাই সেদিন গিরিশের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন। শুধু রামদত্ত গিরিশের পক্ষ নিয়ে রামকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। রামদত্ত বলেছিলেন, 'ওর যেমন স্বভাব তেমনি ওর পুজোর ধারা। কৃষ্ণের কাছে কালীয় নাগ ক্ষোভ ক'রে বলেছিল, "ঠাকুর, আমার মুখে তুমি বিষ দিয়েছ, তোমায় আমি কেমন ক'রে সুধা দিই!' ” রামচন্দ্রের যুক্তি শুনে রামকৃষ্ণ খুব খুশি। সবাইকে ডেকে ডেকে বললেন, 'রামচন্দ্র কেমন বললো তা তোমরা শুনলে ?' গিরিশের সঙ্গে দেখা করবার জন্য রামকৃষ্ণ তখনই একখানা গাড়ি আনতে বললেন।

অবশ্য বিষধর সর্পের সঙ্গে গিরিশের তুলনাটি এক্ষেত্রে ন্যায়োচিত হয় নি। গিরিশের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। তাঁর পরিণত বয়সে যে সব ভক্তেরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁদের দৃষ্টিতে গিরিশ ছিলেন শুদ্ধাত্মা। গিরিশ চেয়েছিলেন তাঁর জীবনে রামকৃষ্ণের কৃপা-প্রভাবটি কত সুনিশ্চিতভাবে কার্যকর হয়েছে, তা দেখানো। মাঝে মাঝে অবশ্য নাটুকেপনা ক'রে গিরিশ বলতেন, 'আমি এত বোতল মদ খেয়েছি যা পরপর জুড়ে দিলে হিমালয়ের মাথা ছাড়িয়ে যাবে।' একথা ঠিক যে গিরিশ পানাসক্ত ছিলেন। অনেক সময় অতিরিক্ত মদ্যপান করে তিনি কলহপ্রিয় হয়ে উঠতেন। একথাও ঠিক যে তিনি বেশ্যাসক্ত ছিলেন এবং রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে এক নাগাড়ে পনের বছর মদের সঙ্গে আফিম

গুলে পান করেছেন। কিন্তু প্রমাণসাক্ষ্য দিয়ে একথা বলা যাবে না যে, গিরিশ ভণ্ড বা প্রতারক ছিলেন। নারীর সতীত্ব নাশ করা, মিথ্যা দোষারোপ করে নারীর চরিত্র কলঙ্কলিপ্ত করা কিংবা ঠাণ্ডা মাথায় নিষ্ঠুরতা করার নজীর গিরিশের চরিত্রে নেই।

ইতিমধ্যে গিরিশের চরিত্রের উপর রামকৃষ্ণের প্রভাবটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। একদিন রাত্তিরে বেহুঁশ অবস্থায় এক বেশ্যা রমণীর ঘরে পড়েছিলেন। ভোরের দিকে তাঁর চৈতন্য হলো ; রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অনুতাপটুকু কাটিয়ে নেবেন ভাবলেন। গাড়িতে উঠলেন কিন্তু মদের বোতলটি সঙ্গে নিতে ভুললেন না। দক্ষিণেশ্বরে পেঁছে অনুতাপদগ্ধ গিরিশ রামকৃষ্ণের পা দুটি জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। সেই অবস্থার মধ্যেই হঠাৎ তাঁর মদ্যপানের তীব্র ইচ্ছা হলো। কিন্তু কোথায় মদ ? বোতলটি তো গাড়িতে ফেলে এসেছেন এবং সে গাড়িও ফিরে গেছে। কিন্তু মৃদু হেসে রামকৃষ্ণ তখন বোতলটি গিরিশের দিকে এগিয়ে দিলেন। শুধু মদের বোতল নয়, একজন ভক্তকে দিয়ে গিরিশের পায়ের জুতো জোড়া এবং মাফলারটিও রামকৃষ্ণ আনিয়ে রেখেছিলেন। সেদিন বেহায়ার মতন রামকৃষ্ণের সামনেই মুখের ওপর বোতলটি তুলে ঢকঢকে ক'রে সব সুরাটুকু খেয়ে নিলেন গিরিশ। রামকৃষ্ণ স্থির দৃষ্টিতে গিরিশকে দেখছিলেন। সুরাপান শেষ হলে বললেন, 'খাও, যতটা প্রাণ চায়, খাও। আর বেশীদিন তুমি খাবে না।' গিরিশ পরে বলেছিলেন যে, সেদিন থেকেই ধীরে ধীরে তাঁর পানদোষ কাটতে শুরু করে। যদিও এর পরেও রামকৃষ্ণের সামনে তিনি মদ্যপান করেছেন।

লেখক গিরিশ জানতেন যে তাঁর রচিত বাক্যগুলি কত প্রাণহীন, অসার। দিনের পর দিন কত বাণীই না তিনি রচনা করেছেন! কিন্তু কী তার মূল্য ? রামকৃষ্ণকে তাই বলতেন, 'আমি আপনার বাণী শুনতে আসি নি। অমন বাণী আমি গাড়ি গাড়ি লিখতে পারি। ওতে আমার কিছু যায় আসে না। বরং এমন কিছু করুন যাতে আমি বদলে যাই।' গিরিশের বিশ্বাস দেখে রামকৃষ্ণ খুব খুশি। তখনই ভাইপো রামলালকে ডেকে সেই শাস্ত্রবচনটি পাঠ করতে বললেন, যার অর্থ 'নির্জনে গিয়ে গুহায় বাস করলেও শান্তি নেই। শান্তি সেখানে যেখানে বিশ্বাস। বিশ্বাসই সর্ববস্তুর সার।' গিরিশ তখন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন থেকে কি করবো ? থিয়েটার চালিয়ে যাব ?' রামকৃষ্ণ বললেন, 'যা করছ তাই করে যাও।' গিরিশকে তখন রামকৃষ্ণ পুত্রাধিক স্নেহ করেন। নিজের হাতে তাঁকে মিষ্টান্ন খাওয়ান।

তারপর একদিন গিরিশকে ডেকে রামকৃষ্ণ বললেন, এখন থেকে সকালে সন্ধ্যায় গিরিশ যেন ইষ্টনাম জপ করেন। গিরিশ স্বীকার করলেন যে সহজ শোনালেও এই স্মরণ-মনন কাজটি তাঁর কাছে দুঃসাধ্য। তাঁর বিশৃঙ্খল জীবনটি প্রবৃত্তির হাত-ধরা। এ জীবনে কোনো নিয়ম-শাসনের বালাই নেই। যাঁর আহার নিদ্রার নির্দিষ্ট সময় নেই, তিনি নিত্য ভগবানকে স্মরণ করবেন কিরূপে ? রামকৃষ্ণ তাই গিরিশের দিকে চেয়ে একটু চিন্তা করে বললেন, 'বেশ, তা যদি না পার তো খাবার বা শোবার পূর্বে ভগবানকে ডাকবে।' কিন্তু গিরিশের পক্ষে সেটুকু পালন করাও বিড়ম্বনা। আসলে আত্মসংযমের কোনোরকম কড়াকড়িই গিরিশের ভালো লাগে না। এবারও গিরিশ চুপ করে আছেন দেখে রামকৃষ্ণ তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, 'বেশ। তবে তুই আমায় বকলমা দে। এখন থেকে তোকে আর কিছু করতে

হবে না। তোর সব ভার আমার।'

গিরিশের খুশি আর ধরে না। রামকৃষ্ণ তাঁর ভার নিয়েছেন। এই তো তিনি চাইছিলেন। এখন থেকে পাপপুণ্য সব দায় রামকৃষ্ণের। আর তাঁকে পায় কে! এখন তো তিনি বায়ুর মতন মুক্ত!

কিন্তু গিরিশ যে ভুল ভেবেছিলেন অচিরেই তা বুঝতে পারলেন। জানতেও পারেন নি নিঃশর্ত মুক্তির বদলে কেমন করে তিনি রামকৃষ্ণের দাসানুদাসে পরিণত হয়েছেন। একদিন রামকৃষ্ণের সাক্ষাতেই কোনো একটি সামান্য কর্ম 'আমি করবো' বলায়, রামকৃষ্ণ তাঁকে মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, 'ও কি গো? অমন ক'রে আমি করবো বলছ কেন? বলবে, ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তো করবো।' সেই থেকে রামকৃষ্ণের ইচ্ছার নিকট গিরিশ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে নবব্রতীদের উদ্দেশে গিরিশ বলতেন যে, ধর্মের ব্যাপাবে বকলমা দেবার অর্থ গভীর। নিজের পরে আস্থা রেখে কর্ম করার চেয়েও এই সমর্পণ কঠিন। গিরিশ বলতেন, 'আমায় দ্যাখ্! তাঁকে বাদ দিয়ে নিশ্বাসটিও ফেলার জো আমার নেই।' অর্থাৎ, গিরিশ তখন স্বীকার করতেন যে ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কোনো কাজই তিনি সম্পন্ন করতে পারছেন না।

১৯১২ সাল—গিরিশ দেহরক্ষা করলেন। শেষ হলো একটি মহৎ সংগ্রামশীল জীবন—যে জীবনের সঙ্গে জড়িয়েছিল ভাগ্যের অনেক উত্থান পতনের কাহিনী। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত রামকৃষ্ণকে তিনি শ্রদ্ধা করে গেছেন। উভয়ের মধ্যে এই নিবিড় সম্পর্ক থেকে দেখা দিয়েছে এক আশ্চর্য সুষমা, আর তারই ফলশ্রুতি পেয়েছে বাংলার নাট্যালোক। কলকাতায় এমন একটি রঙ্গালয় নেই, যার পিছনমঞ্চে রামকৃষ্ণের একখানি বাঁধাই করা ছবি আলম্বিত থাকে না। মঞ্চে প্রবেশের আগে সেই চিত্রটির সামনে দাঁড়িয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীরা রামকৃষ্ণকে প্রণাম করে, তাঁর আশীর্বাদ কামনা করে। গিরিশের শিল্পকলাকে রামকৃষ্ণ উৎসাহ দিতেন—যাতে এর চর্চা হয় সেটি তাঁর কাম্য ছিল। বলতে গেলে বাংলার নাট্যজগতে রামকৃষ্ণ এক আশ্চর্য প্রেরণা। এই শিল্পকলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষ তাই রামকৃষ্ণকে কখনো ভুলবে না।

বামুনী অঘোরমণি বিধবা হন বালিকা বয়সে। কামারহাটির গঙ্গাতীরের ঠাকুর বাড়িতে (কৃষ্ণমন্দির) অঘোরমণি বাস করতেন। কামারহাটির এই ঠাকুরবাড়িটি ছিল দক্ষিণেশ্বর থেকে তিন মাইল উত্তরে। এক বৈষ্ণবের কাছে অঘোরমণি দীক্ষা নেন। গুরুর কাছে গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নেন এবং গোপালের সেবাই তাঁর জীবনের ব্রত করেন। সেই থেকেই অঘোর-মণির নাম হয় গোপালের মা। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে এই নিঃসঙ্গ পুণ্যবতী বিধবা গোপাল-ভাবে ভগবানকে ভজনা করে এসেছেন।

অঘোরমণি সম্ভবতঃ ১৮৮৪ সালে রামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। সেদিন তাঁর সঙ্গে আর একজন স্ত্রীভক্ত ছিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পর তিনি একাই দর্শন করতে এলেন। সেদিন বাজারে টাটকা সন্দেশ ছিল না; তাই বাসি সন্দেশ এনেছিলেন। এই ত্রুটিটুকুর জন্য মনে একটু অশান্তি ছিল। কিন্তু রীতি অনুযায়ী কিছু তো নিবেদন করতেই হয়! অঘোর-মণি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে বাসি সন্দেশ পেয়েই রামকৃষ্ণ খুশি। খেতে খেতে বললেন,

'যা রাঁধবে সব নিয়ে আসবে।' তারপর তাঁর নিজের পছন্দমত ব্যঞ্জনের এক দীর্ঘ ফর্দ দিলেন। অঘোরমণি গরিব বিধবা। এত পয়সা কোথায় পাবেন যে শখের ব্যঞ্জন বানাবেন! তার ওপর রামকৃষ্ণের এই খাই-খাই ভাব দেখে অঘোরমণির ভক্তি চটে গেল। কোথায় তিনি ধর্মকর্মের কথা বলবেন, ভগবানের কথা বলবেন—তা না কেবল খাই-খাই। অঘোরমণি মনে মনে বেশ ক্ষুন্ন—ভাবলেন আর আসবেন না। কিন্তু ক'টা দিন যেতে না যেতেই আবার সেই টান। এবার সঙ্গে করে আনলেন অতি সাধারণ একটি ব্যঞ্জন! রামকৃষ্ণ 'সুধা' মনে করে সেই পক্ক ব্যঞ্জনটি খান আর বলেন, 'আহা কি রান্না!' আমরা অন্য প্রসঙ্গেও দেখেছি, যে রাঁধে তার প্রতিই রামকৃষ্ণের যত সহানুভূতি; অন্ন-ব্যঞ্জনের স্বাদ-আস্বাদ নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা হ'ত না।

একদিন ভোররাতে অঘোরমণি জপে বসেছেন, হঠাৎ দেখলেন তাঁর পাশটিতেই বসে আছেন রামকৃষ্ণ—গোপালের মতন তাঁর ডানহাতটি মুঠো করা। যেমনি হাত বাড়িয়ে ধরতে যাবেন অমনি রামকৃষ্ণের মূর্তি কোথায় যেন হারিয়ে গেল। তার বদলে অঘোরমণি ভাবাবিষ্ট হয়ে দেখলেন, দশমাসের বালগোপাল হামা দিয়ে ব'সে তাঁর কাছে খাবার চাইছে। অঘোরমণির একবারও মনে হলো না এ ছেলে সত্যিকার গোপাল নয়। এদিকে গোপাল তখন ঝাঁপিয়ে একবার কোলে বসছে, একবার কাঁধে চড়ছে। দেখে শুনে আনন্দে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন তিনি, তারপর ছেলে কোলে নিয়ে ছুটতে ছুটতে তিনমাইল রাস্তা ভেঙে সোজা দক্ষিণেশ্বর।

অঘোরমণির তখন প্রায় উন্মাদ অবস্থা। এলোথেলো পাগল যেন; আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে, দু'চোখ কপালে উঠেছে—সেই অবস্থায় গোপাল গোপাল ব'লে চেঁচাতে চেঁচাতে মন্দির-আঙিনায় ঢুকলেন। তারপর রামকৃষ্ণের ঘরে ঢুকে যা যা খাবার এনেছিলেন, সব এক এক করে রামকৃষ্ণকে খাওয়াতে লাগলেন। এরপর সবাইকে ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন, কেমন ভাবে গোপাল একবার তাঁর কোলে বসছেন, আবার তখুনি রামকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে মিশে যাচ্ছেন। এর পরবর্তী দিনগুলিতে ভাবদৃষ্ট বালক গোপাল প্রায় সর্বক্ষণই যেন অঘোরমণির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো। এমনকি রাতেও তাঁর পাশটিতে শুতো। দিনকয়েক পরে রামকৃষ্ণের সঙ্গে আবার যখন তাঁর দেখা হলো, তখন রামকৃষ্ণই তাঁকে জপতপ করতে নিষেধ ক'রে দিলেন, কারণ তাঁর তো 'সব' দর্শনাদি হয়েই গেছে। তবুও অঘোরমণি জপ করতেন—গোপালের কল্যাণের জন্যেই জপ করতেন। ধীরে ধীরে গোপাল আর রামকৃষ্ণ তাঁর ভাবদৃষ্টিতে এক হয়ে গেল। প্রায় মাস দুই পর্যন্ত অঘোরমণি এই দর্শনলাভ করেছিলেন। অতঃপর এই ভাবদর্শন দুর্লভ হয়ে যায়। রামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, এমনভাবে দিবারাত্র দর্শন পেতে থাকলে অঘোরমণির শরীর থাকতো না। অবশ্য গোপালের দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ে অঘোরমণির মনোকষ্টের আর সীমা ছিল না।

একদিনের ঘটনা। সেদিন নরেন এসেছেন আবার অঘোরমণিও এসেছেন। একদিকে সংশয়, জিজ্ঞাসা, অন্যদিকে সরল বিশ্বাস। এমন বিরুদ্ধবাদী দু'জন মানুষ মুখোমুখি হলে রামকৃষ্ণ খুব মজা পেতেন। রঙ্গ বাধাবার জন্য তিনি অঘোরমণিকে বালগোপালের লীলাবিলাসের কথা শোনাতে বললেন। অঘোরমণির দ্বিধা—তাছাড়া, নিজস্ব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা কাউকে জানাতে রামকৃষ্ণ নিষেধ করেছেন। সেদিন কিন্তু মিষ্টি হেসে রামকৃষ্ণ তাঁকে আশ্বাস

দিলেন দেখে, ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে সজল চোখে গোপালদর্শনের কথা শুরু থেকে তিনি বলতে লাগলেন। বলতে বলতে অঘোরমণি এক একবার চুপ করেন আর নরেনকে জিজ্ঞেস করেন, 'বাবা, তোমরা কত পড়েছ, কত জেনেছ ; আমি দুঃখী কাঙালী, কিছুই জানি না। বুঝি না। তোমরা বল, এসব কি মিথ্যে ?' সেদিন নরেন তাঁর স্বাভাবিক সংশয় সত্ত্বেও বৃদ্ধাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 'না মা, যা যা তুমি দেখেছ তা সব সত্যি !'

রামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর অঘোরমণি নির্জনে একলা একলাই থাকতেন। পনেরো বছর পরে বিবেকানন্দের তিনজন বিদেশিনী শিষ্যা (মিসেস বুল, মিস ম্যাকলিয়ড এবং নিবেদিতা) অঘোরমণির অদ্ভুত জীবনকথা শুনে তাঁকে কামারহাটিতে দেখতে এলেন। বৃদ্ধার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ঘটনাটি নিবেদিতা এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

এক পূর্ণিমারাতে আমরা কয়েকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কি সুন্দর গঙ্গা আর আলো ঝলমল সেই জলের বুকে যেন সাঁতার কেটে চলেছে আমাদের ছোট্ট নৌকাটি। কি নয়নাভিরাম সে দৃশ্য ! তরী ঘাটে এসে লাগল। ছোট ছোট সিঁড়ির ধাপগুলি কি সুন্দর—জলের বুক থেকে ধাপগুলি সোজা উঠে গেছে বাঁধান ঘাট পেরিয়ে সেই ঘরটি অব্দি। একদিন হয়ত এই ছোট্ট ঘরটি ছিল পাশের বড় বাড়িটির চাকরদের ঘর। গোপালের মা এই ছোট্ট ঘরটিতেই একনাগাড়ে অনেকদিন বাস করে গেছেন। এখানে বসেই একান্তে মালা জপেছেন, ধ্যান করেছেন। ঘরের মেঝেটি পাথরের—সেই মেঝের উপরেই শুতেন। বাইরের কেউ দেখা করতে এলে তাক থেকে গোটানো মাদুরটি পেতে বসতে দিতেন। ছাত থেকে ঝোলানো মাটির হাঁড়িতে থাকতো চিঁড়া আর গুড়। তাই দিয়ে অতিথির সেবা করতেন।··· মালা জপ করেই গোপালের মা সাধিকা হয়ে গিয়েছিলেন।

এই সাক্ষাতের কথা শুনে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, ওই যা তোমরা দেখে এসেছ, সেই আমাদের প্রাচীন ভারত।···ওই ব্রত, উপবাস আর চোখের জলের ভারত। ভারতের ওই রূপটি চলে যাচ্ছে, আর ফিরে আসবে না, কোনোদিনই না !'

১৯০৪ সাল নাগাদ অঘোরমণির শরীর খুবই ভেঙে গেল। বলরাম মন্দিরে তাঁকে নিয়ে আসা হলো। বৃদ্ধাকে মাতৃ নির্বিশেষে সেবা করার সুযোগ পাবেন আশা করে নিবেদিতাই আগ্রহ করে অঘোরমণিকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসেন। অঘোরমণিও সাগ্রহে নিবেদিতার সঙ্গে এক বাড়িতে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত বাস করেছেন। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আসন্ন জানতে পেরে অঘোরমণি অন্তর্জলী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ফুল চন্দন আর মালায় সাজিয়ে তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়া হলো। অন্তর্জলী হ'য়ে অঘোরমণি দু'দিন বেঁচে ছিলেন। তৃতীয় দিনে ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি ইহধাম ছেড়ে যান। অঘোর তখন পঁচাশি বছরের বৃদ্ধা।

১৯

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

ইতিমধ্যে আমি অনেকবার শ্রীম'র নাম উল্লেখ করেছি এবং কথামৃত থেকে উদ্ধৃত করেছি। এই অধ্যায়ে তাই শ্রীম'র কথাই সবিস্তারে বর্ণনা করবো—অর্থাৎ তাঁর জীবনের কথা, কথামৃত রচনার কথা এবং এই রচনার মধ্য দিয়ে কেমন করে রামকৃষ্ণের ব্যক্তিসত্তাটি ফুটে উঠেছে এবং বাণীগুলি ব্যক্ত হয়েছে, সেই কথা বলবো।

শ্রীম অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথের জন্ম হয় কলকাতা শহরে, ১৮৫৪ সালে। ছেলেবেলার একটি ঘটনার স্মৃতি তাঁর মনে চিরকাল অমলিন হ'য়ে বেঁচে ছিল। শ্রীম তখন নেহাতই বালক। মায়ের হাত ধরে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন সদ্যসমাপ্ত মন্দিরটি দেখতে। মন্দির আঙিনায় সেদিন অনেক ভক্তের সমাবেশ হয়েছে। সেই ভিড়ে বালক মহেন্দ্র মায়ের কাছছাড়া হয়ে গেলেন। মা-হারা হয়ে বালক মহেন্দ্র যখন কাঁদছেন তখন একজন যুবক এসে তাঁর হাত ধরে তাঁকে ভোলাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত মায়ের খোঁজ করে হারানো ছেলেকে মায়ের কাছে সমর্পণ করে তবে সেই যুবক সেদিন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। মহেন্দ্রনাথের অনুমান, সেদিনের যুবকটি ছিলেন স্বয়ং রামকৃষ্ণ।

ছেলেবেলা থেকেই মহেন্দ্রনাথ মেধাবী এবং লেখাপড়ায় উজ্জ্বল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পরীক্ষায় তৃতীয় হয়ে উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থাতেই কেশব সেনের এক নিকটাত্মীয়াকে মহেন্দ্র বিবাহ করেন এবং কেশবের অন্তরঙ্গদের একজন হয়ে ওঠেন। পড়াশোনা শেষ করে মহেন্দ্র শিক্ষকতাকে বৃত্তিরূপে বেছে নেন। কলকাতার মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনে তিনি যখন শিক্ষকতা করছেন, তখনই রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেটি ১৮৮২ সালের ঘটনা। (কথামৃতের সর্বত্রই সন তারিখের সঠিক বিবরণ শ্রীম দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে অনুমান হয় যে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের দিনটির কথাও তিনি কোনো না কোনোভাবে বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দুটি সন্ধান-সূত্রের উল্লেখ করেছেন। একস্থলে বলেছেন যে ২৩শে ফেব্রুয়ারীর পরের যে রবিবার সেদিনই ছিল তাঁর সাক্ষাতের দিন। ১৮৮২তে ২৩শে ফেব্রুয়ারীর পরবর্তী রবিবারের তারিখ ছিল ২৬শে। সুতরাং অনুমান হয় ২৬শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল।)

কথামৃত শুরু হয়েছে অতর্কিতভাবে। পড়তে পড়তে পাঠক অনেক অসংলগ্নতার মুখোমুখি হবেন। রচনায় শিল্পনিপুণতাও নেই ; তবে অভিজ্ঞতার কথাগুলি এমন অনাড়ম্বর সততার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, যা পাঠককে তৎক্ষণাৎ অভিভূত করে। মনে হয় শ্রীম যেন সাক্ষাতের বর্ণনাগুলি অনুপ্রাণিত হয়ে 'একটানা লিখে গেছেন—এমন কি ঘটনার পরম্পরা রক্ষার জন্য বারেকের জন্যও কলম থামান নি।

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি। মা-কালীর মন্দির। বসন্তকাল, ইংরাজী ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েকদিন পরে। শ্রীযুক্ত কেশব সেন ও শ্রীযুক্ত জোসেফ্ কুকের সঙ্গে ২৩শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ঠাকুর স্টীমারে বেড়াতে গিয়েছিলেন।—এরই কয়েক দিন পরে। সন্ধ্যা হয় হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে শ্রীম এসে উপস্থিত, এই প্রথম দর্শন। দেখলেন, একঘর লোক নিস্তব্ধ হয়ে তাঁর কথামৃত পানকরছেন। ঠাকুর তক্তপোশে ব'সে পূর্বাস্য হয়ে সহাস্যবদনে হরিকথা শোনাচ্ছেন। ভক্তেরামেঝেয় বসে আছেন।

শ্রীম অবাক হয়ে দেখছেন। তাঁর মনে হলো যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ কথা বলছেন, আর সর্বতীর্থের সমাগম হয়েছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসে আছেন ও ভগবানের গুণকীর্তন করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছিলেন, 'যখন একবার হরি বা একবার রামনাম করলে রোমাঞ্চ হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকাব হয়েছে—কর্ম আপনা-আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল বামনাম, কি হরিনাম কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হলো।' আরও বললেন, 'সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।'

সিধুর সঙ্গে শ্রীম এ-বাগানে ও বাগানে বেড়াতে বেড়াতে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে এসে পড়েছেন। রবিবার—২৬শে ফেব্রুয়ারী। কিছুক্ষণ আগে যখন প্রসন্ন বাঁড়ুজ্জের বাগানে বেড়াচ্ছিলেন, তখন সিধু বলেছিলেন, 'গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে, সে বাগানটি কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।'

বাগানে সদর ফটক দিয়ে ঢুকেই শ্রীম ও সিধু বরাবর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘবে এলেন। শ্রীম অবাক হয়ে দেখছেন আর ভাবছেন, 'আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়তে ইচ্ছে করছে না।' খানিক পরে মনে মনে বললেন, 'একবার দেখি কোথায় এসেছি, তারপর এখানে এসে বসবো।'

সিধুর সঙ্গে বাইরে আসতে না আসতেই আরতির মধুর শব্দ কানে লাগলো। এককালে কাঁসর, ঘণ্টা, খোল, করতাল বেজে উঠল। বাগানের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে নহবতের মধুর সুর ভেসে এলো। সেই শব্দ যেন ভাগীরথীবক্ষে ভ্রমণ করতে করতে অতি দূরে গিয়ে কোথায় মিশে যাচ্ছে! মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল! সবে জ্যোৎস্না উঠছে। যেন প্রকৃতিও সেজেগুজে ঠাকুরদের আরতির আয়োজন করছেন। দ্বাদশ শিবমন্দিরে, রাধাকান্তের মন্দিরে ও ভবতারিণীর মন্দিরে আরতি দর্শন করে শ্রীম পরম প্রীতিলাভ করলেন। সিধু বললেন, 'এটি রাসমণির দেবালয়। এখানে নিত্যসেবা; অনেক অতিথি কাঙাল আসে।'

কথা বলতে বলতে দুজনে কালী মন্দির থেকে বেরিয়ে পাকা উঠানের মধ্য দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের সামনে এসে পড়লেন। এবার দেখলেন ঘরের দরজা বন্ধ।

শ্রীম ইংরেজী পড়েছেন। ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করতে পারলেন না। দরজায় বৃন্দে ঝি দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞেস করলেন, 'হাঁগা, সাধুটি কি এখন ঘরের মধ্যে আছেন?' বৃন্দে বললো, 'হাঁ, এই ঘরে আছেন।'

শ্রীম—এখানে কতদিন আছেন?

বৃন্দে—তা অনেকদিন—

শ্রীম—ইনি কি খুব বই-টই পড়েন ?

বৃন্দে—আর বই-টই ! সব ওঁর মুখে !

শ্রীম সবে কলেজের পড়া শেষ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক হলেন।

শ্রীম—আচ্ছা, ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা করবেন ?—আমরা কি এখন ঘরের ভিতর যেতে পারি ? তুমি একবার খবর দেবে ?

বৃন্দে—তোমরা যাওনা বাবা। গিয়ে ঘরে ব'স।

তাঁরা ঢুকে দেখলেন, ঘরে অন্য কেউ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ একাকী তক্তপোশের উপর বসে আছেন। ঘরে ধুনো দেওয়া হয়েছে ও সমস্ত দরজা বন্ধ। শ্রীম ঘরে ঢুকে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে প্রণাম করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বসতে অনুজ্ঞা করলেন—সিধু ও তিনি মেঝেতে বসলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় থাকো, কি করো, বরানগরে কি জন্যে এসেছ ?' শ্রীম সমস্ত পরিচয় দিলেন। কিন্তু দেখতে পেলেন, ঠাকুর যেন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। পরে জেনেছিলেন, এরই নাম ভাব। যেমন কেউ ছিপ হাতে করে মাছ ধরতে বসেছে। মাছ এসে টোপ খেলে ফাতনা নড়ে, তখন সে ব্যক্তি শশব্যস্ত হয়ে একমনে ফাতনার দিকে চেয়ে থাকে, কারও সঙ্গে কথা কয় না। এ যেন ঠিক তেমনি। পরে শ্রীম শুনেছিলেন, নিজেও দেখেছিলেন যে, সন্ধ্যার পরই শ্রীরামকৃষ্ণের এমন ভাবান্তর হয়। কখনো কখনো তিনি একেবারে বাহ্যশূন্য হয়ে যান।

শ্রীম—আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন, তবে এখন আমরা আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবমুখে)—না, সন্ধ্যা ? তা এমন কিছু নয়।

আর কিছু কথাবার্তার পর শ্রীম প্রণাম করে বিদায় নিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আবার এস।'

ফেরার সময় শ্রীম ভাবতে লাগলেন, 'এই সৌম্যদর্শন মানুষটি কে ?—যাঁর কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে ? পড়াশুনা না করলে কি কেউ বড় হয় ? কি আশ্চর্য ! এঁর কাছে আবার আসতে ইচ্ছে করছে ! ইনিও বললেন, আবার এসো ! কাল সকালে কি পরশু আবার আসবো।'

আমাদের দুর্ভাগ্য যে শ্রীম তাঁর প্রথম দর্শনে রামকৃষ্ণের বাহ্য আকৃতির কথা বিশেষ কিছুই জানান নি। অবশ্য নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর 'পূর্বস্মৃতি' গ্রন্থে (রিফ্লেকশনস্ এ্যান্ড রেমিনিসেন্স) রামকৃষ্ণের তখনকার আকৃতির একটি চিত্র দিয়েছেন। স্টীমারে উঠে রামকৃষ্ণ যখন কেশব সেনের সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন এটি সেই সময়কার ঘটনা। ১৮৮১ সালের কোনো এক সময়ে ঘটনাটি ঘটেছিল।

'কেশব ও তাঁর দলবলের সঙ্গে দেখা করতে পরমহংস স্টীমারে উঠলেন। লালপাড় ধুতি ও বোতাম খোলা কামিজ পরেছিলেন তিনি। দেহের বর্ণ বেশ কালো, মুখে সামান্য একটু দাড়ি আছে। চোখ দুটি অর্ধ নিমীলিত কিন্তু গভীর ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। মাথায় মাঝারি উচ্চতার মানুষটি শীর্ণকায় এবং ক্ষীণজীবী।......কথায় সামান্য তোতলামি থাকলেও শুনতে মিষ্টি লাগে। ভাষায় গ্রাম্যভাব ; প্রায়ই 'তুমি', 'তুই' এক করে ফেলছিলেন।'

রামকৃষ্ণের কথায় যে সামান্য জড়তা ছিল সে কথা শ্রীম'র বিবরণ থেকেও আমরা জানতে পারি। দ্বিতীয় দর্শনের সময় একবারই শ্রীম সে কথা উল্লেখ করেছেন। রামকৃষ্ণের ছেলেবেলায় এই জড়তা ছিল না। সুতরাং রোগটি প্রকৃতিগত না সাময়িক উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি তোতলা হতেন, সে কথা জানার উপায় আমাদের নেই।

রামকৃষ্ণের কথ্য ভাষা ছিল কামারপুকুরের গ্রাম্য বাংলা। ব্যাকরণগত দোষ তো ছিলই, উপরন্তু ভাষায় মাজাঘষাও ছিল না। শহরের ভাষার তুলনায় সে ভাষা অর্বাচীন। সেই অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত সমাজে গ্রামের মানুষ অর্বাচীন ভাষা প্রয়োগ করে দেহের বিশেষ অঙ্গের ব্যবহারের কথা কিংবা ইতর প্রাণীর যৌনমিলনের কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করতেও লজ্জা পেত না। গ্রামের সেই পরিবেশে এমনটি অস্বাভাবিক নয়। এমনকি রামকৃষ্ণ নিজেও সারা জীবনে এমন শব্দ বা উপমা অনেক প্রয়োগ করেছেন যা শুনে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ লজ্জা পেতেন, ক্ষুব্ধ হতেন। কিন্তু একথা ঠিক যে, রামকৃষ্ণের শ্রীমুখে ইতর শব্দের নির্দোষ প্রয়োগ সেগুলির সব দোষ খণ্ডন ক'রে দিত।

শ্রীম বর্ণিত আখ্যানে এখন আবার ফিরে আসা যাক।

শ্রীম'র দ্বিতীয় দর্শন, সকাল বেলা আটটার সময়। ঠাকুর তখন কামাতে যাচ্ছেন। এখনও একটু শীত আছে। তাই তাঁর গায়ে মোলেস্কিনের র‍্যাপার। র‍্যাপারের কিনারা লাল শালু দিয়ে মোড়া। শ্রীমকে দেখে বললেন, 'তুমি এসেছ ? আচ্ছা, এখানে বসো।'

কথাবার্তা হচ্ছিল দক্ষিণ-পূর্ব দিকের বারান্দায়। নাপিত এসেছে। ঠাকুর বারান্দায় কামাতে বসলেন ও মাঝে মাঝে শ্রীম'র সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। গায়ে র‍্যাপার, পায়ে চটি জুতো, সহাস্যবদন। কথা বলার সময় কেবল একটু তোত্‌লা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রীম'র প্রতি)—হ্যাঁগা, তোমার বাড়ি কোথায় ?

শ্রীম—আজ্ঞে, কলকাতায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানে কোথায় এসেছ ?

শ্রীম—এখানে বরানগরে বড় দিদির বাড়ি এসেছি। ঈশান কবিরাজের বাড়ি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওহ্‌ ঈশেনের বাড়ি! হ্যাঁগা, কেশব কেমন আছে ? বড় অসুখ হয়েছিল।

শ্রীম—আমিও শুনেছিলাম বটে, এখন বোধহয় ভালো আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি আবার কেশবের জন্যে মার কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলাম। শেষরাতে ঘুম ভেঙে যেত, আর মার কাছে কাঁদতুম ; বলতুম, মা, কেশবের অসুখ ভালো করে দাও। কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব ? তাই ডাব-চিনি মেনেছিলুম। হ্যাঁগা, কুক্‌ সাহেবকে চেন ? সে নাকি কলকাতায় এসেছে, লেকচার দিচ্ছে ? আমাকে কেশব জাহাজে তুলে নিয়ে গিছিল। কুক্‌ সাহেবও ছিল।

শ্রীম—আজ্ঞে, এই রকম শুনেছিলুম বটে, কিন্তু আমি তাঁর লেকচার শুনি নি। তাঁর বিষয়ে বিশেষ কিছু জানিও না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে ক'দিন ছিল। কাজকর্ম নেই। বলে, এখানে থাকবে। শুনলাম, মাগছেলে সব শ্বশুরবাড়িতে রেখেছে। অনেকগুলি ছেলেপুলে। আমি বকলুম, 'ছেলেপুলে হয়েছে ; তাদের কি ও-পাড়ার লোক এসে খাওয়াবে-দাওয়াবে, মানুষ

করবে ? লজ্জা করে না যে, মাগ-ছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে আর তুই তাদের শ্বশুর-বাড়ি ফেলে রেখেছিস ?' তাকে অনেক বকলুম আর কাজকর্ম খুঁজে নিতে বললুম। তবে এখান থেকে যায়। (শ্রীম'র প্রতি) তুমি বিয়ে করেছ ?

শ্রীম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিহরিয়া)—ওরে রামলাল ! কি লজ্জা ! যাঃ ! বিয়ে করে ফেলেছে।

শ্রীযুক্ত রামলাল শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কালীবাড়ির পূজারী। শ্রীম তখন ঘোরতর অপরাধীর মতন মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইলেন। ভাবতে লাগলেন, "বিয়ে করা কি এত দোষ ?'

ঠাকুর আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি ছেলে হয়েছে ?'

শ্রীম'র বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল। ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আজ্ঞে, ছেলে হয়েছে।' ঠাকুর আবার আক্ষেপ করে উঠলেন। বললেন, 'যাঃ ! ছেলেও হয়ে গেছে !'

তিরস্কৃত হয়ে শ্রীম স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তাঁর অহংকার চূর্ণ হতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কৃপাদৃষ্টি করে সস্নেহে বলতে লাগলেন, 'দেখ, তোমার লক্ষণ ভালো ছিল ; আমি কপাল, চোখ এ-সব দেখলে বুঝতে পারি। আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন ? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি ?

শ্রীম—আজ্ঞে ভালো, কিন্তু অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হয়ে)—আর তুমি জ্ঞানী ?

শ্রীম তখনও জানতেন না কাকে জ্ঞান বলে, কাকে অজ্ঞান বলে। শুধু এটুকু জানতেন যে, লেখাপড়া শিখলে, বই পড়তে পারলে জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হয়েছিল। তখন শুনলেন যে ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, আর না জানার নাম অজ্ঞান। ঠাকুর যখন বললেন, 'তুমি কি জ্ঞানী' ? শ্রীম'র অহংকারে খুব লেগেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তোমার সাকারে বিশ্বাস না নিরাকারে ?

শ্রীম আবার অবাক। মনে মনে ভাবলেন, 'সাকারে যার বিশ্বাস তার কি নিরাকারে বিশ্বাস হয় ? ঈশ্বর নিরাকার, এ বিশ্বাস থাকলে ঈশ্বর সাকার, এ বিশ্বাস কি হতে পারে ? বিরুদ্ধ অবস্থা দুটোই কি সত্য হতে পারে ? সাদা দুধ কি আবার কালোও হতে পারে ?

শ্রীম—আজ্ঞে, আমার বিশ্বাস নিরাকারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হলো। নিরাকারে বিশ্বাস, তা তো ভালোই। তবে এ বুদ্ধি ক'রো না যে, এইটি কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকার সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।

দুটিই সত্য, একথা বারবার শুনে শ্রীম অবাক হয়ে রইলেন। একথা তো তাঁর পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নেই। তাঁর অহংকার আবার চূর্ণ হলো। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, তাই আবার একটু তর্ক করতে অগ্রসর হলেন।

শ্রীম—আজ্ঞে, তিনি সাকার, এ বিশ্বাস যেন হলো। কিন্তু মাটির প্রতিমা তো তিনি নন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—মাটি কেন গো। চিন্ময়ী প্রতিমা।

শ্রীম 'চিন্ময়ী প্রতিমা' বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'আচ্ছা, যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়। আর যখন তারা

প্রতিমা পূজা করে তখন তারা ঈশ্বরকেই পূজা করে, মাটিকে নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তস্বরে)—তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক দোষ। কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার নেই ঠিক! তুমি বোঝাবার কে? যাঁর জগৎ, তিনিই বোঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, আব এ উপায় করবেন না? যদি বুঝাবার দরকার হয় তিনিই বুঝাবেন। তিনি তো অন্তর্যামী। যদি মাটিব প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হ'য়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ওই পূজাতেই খুশি হন। ওর জন্য তোমার মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজেব যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।

শ্রীম'র মনে হলো, এবার তাঁর অহঙ্কার একেবারে চূর্ণ হলো। তিনি ভাবলেন, 'ইনি যা বলেছেন, তা-ই ঠিক। আমার বুঝাতে যাবার কি দরকার! আমি কি ঈশ্বরকে জেনেছি—না আমার তাঁর উপর ভক্তি হয়েছে! আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। জানি না, শুনি না, পরকে বুঝাতে যাওয়া বড়ই লজ্জাব কথা ও হীনবুদ্ধির কাজ। এ কি অঙ্কশাস্ত্র, না ইতিহাস, না সাহিত্য যে পরকে বুঝাব? এ যে ঈশ্বরতত্ত্ব! ইনি যা বলছেন, মনে বেশ লাগছে।' ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর এই প্রথম ও শেষ তর্ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি মাটির প্রতিমা-পূজা বলছিলে। যদি মাটিরই হয়, সে পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যার জগৎ তিনিই এ সব করেছেন—অধিকারী ভেদে। যার পেটে যা সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন। এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়িতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা ব্যঞ্জন কবেছেন—যার পেটে যা সয়। কারও জন্য মাছের পোলোয়া, কারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড়চড়ি, মাছ ভাজা—এই সব করেছেন। যেটি যার ভালো লাগে। যেটি যার পেটে সয়—বুঝলে?

শ্রীম—আজ্ঞে হ্যাঁ। (বিনীতভাবে) ঈশ্ববে কি করে মন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরেব নাম গুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ—ঈশ্বরেব ভক্ত বা সাধু, এঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজেব ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্ববে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকাব। প্রথম অবস্থায় নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন। যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে।

ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্বদা সৎ-অসৎ বিচার করবে। ঈশ্বরই সৎ, কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ, কিনা অনিত্য। এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে।

শ্রীম (বিনীতভাবে)—সংসারে কি রকম করে থাকতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা, সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে তারা তোমার কেউ নয়।

বড় মানুষের বাড়িব দাসী সব কাজ ক'চ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মতো মানুষ করে। বলে 'আমার রাম', 'আমার হরি', কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়। কচ্ছপ জলে চ'রে

বেড়ায় কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান ?—আড়ায় পড়ে আছে, যেখানে তার ডিম-গুলি আছে। সংসারের সব কর্ম করবে কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে। ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না ক'রে যদি সংসার করতে যাও, তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ এ সবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়-চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।

তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তা না হলে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হলে নির্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে ব'সে সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।

আবার দেখ, এই মনে নির্জনে ঈশ্বরের চিন্তা করলে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ওই মন নীচ হয়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনী-কাঞ্চন চিন্তা।

সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহলে দুধে-জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে গুণভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না ; ভেসে থাকবে।

সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয় ? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয় এই পর্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এরই নাম বিচার ; বুঝেছ ?

শ্রীম—আজ্ঞে হ্যাঁ; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি পড়েছি, তাতে আছে বস্তুবিচার।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হ্যাঁ, বস্তুবিচার। এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, সুন্দর দেহেই বা কি আছে। বিচার কর, সুন্দরীর দেহতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল, মূত্র এইসব আছে। এইসব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয় ? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায় ?

শ্রীম—ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হ্যাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জনে বাস, তাঁর নাম গুণগান, বস্তু-বিচার ; এইসব উপায় অবলম্বন করতে হয়।

শ্রীম—মনের কি অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে ; টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয় ; কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে ? ডাকার মতো ডাকতে হয়।

এই ব'লে ঠাকুর গান ধরলেন—

'ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
কেমন শ্যামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে ।।
মন যদি একান্ত হও, জবা বিল্বদল লও,
ভক্তি চন্দন মিশাইয়ে (মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও ।।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হন। তারপর সূর্য দেখা দেবেন। ব্যাকুলতায়

পরই ঈশ্বর দর্শন। কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে। এই তিনজনের ভালবাসা, এই তিন টান, একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।

ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছানা কেবল মিউ মিউ ক'রে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানেই থাকে—কখনও হেঁশেলে, কখনও মাটির উপর, কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হলে সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।

দেখতে দেখতে রবিবার এসে পড়লো। বরানগরের নেপালবাবুর সঙ্গে শ্রীম বেলা ৪টার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানে এসে পেঁছিলেন। দেখলেন, সেই পূর্বপরিচিত ঘরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট তক্তপোশের ওপর বসে আছেন। ঘরে এক ঘর লোক। রবিবার অবসর হয়েছে, তাই ভক্তেরা দর্শন করতে এসেছেন। এখনও শ্রীম'র সঙ্গে কারও আলাপ হয় নি; তিনি সভামধ্যে এক পাশে আসন গ্রহণ করলেন। দেখলেন, ভক্তসঙ্গে সহাস্য বদনে শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলছেন।

একজন উনিশবছরের ছোকরাকে উদ্দেশ করে ও তাঁর দিকে তাকিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দের সঙ্গে অনেক কথা বলছিলেন। ছেলেটির নাম নরেন্দ্র, কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। ছেলেটির কথাগুলি তেজঃপূর্ণ। চক্ষু দুটি উজ্জ্বল। ভক্তের চেহারা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেনের প্রতি)—নরেন্দ্র! তুই কি বলিস? সংসারী লোকেরা কত কি বলে! কিন্তু দেখ্, হাতী যখন চলে যায়, পিছনে কত জানোয়ার কত রকম চিৎকার করে। কিন্তু হাতী ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি?

নরেন্দ্র—আমি মনে করবো, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না রে, অতো দূর নয়। (সকলের হাস্য)

ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে ভালো লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে; মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে হয়। বাঘের ভিতরও নারায়ণ আছেন; তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। (সকলের হাস্য) যদি বলো বাঘ তো নারায়ণ, তবে কেন পালাবো। তার উত্তর—যারা বলছে 'পালিয়ে এস' তারাও নারায়ণ, তাদের কথা কেন না শুনি?

একটা গল্প শোন। কোনো এক বনে একটি সাধু থাকেন। তাঁর অনেক শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটি জেনে সকলকে নমস্কার করবে। একদিন একটি শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গিছলো। এমন সময় একটা রব উঠলো, 'কে কোথায় আছ পালাও—একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে।' সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্য পালাল না! সে জানে যে, হাতীও যে নারায়ণ, তবে কেন পালাব? এই বলে দাঁড়িয়ে রইল। নমস্কার করে স্তব-স্তুতি করতে লাগলো। শেষে হাতীটা শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাকে একধারে ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল।

এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে ধরাধরি করে আশ্রমে নিয়ে গেল। আর

ঔষধ দিতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে চেতনা হলে ওকে কেউ জিজ্ঞেস করলে, তুমি কেন হাতী আসছে শুনে চলে গেলে না?' সে বললে, 'গুরুদেব যে আমায় বলে দিয়েছিলেন যে, নারায়ণই, মানুষ জীব-জন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতী নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে সরে যাই নি। গুরু তখন বললেন, 'বাবা, হাতী নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য; কিন্তু বাবা, মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। একই নারায়ণ, তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথাও শুনতে হয়।' (সকলের হাস্য)

একজন ভক্ত—মহাশয়, যদি দুষ্ট লোকে অনিষ্ট করতে আসে বা অনিষ্ট করে, তাহলে কি চুপ করে থাকা উচিত?

শ্রীরামকৃষ্ণ—লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমোগুণ দেখানো দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে, উল্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়। একটা গল্প শোন :

এক মাঠে এক রাখাল গরু চরাতো। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সবাই সেই সাপের ভয়ে খুব সাবধানে থাকতো। একদিন এক ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল। রাখালেরা দৌড়ে এসে বললে, 'ঠাকুর মশাই। ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে।'

ব্রহ্মচারী বললে, 'বাবা তা হোক; আমার তাতে ভয় নেই, আমি মন্ত্র জানি!' এই কথা ব'লে ব্রহ্মচারী সেইদিকে চলে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এদিকে সাপটা তখন ফণা তুলে দৌড়ে আসছে, কিন্তু কাছে না আসতেই ব্রহ্মচারী যেমন একটি মন্ত্র পড়লে, ওমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে পড়ে রইল।

ব্রহ্মচারী তখন বললে, 'ওরে! তুই কেন পরের হিংসা করে বেড়াস? আয় তোকে মন্ত্র দি। এই মন্ত্র জপলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে; ভগবান লাভ হবে। আর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে না।' এই বলে সে সাপকে মন্ত্র দিল। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করল, 'ঠাকুর! কি ক'রে সাধনা করব বলুন?' গুরু বললে, 'এই মন্ত্র জপ করো, আর কারও হিংসা করো না।' যাবার সময় ব্রহ্মচারী বললে, 'আমি আবার আসব।'

এমনি করে দিন যায়। রাখালেরা দেখল যে সাপটা আর কামড়াতে আসে না। ঢ্যালা মারে তবুও তার রাগ হয় না, আর কেঁচোর মতন পড়ে থাকে। একদিন একজন রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে সাপটাকে আছড়ে ফেলে দিল! সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো আর সে অচেতন হয়ে পড়লো। নড়ে না চড়ে না। রাখালেরা মনে করলে যে সাপটা বুঝি মরে গেছে। এই মনে করে তারা চলে গেল।

অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হলো। সে ধীরে ধীরে অতি কষ্টে গর্তের ভিতর চলে গেল। শরীর চূর্ণ—নড়বার শক্তি নেই। অনেকদিন পরে যখন অস্থিচর্মসার, তখন বাইরে আহারের খোঁজে রাত্রে একবার ক'রে চরতে আসতো। মন্ত্র নেওয়া অবধি আর হিংসা করে না। মাটিতে পড়ে থাকা ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করতো।

প্রায় এক বছর পরে ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এলো। এসেই সাপের খোঁজ করলে। রাখালেরা বললো যে সাপটা মরে গেছে। কিন্তু ব্রহ্মচারীর সেকথা বিশ্বাস হলো না। সে জানে, যে মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না হ'লে দেহত্যাগ হবে না। তখন খুঁজে খুঁজে

তার দেওয়া নাম ধরে ব্রহ্মচারী ডাকতে লাগল। সাপটা তখন গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো ও ভক্তিভাবে প্রণাম করলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞেস করলে, 'তুই কেমন আছিস?' সাপটা বললো, 'আজ্ঞে ভালো আছি।' ব্রহ্মচারী জিজ্ঞেস করল, 'তবে তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন?' সাপ বললে, 'ঠাকুর আপনি আদেশ করেছেন—কারও হিংসা ক'র না। তাই ফলটা পাতাটা খাই ব'লে বোধহয় রোগা হয়ে গেছি।' মন্ত্র পেয়ে সাপটার সত্ত্বগুণ হয়েছে, তাই কারু উপর ক্রোধ নেই। সে ভুলেই গিছলো যে রাখালেরা তাকে মেরে ফেলার যোগাড় করেছিল। ব্রহ্মচারী বললে, 'শুধু না খাওয়ার দরুন এমন অবস্থা হয় না। নিশ্চয়ই আরো কারণ আছে, ভেবে দ্যাখ্।' সাপটার তখন মনে পড়ল। সে বললো, 'ঠাকুর মনে পড়েছে বটে; রাখালেরা একদিন আছাড় মেরেছিল। তারা অজ্ঞান, জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা; আমি যে কাউকে কামড়াব না বা কোনোরকম অনিষ্ট করবো না, তারা তা কেমন ক'রে জানবে?' ব্রহ্মচারী বললো, 'ছি! তুই এত বোকা নিজেকে রক্ষা করতে জানিস না? আমি তোকে কামড়াতেই বারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়! ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস নি কেন?'

দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তবে তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নেই, তাদের ক্ষতি করতে নেই।

জীব চার প্রকার: বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব। নিত্যজীব: যেমন নারদাদি। এরা সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলের জন্য, জীবদিগকে শিক্ষা দেবার জন্য।

বদ্ধজীব: বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে—ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না।

মুমুক্ষুজীব: যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ পারে না।

মুক্তজীব:—যারা সংসারে কামিনী কাঞ্চনে আবদ্ধ নয়, যেমন সাধু, মহাত্মা। যাদের মনে বিষয়বুদ্ধি নেই, আর যারা সর্বদা হরি পাদপদ্ম চিন্তা করে।

যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে। দু'চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে, কখনও জালে পড়ে না। এরা নিত্যজীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে; এরা মুমুক্ষুজীবের উপমাস্থল। কিন্তু সব মাছই পালাতে পারে না। দু'চারটি ধপাঙ্ ধপাঙ্ করে জাল থেকে পালিয়ে যায়; তখন জেলেরা বলে—ওই একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল। কিন্তু অধিকাংশই পালাতে পারে না আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মুখে করে পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ করে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে, মনে করে আর কোনো ভয় নেই, আমরা বেশ আছি। কিন্তু জানে না যে, জেলে হড়্‌হড়্ করে টেনে আড়ায় তুলবে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।

বদ্ধজীবেরা সংসারের কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ—তাদের হাত-পা বাঁধা। মনে করে যে, সংসারের ওই কামিনী কাঞ্চনেই সুখ হবে, নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে, 'তুমি তো চল্‌লে, আমার কি করে গেলে?' আবার এমনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশী সল্‌তে জ্বললে বদ্ধজীব বলে, 'তেল পুড়ে যাবে, সল্‌তে কমিয়ে দাও।' এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে।

বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয় তা হ'লে হয় আবোল-তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয় তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে। (সকলে স্তব্ধ)

একজন ভক্ত—মহাশয়, এমন সংসারী জীবের কি কোনো উপায় নেই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—অবশ্য উপায় আছে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ আর মাঝে মাঝে নির্জনে থেকে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। আর বিচার করতে হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও।

(কেদারের প্রতি) : বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ ? পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হলো। কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল। তার আর সেতুর দরকার হলো না। (সকলের হাস্য)

(নরেন্দ্রের প্রতি) : এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, তখন জুজুটি। আবার চাঁদনীতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্তি। এরা নিত্য সিদ্ধের থাক্। এরা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়।

(শ্রীমর প্রতি) : ইংরেজীতে কি কোনো তর্কের বই আছে গা ?

শ্রীম—আজ্ঞে হ্যাঁ। ইংরেজীতে ন্যায়শাস্ত্র (Logic) আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, কি রকম একটু বলো দেখি।

শ্রীম এবার মুশকিলে পড়লেন। বললেন—'এক রকম আছে সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছান। যেমন, সব মানুষ মরে যাবে, পণ্ডিতেরা মানুষ অতএব পণ্ডিতেরা মরে যাবে।'

'আর এক রকম আছে, বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনা দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান। যেমন—এ কাকটা কালো, ও কাকটা কালো, যত কাক দেখছি সবই কালো, অতএব সব-কাকই কালো।

'কিন্তু এ রকম সিদ্ধান্ত করলে ভুল হতে পারে, কেন না, হয় তো খুঁজতে খুঁজতে আর এক দেশে সাদা কাক দেখা গেল।

'আর এক দৃষ্টান্ত—যেখানে বৃষ্টি সেইখানে মেঘ ছিল বা আছে ; অতএব এই সাধারণ সিদ্ধান্ত হলো যে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ কথাগুলি শুনলেন মাত্র। শুনতে শুনতেই অন্যমনস্ক হলেন। কাজে কাজেই আর এ বিষয়ে বেশী প্রসঙ্গ হলো না।

সভা ভঙ্গ হলো। ভক্তেরা এদিক ওদিক পায়চারি করছেন। শ্রীমও পঞ্চবটীতে বেড়াচ্ছেন। বেলা প্রায় পাঁচটা। খানিক পরে তিনি রামকৃষ্ণের ঘরের দিকে এসে দেখলেন, ঘরের উত্তর দিকের ছোট্ট বারান্দার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নরেন্দ্র গান করছেন, দু'চারজন ভক্ত দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীমও গান শুনলেন এবং গান শুনে মোহিত হয়ে গেলেন। ঠাকুরের গান ছাড়া

এমন মধুর গান তিনি কখনও কোথাও শোনেন নি। হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে শ্রীম অবাক। ঠাকুর স্থির অচঞ্চল—চোখের পাতা পড়ছে না। নিশ্বাস বইছে কি বইছে না, কে জানে! জিজ্ঞেস করতে একজন ভক্ত বললেন, এর নাম সমাধি! শ্রীম এমন কখনও দেখেন নি, শোনেন নি। অবাক হয়ে ভাবছেন, ভগবানকে চিন্তা ক'রে মানুষ কি এমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়? না জানি কতদূর বিশ্বাস ভক্তি থাকলে এমনটি হয়!

গানের শেষ চরণটি গাইবার সময় ঠাকুরের শিহরণ হলো। দেহ রোমাঞ্চিত! চক্ষু হতে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ছে। মাঝে মাঝে যেন কি দেখে হাসছেন। এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়-রূপ-দর্শন? কত সাধনা করলে, কত তপস্যার ফলে, কতখানি ভক্তি-বিশ্বাসের বলে, এরূপ ঈশ্বর দর্শন হয়?

সমাধি ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয় মধ্যে ধারণ ক'রে শ্রীম সেদিন ঘরে ফিরে এলেন।

তার পরদিনও ছুটি ছিল। বেলা তিনটার সময় শ্রীম আবার এসে উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বসে আছেন। মেঝেতে মাদুর পাতা। সেখানে নরেন্দ্র, ভবনাথ, আরও দু-একজন বসে আছেন। সবাই ছোকরা—উনিশ-কুড়ি বছর বয়স। শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যবদন, ছোট তক্তপোশের উপর বসে আছেন, আর ছোকরাদের সঙ্গে আনন্দে কথাবার্তা বলছেন।

শ্রীমকে ঘরে ঢুকতে দেখে ঠাকুর উচ্চহাস্য ক'রে ছোকরাদের বলে উঠলেন, 'ওই রে, আবার এসেছে!' সবাই হেসে উঠল। শ্রীম এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বসলেন। আগে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে প্রণাম করতেন—ইংরেজী পড়া লোকেরা যেমন করে। কিন্তু সেদিন তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে শিখেছেন। শ্রীম'র আসন গ্রহণ করার পর, নরেন্দ্র ও অন্য ভক্তদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর হাসির কারণ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

তিনি বললেন, 'দেখ, একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাওয়ানো হয়েছিল। পরদিন ঠিক চারটার সময় ময়ূরটা এসে উপস্থিত—আফিমের মৌতাত ধরেছে, তাই ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে।' (সকলের হাস্য)।

শ্রীম মনে মনে ভাবছেন, 'ইনি ঠিক কথাই বলেছেন। বাড়িতে যাই কিন্তু দিবানিশি এঁর দিকেই মন পড়ে থাকে—মনে ভাবি, কখন এঁকে দেখবো! কে যেন এখানে টেনে আনে! মনে করলেও অন্য জায়গায় যাবার যো নেই। এখানে আসতেই হবে!' শ্রীম যখন এইসব ভাবছেন, তখন ঠাকুর ছোকরাদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করছিলেন, যেন তারা সমবয়স্ক। হাসির লহরী উঠতে লাগল—যেন আনন্দের হাট বসেছে।

শ্রীম অবাক হয়ে এই অদ্ভুত চরিত্র দেখছেন। দেখতে দেখতে তাঁর মনে হলো, 'আগের দিন কি এঁরই সমাধিভাব হয়েছিল? এঁরই মধ্যে কি অদৃষ্টপূর্ব প্রেমানন্দ দেখেছিলাম। আশ্চর্য! সেই লোকটি আজ কত স্বাভাবিক! ইনিই কি আমায় প্রথম দিনে উপদেশ দেবার সময় তিরস্কার করেছিলেন! ইনিই কি আমায়, "তুমি কি জ্ঞানী," বলেছিলেন? ইনিই কি বলে-ছিলেন "সাকার-নিরাকার, দুই-ই সত্য?" ইনিই কি বলেছিলেন যে, ঈশ্বরই সত্য, আর সংসারের সমস্তই অনিত্য? ইনিই কি আমাকে ধনীর সংসারে দাসীর মতন থাকতে বলে ছিলেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ করছেন ও শ্রীমকে এক-একবার দেখছেন। দেখলেন, স্তব্ধ অবাক হয়ে শ্রীম বসে আছেন। তখন রামলালকে উদ্দেশ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'দেখ! এর উমের বেশী কিনা, তাই একটু গম্ভীর। এরা এত হাসি খুশী করছে, কিন্তু এ চুপ ক'রে বসে আছে।' শ্রীম'র বয়স তখন সাতাশ বছর হবে।

শ্রীম ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন ক'রে ঠাকুর বললেন, 'তোমরা দু'জনে ইংরেজীতে কথা কও ও বিচার করো, আমি শুনবো।'

শ্রীম ও নরেন্দ্র উভয়েই এই কথা শুনে হাসছেন। দু'জনে কিছু কিছু আলাপ করলেন, কিন্তু বাংলাতে। ঠাকুরের সামনে তর্ক বা বিচার করা শ্রীম'র পক্ষে সম্ভব নয়। ঠাকুর আর একবার জিদ করলেন, কিন্তু ইংরেজীতে তর্ক করা হলো না।

পাঁচটা বাজলো। ভক্ত ক'জন যে যার বাড়ি চলে গেলেন। কেবল শ্রীম ও নরেন্দ্র থাকলেন। শ্রীম ঠাকুরবাড়ির এদিক-ওদিক পায়চারি করছেন। কিছুক্ষণ পরে কুঠির কাছ দিয়ে হাঁস পুকুরের দিকে আসতে লাগলেন। দেখলেন, পুকুরের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির চাতালের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন আর নরেনের সঙ্গে কথা বলছেন। ঠাকুর বললেন, 'দেখ্, আর একটু বেশী বেশী আসবি। সবে নতুন আসছিস কিনা। প্রথম আলাপের পর নতুন সকলেই ঘন ঘন আসে; যেমন নতুন পতি'—(নরেন্দ্র ও শ্রীম হাসলেন) 'ঠিক কি না বল্! কেমন, আসবি তো?' নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ছেলে, হাসতে হাসতে বললেন, 'হ্যাঁ, চেষ্টা করবো।'

সকলে কুঠির পথ দিয়ে ঠাকুরের ঘরে আসছেন। কুঠির কাছে এসে শ্রীমকে ঠাকুর বললেন, 'দেখ, চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়; তারা ভালো গরু, মন্দ গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নিচে হাত দিয়ে দেখে। কোনো গরু ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে, সে গরু কেনে না। যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং-মিড়িং ক'রে লাফিয়ে ওঠে সেই গরুকেই পছন্দ করে। নরেন্দ্র সেই গরুর জাত; ভিতরে খুব তেজ।' এই ব'লে ঠাকুর হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'আবার কোনো কোনো লোক আছে, যেন চিঁড়ের ফলার, আঁট নেই, জোর নেই, ভ্যাৎ ভ্যাৎ করছে।'

সন্ধ্যা হলো। ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করছেন। শ্রীমকে বললেন, 'তুমি নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করগে, আমায় বলবে কি রকম ছেলে।' আরতি সাঙ্গ হলো। শ্রীম অনেকক্ষণ পরে চাঁদনীর পশ্চিম ধারে নরেন্দ্রকে দেখতে পেলেন। পরস্পর আলাপ হতে লাগল। নরেন্দ্র বললেন যে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের, কলেজে পড়েন, ইত্যাদি।

রাত হয়েছে—শ্রীম এবার বিদায় নেবেন। কিন্তু যেতে আর পারছেন না। তাই নরেনের কাছ থেকে এসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে খুঁজতে লাগলেন। ঠাকুরের গান শুনেছেন। তাঁর হৃদয় মন মুগ্ধ। বড় সাধ যে আবার তাঁর গান শোনেন। খুঁজতে খুঁজতে দেখলেন, মা-কালীর মন্দিরের সামনের নাটমন্দিরে একাকী পায়চারি করছেন। মার মন্দিরে মার দুই পাশে আলো জ্বলছিল। বৃহৎ নাটমন্দিরে একটি আলো জ্বলছে; ক্ষীণ আলো।

ঠাকুরের গান শুনে শ্রীম আত্মহারা হয়েছেন। যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্প।

অনেক সঙ্কোচের সঙ্গে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ, আর কি গান হবে?' ঠাকুর চিন্তা ক'রে বললেন, 'না, আজ আর গান হবে না।' এইবার কি যেন মনে পড়ল; তখন

বললেন, 'তবে এক কাজ ক'রো। আমি বলরামের বাড়ি কলকাতায় যাব, তুমি যেও, সেখানে গান হবে।'

শ্রীম—যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি জান ? বলরাম বসু ?

শ্রীম—আজ্ঞে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বলরাম বসু। বোসপাড়ায় বাড়ি।

শ্রীম—যে আজ্ঞা, আমি জিজ্ঞেস করবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(শ্রীম'র সঙ্গে নাটমন্দিরে বেড়াতে বেড়াতে) আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আমাকে তোমার কি বোধ হয় ?

শ্রীম চুপ।

ঠাকুর আবার জিজ্ঞেস করলেন। 'তোমার কি বোধ হয় ? আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে ?'

শ্রীম—'আনা' কি তা বুঝি না। তবে এমন জ্ঞান, বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদারভাব কখনও দেখি নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে লাগলেন।

এইসব কথাবার্তার পর শ্রীম প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন। সদর ফটক পর্যন্ত এসে কি মনে পড়ল, তখন ফিরলেন। আবার নাটমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে উপস্থিত। দেখলেন সেই ক্ষীণালোকে শ্রীরামকৃষ্ণ একা একা পায়চারি করছেন। একাকী—নিঃসঙ্গ। যেন অরণ্য-মধ্যে পশুরাজ একাকী বিচরণ কবছেন। আত্মারাম, সিংহ একলা থাকতে, একলা বেড়াতে ভালবাসে! অনপেক্ষ! অবাক হয়ে শ্রীম সেই মহাপুরুষ দর্শন করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(শ্রীমকে) আবার যে ফিরে এলে ?

শ্রীম—আজ্ঞে, বোধহয় বড়-মানুষের বাড়ি। যেতে দেবে কি না। তাই যাব না ভাবছি। এখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, তা কেন ? তুমি আমার নাম করবে। বলবে, তাঁর কাছে যাব ; তা হলেই, কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে।

'যে আজ্ঞা' ব'লে শ্রীম আবার প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীম'র প্রথম চারটি সাক্ষাতের সম্পূর্ণ বিবরণ দিলাম। এই সম্পূর্ণ বিবরণ প্রথম খণ্ডেই লিপিবদ্ধ আছে। পুনরুক্তি রোধ করতে কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়েছি। গ্রন্থটিতে মোট ৫২টি অধ্যায় আছে। (এ থেকেই গ্রন্থের কলেবরের একটি ধারণা পাঠক করতে পারবেন।) ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু করে ১৮৮৬র এপ্রিল পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ ধারাবাহিক ভাবে এই গ্রন্থে দেওয়া আছে। ১৮৮৬র ২৪শে এপ্রিল তারিখে সস্ত্রীক শ্রীম ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। কিছুদিন আগেই আর এক ছেলের মৃত্যু হয়েছে। সেই থেকে প্রায় পাগলের মতন হয়ে গেছেন শ্রীম'র স্ত্রী। রামকৃষ্ণ ব্যাপারটি জানতেন, তাই শ্রীমকে পরিবার নিয়ে দেখা করতে বলেছিলেন। রামকৃষ্ণ নিজেও তখন গুরুতর রকমের পীড়িত। সারদাদেবী সর্বক্ষণ তাঁর সেবা করছেন। তবুও শ্রীম'র পত্নীকে কাছে ডেকে তিনি সান্ত্বনা দিলেন, তারপর সারদার সঙ্গে কিছুদিন

বাস করতে বললেন। শ্রীম অভিভূত। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গসুখ লাভ করে তাঁর স্ত্রী যে নিশ্চিত সান্ত্বনা পাবেন তা ভেবে শ্রীম কৃতার্থ। রাত প্রায় ন'টা। শ্রীম তাঁকে হাত-পাখার বাতাস করছেন। ভক্তেরা রামকৃষ্ণের গলায় একটি ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে গেছেন। গলা থেকে মালাটি খুলে রামকৃষ্ণ আপন মনে কি যেন বললেন তারপর মালাটি শ্রীমকে দিলেন। শ্রীম লিখছেন, 'সেদিন ঠাকুর ছিলেন আশ্চর্য কৃপাপরবশ।' রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীম'র এটিই শেষ প্রত্যক্ষ বিবরণ। এর পরও রামকৃষ্ণ সাড়ে তিনমাস মর্ত্যলোকে ছিলেন। এই দিনগুলির বিবরণ শ্রীম'র দিনলিপিতে লেখা নেই। তখন তাঁর শরীর দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল। তবুও সন্ন্যাসী ভক্তদের ডেকে সাধনার ধারা শিখিয়ে দিতেন। হয়ত, সেই কারণেই গৃহীভক্তদের দিকে কৃপাদৃষ্টি দেবার অবসর তিনি পান নি। তবুও প্রায় প্রত্যহই শ্রীম তাঁর কাছে আসতেন। অনুমান হয়, শ্রীম ইচ্ছাকৃতভাবেই রামকৃষ্ণের ক্যান্সার রোগের যাতনাময় দিনগুলির কথা দিনলিপি থেকে বাদ দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই যে আলোকচিত্রটি নেওয়া হয়েছিল, সেখানে শ্রীমকে একেবারে শেষের সারিতে দীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ১৮৮৬র ১৬ই আগষ্ট তারিখের অপরাহ্ণে ছবিটি তোলা হয়েছিল।

কথামৃতের ৫২ অধ্যায়ে (এটিই শেষ অধ্যায়) শ্রীম বরানগরের নবীন সন্ন্যাসীদের মঠটি পরিদর্শনের কথা বলেছেন। কয়েকবারই সেই 'দানা'দের মঠে তিনি-গেছেন। প্রথমবার গিয়েছিলেন ১৮৮৭র ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। শেষবার যান সেই বছরেরই ১০ই মে তারিখে। গল্পের এই অংশটির অনেক কথা আমায় পরে বলতে হবে। চরিতকাররূপে শ্রীম'র মহৎ গুণ হলো তাঁর সততা। দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময় রামকৃষ্ণের কাছে তিরস্কৃত হয়ে নিজেকে হীন ভাবলেও সে বিবরণ যেমন দিয়েছেন, তেমনি কথামৃতের অন্যত্র 'কৃপাধন্য' ভাবটিও ব্যক্ত করেছেন। যে কোনো আত্মসচেতন মানুষ হয়ত প্রশংসার কথাগুলি সযত্নে পরিহার করতেন। কিন্তু শ্রীম ছিলেন প্রকৃতই আত্মভাববিলুপ্ত, তাই সহজ সরলভাবে তিনি শুধু ঘটনাগুলি ব্যক্ত করে গেছেন।

রামকৃষ্ণের দেবত্ব সম্পর্কেও শ্রীম'র সততা প্রশ্নাতীত ছিল। এ ব্যাপারে তিনি এত নিশ্চিত ছিলেন যে, পৃথকভাবে রামকৃষ্ণের মহিমা প্রচারের কথা তাঁর মনেও হয় নি। রামকৃষ্ণ যা বলতেন যা করতেন, সে সবই শ্রীম'র কাছে পবিত্র মনে হ'ত। যা তিনি দেখেছেন, শুনেছেন তার কিছুই বাদ দেন নি, বদলও করেন নি। কথামৃতের বিবরণের মধ্যে রামকৃষ্ণকে আমরা অখণ্ড চৈতন্যসত্তারূপে প্রত্যক্ষ করি। কখনও তিনি ঈশ্বরবৎ ; কখনও বালকবৎ ; কখনও মহান, কখনও বিচিত্র ; কখনও সর্বোচ্চ জ্ঞানের কথা বলছেন, কখনও জীবজন্তুদের নিয়ে কৌতুককর নীতিগল্প শোনাচ্ছেন। কখনও উন্মাদবৎ হয়ে নৃত্যগীত করছেন, কখনও বা আনন্দাতিশয়ে মাতালের মতন স্খলিত চরণে পথ চলেছেন। যখন ভক্তদের ভর্ৎসনা করছেন তখন কী প্রগাঢ় পরিণত জ্ঞান! কিন্তু পরক্ষণেই হয়ত কটিদেশের বস্ত্রখণ্ডটি শিথিল হয়ে গেল, আর বালকের মতন নগ্ন হয়ে তিনি পথ হাঁটতে লাগলেন।

যারা ঈশ্বরজ্ঞান পেতে চাইত রামকৃষ্ণ তাদের দর্শন দিতেন। এদের কারো মধ্যে যশোলিপ্সা দেখলে, পুঁথিগত জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ দেখলে, কিংবা যারা অনাসক্তির ভান করে ইহসুখের প্রতি লালায়িত হয়, তাদের প্রতি তাঁর আচরণে এতটুকু বিদ্বেষ থাকত না। কিন্তু

নবব্রতীদের সম্পর্কে তাঁর শাসন খুব কঠোর হ'ত। কারণ, তিনি জানতেন যে, ত্রুটিগুলি শোধন করে নিলে নবব্রতীরা শুদ্ধ হবে। যারা যথার্থই জ্ঞানী তাদের কাছে রামকৃষ্ণ খুব সহজ হতেন। বলতেন, যারা নেশা করে তারা নেশাখোরদের সঙ্গই ভালবাসে। শিশু বালকদের যেমন ভালবাসতেন তেমনি তাদের সমীহও করতেন। এই সহাস্যপ্রেমের এক অপরূপ বৃত্তান্ত শ্রীম কথামৃততে উল্লেখ করেছেন। ঘটনার তারিখ ৩রা জুলাই ১৮৮৪। ছয় কি সাত বছরের এক বালিকা রামকৃষ্ণকে প্রণাম করলো। কিন্তু রামকৃষ্ণ খেয়াল করেন নি। মেয়েটি তাই ধমক দিয়ে বললো, 'আমি নমস্কার করলুম, দেখলে না?' এই ব'লে বালিকা আবার তাঁকে নমস্কার করলো। রামকৃষ্ণও তখন হাসতে হাসতে বালিকাকে প্রতিনমস্কার করলেন। পরে বালিকাকে একখানি গান শোনাতে বললেন। বালিকা বললো, 'মাইরি, গান জানি না।' রামকৃষ্ণ আবার তাকে গান গাইতে বললেন। বালিকা বললো, 'মাইরি বললে আর বলা হয়?' রামকৃষ্ণ তখন নিজেই গান ধরলেন। সবাই আনন্দ করছে, হাসছে। রামকৃষ্ণ গাইলেন, 'আয় লো তোর খোঁপা বেঁধে দি/তোর ভাতার এলে বলবে কি!' গান শেষ ক'রে রামকৃষ্ণ ভক্তদের বললেন, 'পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ বছরের বালকের মতন। সব চৈতন্যময় দেখে।' আরও বললেন, 'একবার কামারপুকুরে ছিলাম। আমার ভাইপো শিবরাম তখন আমার কাছে। চার পাঁচ বছর বয়স তার। একদিন পুকুরের ধারে ফড়িং ধরছিল। বাতাসে পাতা নড়ছে; পাছে পাতার শব্দে ফড়িং উড়ে যায় তাই পাতাকেই বললো, "চোপ্! আমি ফড়িং ধরবো!" আর একদিন; সেদিন খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে; আমার সঙ্গে সে ঘরের ভেতরে রয়েছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—তবুও দরজা খুলে বাইরে যেতে চায়। আমি বকার পর আর বাইরে গেল না। কিন্তু দরজা দিয়ে উঁকি মেরে এক একবার বিদ্যুৎচমক দেখে আর দৌড়ে আমার কাছে এসে বলে, "খুড়ো, আবার চকমকি ঠুকছে।"'

কথামৃতের যে কাহিনী তা নিত্যকালের। এ আখ্যায়িকায় অতীত নেই, ভবিষ্যতও নেই। বর্তমানই এর কাল। আমরা অধিকাংশ মানুষ অতীত ও ভবিষ্যতের ভাবনাতেই মগ্ন থাকি। হয়, যা ঘটে গেছে তার জন্য দুঃখবোধ করি, নয়ত আগামী দিনের প্রত্যাশা নিয়ে সুখস্বপ্ন দেখি। শ্রীম তাঁর কথামৃতে এমন এক সত্তার কথা বলেছেন, যিনি নিত্যভাবে বর্তমানের মধ্যে বিরাজ করছেন। বাস্তবিক, ঈশ্বরের অস্তিত্বে অতীত বা ভবিষ্যত থাকে না। তিনি ছিলেন বা থাকবেন তা নয়, তিনি সর্বক্ষণই আছেন। রামকৃষ্ণের সান্নিধ্য পাবার অর্থ হলো সেই বর্তমানের মধ্যেই থাকা। সেদিন দক্ষিণেশ্বরে যাঁরা আসতেন তাঁরা সবাই যে এই সত্যটি উপলব্ধি করতেন তা নয়। কিন্তু শ্রীম তাঁর প্রথম দর্শনের দিনটি থেকেই সত্যটি যথাযথ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই রামকৃষ্ণের কাছাকাছি হবার সুযোগটি তিনি ভাগ্যের কৃপা ব'লেই ধরে নিয়েছিলেন। আখ্যায়িকার প্রতিটি বর্ণনার মধ্যেই তাই আমরা একজন নগণ্য স্কুল মাস্টারের বিস্ময়মুগ্ধ কৃতার্থ মনের পরিচয় পাই, পাই তাঁর শ্রদ্ধা। প্রতিটি ঘটনারই অন্তর্গত মাহাত্ম্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তিনি বর্ণনা করেছেন। অতি তুচ্ছ বর্ণনার মধ্যেও যে যাদু আছে তা পাঠ ক'রে আমরা প্রমোদিত হই। সেইরকম তুচ্ছ এক ঘটনার বিবরণ কথামৃত থেকে উদ্ধৃত করছি:

'গাড়ি চলিতে লাগিল। ইংরেজটোলা। সুন্দর রাজপথ। পথের দুই দিকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা। পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, অট্টালিকাগুলি যেন বিমল শীতল চন্দ্রকিরণে বিশ্রাম

করিতেছে। দ্বারদেশে বাষ্পীয় দীপ, কক্ষ মধ্যে দীপমালা, স্থানে স্থানে হার্মোনিয়াম, পিয়ানো সংযোগে ইংরেজ মহিলারা গান করিতেছে। ঠাকুর আনন্দে হাস্য করিতে করিতে যাইতেছেন। ঠাকুর হঠাৎ বলিলেন, "আমার জলতৃষ্ণা পাচ্ছে; কি হবে?" কি করা যায়। নন্দলাল ইণ্ডিয়া ক্লাবের নিকট গাড়ি থামাইয়া উপরে জল আনিতে গেলেন, কাঁচের গ্লাসে করিয়া জল আনিলেন। ঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন; "গ্লাসটি ধোয়া তো?" নন্দলাল বলিলেন, হাঁ। ঠাকুর সেই গ্লাসে জল পান করিলেন।

বালকের স্বভাব। গাড়ি চালাইয়া দিলে ঠাকুর মুখ বাড়াইয়া লোকজন গাড়ি-ঘোড়া চাঁদের আলো দেখিতেছেন। সকল তাতেই আনন্দ। পিয়ানো সংযোগে ইংরেজ মহিলারা গান করিতেছেন। তাহাতেও আনন্দ।'

রামকৃষ্ণকে অনেক রূপে অনেক পরিমণ্ডলে শ্রীম আমাদের দেখিয়েছেন। তাঁকে দিনে দেখিয়েছেন, রাত্রে দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে, বলরাম-ভবনে এবং অন্য ভক্ত-গৃহেও। দেখিয়েছেন কেশব সেনের সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহারে, দেখিয়েছেন কলকাতার রাস্তায় অশ্বশকটে। অনেক মানুষ তাঁর কাছে আসতেন। শিষ্যেরা আসতেন, আসতেন গৃহীভক্তেরাও, আবার সাধারণ দর্শনপ্রার্থী মানুষও আসতেন। রামকৃষ্ণের কাছে এদের জানবার বিষয় একরকমই হ'ত; তাই রামকৃষ্ণের উত্তরের মধ্যেও পুনরুক্তি থাকত। শ্রীম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব ঘটনাই লিপিবদ্ধ করেছেন; এমনকি রামকৃষ্ণ যে গানগুলি বারবার গাইতেন তারও যথাযথ নকল রেখেছেন। নবাগত পাঠকের কাছে কথামৃতের এই পুনরুক্তিদোষ প্রথম প্রথম একঘেয়ে মনে হতে পারে; কিন্তু যথেচ্ছ পাঠের বদলে পাঠক যদি ধারাবাহিক ভাবে গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তাহলে প্রত্যহের খুঁটিনাটির মধ্যেই জীবনধারার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহটি তিনি খুঁজে পাবেন। যিনি কখনও পুনরুক্তি করেন না তিনি যত্ন ক'রে জীবনকে শিল্পমণ্ডিত ও পরিচ্ছন্ন করতে সক্ষম হলেও প্রাণের ছোঁয়া সেখানে থাকে না।

প্রথম অধ্যায় থেকেই রামকৃষ্ণের শিক্ষণ-ধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়ে যায়। প্রতিটি নীতি-উপদেশের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়ে মুখ্য বাণীগুলি তিনি ভক্তদের বুঝিয়ে দিতেন। কখনও আপন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা সরাসরি ব্যক্ত করে ভক্তদের উপদেশ দিতেন, কখনও বা উপাখ্যান সহযোগে উপদেশ দিতেন। এইসব গল্প-উপাখ্যান বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জের জীবনধারার মধ্যে থেকেই কুড়িয়ে আনা। তার মধ্যে যেমন কৌতুক থাকত, তেমনি থাকত সংসারের কঠিন বাস্তব-জ্ঞানের সঙ্গে মিশ্রিত আধ্যাত্মিকজ্ঞান। যেমন, 'সাপ ও তার ফোঁস' করার গল্প। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে শ্রীম ছিলেন মুখ্যত গৃহীভক্ত—সুতরাং রামকৃষ্ণ তাঁর সন্ন্যাসী ভক্তদের যে উপদেশগুলি দিয়েছেন তার উল্লেখ কথামৃতে নেই। কথামৃতের মধ্যে আমরা যা পাই সে সবই সংসারীভক্তদের জন্য।

তা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণের যথার্থ ভাবরূপটি, সন্ন্যাসী গৃহী সব ভক্তই দেখেছেন। তাঁর সমাধিভাব এবং সেই ভাবঘনরূপের মধ্যে কখনও আত্মকথন, কখনও উদ্দীপন এবং সেই আরূঢ়ভাবে অবস্থিত থেকে নৃত্যগীত—এসব দর্শনে শুধু যে সন্ন্যাসী এবং গৃহী ভক্তেরা ধন্য হয়েছেন তা নয়, দক্ষিণেশ্বরে হঠাৎ এসে পড়া সাধারণ মানুষও এই দুর্লভ দর্শন লাভ করে রোমাঞ্চিত হয়েছেন। এই চিদানন্দরূপটিই তাঁর যথার্থ পরিচয়। ঈশ্বর যে আছেন তা তাঁর

এই দিব্যভাবরূপের মধ্যেই প্রতিফলিত হ'ত। অতি বড় জড়বুদ্ধিসম্পন্ন কিংবা অনুভূতিহীন মানুষ ছাড়া আর সবাই সেদিন এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর ভাবরূপের কাছে সারগর্ভ সব উপদেশই ম্লান হয়ে গেছে।

প্রতিটি দর্শনের পরেই রামকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাণীগুলি শ্রীম আদ্যোপান্ত টুকে রাখতেন। কথিত আছে, দর্শনের পরের তিনটি দিন চলে যেত সেগুলি লিপিভুক্ত করতে। তবুও পুস্তিকাকাবে প্রকাশের আগে উপকরণগুলি সাজাতেই তাঁর জীবনের শেষ পঁয়ত্রিশটি বছর কেটে যায়।

শ্রীম প্রথমদিকে পুস্তিকা প্রকাশে একেবারেই আগ্রহ দেখান নি। তিনি বলতেন, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনেই তিনি এই দিনলিপি রচনা করেছেন। কিন্তু পরে, অনেকগুলি কারণের সম্মিলিত প্রেরণায়, তাঁকে মত বদলাতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ দেহরক্ষা কবেছেন; নবীন সন্ন্যাসীরা বরানগরে মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তখন শ্রীমই ছিলেন তাঁদের একমাত্র বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী। সে সময় শ্রীম দুটি ইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। একটির বেতন দিয়ে সংসার চালাতেন; অন্য বেতনের সবটুকু মঠের ভাইদের প্রতিপালনে ব্যয় করতেন। মঠের এইসব ভাইরাই শ্রীমকে দিনলিপি প্রকাশে উৎসাহ দিতেন। তবুও গ্রন্থপ্রণয়নে শ্রীম তেমন ব্যাকুল হন নি। এব অনতিকাল পরেই সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাটি ঘটে এবং শ্রীম তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হন। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীমা সারদা দিনলিপিটি শুনতে চাইলেন। সম্পূর্ণ শোনার পর মাতা সারদা খুশিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সম্পূর্ণ লিপিটি ছেপে প্রকাশ করতে আদেশ দেন। জগন্মাতার সে আদেশ শ্রীম শিরোধার্য করেছিলেন।

১৮৯৭ সালে দিনলিপির অংশবিশেষ নিয়ে শ্রীম ইংরেজী তর্জমা ও টীকাসহ দুটি ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। পুস্তিকা দুটির রচনাভঙ্গি কিঞ্চিৎ অদ্ভূত ছিল। শ্রীম অনুমান করেছিলেন যে এমন সংকলনের ভাষা অপ্রচলিত শব্দভাণ্ডারে ঋদ্ধ হওয়া দরকার। উদাহরণস্বরূপ তাঁর প্রথম সাক্ষাতের শেষ বচনটি উদ্ধৃত করছি:

অল্পক্ষণ পবে শ্রীম ঠাকুরকে নমস্কার করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বিদায় দিয়া বলিলেন, 'আবার আইস।'

কিন্তু বিবেকানন্দ অত্যুল্লাসে পত্র লিখলেন। পত্রের সে ভাষা অননুকরণীয় এবং প্রশংসায় মুখর। তিনি লিখলেন: 'cest bon mon ami (বেশ হচ্ছে, বন্ধু)—এখন আপনি ঠিক কাজে হাত দিয়েছেন। হে বীর আত্মপ্রকাশ করুন। জীবন কি নিদ্রাতেই অতিবাহিত হবে? সময় যে বয়ে যায়! সাবাস, এই তো পথ!' তবুও, সকলের অভিমত হলো যে, রামকৃষ্ণের বাণীগুলি মাতৃভাষায় রচিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পাঠক তাঁর মুখে বাংলা কথা শুনলে খুশি হবে। শ্রীম তাই স্থির করলেন যে, বাংলাভাষাতেই কথামৃত প্রকাশ করবেন। তিন চারটি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বিবরণীগুলি টীকাসহ ছাপা হতে লাগল। ১৯০২ সালে ত্রিগুণাতীতানন্দ সবগুলি মুদ্রিত অংশ একত্র করে এক খণ্ডে প্রকাশ করলেন।

ক্রমে আরও চারটি খণ্ডে কথামৃত প্রকাশিত হলো। শেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীম'র দেহত্যাগের বছরটিতেই, অর্থাৎ ১৯৩২ সালে। শ্রীম খুব ধীরে ধীরে কাজ করতেন। একটি কারণ হলো যে, তাঁকে অন্য কাজও করতে হ'ত। ১৯০৫ সালে তিনি দি মর্টন ইন্সটিটিউশন

নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিনে নেন। অন্য কারণ হলো যে, এই কাজটিকে তিনি তপঃ-সাধনা মনে করতেন। যখনই লিখতে বসতেন, ধ্যানের দ্বারা মনটিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে নিতেন। যেদিন লিখতেন সেদিন একবেলা আহার করতেন।

শ্রীমর অনুরোধে ১৯০৭ সালে স্বামী অভেদানন্দ কথামৃতের ইংরেজী সংস্করণটি সম্পাদনার ভার নেন। স্বামী অভেদানন্দ সর্বপ্রথম ভাষাটি আধুনিক করলেন। এরপর বাংলা কথামৃত থেকে সরাসরি তর্জমা করে নতুন কয়েকটি অধ্যায়ও সংযোজন করলেন। কিন্তু তবুও গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হলো না। সম্পূর্ণ কথামৃত (ইংরেজী) পরবর্তী পঁচিশ বছরের আগে সংকলিত হয় নি। শ্রীম তাঁর বাংলা কথামৃততে ঘটনার তাৎপর্য অনুসারে সেগুলি আগে পরে করেছিলেন। স্বামী নিখিলানন্দের সম্পাদনায় ১৯৪২ সালে যে ইংরেজী সংস্করণটি প্রকাশিত হয়, তার বিন্যাস-রীতি প্রধানভাবে সাল তারিখ নির্ভর ছিল।

সেদিন শ্রীম যদি জানতেন যে, অল্‌ডাস হাক্সলী একদিন তাঁকে জীবনী লেখক বসওয়েলের সঙ্গে তুলনা করবেন এবং 'কথামৃত'কে জীবনীসাহিত্যের মধ্যে অদ্বিতীয় সৃষ্টিরূপে অভিহিত করবেন, তাহলে অবশ্যই তিনি আত্মশ্লাঘায় অভিভূত হতেন। তবে একথা ঠিক যে, হাক্সলীর এই স্তুতিবাদ ঘটনার স্বীকৃতি ছাড়া অন্য কিছু না। পরবর্তী যুগের মানুষের সেবায় শ্রীম যে কাজটি ক'রে গেছেন তাকে বাড়িয়ে বলার প্রয়োজন নেই। তেমন একটি মহৎ কাজের দায়িত্ব পেলে যে কোনো আত্মগর্বিত লেখকই বিনয়ে গদগদ হয়ে উঠতেন। অবশ্য শ্রীমর মধ্যে এতটুকুও আত্মশ্লাঘা দেখা যায় নি।

রামকৃষ্ণের এই জীবনাদর্শ গৃহীভক্তদের জন্যই তিনি (শ্রীম) প্রচার করে গেছেন। আমরা তাঁকে একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত এবং যোগ্য শিক্ষকরূপে জানি। এও জানি যে, মর্যাদার সঙ্গেই তিনি শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তবুও নিজেকে তিনি অন্যের সমকক্ষ ভাবতেন না; নিজেকে সকলের দীন সেবক মনে করতেন। এমন বাসনাশূন্য একজন মানুষকে সংসার কোনো কিছু দিয়েই জয় করতে পারে না; এমনকি ভালবাসা দিয়েও নয়। তবুও যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই শ্রীমকে ভালবেসেছেন। শোনা যায়, বড় বড় অট্টালিকার গাড়ি বারান্দার নিচে তিনি নিজের বিছানাটি পেতে গৃহহীনদের মধ্যে রাত কাটাতেন। শ্রীম নিজেকে রামকৃষ্ণের নীতিগল্পের সেই দাসীটির মতো ভাবতেন, যে পরের ঘরে কাজ করলেও মনে মনে জানতো তার আসল ঘর অন্যত্র।

শ্রীম'র প্রয়াণ হয় ৪ঠা জুন ১৯৩২। যাবার বেলায় তাঁর শেষ কথাটি ছিল, 'মা—ঠাকুর, আমাকে তোমাদের কোলে তুলে নাও!'

২০

শেষের বছরটি

১৮৮৫—সেবার বছরের শুরুতেই হঠাৎ খুব গরম পড়ে গেল। গরমে রামকৃষ্ণ কষ্ট পেতে থাকলেন। ভক্তেরা তাই বরফ ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনিও বরফ খেয়ে বেশ আরাম পাচ্ছেন। শরবত বা অন্য পানীয়ের সঙ্গেও রামকৃষ্ণ বরফ খেতেন। কিন্তু ক'টা মাস যেতে না যেতেই, অর্থাৎ এপ্রিলের শেষাশেষি তাঁর গলদেশে বেদনা দেখা দিল। সবাই ভাবলেন বোধহয় বরফ ব্যবহার করেই তাঁর এই কষ্ট। স্বভাবতই ভক্তেরা এ ব্যাপারে নিজেদেরই দায়ী করলেন।

কিন্তু রামকৃষ্ণের এ ক্লেশের কারণ গুরুতর গলক্ষত। চিকিৎসা হলো বটে কিন্তু ক্লেশের উপশম হলো না। বরং রোগ নতুন আকার নিল। অধিক কথা বলা অথবা ভাবাবিষ্ট অবস্থায় থাকা মানেই রোগবৃদ্ধি—সুতরাং ডাক্তারেরা তাঁকে সংযত হতে পরামর্শ দিলেন। সমাধিস্থ অবস্থায় গলদেশে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় ব'লে ওই ভাবটি বর্জন করতে বললেন।

মে মাসে পাণিহাটি গ্রামে বৈষ্ণব ভক্তেরা প্রতি বৎসর উৎসব করেন। শ্রীচৈতন্যের প্রধান শিষ্য শ্রীনিত্যানন্দের স্মরণেই এই উৎসবানুষ্ঠান। চৈতন্যের গৃহীভক্ত রঘুনাথ এই দিনটিতেই গঙ্গাতীরের গ্রামে নিত্যানন্দকে আপ্যায়িত করেছিলেন। নিত্যানন্দের প্রেরণা পেয়ে এবং শ্রীচৈতন্যের অনুমতি নিয়ে রঘুনাথ সংসার ত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাসী হন।

এর আগে বহুবার রামকৃষ্ণ এই উৎসবে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু সেবার ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যভক্তদের 'হরিনামের হাট বাজার' দেখাতে তাঁর বড় সাধ হলো। পথের ঝুঁকি এবং অসুখের কথা ভেবে অনেকে আপত্তি করলেও রামকৃষ্ণ তা মানলেন না। সামান্য পথ। সকাল সকাল যাত্রা করে দুএক ঘণ্টা উৎসবে কাটিয়ে ফিরে আসবেন। যাতে ভাবসমাধি না হয় কিংবা হরিসংকীর্তনে যোগ না দেন—সে ব্যাপারেও সাবধান হবেন, বললেন। সকলের মতন রামকৃষ্ণও জানতেন যে, কীর্তনে যোগ দিলে তাঁর ভাবাবেশ হয় এবং তাঁর গলদেশের বেদনা বেড়ে যাবার আশঙ্কা নিশ্চিত হয়ে ওঠে।

পাণিহাটি গ্রামে নৌকা থেকে নেমে দলবল নিয়ে রামকৃষ্ণ স্থানীয় এক জমিদারের বাড়িতে অতিথি হলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর সবাইকে নিয়ে তিনি রাধাকান্ত-মন্দির দেখতে গেলেন। নাটমন্দিরে পৌঁছে রাধাকান্তজীকে দর্শন করতে তাঁর কোনো কষ্ট হলো না। উঠানে সেদিন একদল কীর্তনীয়া হরিসংকীর্তন করছিল। এক স্থূলবপু বৈষ্ণব অঙ্গভঙ্গি করে ভাবাবেশে নাচছিল। তার ভাবাবেশের ধরন দেখে রামকৃষ্ণ মৃদু হাসলেন, তারপর পাশে দাঁড়ানো নরেনের কানে কানে বললেন, 'ঢং দ্যাখ্!' রামকৃষ্ণ যে তখন পর্যন্ত ভাবদমন করে সামলে-সুমলে চলেছেন, তা দেখে ভক্তেরাও নিশ্চিন্ত। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর অন্য মূর্তি। প্রায় লাফ দিয়ে তিনি কীর্তনীয়াদের দলের মধ্যে গিয়ে পড়লেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সমাধিস্থ হ'য়ে গেলেন। ভক্তেরা অবাক। তাড়াতাড়ি নাটমন্দির

থেকে নেমে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন ; এ ছাড়া আর কীই-বা তাঁরা করবেন ! নব্যভক্তের দলে সেদিন শরৎ (সারদানন্দ) ছিলেন। রামকৃষ্ণকে দিব্যভাবাবেগে নৃত্য করতে দেখে তিনিও স্তম্ভিত। সেই নৃত্যরূপের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন সত্যই তা আমাদেরও স্তম্ভিত করে দেয়। তিনি বলেছেন যে, অর্ধভাবাবেশে নৃত্য করতে করতে রামকৃষ্ণ সেদিন একবার এগিয়ে যাচ্ছিলেন একবার পিছিয়ে আসছিলেন। একদিকে প্রচণ্ড বিক্রম, অন্যদিকে মাধুর্য। মনে হচ্ছিল যেন কখনও তিনি সিংহবিক্রমে দাপাদাপি করছেন, কখনও 'সুখময় সায়রে' মীনের মতন স্বচ্ছন্দে ছুটোছুটি ক'রে জলে সাঁতার কাটছেন। যেন তাঁর শরীরটি কঠিন হাড়ের উপাদানে গঠিত নয় ; বুঝি আনন্দসাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে এবং তাঁর শরীরমধ্যে সেই তরঙ্গ প্রত্যক্ষ হচ্ছে।

এইভাবে আধঘণ্টা কেটে গেল ; রামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হলেন। ভক্তেরা তখন তাঁকে কীর্তনীয়াদের মাঝ থেকে সরিয়ে আনলেন। স্থির হলো কাছাকাছি কয়েকটি বিগ্রহ দর্শন করে তাঁরা নৌকায় ফিরে যাবেন। রামকৃষ্ণও রাজী। কিন্তু কীর্তনদল ছেড়ে যেমনি তাঁরা খানিকদূর গেছেন, দেখলেন যে, কীর্তনীয়ারাও মহোৎসাহে নামগান করতে করতে তাঁদের পিছনে পিছনে আসছে। রামকৃষ্ণের পক্ষে তখন আর ওদের এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি দু'এক পা হাঁটেন আর ভাবাবেশে স্থির হয়ে দাঁড়ান। সবাই সেই অর্ধভাবাবেশ স্তম্ভিত হয়ে দেখছেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। কাহিনীর আরম্ভে যে অনন্যসাধারণ চৈতন্যসত্তার কথা বলেছি যেন সেই ভাবেরই প্রকাশ হচ্ছিল তাঁর সেইদিনের ভাবরূপে। সেই অনুপম দেহসুষমা যেমনটি দেখেছিলেন তেমনটি বর্ণনা করেছেন সারদানন্দ। 'তাঁহার উন্নত দেহ প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু মনে হইতেছিল। তাঁহার গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল দেখাইতেছিল এবং গৈরিক বর্ণের পরিধেয় গরদখানি ওই অপূর্ব দেহকান্তের সহিত পূর্ণসামঞ্জস্যে মিলিত হইয়া তাঁহাকে অগ্নিশিখা বলিয়া ভ্রম হইতেছিল।' কীর্তনীয়ারাও সেই দিব্যোজ্জ্বল শ্রী দেখে মন্ত্রমুগ্ধ। নিত্যানন্দের উদ্দেশে রচিত গানখানি রামকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁরা গেয়ে উঠলেন :

সুরধনীর তীরে হরি বলে কে রে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে !
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে ?
এই আমাদের প্রেমদাতা নিতাই এসেছে !

কীর্তনীয়ারা যতবার শেষ ছত্রটি গাইলেন ততবারই রামকৃষ্ণের দিকে আঙুল তুলে বলতে লাগলেন। 'এই আমাদের প্রেমদাতা !' আর তাঁকে ঘিরে মহানন্দে নাচতে লাগলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য ! উৎসবের সমবেত মানুষ রামকৃষ্ণের সেই দিব্যজ্যোতি দর্শন ক'রে মহোল্লাসে তাঁকে ঘিরে নৃত্য করতে লাগল।

সবাই যখন নৃত্য করছে তখন কোথা থেকে একজন কদাকার ভেকধারী মানুষ, এক স্ত্রী ভক্তের হাত থেকে এক মালসা প্রসাদ নিয়ে নিজের হাতে রামকৃষ্ণের মুখে গুঁজে দিল। রামকৃষ্ণের তখন পূর্ণ ভাবাবেশ ; তাই ভেকধারী কদাকার মানুষটির ছোঁয়া পাওয়া মাত্রই তাঁর ভাবভঙ্গ হলো। তিনি শিউরে উঠে থু থু করে মুখের প্রসাদ ফেলে মুখ ধুয়ে ফেললেন। ভক্তেরা বুঝতে পারল যে ভেকধারী নিশ্চয়ই ভণ্ড। এদিকে ভেকধারীও সকলের চোখ

এড়িয়ে সরে পড়েছে। রামকৃষ্ণ তখন আর এক ভক্তের হাত থেকে প্রসাদ নিয়ে মুখে দিলেন।

অগণিত ভক্তসহ গঙ্গাতীর অব্দি পৌঁছাতে রামকৃষ্ণের চার ঘণ্টা সময় লেগে গেল। সবে নৌকায় উঠবেন, এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। নবচৈতন্য মিত্র নামে রামকৃষ্ণের এক ভক্ত, ব্যাকুল হয়ে ছুটতে ছুটতে উন্মত্তের মতন তাঁর পায়ের উপর আছড়ে পড়ল এবং 'কৃপা করুন' ব'লে আবেগে কাঁদতে লাগল। তার ব্যাকুলতা দেখে রামকৃষ্ণ তাকে ভাবাবেশে স্পর্শ করলেন। সে ছোঁয়া পেয়ে নবচৈতন্যের বাহ্যজ্ঞান নিমেষের মধ্যে লুপ্ত হলো। ভাবাবেগে নবচৈতন্য নৌকায় উঠে রামকৃষ্ণের স্তুতি করতে করতে উদ্দাম হয়ে নাচতে লাগল। খানিকক্ষণ এইভাবে কাটবার পর রামকৃষ্ণ তার পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। নবচৈতন্য শান্ত হলো। এর আগে রামকৃষ্ণকে সে অনেকবার দর্শন করেছে কিন্তু তাঁর কৃপা পায় নি। কৃপাধন্য নবচৈতন্য এখন যেন অন্য মানুষ। ধীরে ধীরে ছেলের উপর সংসারের ভার দিয়ে গঙ্গাতীরে সাধনভজন করে সন্ন্যাসীর মতন সে জীবন কাটাতে লাগল।

পেনেটির উৎসব থেকে ফিরে আসার পর রামকৃষ্ণের গলক্ষত অনেক বেড়ে গিয়েছিল। পেনেটিতে সেদিন সারাদিন বৃষ্টি পড়েছে, রামকৃষ্ণও ভিজেছেন। তাই ডাক্তাররা ভাবলেন যে, জলে ভেজার জন্যই রামকৃষ্ণের এই বেদনা বৃদ্ধি। এদিকে দুষ্টুমি করে রামকৃষ্ণ তখন বলে বেড়াচ্ছেন যে, রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ কিছু পুরোনো ভক্তদের জন্যই রোগবৃদ্ধি হয়েছে। ভাবখানা, যেন এঁদের কেউ নিষেধ করলে তিনি পেনেটির উৎসবে যেতেন না। যাহোক, ডাক্তারবাবুরা গলার ভিতরে ও বাইরে লাগাবার জন্য একটি মলম ও প্রলেপের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু রোগের কোনো উন্নতি হলো না। ডাক্তারবাবুরা তখন রামকৃষ্ণকে কথা বলতেও নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু কে শোনে সে কথা?

এমনি করে আষাঢ় মাসটিও কেটে গেল, কিন্তু চিকিৎসায় কোনো ফল পাওয়া গেল না। এদিকে রামকৃষ্ণের গলদেশ তখন এত অধিক ফুলে উঠেছে যে, কোনোরকম শক্ত খাবার গলাধঃকরণ করা প্রায় অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামান্য দুধ এবং নরম করে রান্না সুজির পায়েস খেয়েই রামকৃষ্ণ ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন। ডাক্তারবাবুরা ততদিনে নিঃসন্দেহ যে, এ ক্ষত সাধারণ নয়। তাঁরা রায় দিলেন যে এ রোগের নাম 'ক্লার্জিম্যানস্ সোরথ্রোট।' মানুষজনকে দিবারাত্র ধর্মোপদেশ দেবার দরুন বাগযন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহার থেকেই এই রোগের উৎপত্তি হয়। রোগ নির্ণয় করে ডাক্তারেরা যেমন ওষুধপত্রের ব্যবস্থা দিলেন তেমনি দুটি ব্যাপারে তাঁকে সাবধান হতে বললেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ নিষেধগুলি মানতেন না। বাক্ সংযম করতেন না এবং প্রায়ই সমাধিস্থ হতেন। ধর্মপিপাসু মানুষ তাঁর কাছে এলে তিনি তাদের উপদেশ দিতেন এবং তারাও কৃতার্থ হ'ত। কিন্তু ধর্মপিপাসুদের' সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে যেতে লাগল। গলার বেদনায় অস্থির হয়ে ভাবাবিষ্ট রামকৃষ্ণ তাই জগন্মাতার কাছে মাঝে মাঝেই আক্ষেপ করতেন; বলতেন, 'এত লোক কি আনতে হয়? একেবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস। লোকের ভিড়ে নাবার-খাবার সময় পাই না। একটা তো ফুটো ঢাক—রাতদিন এটাকে বাজালে আর কদিন টিকবে?'

সেপ্টেম্বর মাসে রামকৃষ্ণের একজন স্ত্রীলোক ভক্ত সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্তদের জন্য তাঁর গৃহে

আহারাদির ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর সাধ রামকৃষ্ণও তাঁর গৃহে আহার করেন। তাই রামকৃষ্ণকে ডেকে আনবার জন্য স্বার্থপরের মতন তিনি একজন লোক পাঠালেন। লোকটি ফিরে এসে জানালো যে রামকৃষ্ণের গলদেশ থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই ভীত, স্তব্ধ। নরেনও সেখানে ছিলেন। সব শুনে তিনিও বেশ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন। তারপর সমবেত ভক্তদের দিকে চেয়ে বললেন, 'এতদিন ধরে যাঁকে নিয়ে আমাদের এত আনন্দ, এবার বুঝি তাঁর বিদায় নেবার পালা। আমার ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলেছি, বইপত্তরও ঘেঁটেছি—তাঁদের ধারণা এই কণ্ঠরোগ থেকেই ক্যানসার হয়। আজ আবার রক্ত পড়ল। মনে হচ্ছে ডাক্তাররা যা আশংকা করেছেন তাই ঠিক। যদি সত্যিই তা হয় তবে বলবো এ রোগের চিকিৎসা নেই।'

সেদিনই স্থির হলো যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। পরদিন সকালেই কয়েকজন গৃহীভক্ত দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বললেন যে, কলকাতায় এনে তাঁর চিকিৎসা করা হবে। রামকৃষ্ণ রাজী ; দিন কয়েকের মধ্যেই বাগবাজার অঞ্চলে একটি ছোট বাড়ি ভাড়া করা হলো। বাড়ির ছাত থেকে গঙ্গাদর্শন করা যায়। ভক্তেরা সবাই খুশি, কারণ রামকৃষ্ণ গঙ্গা দেখতে ভালবাসেন। কিন্তু বাড়ি দেখে রামকৃষ্ণ একটুও খুশি হতে পারলেন না। দক্ষিণেশ্বরের খোলামেলা মুক্ত পরিবেশে যিনি এতকাল বাস করে এসেছেন, তাঁর পক্ষে এই স্বল্প পরিসর গৃহে বাস করা মানে বন্দী হয়ে থাকা। এই অসহ্য বদ্ধ পরিবেশে তিনি একটি রাতও কাটাতে চাইলেন না। তখুনি পায়ে হেঁটে বলরামভবনে চলে এলেন। বলরাম তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং যতদিন না একটি ভালো বাড়ি পাওয়া যায় ততদিন তাঁর কাছে থাকতে অনুরোধ করলেন।

ইতিমধ্যে ভক্তেরা কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারদের দিয়ে রামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিয়েছেন। পরীক্ষা করে সবাই বুঝলেন যে এর নাম ক্যানসার এবং এ ব্যাধি দুরারোগ্য। তবে তাঁরা সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। ভক্তেরা জানেন যে, রামকৃষ্ণ অধিক ঔষধ ব্যবহার করতে পারেন না। সুতরাং সবাই স্থির করলেন যে, হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা হবে এবং তৎকালীন কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে চিকিৎসার ভার নিতে অনুরোধ করা হবে। কলকাতায় সে সময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার খুব চল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিধান হলো, যে ঔষধ দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করা হবে, সেই ঔষধ সেবন করলে সুস্থ মানুষের দেহেও রোগের একই লক্ষণ প্রকাশ হবে। তাছাড়া হোমিওপ্যাথিতে তিল পরিমাণ ঔষধ দিয়েই রোগনিবৃত্তি করা যায়, তাই অধিক ঔষধ ব্যবহারের সম্ভাবনাও কম। এইসব কারণে স্থির হলো যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনেই রামকৃষ্ণকে রাখা হবে।

এদিকে রামকৃষ্ণের কলকাতায় আসার খবরটি তখন লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিচিত অপরিচিত মানুষ দলে দলে তাঁকে দর্শন করতে বলরাম বসুর বাড়িতে আসছেন। রামকৃষ্ণ তাঁদের দর্শন দিচ্ছেন, ধর্মালোচনা করছেন—ভোর থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত চলছে এই দর্শন-দান। দুপুরের দিকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য আহার, বিশ্রাম ছাড়া রামকৃষ্ণ প্রায় সর্বক্ষণই ভক্তদের সঙ্গে আলাপাদি করতেন। যেন নিজের চিকিৎসা নয়। ভক্তদের সুবিধার জন্যই দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে তিনি কলকাতায় এসেছেন। বস্তুত, ভক্তদের অনেকেই তাঁর বাহ্যরূপ এবং ব্যবহার দেখে বুঝতো না যে, তিনি কত পীড়িত। রামকৃষ্ণও তা প্রকাশ করতে চাইতেন

না। ঈশ্বরের আলোচনায় সর্বক্ষণই আনন্দময় থাকতেন এবং থেকে থেকেই সমাধিস্থ হতেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই ৫৫শ্যামপুকুরস্ট্রীটে আর একটি বাড়ি ভাড়া করা হলো। বলরামভবনে দিন সাতেক থাকার পর রামকৃষ্ণ নতুন বাড়িতে চলে এলেন। তাঁর ও ভক্তদের বসার ঘরগুলি ছিল দোতলায়। আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের কিঞ্চিৎ অভাব হ'লেও একরকম মনোমত হলো বাড়িটি। সব হলো, কিন্তু পথ্য কে রাঁধবেন? রাঁধুনী কোথায়? সুতরাং দক্ষিণেশ্বর থেকে সারদাকে আনাবার ব্যবস্থা হলো। এর আগে এমনভাবে পুরুষ বেষ্টিত হয়ে সারদাদেবী কখনও থাকেন নি। এ যেন তাঁর কাছে এক চরম পরীক্ষা। তবুও তিনি এলেন, অসুবিধা সত্ত্বেও এলেন। ছাতে যাবার পাশে মাথাঢাকা একটি চাতাল ছিল। সেখানে বসেই তিনি রামকৃষ্ণের জন্য পথ্য রেঁধে দিতেন। পরিবেশনের সময় হয় কোনো পুরুষভক্ত সেগুলি নিয়ে যেতেন, নয়ত ঘর থেকে পুরুষদের সরিয়ে সারদাদেবী নিজেই অন্নব্যঞ্জন গুছিয়ে দিয়ে আসতেন। রাত্রে সবাইকে খাইয়ে তবে তিনি বিশ্রাম করতে নিজের ঘরটিতে যেতেন। সারা বাড়িতে শৌচাগার ছিল একটি। ফলে প্রত্যহ শেষরাতে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নান করে নিতেন।

দেখা গেল যে রামকৃষ্ণকে ডাক্তার সরকার চিনতেন। বেশ কিছুদিন আগে, মথুর বেঁচে থাকতে ডাঃ সরকার একবার মথুরের পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্য দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। তখনই রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। প্রথম দিনের পরীক্ষার পর ডাক্তার সরকার পারিশ্রমিক নিলেন। কিন্তু পরে যখন কথায় কথায় জানতে পারলেন যে, রামকৃষ্ণের সমুদয় চিকিৎসার ব্যয়বহন ভক্তেরাই করছেন, (হয় সংসারের ব্যয় কমিয়ে নয়ত স্ত্রীর সামান্য দু'একটি অলঙ্কার বন্ধক রেখে) তখন থেকে আর তিনি পারিশ্রমিক নিতেন না। প্রথম দিন রামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করে ডাক্তার সরকারের মনেই হয় নি যে, এই ব্যাধি দুরারোগ্য। বরং তাঁর মনে হয়েছিল যে কঠিন এবং দীর্ঘ হলেও এ ব্যাধি আরোগ্যসাধ্য।

ঠাকুরের জন্য ভক্তেরা সবাই একত্র হয়ে যে কোনো ত্যাগস্বীকার করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ততই তাঁরা ঠাকুরের ব্যাধি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। শেষে তিন দলে ভাগ হয়ে তিনভাবে তাঁরা ঠাকুরের ব্যাধির বিচার করতে বসলেন।

প্রথম দলের নেতা ছিলেন গিরিশ। তাঁর দলের ধারণা হলো যে, যুগাবতার রামকৃষ্ণের এই ব্যাধি মিথ্যা ভান মাত্র। উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জেনেশুনে তিনি এই ভাব গ্রহণ করেছেন। যখনই কামনা করবেন আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবেন। নিরোগ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন।

দ্বিতীয় দলের মত হলো যে, জগন্মাতার ইচ্ছার অনুগত হয়েই রামকৃষ্ণ এই ব্যাধিভাব গ্রহণ করেছেন। তিনি মায়ের হাতের যন্ত্র—যেমন বাজান তেমন তিনি বাজেন। মায়ের নিগূঢ় ইচ্ছায় জনকল্যাণ সাধনের জন্যই তাঁর এই ব্যাধি। মায়ের সেই গূঢ় অভিপ্রায় কি, তা কেউ জানে না। সম্ভবত ঠাকুর নিজেও জানেন না। তবে একথা ঠিক যে, জগন্মাতার অভিপ্রায় সিদ্ধ হলে ঠাকুর আবার পূর্বাবস্থা ফিরে পাবেন।

তৃতীয় দলের প্রবক্তারা বিষয়টি নিয়ে এমন অদৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। ঘটনাটি তাঁরা বাস্তব দৃষ্টিতেই দেখতে চেয়েছিলেন। অজ্ঞেয়বাদী তাঁরা নন।

তবে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি সবই যখন শরীরের ধর্ম, তখন প্রাকৃতিক কারণেই শরীরকে তা ভোগ করতে হবে এবং বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসার সাহায্যেই সেগুলি দূর করতে হবে। এর মধ্যে অলৌকিকতা আরোপ করা কিংবা ঈশ্বরাদেশের জন্য অপেক্ষা করার কী প্রয়োজন? বলা বাহুল্য, শেষোক্ত মতের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন স্বয়ং নরেন এবং তাঁর ইয়ং বেঙ্গল সন্ন্যাসী শিষ্যের দল।

অচিরেই রামকৃষ্ণের প্রতি ডাক্তার সরকার আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। রামকৃষ্ণকে প্রায় প্রতিদিনই তিনি দেখতে আসতেন। লক্ষ্য করতেন তাঁর শারীরিক অবস্থা। এর জন্য অন্য রোগীদের সম্বন্ধে ডাক্তারবাবুর ঈষৎ অবহেলা ছিল। ডাক্তার সরকার বলতেন, 'তোমাকে আমি খুব বকাই ; সেটি ভালো না। অবশ্য বাকী সময় যদি তুমি কথা না ব'লে থাকতে পার তাহলে বিশেষ ক্ষতি হয় না।'

সরকার যখন জানলেন যে ভক্তেরা রামকৃষ্ণকে অবতার ব'লে মানেন, তখন তাঁর যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মন ভক্তদের এই বিশ্বাসটি যথেষ্ট সমীহ করতে পারে নি। শ্লেষ করে তিনি বলতেন, 'দেহান্বিত ঈশ্বর? সেটি কি বস্তু? তার মানে মল মূত্র ত্যাগ করা একজন মানুষের সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে? অসম্ভব!' সরকার বলতেন যে, সত্যের প্রতি রামকৃষ্ণের নিষ্ঠা ও প্রেমের জন্যই রামকৃষ্ণকে তিনি শ্রদ্ধা করেন।

অবশ্য ডাক্তারের চরিত্রের অন্য এক দিকও ছিল। ডাক্তার নিজেও তা জানতেন। শ্রীম'র কাছে তিনি বলেছিলেন, 'মনটা ছোট লোক ; একটুতেই পারবো না, হবে না, বলে বসে। কিন্তু প্রাণটা তেমন নয় ; সে পারবো না হবে না বলে না। ও কথায় সে সায় দেয় না বলেই তো যত কিছু সত্যের আবিষ্কার হয়েছে ও হচ্ছে!' ভক্তদের মধ্যে যারা আবেগপ্রবণ, মাঝে মাঝে তাদের নাড়া দেবার জন্যই তিনি যুক্তি দিয়ে তাদের উচ্ছ্বাসগুলি কাটাকুটি করে দিতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডাক্তার তাঁর মনটি খোলা রেখেছিলেন। অবৈজ্ঞানিক ব'লে ভাবের বস্তুগুলি অবজ্ঞাভরে উড়িয়ে দিতেন না। ভক্তিগীতি গাইতে গাইতে একদিন দু'জন যুবক ভক্তের ভাবাবেশ হয় এবং বাহ্য সংজ্ঞার লোপ হয়। ডাক্তার তখনই নাড়ি পরীক্ষা করে স্বীকার করলেন যে, ওদের বাহ্য জ্ঞান নেই। রামকৃষ্ণ তখন তাদের বুকে হাত বুলিয়ে ধীরে ধীরে ভগবানের নামগান করতেই, তারা আবার প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে। সেদিন ডাক্তার সরকার হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'এসব তোমারই খেলা।' রামকৃষ্ণ মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'আমার নয় গো। এসব তাঁরি ইচ্ছেয় হয়েছে।' সেবার দুর্গাপূজার সময় রামকৃষ্ণ যখন সমাধিস্থ হয়েছেন, তখন স্টেথো দিয়ে ডাক্তার তাঁর হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করেন। স্পন্দন তিনি পেলেন না। হাত দিয়ে রামকৃষ্ণের চোখের তারা স্পর্শ করলেন। তবুও ভাবের তারতম্য হলো না। ডাক্তার এইসব ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন, নথিভুক্ত করেছেন, কিন্তু কেন ঘটছে তার কারণ বুঝিয়ে বলতে পারেন নি।

ডাক্তারের প্রতি রামকৃষ্ণের শ্রদ্ধা ভালবাসার যেন অন্ত ছিল না। একদিন তাই ভাবাবেশে ডাক্তারের কোলে তাঁর চরণখানি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি খুব শুদ্ধ! তা না হলে পা রাখতে পারতুম না।' আরও বললেন যে, কেমন করে জগন্মাতা তাঁকে দেখিয়েছেন যে ডাক্তারের খুব জ্ঞান হবে। অবশ্য সে জ্ঞান নাকি শুষ্কজ্ঞান। পরে ডাক্তারের দিকে চেয়ে

রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'কিন্তু আমি বলছি, তুমি রোসবে।'

রামকৃষ্ণের পথ্য নিয়ে ডাক্তারের খুব কড়াকড়ি। একদিন এসে দেখলেন যে রোগ অনেক বেড়েছে। ভাবলেন নিশ্চয় পথ্যের অনিয়ম হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানলেন, ঠিক তাই। রামকৃষ্ণের জন্য ফুলকপি দিয়ে ঝোল রান্না করা হয়েছিল। তবে পথ্যের কড়াকড়ি করলেও ডাক্তার বুঝেছিলেন যে এ ব্যাধি দুরারোগ্য। ২৫শে অক্টোবর (১৮৮৫)—শ্রীম সেদিন ডাক্তারের সঙ্গে একলাই ছিলেন। শ্রীম তাঁকে নিভৃতে বললেন যে একজন ভক্ত মনে করেন যে, 'ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াবার জন্যই, রামকৃষ্ণ রোগগ্রস্ত হয়েছেন। ইচ্ছা করলে তিনি রোগমুক্ত হতে পারেন। সেদিন ডাক্তার সরকার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। শ্রীম'র দিকে চেয়ে বলেছিলেন 'আপনা থেকেই ব্যারাম ভালো হওয়া! অসম্ভব! এ রোগ যে দুরারোগ্য তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই।'

নভেম্বরের গোড়া। কালীপুজোর দিন এগিয়ে এসেছে। সাব্যস্ত হলো যে, রামকৃষ্ণের ইচ্ছে মতো তাঁর ঘরেই কালীপুজোর আয়োজন করা হবে। পুজার আয়োজন সম্পূর্ণ। সমস্ত উপকরণও আনা হয়েছে। জনা তিরিশ ভক্ত ব্যগ্র হয়ে রামকৃষ্ণের নির্দেশের অপেক্ষা করছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের যেন কোনো তাড়া নেই। দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছেন। হঠাৎ গিরিশ যেন এক দিব্য প্রেরণা পেলেন। তাঁর মনে হলো, তবে কি ঠাকুরের জীবন্ত দেহকে প্রতিমারূপে পুজো করে ভক্তেরা ধন্য হবে? আর সেকথা ভেবেই কি ঠাকুর পুজায়োজন করতে বলেছেন? কথাটি মনে হতেই ভাবোল্লাসে গিরিশ 'জয় মা' ব'লে চিৎকার ক'রে উঠলেন, তারপর চন্দনবাটা আর ফুল দিয়ে রামকৃষ্ণকে সাজিয়ে তাঁর চরণ দুটি বন্দনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের শরীরে যেন বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল এবং তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হলেন। গিরিশের পর একে একে শ্রীম, রাখাল প্রভৃতি ভক্তেরা ওইভাবে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। শ্রীম বলেছেন যে, তখন রামকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন এক জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি—দেবীর মতনই তাঁর একহাতে আশীর্বাদ অন্য হাতে অভয়।

রামকৃষ্ণের প্রতি গিরিশের গভীর ও বিশুদ্ধ ভক্তিভাবটি সকলের কাছে যেন দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্থূলভাবের মানুষের কাছে ব্যাপারটি একেবারেই পরিপাক-যোগ্য ছিল না। গিরিশের স্বভাব ও আচরণে ধর্মের প্রতি যে ব্যাকুলতা, সাধারণ মানুষ তাকে আবেগ ব'লে ভুল করতো। তাদের কাছে এই ব্যাকুলতার অর্থ হলো অশ্রুপাত কিংবা নাচগানের মাতামাতি। এমনকি রামকৃষ্ণের কাছে গিরিশের বকল্মা দেবার ব্যাপারটিও তারা সহজ আত্মসমর্পণ মনে করতো। কিন্তু নিজেকে সমর্পণ করা যে কত কঠিন তা তারা জানতো না।

অবশ্য সাধারণ মানুষের এই চপল মনোভাবটি নরেন তীব্রভাবে আক্রমণ করতেন। বার বার চোখে আঙুল দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কতদিনের কঠিন তপস্যা ও শরীর পীড়ক সাধনা করে তবে রামকৃষ্ণ এমন আধ্যাত্মিক উচ্চমার্গে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর ভাবাবিষ্ট সমাধিভাবটি যারা লঘু করে দেখতো, কিংবা ভাবালুতা মনে করতো, ধর্মচর্চাকে তারা হেয় প্রতিপন্ন করেছে। নরেন বলতেন, 'যত মানুষ ধর্মচর্চা করে তাদের

মধ্যে শতকরা আশীজন মানুষই ভণ্ড প্রতারক। শতকরা পনর জন মানুষ সাধনায় উন্মার্গগামী। অবশিষ্ট পাঁচজন সাধকই মাত্র সত্যকে সরাসরি জেনেছেন এবং কৃতার্থ হয়েছেন। অতএব সাবধান!'

প্রথম প্রথম ইয়ং বেঙ্গল ভক্তেরাও নরেনের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি; তাঁরা ভাবতেন নরেন অকারণ বাড়াবাড়ি করছেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, বেশীরভাগ ভক্তই সমাধি-অবস্থার বাহ্য লক্ষণগুলি নিয়ে মাতামাতি করে—ভাবোন্মত্ত হয়ে যাঁরা নৃত্য করেন তাঁদের অঙ্গভঙ্গি নকল করে। এইসব ভক্তদের সঙ্গে তর্ক করে নরেন বোঝাবার চেষ্টা করতেন যে, মূঢ় আবেগ সংযত করতে না পারলে তাদের আচরণ হয়ে উঠবে হিস্টীরিয়া রোগীদের মতন। নরেন তাদের পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে বীর্যবান হতে উপদেশ দিতেন। নরেনের উপদেশের ফল হাতে হাতেই মিললো। দেখা গেল, ভক্তদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাহ্য লক্ষণগুলি নিয়ে তারা আর মাতামাতি করে না। যারা নরেনের উপদেশ মানে নি তাদের জন্য নরেন অন্যরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের ভাবভঙ্গিগুলির এমন ব্যঙ্গাত্মক নকল তিনি করতেন যে লোকে তা দেখে হাসাহাসি করতো। তারাও লজ্জা পেত।

শ্যামপুকুরে থাকাকালীন রামকৃষ্ণের একদিন অদ্ভুত এক দর্শন হলো। তিনি দেখলেন তাঁর স্থূলদেহের ভিতর থেকে একটি সূক্ষ্ম শরীর বেরিয়ে এসে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সূক্ষ্ম-শরীরের পৃষ্ঠদেশে, বিশেষ গলার কাছে অনেকগুলি ক্ষতচিহ্ন। রামকৃষ্ণ অবাক, কেন এমন হলো? মা জগদম্বাকে জিজ্ঞেস করলেন। মা বুঝিয়ে দিলেন যে নানারকম দুষ্কর্ম করে লোকে তাঁকে স্পর্শ করে। তারা পাপভার মুক্ত হয় বটে কিন্তু তাদের পাপগুলি সংক্রামিত হয়ে তাঁর শরীরে নানা রোগক্ষত সৃষ্টি করে। মায়ের কথা শুনে রামকৃষ্ণ সেদিন একটুও বিচলিত হন নি। এবং বারবার বলতে লাগলেন যে, জীবের কল্যাণের জন্য তিনি লক্ষকোটি বার জন্ম নেবেন এবং জীবনধারণ করে দুঃখভোগ করবেন। অবশ্য নরেন প্রমুখ যুবক-ভক্তেরা সবকথা জানবার পর স্থির করেছিলেন যে, যতদিন না রামকৃষ্ণ সুস্থ হচ্ছেন তত-দিন নতুন দর্শনাকাঙ্ক্ষীদের তাঁর শ্রীদেহ স্পর্শ করতে দেবেন না। দর্শনপ্রার্থীর সংখ্যা কমাতে ভক্তেরা আরও স্থির করলেন যে, নিয়মিত ভক্তদের জানাশোনা ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ তাঁর দর্শনলাভের অধিকারী হবেন না।

ভক্তদের এই প্রয়াসটি গিরিশের মনোমত হয় নি। তিনি বলেছিলেন, 'চেষ্টা করছ করো, কিন্তু ঠাকুরকে আটকাতে পারবে না। কারণ, ঠাকুর ওই জন্যই দেহধারণ করেছেন।' বাস্তবিক তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যিনিই আসতেন তাঁর সঙ্গেই রামকৃষ্ণ ঈশ্বরীয় কথা বলতেন। একদিন একজন যুবককে সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যানরীতির কথা বোঝাতে গিয়ে রাম-কৃষ্ণ বললেন, 'তোকে আমি ধ্যানের সেই আসনটি দেখাতে পারছি না, কারণ ওই ভঙ্গিতে ধ্যানে বসলেই উদ্দীপন হয়। তখন বায়ু ঊর্ধ্বগামী হয়ে গলার ঘা বাড়িয়ে দেয়। যাতে সমাধিভাব না হয় ডাক্তার তা দেখতে বলেছে।' যুবক ভক্তটি ভয় পেয়ে বললো, 'তাহলে আমায় ওসব দেখাচ্ছেন কেন?' রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'আমি জানি এটুকুও আমার করা উচিত নয়। কিন্তু তোদের একটু আধটু না বলে দিলে পারি কই?'

সেবার (১৮৮৪) স্টার থিয়েটারে রামকৃষ্ণ চৈতন্যলীলা দেখতে গেছেন। যুবক চৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন একজন অভিনেত্রী। অভিনয়ের খুব প্রশংসা করলেন রামকৃষ্ণ এবং অভিনয় শেষ হতেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে যান। সেই ভাবাবিষ্টরূপ দেখে অভিনেত্রীও অভিভূত। তখনই রামকৃষ্ণের পাদবন্দনা করলেন। সেই দিন থেকেই মেয়েটি তাঁর ভক্ত হয়ে যায় এবং রামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান ব'লে মানতে শুরু করে। তারপর মেয়েটি যেদিন রামকৃষ্ণের কঠিন পীড়ার কথা শুনল, সেদিনই তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল।

সে যুগে বঙ্গ রঙ্গালয়ের নটীরা সমাজে মর্যাদা পেত না। সমাজের চোখে তারা ছিল বারনারী। শুধু বাংলাদেশ কেন, ইংল্যান্ডের সমাজেও এই সংস্কারটি, অন্তত উনিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত, অব্যাহত ছিল। এহেন অবস্থায় নটীনারীর দর্শনাভিলাষ যে পূর্ণ হবে এমন নিশ্চয়তা একেবারেই ছিল না। মেয়েটি তাই গিরিশের অনুগামী কালীপদ ঘোষের শরণাপন্ন হলো। গিরিশের মতো কালীপদও মনে করতেন যে রামকৃষ্ণের পীড়া, ভান মাত্র ; কারো ছোঁয়ায় রামকৃষ্ণের রোগবৃদ্ধির আশঙ্কা নেই। যাহোক, কালীপদর পরামর্শে মেয়েটি ইওরোপীয়দের অনুকরণে হ্যাটকোট পরে পুরুষের বেশ ধারণ করলো। সেযুগে নব্যবঙ্গের যুবকদের এটিই ছিল আদরের পোশাক। পুরুষের বেশ নিয়ে মেয়েটি কালীপদর পুরুষ বন্ধুরূপে শ্যামপুকুরে এসে পৌঁছাল। তাঁরা যখন রামকৃষ্ণের ঘরে ঢুকলেন, তখন অন্য ভক্ত দর্শক কেউ ছিল না। কালীপদ ঘরে ঢুকেই মেয়েটির আসল পরিচয় দিলেন। সব শুনে রঙ্গপ্রিয় রামকৃষ্ণ সেদিন খুব হেসেছিলেন। সাহস আর ভক্তি দেখে মেয়েটির প্রশংসাও করেছিলেন ; তারপর মেয়েটিকে কিছু তত্ত্বকথা শুনিয়েছিলেন। পরে মেয়েটি তাঁর পাদবন্দনা করলে রামকৃষ্ণ তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। ওরা চলে যাবার পর রামকৃষ্ণ আমোদ করে ঘটনাটি তাঁর শিষ্যদের কাছে বলেন। ব্যাপারটি ছলনা হলেও রামকৃষ্ণের নিষ্পাপ আনন্দ দেখে সেদিন কোনো ভক্তই রাগারাগি করতে পারে নি।

•

এদিকে দিনদিনই রামকৃষ্ণের অবস্থা খারাপ হতে লাগল। ডাক্তার সরকারের দৃঢ় ধারণা হলো যে, কলকাতার দূষিত বাতাসই এই রোগবৃদ্ধির কারণ। ডাক্তার তাই পরামর্শ দিলেন যে, শহরের বাইরে খোলামেলা মুক্ত পরিবেশে রোগীকে সরানো হোক। দিনকয়েকের মধ্যেই উত্তর শহরতলিতে ৯০ নম্বর কাশীপুর রোডের পাশে একটি উদ্যানবাটী ভাড়া নেওয়া হলো। এই সড়ক ধরে কিছুদূর উত্তরে গেলেই দক্ষিণেশ্বর। উদ্যানবাটীর মাসিক ভাড়া আশী টাকা। শ্যামপুকুরের বাটীভাড়ার চেয়ে অধিক ব'লে রামকৃষ্ণ একটু ক্ষুণ্ন। সেদিনই পরমভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্তিরকে ডেকে সব ব্যয়ভার নিতে বললেন। নইলে ছাপোষা ভক্তেরা এত টাকার ভার কেমন করে নেবে! সুরেন মিত্তিরও সানন্দে রাজী। ১৮৮৫র ১১ই ডিসেম্বর তারিখে অঘ্রাণ মাসের সংক্রান্তির ক'টা দিন আগে রামকৃষ্ণকে কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে নিয়ে আসা হলো। পৌষ মাসে যাত্রা নাস্তি ব'লেই সেদিন এই সামান্য তাড়াহুড়াটি করতে হয়েছিল।

উদ্যানবাটীর পরিবেশ বেশ মনোরম। সাড়ে চার একর অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ বিঘার মতন জমি নিয়ে বাগানবাড়ি। বাগানের মধ্যে আছে একটি ছোট ডোবা, একটি বড় পুকুর—আম, কাঁঠাল, লিচুর গাছ আর নানা শাকসব্জি। বসতবাটীটি দোতলা—শ্যামপুকুরের বাটীর

চেয়ে অনেক প্রশস্ত। (বিবেকানন্দ তখনই এই সম্পত্তিটি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধিকারে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৪৬ এর আগে সম্পত্তিটি কেনা সম্ভব হয় নি। তখন বাড়িটির প্রায় ভগ্নদশা। ফলে পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলে একই ছাতে নতুন ভবনটি তৈরি হয়।)

রামকৃষ্ণকে কাশীপুরে আনার পর সেবার কাজে আর এক সমস্যা দেখা দিল। বেশীরভাগ বালক ভক্তদেরই কলকাতায় বসবাস। নরেন তাই ঠিক করলেন যে বালকভক্তদের কাশীপুরের উদ্যানভবনেই থাকতে হবে এবং পালা করে রাত জেগে ঠাকুরের সেবা করতে হবে। এ ব্যবস্থায় বালকভক্তেরা রাজী হলেও অভিভাবকরা ঘোর আপত্তি করলেন। ফলে সেই প্রথম ভক্তদের সামনে পথ বেছে নেবার প্রশ্নটি বড় হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু কোন্ পথ? গৃহধর্মপালন না সংসার ত্যাগ করে ঠাকুরের সেবা এবং সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করা? নরেন কিন্তু তখনও সংসারচিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের সমস্ত দায় তখন তাঁর কাঁধে। তখনও তিনি ভাবছেন যে এ্যাটর্নি হয়ে মা-ভাইদের ভরণপোষণ করবেন, আর তাই আইন পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। অবশ্য পরে তিনি পরিকল্পনাটি বাতিল করে দেন। অবশেষে একদিন বইপত্তর নিয়ে কলকাতা থেকে কাশীপুরে চলে এলেন —উদ্দেশ্য নির্জনে আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

সে সময় কাশীপুর উদ্যানবাটীতে নরেনের উপস্থিতির খুব দরকার ছিল। ভক্তদের প্রেরণা দিতে, পথ দেখাতে, নরেনের উপদেশের অনেক মূল্য। ভক্তেরাও তাঁর উপর নির্ভর করতো, কারণ তাদের মনেও অনেক দ্বিধা অনেক সংশয়। তারা কি করবে? যে পথে তারা পা বাড়িয়েছে সেই কি তাদের সত্য পথ? তারা কি যথার্থই সন্ন্যাসী হতে চায়? তাদের পিতা মাতার চেয়েও কি তারা ঠাকুরকে বেশী জানে? যে ঠাকুরকে তারা ঈশ্বর মনে করে তিনি তো তাদের চোখের উপরেই ধীরে ধীরে লীন হয়ে যাচ্ছেন? তাহলে?···একদিন গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে ঠাকুরের পীড়া সংক্রামক। সেদিন যাদের সেবার পালা তারা পিছিয়ে এলো। সব কথা নরেনের কানে গেলে তিনি সবাইকে নিয়ে রামকৃষ্ণের ঘরে এলেন। ঘরের এক কোণে একটা কাপের মধ্যে রামকৃষ্ণের মুখ-লালা মেশানো খানিকটা ভাতের মণ্ড পড়েছিল। সকলের সামনেই নরেন সেই ভুক্তাবশেষটুকু তাঁর নিজের গলায় ঢেলে দিলেন।

একদিন রাত্তিরে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন নরেন। দেখলেন শরৎ ও আরও দু'একজন ভক্ত তখনও জেগে আছেন। সবাইকে ডেকে বললেন, 'চল্! তামাক খেতে খেতে বাগানে একটু ঘুরে আসি।' বাগানে বেড়াতে বেড়াতে নরেন বললেন, 'ঠাকুরের কাল্ব্যাধি; তিনি দেহরক্ষার সঙ্কল্প করেছেন কি না কে জানে? সময় থাকতে তাঁর সেবা আর ধ্যান-ভজন করে যে যতটা পারিস এগিয়ে যা, নতুবা তিনি সরে গেলে পরে অনুতাপ করতে হবে। এটা করবার পরে ভগবান ডাকবো, ওটা করা হ'য়েগেলে সাধন-ভজন করবো; দিনগুলো তো এইভাবেই কেটে যাচ্ছে আর বাসনাজালে জড়িয়ে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি! ওই বাসনাতেই সর্বনাশ, মৃত্যু। বাসনা ত্যাগ কর্, ত্যাগ কর্!' নরেন এবার এক গাছের তলায় বসলেন। তাঁকে দেখে আর সবাইও বসলেন। সামনেই পড়েছিল গাছের ভাঙা ডালপালার স্তূপ। সেগুলি দেখে নরেন বলে উঠলেন, 'দে, ওগুলোতে আগুন লাগিয়ে দে। সাধুরা এইরকম সময়ে ধুনি জ্বালান। আমরাও ওইভাবে ধুনি জ্বালিয়ে মনের বাসনা সব পুড়িয়ে দিই।' সবাই তখন ভাঙা ডালপালাগুলি জড়ো করে ধুনি জ্বালালেন। আগুন

যখন জ্বলে উঠল তখন তাঁদের মনে এক অপূর্ব উল্লাসের সৃষ্টি হলো। সবাই ভাবতে লাগলেন, এমনি করে মনের বাসনাসমূহ তাঁরা জ্বলন্ত আগুনে আহুতি দিলেন। একজন ভক্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'এমন তো আগে কখনও করি নি? এমন আনন্দ পাব তাও জানতাম না!' সবাই তখন স্থির করলেন যে অবসর পেলেই ধুনি জ্বালিয়ে তাঁদের মনের বাসনাগুলি পুড়িয়ে দেবেন। ডালপালা যখন সব ফুরিয়ে গেল তখন রাত প্রায় ভোর—কাদের পেটা ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে চারটে বাজছে।

কাশীপুরে আসার দিন কয়েকের মধ্যেই একটু সুস্থ বোধ করায় রামকৃষ্ণ একদিন বাগানে বেড়াতে গেলেন। ভক্তেরা সবাই খুশি—নিয়মিত এমন বেড়াতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবেন, শরীরে বল পাবেন। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। শরীর যেন আরও দুর্বল হয়ে পড়ল। তখন ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে কচি পাঁঠার মাংসের সুপ খেতে দেওয়া হলো। এই নতুন পথ্যে রামকৃষ্ণ খানিকটা উপকার পেলেন। পথ্য রান্নার ভার আগের মতন সারদা-দেবীর হাতেই ছিল। তবে তাঁকে সাহায্য করতে ইদানিং রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী ('রামেশ্বরের কন্যা) লক্ষ্মীকে আনিয়ে রাখা হয়েছিল।

সে যুগে কলকাতায় আর একজন অগ্রণী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর নাম রাজেন্দ্রনাথ দত্ত। এই রাজেন দত্তের উৎসাহেই ডাক্তার সরকার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে আকর্ষণ বোধ করেন। রাজেন দত্ত বুঝেছিলেন যে রামকৃষ্ণকে যদি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আরোগ্য করতে পারেন, তবে সেটি হবে এক যুগান্তকারী জয়। তাই ডাক্তার সরকারের অনুমতি নিয়ে তিনি একদিন রামকৃষ্ণকে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেন; তারপর ভেবেচিন্তে যে ওষুধটি বাছলেন তার নাম লাইকোপোডিয়ম ২০০। সে ওষুধ সেবন করে পরবর্তী ক'টি সপ্তাহে রামকৃষ্ণ আশ্চর্য রকমের ভালো ছিলেন। অচিরেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন ভেবে ভক্তেরাও আশান্বিত হয়ে উঠলেন।

ইতিমধ্যে ভক্তশিষ্যদের প্রতি রামকৃষ্ণের স্নেহ যেন অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ২৩শে ডিসেম্বরের সকালের একটি ঘটনা শ্রীম এইভাবে উল্লেখ করেছেন। 'আজ সকালে প্রেমের ছড়াছড়ি। নিরঞ্জনকে বলছেন, "তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসবো।" কালীপদর বক্ষ স্পর্শ করে বলছেন, "চৈতন্য হও।" দু'জন স্ত্রীলোক ভক্তকেও তিনি কৃপা করলেন। তাঁর কৃপা পেয়ে তারা কেঁদেই আকুল।'

সন্ধ্যা নাগাদ শ্রীমকে কাছে ডেকে রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এ অসুখটা কদিনে সারবে?' শ্রীম সোজা জবাবটি এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'পাঁচ ছ'মাস হতে পারে।' শ্রীম'র জবাব শুনে রামকৃষ্ণ আশ্চর্য। অধৈর্য হয়ে বললেন, 'সে কি গো? এত দিন?' তারপরই বললেন, 'আচ্ছা! এত ঈশ্বরীয় রূপদর্শন, ভাব, সমাধি! তবে এমন ব্যামো কেন?' অন্য কেউ হলে অনুরূপ অবস্থায় তার সঙ্গীসাথীদের বিরক্ত করতো।

রামকৃষ্ণ আরও বললেন, 'সেদিন এক দর্শন হলো। আমার খুব অসুখ। পায়েস খেয়ে থাকতে হবে। পরিবার পায়েস নিয়ে এলো। আমায় খাইয়ে দিচ্ছিল। তখন কাঁদলাম, বললাম—এই কি পায়েস খাওয়া! এই কষ্টে! যেন আমার শেষ খাওয়া!'

সেই মাসেই (ডিসেম্বর) শশধর পণ্ডিত কাশীপুরে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

শশধর বললেন, 'শাস্ত্রে বলেছে যিনি আপনার মতন পরমহংস তিনি ইচ্ছে করলেই রোগমুক্ত হতে পারেন। তা আপনি চেষ্টা করছেন না কেন ?'

রামকৃষ্ণ অবাক। পণ্ডিতের দিকে চেয়ে বললেন, 'এত গ্রন্থের প'ড়ে শেষ পর্যন্ত তুমি এই কথা বললে ? এ মন তো ভগবানে দেওয়া। ফিরিয়ে এনে আবার এই দেহে বসাই কি করে ?'

শশধর চুপ। কিন্তু শশধর চলে যাবার পর নরেন ইত্যাদি ভক্তেরা অনুরোধ করতে লাগলেন, যেন অন্তত তাদের মুখ চেয়েও রামকৃষ্ণ নিজেকে সারিয়ে তোলেন। রামকৃষ্ণ বললেন, 'তোরা কি ভেবেছিস আমি ইচ্ছে করে কষ্ট পাচ্ছি ? সেরে উঠতে তো আমিও চাই ! কিন্তু সবই যে মা জগদম্বার ইচ্ছে !' উত্তরে নরেন বললেন, 'তবে মাকে বলেন না কেন ? তিনি নিশ্চয়ই আপনার কথা শুনবেন।' রামকৃষ্ণ প্রতিবাদ করলেন। ওদের বোঝাতে চাইলেন যে নিজের অসুখের কথা কিছুতেই তিনি মাকে বলতে পারেন না ! তবুও সবাই মিলে অনুরোধ করলে অনেকখানি অনিচ্ছার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মা জগদম্বার কাছে অসুখের কথাটি বলতে রাজী হলেন। ঘণ্টা কয়েক পরে নরেন আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'মাকে বলেছিলেন ?' রামকৃষ্ণ ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ'। তারপর নরেনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'মাকে বললুম, "কষ্টের জন্যে খেতে পারচি না—যাতে একটু কিছু খেতে পারি তার ব্যবস্থা করে দে।" শুনে মা কি বললেন জানিস ? মা তোদের সবাইকে দেখিয়ে বললেন, "এতগুলো মুখ দিয়ে তো খাচ্চিস, আবার খেতে চাস ?" শুনে লজ্জায় মরি আর কি !'

পীড়িত হবার পাঁচবছর আগেও রামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন তখন মাঝে মাঝেই তাঁর অন্তিম সময়ের অবস্থার কথা বলে দিতেন। বলতেন, 'যখন দেখবি রাতের পর রাত কলকাতায় থাকছি, বাছবিচার না করে যার তার কাছ থেকে চেয়ে খাচ্ছি, এমনকি পরের এঁটো খাবার খেতেও আপত্তি করছি না, তখন জানবি আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে।' আরও বলতেন, 'যাবার আগে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব। যখন অনেক লোকে জানতে পারবে, কানা-কানি করবে জানবে আমি কে, তখন মার ইচ্ছেয় এই খোলটা আর থাকবে না। কারা অন্তরঙ্গ আর কারা বহিরঙ্গ তার বিচার হয়ে যাবে।' এখন কাশীপুরে থাকতেও রামকৃষ্ণ সেই কথাই বললেন। বললেন, 'আমার এই অসুখটা ভক্তদের ঝাড়াই-বাছাই করে দিচ্ছে। কারা অন্তরঙ্গ আর কারা বহিরঙ্গ তার নিরূপণ হয়ে যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে আমার সেবাই ধ্যানজ্ঞান করেছে তারাই আমার অন্তরঙ্গ। আর যারা মাঝে মাঝে আসে আর বলে, "কেমন আছেন ?" তারা বাইরের লোক।'

'যাবার আগে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব', অর্থাৎ সকলের সামনে নিজের দেবত্ব প্রকাশ করে যাব—একথা ব'লে রামকৃষ্ণ যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার সঙ্গে ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারীর ঘটনাটির বেশ সংযোগ আছে। ঘটনাটি বলি। ১লা জানুয়ারীর বিকেল। ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথের চিকিৎসায় থেকে রামকৃষ্ণ ক'দিন বেশ ভালো বোধ করছিলেন। বাগানে খানিক বেড়াবার ইচ্ছে হলো। বেলা তখন তিনটে। ছুটির দিন। দলে দলে সংসারী ভক্তেরা সেই দুপুর থেকে তাঁকে দর্শন করতে এসেছে। রামকৃষ্ণ যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছেন তখন জনা তিরিশ ভক্ত একতলার বড় হলঘরে দলবদ্ধ হয়ে বসেছিলেন। রামকৃষ্ণকে দেখেই সবাই

ভক্তিভরে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। রামকৃষ্ণ একটিও কথা বললেন না। ধীরে ধীরে বাগানের মধ্যে দিয়ে ফটকের দিকে হাঁটতে লাগলেন। সসম্ভ্রম দূরত্ব রেখে ভক্তেরাও তাঁর পিছু পিছু হাঁটতে লাগল।

ফটকের কাছে একটা গাছের তলায় ব'সে গিরিশ তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। রামকৃষ্ণকে আসতে দেখে ওরা সবাই উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। গিরিশকে দেখেই রামকৃষ্ণ সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'আচ্ছা গিরিশ! শুনতে পাই, তুমি নাকি সবাইকে আমার সম্বন্ধে ব'লে বেড়াও! তা তুমি আমার সম্বন্ধে কি দেখেছ যে ওসব কথা বলো?'

জানু পেতে ব'সে রামকৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে ভাবে গদগদস্বরে গিরিশ বললেন, 'ব্যাস—বাল্মীকি যাঁর মহিমা ইয়ত্তা করতে পারেন নি, তাঁর সম্বন্ধে আমি কি বলবো!' গিরিশের ভক্তি দেখে রামকৃষ্ণ আনন্দে মাতোয়ারা। গিরিশ ও অন্য ভক্তদের ডেকে বললেন, 'তোমাদের আর কি বলবো! আশীর্বাদ করি চৈতন্য হও।' এই কথাকটি বলেই আত্মহারা রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ভক্তদের মনেও তখন আনন্দের বন্যা। তাঁরাও যেন পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সব ভুলে যাচ্ছেন। তাকে স্পর্শ না করার প্রতিজ্ঞার কথা তখন তাঁদের মনে নেই। ভাবাবিষ্ট রামকৃষ্ণের পায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ে তাঁর পদধূলি নিচ্ছেন। রামকৃষ্ণও একে একে সবাইকে স্পর্শ করলেন। কেউ আত্মহারা হলেন, কেউ নিগূঢ় ভাবমগ্নতায় উদ্বুদ্ধ হলেন। সকলের দৃষ্টির সামনে রামকৃষ্ণ যেন সেই প্রথম তাঁর সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ প্রদর্শন করলেন। আনন্দাপ্লুত হয়ে সবাই বলে উঠলেন, 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ।'

সেদিন রামকৃষ্ণের কোনো নবীন ভক্তশিষ্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। নরেন ও অন্য ভক্তেরা সারারাত জেগে রামকৃষ্ণের সেবা করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। লাটু ও শরৎ ছাত থেকে দেখেও নেমে আসেন নি। রামকৃষ্ণের স্পর্শধন্য হয়ে একজন ভক্ত উল্লাসে চিৎকার করে সবাইকে ডাকছিলেন, 'ওরে কে কোথায় আছিস, এই বেলা চলে আয়। ঠাকুরের কৃপা নিয়ে যা।' কিন্তু নবীন ভক্তেরা তো এমনভাবে কর্তব্যে উদাসীন হ'য়ে চলে আসতে পারেন না! ঠাকুরের অনুপস্থিতির সময় তাঁরা যে তাঁর ঘরখানি মার্জনা করার কিংবা শয্যাদি রোদে দেবার সুযোগ পেয়েছেন! তা ছাড়া নরেন তাদের শিখিয়েছেন, এসব অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার চেয়ে গুরুসেবার তাৎপর্য অনেক ব্যাপক। তাই কর্তব্যে উদাসীন হয়ে কিংবা কর্ম অর্ধসমাপ্ত রেখে তাঁরা কেমন করে আসবেন! অল্পক্ষণ পরেই সেদিন রামকৃষ্ণের বাহ্য চৈতন্য ফিরে এসেছিল।

সেদিনকার ঘটনাটির তত্ত্ববিচার এইভাবে করেছিলেন সারদানন্দ: 'ঠাকুর সেদিন নির্বিচারে সকল ভক্তের কাছে দেবমানবত্ব প্রকাশ করে তাদের অভয়াশ্রয় প্রদান করেছিলেন।'

২রা জানুয়ারী নরেনের যে অভিজ্ঞতাটি হয়েছিল দু'দিন পরে অর্থাৎ ৪ঠা জানুয়ারী শ্রীম'র কাছে নিভৃতে বসে সেই কথাই তিনি বলছিলেন। নরেন বললেন, 'গত শনিবার এখানে ধ্যান করছিলাম। হঠাৎ বুকের মধ্যে কি রকম করে এলো! বোধহয় কুণ্ডলিনী জাগরণ। ঈড়া পিঙ্গলা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। গতকাল রবিবার, উপরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা ক'রে সব বললাম। ওঁকে বললাম, "সবার হলো, আমার কিছু হবে না? আমায়

কিছু দিন ! ঠাকুর বললেন, "তুই বাড়ির ব্যাপারটা আগে ঠিক ক'রে নে, তারপর সব হবে। ......কি চাস তুই ?" আমি বললাম, "আমার ইচ্ছে ওমনি তিনচার দিন সমাধিস্থ হয়ে থাকবো ! কখনো কখনো এক একবার খেতে উঠবো !" উনি তখন বললেন, "তুই তো বড় হীনবুদ্ধি ! যা চাইছিস তার চেয়েও উঁচু অবস্থা আছে। তুই তো গান গাস, "যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায় !" সমাধি থেকে নেমে এসে সাধক দেখতে পায় যে তিনিই জীবজগৎ, তিনিই এই সমস্ত হয়েছেন। একমাত্র ঈশ্বরকোটি সাধকেরই এই অবস্থা হতে পারে। সাধারণ মানুষ বড় জোর সমাধি অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে—তার পর আর উঠতে পারে না।

'আজ সকালে বাড়ি গেলাম। বাড়ির লোকেরা বকাবকি করতে লাগল। বললে, "কি হো হো করে বেড়াচ্ছিস ? সামনে তোর আইন পরীক্ষা, আর পড়াশুনো না করে তুই হৈ হৈ ক'রে বেড়াচ্ছিস ?" তখন দিদিমার ঘরে পড়তে গেলাম। পড়তে গিয়ে ভয়ানক আতঙ্ক হলো—যেন পড়াটা কি ভয়ের জিনিস ! তখন কেঁদে ফেললাম। অমন কান্না কখনও কাঁদি নি। তারপর বইটই ফেলে দৌড় ! রাস্তা দিয়ে ছুট ! জুতোটুতো রাস্তার কোথায় এক দিকে পড়ে রইল ! খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম—গায়ে খড় লেগে গেল। আমি তখনও দৌড়চ্ছি। শেষে থামলুম এখানে এসে।'

রামকৃষ্ণের স্বাস্থ্যের একটু যে উন্নতি হচ্ছিল তা হঠাৎ থেমে গেল এবং ব্যাধির উপদ্রব দিন দিন বাড়তে লাগল। ক্ষয় হতে হতে শরীরের অবস্থা কংকালসার। কোনোরকমে ভাঙা গলায় ফিসফিস করে কথা বলেন। মাঝে মাঝে যখন সেটুকুও পারেন না, তখন ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করেন। গলা দিয়ে প্রায়ই রক্ত পড়ে, যন্ত্রণায় ফুলে ওঠে গলা। কিন্তু বাহ্যদেহের ক্রমাবনতির দিনগুলিতেও তাঁর আত্মভাবটি অক্ষুণ্ণ ছিল, যার মধ্যে বিকশিত হয়েছিল তাঁর আধ্যাত্মিকতা, তাঁর প্রেম এবং তাঁর সহজ আত্মজ্ঞান। এত রোগভোগ করতেন তবুও কি আশ্চর্য সহাস্য তাঁর উৎফুল্লতা ! মনে তাঁর কখনও বিষণ্ণতার মেঘ জমত না। শুধু বলতেন, প্রায়ই বলতেন, 'ওরে মন আনন্দে থাক্ ! দেহ ও রোগ পরস্পরকে দেখুক, তুই কিন্তু মধুতে থাকিস !' একদিন নরেনকে বললেন, 'তোর জিম্মায় ছেলেগুলোকে দিয়ে যাচ্ছি—দেখিস যাতে নিয়ম করে ধ্যানট্যান করে ; সংসারে যেন আর ফিরে না যায়।' একদিন সবাইকে ডেকে জড়ো করলেন। সকলকে ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীর মতো ভিক্ষা চাইতে বললেন। ভক্তদের মধ্যে সে এক দারুণ উত্তেজনা। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে সবাই রাস্তায় দাঁড়ালেন। যার ঝুলিতে যেটুকু পড়লো তাই জড়ো করে পাক করা হলো। সেই ভিক্ষান্ন একটু ঠাকুরও মুখে দিলেন। কি তৃপ্তি তাঁর ! বললেন 'অমৃত ; এ অন্ন সুধার মতো পবিত্র।'

১৪ই মার্চ ; বেশ রাত তখন। শ্রীমকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন, তারপর তাঁর কানে কানে বললেন, 'তোমরা কাঁদবে ব'লে এত ভোগ করছি—তোমরা সবাই যদি বলো, "এত কষ্ট যখন তবে দেহ যাক"—তা হলেই আমার দেহ যায়।'

পরদিন সকালেই সবাইকে ডেকে তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। কোনোরকমে ফিসফিস করে বললেন, 'এই মুহূর্তে কি দেখছি জানো ? তিনি সব হয়েছেন। পুরুষ নারী যা বলো সব যেন চামড়ার খোল দিয়ে ঢাকা, তার ভিতর থেকেই

তিনি হাত পা মাথা নাড়াচ্ছেন। যেমন একবার দেখেছিলাম। মোমের বাড়ি, বাগান, রাস্তা, মানুষ, গরু—সব মোমের, সব এক জিনিসে তয়েরি। দেখছি সে-ই কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাঁড়িকাঠ! এক ঈশ্বরই সব! আহা!

'ওই লোটো, মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে—দেখছি তিনিই মাথায় হাত দিয়ে রয়েছেন।

'শরীরটা যদি কিছুদিন থাকতো লোকেদের চৈতন্য হতো।...না। তা হবে না। এবার শরীর থাকবে না।......রামকৃষ্ণ আবার বললেন, 'এই শরীরের মধ্যে দু'জনা আছেন। একটি তিনি, অন্যজন ভক্ত। যে ভক্ত তারই হাত ভেঙে ছিল, তারই এই অসুখ করেছে। বুঝেছ? ...কাকেই বা বলবো, কেই বা বুঝবে!

'ঈশ্বর মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা আবার তাঁরই সঙ্গে চলে যায়—'

শ্রীম, নরেন প্রভৃতির সঙ্গে রাখালও ছিল। রাখাল বলে উঠল, 'তবে আমাদের কামনা, আপনি আমাদের ফেলে যাবেন না!'

রামকৃষ্ণ মৃদু হাসছিলেন। বললেন, 'বাউলের দল হঠাৎ এলো, নাচলে, গান গাইলে; আবার হঠাৎ চলে গেল! এলো, গেল—কেউ চিনলে না।'

নরেন তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'ত্যাগ করবার কথা বললে কেউ কেউ আমার ওপর রাগে।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'ত্যাগ দরকার।' তারপর নিজের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়ে বললেন, 'একটা জিনিসের ওপর যদি আর একটা জিনিস থাকে তবে প্রথমটি পেতে গেলে পরেরটি সরাতে হবে না? একটা না সরালে কি আর একটা পাওয়া যায়? জগৎ যখন তিনি-ময় হয়, তখন কি আর কিছু দেখা যায়?'

নরেন বললেন, 'তার মানে ত্যাগ করতেই হবে?'

'হবে বৈকি! যা বললুম, তিনি-ময় হলে কি আর কিছু দেখা যায়? সংসার-ফংসার সব ভেসে যায়। তবে ত্যাগ করতে হবে মনে। এখানে যারা আসে তারা কেউ সংসারী নয়। অবিশ্যি কারুকারু একটু ইচ্ছে ছিল মেয়েমানুষের সঙ্গে থাকা—' (রামকৃষ্ণের কথা শুনে রাখাল, শ্রীম প্রভৃতি সবাই হেসে উঠলেন) 'কিন্তু তাদের সে ইচ্ছেটুকু পূরণ হয়ে গেল।'

কথা শেষে রামকৃষ্ণ সকলের দিকে সস্নেহে তাকালেন। দেখতে দেখতে তিনি আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেলেন। তারপর তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বললেন, 'খুব।'

আগ্রহভরে নরেন জিজ্ঞেস করলেন, 'খুব কি?' রামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে বললেন, 'খুব ত্যাগ। যা দেখছি তা থেকে মনে হচ্ছে ত্যাগের জন্যে সবাই প্রস্তুত।'

রামকৃষ্ণের এই উক্তি ভবিষ্যদবাণীর মতন শোনালেও সেই 'মহান ত্যাগ' কিন্তু আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮৮৬র জানুয়ারী। তীর্থভ্রমণ শেষ করে গোপাল ঘোষ সবে ফিরেছেন। রামকৃষ্ণের কাছে কলকাতায় ভ্রমণরত সন্ন্যাসীদের গেরুয়া বসন আর জপমালা দেবার অনুমতি চাইলেন। নরেন ও অন্য ভক্তেরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ হঠাৎ তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করে গোপালকে বললেন, 'তা এরাও তো সাধু! এদের দেবে না? খুব ত্যাগ এদের। এদের চেয়ে ভালো সাধু আর কোথায় পাবে?' গোপালের আছে মাত্র বারোখানি গেরুয়া কাপড় আর বারোটি জপমালা। ঠাকুরের কথা শুনে গোপাল সেগুলি

তাঁর হাতে তুলে দিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বিশেষ উৎসব করে রামকৃষ্ণ সেগুলি বিলি করে দিলেন। শুধু তাই নয়, ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে সন্ন্যাসীদের মতন জীবনধারণের অনুমতিও তাদের দিলেন। সেদিন যাঁরা বস্ত্র আর জপমালা পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন নরেন, রাখাল, যোগীন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, তারক, শশী, গোপাল ঘোষ, কালী এবং লাটু। রামকৃষ্ণ শুধু একখানি ধুতি এবং একটি জপমালা গিরিশের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। এইভাবে মর্ত্যবাস-কালেই রামকৃষ্ণ তাঁর সন্ন্যাসী সঙ্ঘ তৈরী করে যান। অবশ্য তাঁর মহাপ্রয়াণের পরেই এই সংঘের নিয়মিত স্বীকৃতি হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অক্ষমতার দরুন রামকৃষ্ণের জীবনের সেই অনিবার্য পরিণতি যে ঘনিয়ে আসছে, তা দিনের আলোর মতন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সারদাদেবীও তা জানতেন। তীব্র শোকে তিনি তখন কাতর। সেই অবস্থাতেই তারকেশ্বর মন্দিরে ধরনা দিতে ছুটে গিয়েছিলেন। শিব বিগ্রহের সামনে দু'দিন নির্জলা উপোস করে পড়ে রইলেন। তখনকার মানসিক অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে সারদাদেবী পরবর্তীকালে বলেছেন, 'দ্বিতীয় রাত্রে এমন আশ্চর্য এক কড়্‌কড়্‌ শব্দ কানে এলো, যেন মনে হলো মাটির তৈরী অনেকগুলি গামলা ধাক্কা দিয়ে কে ভেঙে দিচ্ছে। এতক্ষণ যে ঘোরের মধ্যে ছিলাম তা যেন সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে গেল। আর চকিতে মনের মধ্যে এক আশ্চর্য অনুভূতি হলো। কে যেন শোনাল: "স্বামী কি? স্ত্রীই বা কি? কিসের এই সংসার? কিসের এই সম্পর্ক? কেন আত্মঘাতী হতে গিয়েছিলে?" ঠাকুরকে নিয়ে আমার সব অহং, সব আসক্তি চলে গেল। ত্যাগে ভরে উঠল মন। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মন্দিরের ঠিক পিছনেই একটা ছোট্ট পুকুর। সেখান থেকে দু হাতের আঁজলায় জল নিয়ে চোখে-মুখে ছিটোলাম। তৃষ্ণায় তালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। বেশ খানিকটা জল পান করে অনেকখানি সুস্থ বোধ করলাম। পরদিন সকালেই কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে ফিরে এসেছিলাম। ঠাকুরের মুখোমুখি হতে তিনি যেন আমায় দেখে কৌতুক বোধ করলেন। ঠোঁট চেপে একটু হেসে বললেন, "হ্যাঁগা! যা চাইছিলে তা পেলে?" তারপর যেন নিজেকে শোনাতেই বললেন, "তুমি কিছুই পাও নি।"

সন্ধ্যাহ্নিক করতে করতে নরেনের একদিন মনে হলো যে, তাঁর মাথার পিছন দিকে দীপশিখার মতন একটি জ্যোতি রয়েছে। সে আলো ক্রমেই বাড়তে লাগলো। একসময় প্রদীপটি টুকুরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। নরেন সমাধিস্থ হলেন। খানিক পরে অর্ধ-বাহ্যদশা ফিরে এলে নরেনের মনে হলো, যেন মাথাটি ছাড়া তাঁর শরীরের অন্য অংশ নেই। নরেন চিৎকার ক'রে উঠলেন, 'আমার দেহটা কোথায়?' নরেনের আর্তনাদ বুড়ো গোপাল শুনেছিলেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, 'এই তো তোমার দেহ! তুমি কি বুঝতে পারছ না?' কিন্তু নরেন তখনও আর্তনাদ করছেন দেখে বুড়ো গোপাল আতঙ্কিত হয়ে রামকৃষ্ণকে জানাতে গেলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ একটুও অবাক হলেন না। শান্তভাবে সব শুনে বললেন, 'অমনটি যে হবে তা জানতুম। কিছুক্ষণ ও ওইভাবেই থাকুক। ক'দিন থেকেই সমাধিভাব পেতে আমায় বড় বিরক্ত করছিল।'

ধীরে ধীরে নরেনের মন যখন সাধারণ ভূমিতে নেমে এলো তখন তাঁর মনে অপার শান্তি। দ্রুত এসে দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণের সামনে। রামকৃষ্ণ বললেন, 'মা তোকে সব দেখিয়েছেন।

কিন্তু মা যা দেখিয়েছেন সব তোলা রইল ওই বাক্সের মধ্যে। চাবি আমার কাছে। তোকে দিয়ে মার সব কাজ যখন শেষ হবে, তখন তালা খুলে তোকে সব ফিরিয়ে দেব। আজ যা জেনেছিস নতুন ক'রে আবার সেগুলিই জানতে পারবি।'

রামকৃষ্ণ পরে অন্য শিষ্যদের বলেছিলেন, 'নরেন যখন জানতে পারবে ও কে তখন আর দেহ রাখবে না। খুব শীগগির বুদ্ধি আর আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে জগতকে ও কাঁপিয়ে দেবে। আমি মা-র কাছে কেঁদে বলেছি, ওর যেন ব্রহ্মজ্ঞান না হয়। যেন মায়া দিয়ে ওকে ভুলিয়ে রাখা হয়। মা ওকে দিয়ে অনেক কাজ করাতে চান বলেই এমনি ভুলিয়ে রাখা। তবে মায়ার এই চাদর বড় পাতলা। টান পড়লেই ছিঁড়ে যায়।'

একথা আগেই বলেছি যে, রামকৃষ্ণের জীবনের শেষ সাড়ে তিন মাসের কোনো ধারাবাহিক বিবরণ নেই। সারদানন্দ তাঁর লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। শ্রীম তাঁর কথামৃত গ্রন্থে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত ঘটনার কথা বলেছেন। পরবর্তী সময়ের যা কিছু ঘটনা তা আমরা ভক্তদের মুখে শুনেছি। কখনও সারদা, কখনও নরেন, রাখাল বা অন্যভক্তেরা সেসব কথা আমাদের জানিয়েছেন। তবে কখন কোন্ ঘটনা ঘটেছে তার কালানুক্রম ঠিক মতন নির্ণয় করা নেই।

একদিন। বাকশক্তি তখন প্রায় স্তব্ধ হয়ে এসেছে, একখণ্ড কাগজের উপর রামকৃষ্ণ লিখলেন, 'নরেন লোকশিক্ষা দেবে।' সে কথা শুনে নরেন প্রতিবাদ করলেন। বললেন ওসব করতে পারবেন না। সেদিন নরেনকে ডেকে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'তোর হাড় করবে।' আর একবারের কথা। নরেনকে ডেকে রামকৃষ্ণ বললেন, 'রাখালের বুদ্ধি রাজার মতন। ও চাইলে রাজত্ব চালাতে পারে।' ঠাকুরের মনের ভাবটি নরেন সেদিন ঠিকমতন বুঝতে পেরেছিলেন। পরের বার সন্ন্যাসী ভাইরা যখন একত্র হয়েছেন, তখন রাখালের খুব প্রশংসা করে নরেন বললেন, 'আজ থেকে রাখালকে আমরা রাজা বলবো।' সেই থেকে ঘনিষ্ঠরা সবাই রাখালকে 'মহারাজ' বলতো। এমনি করে প্রেমের বাঁধনটি শক্ত করে রামকৃষ্ণ সব ভক্তদের বেঁধে ফেলেছিলেন, যাতে দুঃখক্লেশের দিনগুলিতেও সন্ন্যাসীভাইরা একসূত্রে বাঁধা থাকতে পারেন।

রামকৃষ্ণের অসুখ যে ভান মাত্র সেকথা হরি (তুরীয়ানন্দ) যে শুধু মানতেন তা নয়, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। পরবর্তীকালে প্রায়ই এই গল্পটি বলতেন:

'একদিন অসুস্থ ঠাকুরের শয্যার পাশে গিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন আছেন?" ঠাকুর মাথা নেড়ে কোনোরকমে বললেন, "ভাল না। গলায় বড় যন্ত্রণা। কিছু খেতে পারি না।" জবাব শুনে ভাবলাম ঠাকুর নিশ্চয়ই আমার ভক্তির পরখ করছেন। উপনিষদের বাণী কে না জানে! আত্মা নির্লিপ্ত, তার কোনো ব্যাধিবোধ নেই। আর ঠাকুর তো ব্রহ্মজ্ঞানী, আত্মারাম!

'সেদিন ব্যাধির কথা ঠাকুর যত বলছিলেন। ততই আমার মনে হচ্ছিল তিনি আমায় পরীক্ষা করছেন। শেষমেশ আর থাকতে পারলাম না। নিজেকে প্রকাশ করে ফেললাম, বললাম, 'রোগের কথা যা-ই বলুন না কেন, আমরা জানি আপনি আমাদের কাছে অপার আনন্দময়।'

'আমার কথা শুনে মৃদু একটু হেসে সেদিন ঠাকুর যেন নিজের মনেই বলে উঠেছিলেন, "শালা আমায় ঠিক চিনেছে।"

অসুখের শেষের দিকে যখন রামকৃষ্ণের শরীর দিনদিন ক্ষয় হচ্ছে, তখন নাগমশাই মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে আসতেন। একদিন সেইরকম এসেছেন। নাগমশাই কাছে আসতেই রামকৃষ্ণ তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। মনে হলো এতক্ষণ যেন তাঁরই অপেক্ষায় তিনি ছিলেন। নাগমশাই বিব্রত। রামকৃষ্ণ বললেন, 'ওরা (ডাক্তার) তো হাল ছেড়েই দিয়েছে! তুমি কিছু করতে পারো?'

নাগমশাই যে নানা সিদ্ধাই জানতেন সেকথা বলেছি। ইচ্ছা করলে রোগীর দেহ থেকে রোগটি নিজের দেহে নিয়ে আসতে পারতেন। তাই একটু যেন দ্বিধা করলেন। তবুও ভক্তির জোর অধিক থাকায় মনের দ্বিধা কেটে গেল। সাহস করে বললেন, 'হ্যাঁ, পারি। নিশ্চয় পারি। আপনার কৃপায় আমি এখুনি রোগ সারিয়ে দেব।' এই ব'লে রামকৃষ্ণকে স্পর্শ করতে নাগমশাই দু-পা এগিয়ে এলেন। আর তখনই যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন পিছিয়ে এসে রামকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ জানি; তুমি যে পারো তা জানি।'

আগস্ট মাসের প্রথম দিকে রামকৃষ্ণ যোগীনকে ডেকে পাঠালেন। যোগীন এলে তাঁকে পাঁজি থেকে ২৫শে শ্রাবণের পরের দিনগুলি পড়ে যেতে বললেন। সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত পড়া হলে রামকৃষ্ণ তাঁকে ইশারা করে থামতে বললেন।

এই ঘটনার দিনকতক পরে রামকৃষ্ণ একদিন নরেনকে ডেকে পাঠালেন। সেদিন ঘরে অন্য কেউ ছিল না। নরেন এলে তাঁর দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন তিনি। চেয়ে থাকতে থাকতেই রামকৃষ্ণের সমাধিভাব হলো। ঠিক তখনই নরেনের শরীরেও বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে গেল। নরেনও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। খানিক পরে বাহ্য-চেতনা ফিরে এলে নরেন দেখলেন যে রামকৃষ্ণ কাঁদছেন। সেই অবস্থাতেই নরেনকে বলে উঠলেন, 'নরেন! আমার যা ছিল সব আজ তোকে দিয়ে গেলুম। আমি এখন নিঃস্ব, ফকির! কিন্তু তোর মধ্যে যে ক্ষমতা দিলুম তা দিয়ে তুই জগতের অনেক মহৎ কাজ করতে পারবি। সব কাজ সমাধা হলে যেখান থেকে এসেছিস সেখানে তুই ফিরে যাবি!'

শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন দুই আগেকার ঘটনা। সেদিনও নরেন যখন রামকৃষ্ণের ঘরে এলেন তখন তিনি একা। বিছানায় শুয়ে নিঃশব্দে রোগযাতনা ভোগ করছেন। ঘরে ঢুকে একনজর ওই রোগজর্জর দেহটির দিকে চেয়েই নরেনের মনে চকিতে এক বিরূপ ভাবের উদয় হলো। অন্ত্যজ প্রাণীর মতন যে মানুষটি মুখ বুজে এমন কষ্ট পাচ্ছেন তিনি কি সত্যিই অবতার? মনে মনে বললেন, 'এই মুহূর্তে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ইনি যদি দেবত্ব প্রমাণ করতে পারেন তবেই এঁকে অবতার বলে মানতে পারি!' যেমনি সে কথা ভাবা ওমনি যেন নিজের কাছেই কুণ্ঠিত হয়ে উঠলেন নরেন। মন থেকে এই ভাবনাটি জোর করে দূরে সরিয়ে দিলেন, তারপর স্তব্ধ হয়ে রামকৃষ্ণের মুখের দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে থাকলেন। একটি একটি করে মুহূর্ত কেটে যাচ্ছিল। একসময় রামকৃষ্ণের ঠোঁটদুটি খুলে

গেল। তারপর যেন অনেকদূর থেকে ভেসে এলো একটি স্বর ; 'ওঃ নরেন ! এখনও তোর অবিশ্বাস গেল না ? শোন্, যে রাম যে কৃষ্ণ, এই দেহেই সে রামকৃষ্ণ। তোর বেদান্ত বিশ্বাসের সূক্ষ্ম দেহে নয়, রক্তমাংসের দেহেই সেই।'

তির্যক হলেও বেদান্ত দর্শনের উল্লেখটি রামকৃষ্ণ ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছিলেন। কারণ, বেদান্ত দর্শনে শুধু আত্মারই অস্তিত্ব আছে, দেহের নয়। কিন্তু রামকৃষ্ণ সেদিন সুস্পষ্ট ভাবেই নিজেকে দেহান্বিত ঈশ্বর ব'লে ঘোষণা করলেন।

ইংরেজী ১৫ই আগস্ট—রবিবার। রামকৃষ্ণকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি ক্রমেই অবসন্ন হয়ে যাচ্ছেন। নাড়ির গতি অনিয়মিত। সন্ধ্যা নাগাদ বেশ শ্বাসকষ্ট দেখা দিল। তবুও বিদায় নিতে সারদাদেবীকে ডেকে পাঠালেন। লক্ষ্মীর সঙ্গে সারদাদেবী তাঁর শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে আরও কাছে ডেকে রামকৃষ্ণ বললেন, 'শোনো ! মনে হচ্ছে এবার আমার ডাক এসেছে। কোথাও যেতে হবে—অনেক দূরে কোথাও। সবটাই জলপথ।' সারদা কাঁদ-ছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁকে আশ্বাস দিলেন। বললেন, 'কাতর হতে নেই। যেমন চলছিল তেমনই চলবে। নরেন এরা তোমায় দেখবে। আমায় যেমন দেখতো তেমনি তোমাকেও ওরা দেখবে। লক্ষ্মীকে দেখ—'

সন্ধ্যা নাগাদ কিছু তরল খাদ্য খাওয়াবার চেষ্টা হলো। কিন্তু রামকৃষ্ণ কিছুতেই গিলতে পারলেন না। হাত পাখা দিয়ে যখন সবাই বাতাস করছেন তখনই তাঁর সমাধি হলো। ক্রমে শরীর শক্ত হয়ে উঠল। ভক্তেরা ভাবলেন বুঝি তাঁর জীবনান্ত হয়েছে। কিন্তু মাঝরাতের পর রামকৃষ্ণের চৈতন্য ফিরে এলো। বললেন, খিদে পেয়েছে। তারপর স্বচ্ছন্দে একবাটি নরম পায়েস ঢোক ঢোক ক'রে গিলে ফেললেন। পায়েসটুকু খাবার পর তাঁকে বেশ ঝরঝরে দেখা-চ্ছিল। নরেন বললেন, 'একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।' রামকৃষ্ণ তখন রিনরিনে গলায় পরিষ্কার করে তিনবার ভবতারিণীর নাম নিলেন। সে সময় তাঁকে একটুও অসুস্থ মনে হচ্ছিল না। তারপর ঘুমোবার জন্য তিনি পাশ ফিরে শুলেন। তা দেখে নরেন বিশ্রাম করতে নিচে নেমে গেলেন।

নরেন চলে যাবার অল্পক্ষণ পরেই রামকৃষ্ণের সারা শরীর হঠাৎ কেঁপে উঠল। নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির—সারা মুখখানি মধুর হাসিতে ঝলমল করছে। রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। তখন সময় রাত ১টা বেজে দু'মিনিট। সোমবার, ১৬ই আগস্ট, ১৮৮৬ সাল।

এটিই তাঁর মহাসমাধিকাল—পরমহংস রামকৃষ্ণের শরীর ত্যাগের পুণ্যলগ্ন। কিন্তু ভক্তেরা যেন তা মেনে নিতে পারছিলেন না। বাকি রাতটুকু তাঁরা মৃতদেহটি চোখে চোখে রাখলেন। কিন্তু সকলের সব আশা ধীরে ধীরে নির্মূল হয়ে গেল। শেষ রাত নাগাদ এসে পেঁছিলেন গিরিশ আর রামচন্দ্র দত্ত। তখন ঝিরঝির ক'রে ভোরের বাতাস বইছে। রামকৃষ্ণের মহা-প্রয়াণের বার্তা তখন কলকাতার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। দলে দলে ভক্তবৃন্দ শেষ দেখা দেখতে আসছেন। বিশ্বনাথ উপাধ্যায় তবুও আশা নিয়ে বসে আছেন। বললেন শরীরে তখনও একটু উত্তাপ আছে। নিজেই উৎসাহ নিয়ে শিরদাঁড়া ঘষে উত্তাপটি বজায় রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন। দুপুর নাগাদ এলেন ডাক্তার সরকার। মৃতদেহ পরীক্ষা করলেন তারপর বললেন যে, তাঁর মতে মাত্র আধঘণ্টা পূর্বে রামকৃষ্ণ ইহধাম ত্যাগ করেছেন।

বিকাল পাঁচটায় রামকৃষ্ণের মরদেহ একতলায় নামিয়ে একটি খাটে শোয়ানো হলো। ফুলে

চন্দনে আর গেরুয়া কাপড় দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হলো তাঁর মরদেহ। ডাক্তার সরকারের নির্দেশ মতন ভক্তদের নিয়ে একটি আলোকচিত্র তোলা হলো। (শেষ অধ্যায়ে এই বিশেষ ছবিটির কথা উল্লেখ করেছি।) একঘণ্টা পরে ভক্তিগীতি গাইতে গাইতে ভক্তেরা তাঁর মরদেহখানি কাছাকাছি বরানগর ঘাটে শেষকৃত্যের জন্য বয়ে নিয়ে এলেন। যেখানে মরদেহটির সৎকার করা হলো সেখান থেকে সরাসরি তাকালে নদীর ওপারে গড়ে ওঠা আজকের বেলুড়-মহামন্দিরটি দেখা যাবে।

সেদিন সন্ধ্যায় কিন্তু শোকার্ত শবানুযাত্রীরা নদীর ওপারে গড়ে ওঠা মহামন্দিরটি দেখতে পান নি; সেদিন তাঁরা ভাবতেও পারেন নি যে রামকৃষ্ণের চিন্তা ও কর্মধারাগুলি এমনভাবে যুগ যুগ ধরে সময় বেয়ে আগামী দিনেও পৌঁছে যাবে। একসময় শেষ ভক্তিগীতিটি গাওয়া সাঙ্গ হলো; নিভে এলো চিতার আগুন। তারপর যখন দীর্ঘ গ্রীষ্মরাত্রি চুপি চুপি নেমে এসেছে উদাসীন শহরের বুকে; নেমে এসেছে নিরবধি বয়ে চলা নদীর চঞ্চল জলে, তখন রক্তমাংসের দেহখোল ছেড়ে রামকৃষ্ণ চলে গেছেন অনেক দূরে—সাধনোচিত ধামে। ভস্মাবশেষ ছাড়া রামকৃষ্ণ সেদিন ভক্তদের জন্য কিছুই রেখে যান নি। তাই সেই চিতাভস্মটুকু একটি তামার পাত্রে সযত্নে তুলে রেখে দিলেন পরমভক্ত শশী। ঠাকুরকে হারানোর ক্ষতিটুকু ছাড়া ভক্তদের সেদিন নিজের বলতে কিছুই প্রায় রইল না।

তবুও শ্মশানঘাট থেকে ফিরে আসার সময় ভক্তেরা সেদিন কেউ চোখের জল ফেলেন নি। তাঁরা জানতেন তাঁদের এ জীবন পরহিতে সমর্পিত। ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কোনো সংগ্রহই তাঁদের নেই। কিন্তু সেটুকুই তো ঢের! তাই ফেরার পথে দুর্জয় সাহস নিয়ে সমস্বরে সবাই মাথা উঁচু করে গেয়ে উঠলেন 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ'!

২১

কাহিনী ধারা বহে চলে

হিন্দুর সংস্কার মতে সেদিন সন্ধ্যাতেই সারদাদেবী গা থেকে গহনাগুলি একে একে খুলে ফেলতে লাগলেন। হাত থেকে সোনার বালাজোড়া সবে খুলতে যাবেন, এমন সময় রামকৃষ্ণের মূর্তিটি চোখের উপর ভেসে উঠল। রামকৃষ্ণ তাকিয়ে আছেন—ঠিক যেমনটি অসুখের আগে একবার তাকিয়েছিলেন। সারদার হাতখানি ধরে রামকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁগা! গা থেকে গয়নাগুলো খুলছো কেন? ও যে এয়োতির লক্ষণ? তুমি কি সত্যি ভাব যে আমি মরে গেছি?' এই দর্শনের পর সারদা আর কখনও হাতের বালাজোড়া খুলে রাখেন নি। দিন কয়েক পরে বলরাম বসু একখানি থানধুতি নিয়ে এলেন। তারপর সারদার অনুগতা গোলাপ মাকে ডেকে, তার হাত দিয়ে সেটি সারদার কাছে পেঁছে দিলেন। গোলাপ মার সঙ্কোচের অন্ত নেই। এ যে প্রায় দুঃসাধ্য! মুখ ফুটে সে কেমন করে কথাটি বলবে? এ যেন নিষ্ঠুরের মতন সারদাকে তাঁর বৈধব্য অবস্থার কথাটি মনে করিয়ে দেওয়া! কিন্তু সব সঙ্কোচ কাটিয়ে গোলাপ মা যখন সারদার কাছে থানধুতিটি নিয়ে গেল, তখন অবাক হয়ে দেখল যে সারদা নিজের হাতে তাঁর পরনের লালপাড় শাড়ির খানিকটা পাড় ছিঁড়ে নিয়েছেন। সেই থেকে সারদা বরাবর সরু লালপাড় শাড়িই ব্যবহার করে এসেছেন।

রামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের এক সপ্তাহ পরের কথা। হরিশ নামে একজন গৃহী ভক্তের সঙ্গে নরেন কাশীপুর বাগানের মধ্যে ছোট্ট ডোবাটির ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাত তখন প্রায় আটটা। হঠাৎ নরেন দেখলেন বাগানের ফটকের দিক থেকে কাপড়চোপড়ে ঢাকা একটি উজ্জ্বল বস্তু তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। চকিতে নরেনের মনে হলো ঠাকুর নয় তো? তখনই হরিশকে কিছু বললেন না। ভাবলেন, হয়ত তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম। কিন্তু পর-মুহূর্তেই চাপা গলায় হরিশ ব'লে উঠল, 'ওটা কি?' সঙ্গে সঙ্গেই নরেনও চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে ওখানে?' নরেনের চিৎকার শুনে বাগানবাড়ি থেকে অন্য ভক্তেরাও তখন ছুটে এসেছেন। কিন্তু সেই উজ্জ্বল বস্তুটি দশবারো গজ দূরে যুঁইঝাড়ের মধ্যে যেন হঠাৎই মিলিয়ে গেল।

এই সব দিব্য দর্শনের উদ্দেশ্য হলো ভক্তদের মনে অধ্যাত্মবিশ্বাসটি সুনিশ্চিত করা। কিন্তু কিছু ভক্তের বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এই বিশ্বাসের কোনো মিল ছিল না। কাশীপুর উদ্যানভবনের ইজারার মেয়াদ ছিল আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত। রামদত্ত এবং কিছু পুরোনো ভক্তের ধারণা হলো যে, উত্তীর্ণ মেয়াদের নবীকরণ বাহুল্য মাত্র। তাঁরা ভাবলেন, শিষ্যদের আলাদা বাসস্থানের প্রয়োজন কী? কেনই বা তাঁরা একত্রে থাকবেন? তাঁরা কি সংসারে ফিরে গিয়ে সৎ এবং সাধুজীবন যাপন করতে পারেন না?

এঁদের দোষ দেওয়া যায় না কারণ রামকৃষ্ণের গোপন ইচ্ছার কথা এঁরা কেউ জানতেন

না। রামকৃষ্ণের বাসনা ছিল একটি সন্ন্যাসীমণ্ডল গড়ে তোলা। সেই অনুসারে তিনি বেছে বেছে নবীন সন্ন্যাসীদের উপদেশ দিয়েছেন, তাদের সন্ন্যাসীর বস্ত্র দান করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটি এত গোপন রাখা হয়েছিল যে, রাম দত্ত সমেত পুরোনো ভক্তেরা ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পারেন নি। আরও একটি কারণ ছিল। সেকালে সন্ন্যাসীদের সম্প্রদায়গত ভাবে দেখতে বাঙালী অভ্যস্ত ছিল না। বাঙালী জানতো যে, সন্ন্যাসীরা নিঃসঙ্গ—তারা একা একা ঘুরে বেড়ায় এবং পরস্পরকে কখনও সাহায্যও করে না।

যাহোক, রামচন্দ্র দত্ত ও তাঁর অনুগামীরা ১৯শে আগস্ট এক সভা ডাকলেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর একটি খসড়া তৈরি করা হলো। স্থির হলো যে, কাশীপুর বাগানবাড়ির অধিকার ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সমস্যা হলো সারদাদেবীকে নিয়ে। তিনি কোথায় থাকবেন? তখন সাব্যস্ত হলো যে, সারদাদেবী তীর্থভ্রমণে যাবেন এবং এতে তাঁর শোকের কিঞ্চিৎ লাঘব হবে। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণের পবিত্র চিতাভস্মটুকু কাঁকুড়গাছির বাগানবাড়িতে নিয়ে আসার কথা হয়েছে। রামকৃষ্ণের প্রস্তাবেই রামবাবু এই বাগানবাড়িটি কিনেছিলেন, ভক্তেরা যাতে নির্জনে ধ্যান ও কীর্তনাদি করতে পারেন। কেনার পর রামকৃষ্ণের পুণ্য পাদস্পর্শে বাড়িটি ধন্য হয়েছে। সুতরাং, রামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের জন্য সংঘ গড়ার কি প্রয়োজন? বইপত্তর, বক্তৃতা, রচনা ইত্যাদি প্রচলিত মাধ্যমগুলির সাহায্য নিয়ে কি লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না?

কর্মসূচীটি অধিকাংশ ভক্তের পছন্দ হলেও নরেন ও তাঁর অনুগামীদের মনঃপূত হয় নি। এমনকি নরেনকে কেন্দ্র করে গিরিশ, বলরাম, সুরেন মিত্তির এবং শ্রীমকে নিয়ে যে ছোট্ট গোষ্ঠীটি গড়ে উঠেছিল, তাঁদের কাছেও পরিকল্পনাটি উপাদেয় মনে হয় নি। এঁরা সবাই ভেবে রেখেছিলেন যে, গঙ্গার তীরে একটি মন্দির গড়ে তার মধ্যে ঠাকুরের চিতাভস্মটুকু সযত্নে রক্ষা করবেন। একটা সময় ছিল যখন প্রায় সব ভক্তই এমনটি ভাবতেন; অথচ মন্দির নির্মাণ করতে হলে তখনই জমি কেনা দরকার! কিন্তু অর্থ কোথায়? এদিকে কাঁকুড়গাছির বাগানবাড়িতে ঠাকুরের চিতাভস্ম নিয়ে যাবার প্রস্তাবটি তখন পাকাপাকি হয়ে গেছে। শশী ও নিরঞ্জন একটু চালাকির আশ্রয় নিলেন। ভস্মের অনেকখানি তাঁরা গোপনে অন্য একটি পাত্রে ভরে সেটি অন্যত্র চালান করে দিলেন; এবং সন্দেহ লাঘব করতে অবশিষ্টটুকু পাঠালেন কাঁকুড়গাছিতে। এই উপলক্ষে আগস্ট মাসের ২৩ তারিখে কাঁকুড়গাছিতে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। সেদিন ছেলেরা সবাই ভালমানুষের মতন উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন। শশী নিজেই আগ্রহ করে তাম্রাধারে রাখা চিতাভস্মটুকু মাথায় নিয়ে কাঁকুড়গাছি অব্দি হেঁটে যান। এদিকে বলরামের বাড়িতে লুকিয়ে রাখা চিতাভস্ম পরবর্তীকালে বেলুড় মহামন্দিরে নিয়ে আসা হয় এবং তাম্রাধারটি কাঁকুড়গাছির নতুন মন্দিরে স্থাপন করা হয়।

চিতাভস্ম নিয়ে কলহের ব্যাপারটি সারদাদেবীর মোটেই পছন্দ হয় নি। ঠাকুরের প্রয়াণের তুলনায় ব্যাপারটি কতই না তুচ্ছ! যাহোক, সারদাদেবীর তীর্থভ্রমণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলো। আগস্ট মাসের শেষাশেষি যোগীন্দ্র, কালী, লাটু, তারক, গোলাপ মা ও আরও কয়েকজন স্ত্রীভক্তের সঙ্গে সারদা বৃন্দাবনধামের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। রাখাল থেকে গেলেন বলরাম বসুর বাটীতে। অন্য ভক্তেরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে যার নিজের বাড়িতে সাময়িক ভাবে ফিরে

গেলেন।

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিক। সুরেন্দ্র মিত্তির একদিন তাঁর ঠাকুরঘরে বসে ধ্যান করছেন। রামকৃষ্ণ তাঁকে দর্শন দিলেন; ক্ষুব্ধস্বরে রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই এ কি করছিস? আমার ছেলেদের থাকবার জায়গা নেই। তারা যেখানে সেখানে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে! সব কাজ ছেড়ে আগে এদের ব্যবস্থা কর!' অভিভূত সুরেন্দ্র তখনই ছুটে গেলেন নরেনের কাছে। প্রতিজ্ঞা করলেন যে, কাশীপুর উদ্যানভবনের জন্য যা ব্যয় করতেন তা-ই ব্যয় করবেন; শুধু নরেন যেন ঠাকুরের চিতাভস্ম এবং অন্যান্য অভিজ্ঞান রাখার জন্য একটি বসতবাড়ির খোঁজ করেন। সেই বাসাটিই হবে ভক্তদের জুড়াবার জায়গা। সবাই সেখানে মিলিত হয়ে ঠাকুরের ধ্যান করবেন।

অনেক সন্ধানের পর বরানগরে গঙ্গার ধারে যথাসম্ভব কম ভাড়ায় নরেন একখানি বাসা ভাড়া করলেন। সেপ্টেম্বর মাস শেষ হবার আগেই সবাই নতুন বাসায় উঠে এলেন এবং সেটি ব্যবহার করতে লাগলেন। বুড়ো গোপাল (গোপাল ঘোষ) হলেন প্রথম স্থায়ী বাসিন্দা। অন্য ভক্তেরা দিনের বেলায় আসতেন আর রাত হলে ফিরে যেতেন। এই ব্যবস্থাই চলতে থাকল, যতদিন না সংসার ছেড়ে সবাই পাকাপাকিভাবে চলে আসতে পেরেছিলেন।

ভক্তেরা আসার আগে বেশ কিছুকাল যাবৎ বাড়িটি পরিত্যক্ত ছিল। লোকে বলতো হানা-বাড়ি। এককালে এই বাড়িতে নাকি অনেক খুন-রাহাজানি হয়েছে। বাড়িটির তখন প্রায় ভগ্নদশা। ফাঁক-ফোকরে ওৎ পেতে থাকে বিষধর গোখরো সাপ। সংলগ্ন বাগানটি শ্রীহীন হয়ে জঙ্গলে পর্যবসিত। সেখানে শিবাকুল স্বচ্ছন্দে বিহার করে। কিন্তু ভক্তদের মনে যেন কোনো বিকারই নেই। কারণ, এখন তারা মঠ পেয়েছেন এবং ঠাকুর যেমনটি শিখিয়েছেন সেইভাবেই তারা সেখানে বাস করছেন।

বালক ভক্তেরা রাত্রে মাদুর বিছিয়ে শুতো। ব্রাহ্মমুহূর্তে নরেন তাদের ডেকে তুলতেন, মধুর স্বরে ভগবানের নামগান শোনাতেন—'ওঠ্, জাগ্, হরিরসমদিরা পান কর্!' ওদের ধ্যানঘরের ঠিক মাঝখানে রামকৃষ্ণের শয্যাখানি পাতা থাকতো। শয্যার মাথার দিকে থাকতো ঠাকুরের ছবি। পায়ের দিকে নিচু টুলের উপর ছিল তাম্রাধারে রাখা রামকৃষ্ণের চিতাভস্ম এবং তাঁর ব্যবহার করা একজোড়া পাদুকা। প্রতিদিন শশী এখানটিতে ব'সে ধ্যান করতেন।

মঠের ভাইদের টাকাপয়সা বা খাবারদাবারের কোনো সংস্থান ছিল না। অভাব পূরণের কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। শাকভাত যেদিন যা জুটতো তাই তাঁরা খেতেন। জনসমাজে যাবার একটিমাত্র উপযুক্ত পোশাক ছিল। যে যখন বাইরে যেতেন সেটি পরতেন। নিজেদের তাঁরা 'দৈত্যদানা' বলতেন। সন্ধ্যার সময় ভক্তেরা ছাতে উঠতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঈশ্বর বিষয়ে নানা আলোচনা করতেন। কখনও রামকৃষ্ণের কথা, কখনও শঙ্করাচার্য, রামানুজ বা যীশু-খ্রীস্টের কথা, কখনও হিন্দু দর্শন, কখনও বা পাশ্চাত্য দর্শনের কথা। নরেন মঠের ভাই-দের গানবাজনা শেখাতেন। গভীর রাত পর্যন্ত সবাই গানবাজনা করতেন। প্রতিবেশীরা কিন্তু এই পুণ্যালোচনার কোনো সুযোগই নিত না। তারা শুধু অনুযোগ করতো।

সেবার ডিসেম্বর মাসে বাবুরামের মা তাঁর আঁটপুরের দেশের বাড়িতে বাবুরামকে ডেকে পাঠালেন। তবে শুধু তো সন্ন্যাসী ছেলেই নয়, নরেনকেও দেখতে চেয়েছেন বৃদ্ধা। যাত্রার সময় দেখা গেল দল বেশ ভারি—শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর, সারদাপ্রসন্ন সবাই উৎসাহী। ট্রেনে চড়ে আঁটপুরে যেতে সারা পথ তাঁরা ভজন গাইতে গাইতে চললেন।

বাবুরামের মা নিজেও রামকৃষ্ণের ভক্ত শিষ্যা। তাই সন্ন্যাসী ছেলের সঙ্গে মঠের ভাইদের সবাইকে দেখে তিনি খুব খুশি। মঠের ভাইরা এখানে অবসর কাটাতে আসেন নি। তাঁরা এসেছেন নিভৃতে ধর্মচর্চা করতে এবং সেইভাবেই বেশীরভাগ সময় তাঁরা ধ্যানাদি কাজে কাটাতেন।

একদিন বাড়ির উঠানে তাঁরা ধুনি জ্বাললেন। ধুনিকে ঘিরে তাঁরা সবাই বেশ কিছুক্ষণ ধ্যান করলেন। ধ্যানের পর নরেন সবাইকে যীশুর মহান ত্যাগের কথা বললেন এবং ম্যাথ-লিখিত সুসমাচার থেকে পাঠ ক'রে শোনালেন। 'বাস করার জন্য শৃগালের গুপ্ত গুহা আছে, পক্ষীকুলের খড়কুটার নীড় আছে, কিন্তু মানুষের মাথা গোঁজার কোনো অশ্রয় নেই।' বাণীটি উদ্ধৃত করে নরেন দেশে দেশে পরিভ্রমণরত খ্রীস্টবাণী প্রচারকদের কথা শোনা-লেন। তারপর তিনি ঠাকুরের বাণী প্রচারের কাজে মঠের ভাইদের শপথ নিতে বললেন। শপথ নেবার সময় দেখা গেল যে সেটি যীশুর জন্মের পূর্বদিন ; শপথ নেবার পক্ষে এমন অনুকূল দিন আর কি হতে পারে !

বরানগরের মঠবাড়িতে ফিরে আসার পর হোম করে শিষ্যভক্তেরা তাঁদের ব্রহ্মচারী নামগুলি গ্রহণ করলেন এবং সন্ন্যাসীর বস্ত্র পরলেন। কালী (অভেদানন্দ) তাঁর আত্মজীবনীতে এই হোম অনুষ্ঠান সম্পর্কে যে তথ্য দেন তা থেকে জানা যায় যে, ১৮৮৭র জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্ভবত অভেদানন্দ পরিবেশিত তথ্যটি নির্ভুল ; যদিও তারকের (শিবানন্দ) একখানি চিঠি থেকে জানা যায় যে, এই অনুষ্ঠান অনেক আগেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্য শ্রীম তাঁর কথামৃততে ১৮৮৭র মে মাস পর্যন্ত যে বিবরণ দিয়েছেন, সেখানে তিনি মঠের ভাইদের পূর্বাশ্রম নামগুলিই ব্যবহার করেছেন। অনুমান হয়, এঁদের সকলের সঙ্গে শ্রীম'র দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গতাই এর প্রধান কারণ।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭। সেদিনই শ্রীম প্রথম বরানগর মঠে এসেছেন। তাঁকে দেখে তারক ও রাখাল আনন্দে গান ধরলেন। নরেন্দ্র সবেমাত্র শিবসঙ্গীতটি লেখা শেষ করেছেন :

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বববম্ বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল মাল।
গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল-ত্রিশূল রাজে
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলি বন্ধ, জ্বলে শশাঙ্ক ভাল॥

গানের সঙ্গে নৃত্য করছেন তারক ও রাখাল। শ্রীম দেখলেন, তারক রাখাল ছাড়াও মঠে আছেন নরেন, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, কালী, বাবুরাম, সারদাপ্রসন্ন সবাই।

সেদিন নরেন বেশ বেলা করে কলকাতা থেকে ফিরেছেন। মোকদ্দমার কাজে কলকাতা গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে কালী জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মামলার কি হলো ? নরেন বেশ বিরক্ত। কালীর দিকে চেয়ে বললেন, 'ওসব খবরে তোমাদের দরকারটি কি ?' নরেনের সে-দিন তীব্র বৈরাগ্যভাব। সংসার সম্বন্ধে তিনি বীতস্পৃহ। বললেন, 'কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে সংসার ত্যাগ হবে না।' আরও বললেন, 'কামিনী নরকস্য দ্বারম। যত পুরুষ সব স্ত্রীলোকের বশ।' নরেনের এই উক্তি কিন্তু নারী বিদ্বেষ নয়। রামকৃষ্ণ যে ভাষায় পুরুষের নারী লিপ্সার নিন্দা করতেন, নরেনও সেই ভাবটিই গ্রহণ করেছিলেন।

রাত্রে শিবপূজার আয়োজন হয়েছে। পূজা হবে বাগানে, বেলতলায়। চার প্রহরে চার পূজা। পূজান্তে বলরামের পাঠানো ফল ও মিষ্টান্ন খেয়ে সবাই উপবাস ভঙ্গ করলেন।

নরেনের তখন পূর্ণ কৌতুকভাব। আমোদের জন্য রামকৃষ্ণের সমাধিভাবের নকল করছেন। মুখে মিষ্টান্ন পুরে একেবারে স্পন্দনহীন। চক্ষু নিমেষশূন্য। তাড়াতাড়ি একজন দৌড়ে এলেন; তারপর যেন সমাধিমগ্ন নরেনকে ধারণ করছেন এমন ভান করলেন। ঠিক যেমনটি রামকৃষ্ণকে ধারণ করা হ'ত তেমনি ভঙ্গিমা নরেনের। খানিকক্ষণ পরে নরেন চোখ খুল-লেন। রসগোল্লাটি তখনও তাঁর মুখে। ধীরে ধীরে তাকালেন, যেন বাহ্যচেতনা ফিরে এসেছে! তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বললেন। 'আমি-ভাল-আছি।' নরেনের নকুলে ভঙ্গি দেখে সবাই হেসে আকুল।

একদিন বরানগর মঠে রাখালের বাবা এসে উপস্থিত। ছেলেকে সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। রাখাল বললেন, 'কেন বারবার কষ্ট করে আসেন? আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ করুন যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আমি আপনাদের ভুলে যাই।'

৭ই মে, ১৮৮৭। নরেন এসেছেন শ্রীম'র কলকাতার বাড়িতে। কথায় কথায় বললেন, 'জানেন! আমার আজকাল কিছু ভালো লাগে না। এই আপনার সঙ্গে কথা বলছি, ইচ্ছে হচ্ছে উঠে যাই।' খানিক চুপ করে নরেন আবার বললেন, 'প্রায়োপবেশন করবো—যাতে ভগবানকে পাই।' নরেনের তীব্র ঈশ্বরাসক্তি দেখে শ্রীম'র কৌতুক হলো। বললেন, 'তা বেশ তো। করো না! ভগবানকে পাবার জন্য সবই তো করা যায়।'

নরেন: কিন্তু, যদি খিদে সামলাতে না পারি?

শ্রীম: তাহলে খেয়ো—খেয়েদেয়ে আবার লেগে পড়বে।'

কথাবার্তার পর একখানা গাড়ি করে দু'জনে সোজা বরানগরে এসে পৌঁছলেন। এদিকে নরেন্দ্র কলকাতায় গেছেন দেখে সকলের অলক্ষ্যে সারদাপ্রসন্ন মঠ ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। কোথায় গেছেন কেউ জানে না। সারদার নিরুদ্দেশ হবার কথা শুনে নরেন বেশ বিচলিত। কোথায় গেল ছেলেটা? আর মঠের এরাই বা কেমন? রাখালই বা কেন তাকে যেতে দিলেন? কিন্তু রাখাল তো সে সময় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গিয়েছিলেন? তাহলে হরিশ? সে কেন সারদাকে বারণ করলো না? নরেন্দ্র জনে জনে জিজ্ঞেস করছেন। রাগা-রাগি করছেন। হরিশকে ডেকে বললেন, 'আমি জানি তুমি তখন পা ঝাঁকি করে লেকচার দিচ্ছিলে। তা তুমি ছেলেটাকে সামলাতে পার নি?' উত্তরে মিনমিন করে হরিশ বললে, 'রাখালদা তো বারণ করেছিলেন। তবুও সে চলে গেল।' নরেন এবার শ্রীম'র দিকে ঘুরে বলে উঠলেন, 'দেখছেন! আমার কি মুশকিল! এখানেও এক মায়ার সংসারে পড়েছি। কে জানে ছোঁড়াটা কোথায় গেল?' যাহোক, একটা হদিশ অবশেষে মিললো। নরেনের নামে সারদা একখানা চিঠি লিখে গেছেন। সেটি পাওয়া গেল শেষপর্যন্ত। সারদা লিখেছে, পায়ে হেঁটে সে বৃন্দাবনধাম চলেছে। আরও লিখেছে, 'এখানে থাকা আমার পক্ষে বিপদ। আমার মনে ভাবের বদল হচ্ছে; আগে বাপ-মা বাড়ির সকলের স্বপ্ন দেখতাম। এখন মায়ার প্রতিমূর্তি নারীর স্বপ্ন দেখছি। দু'বার বাড়ি ফিরে যেতে হয়েছিল; খুব মনোকষ্ট পেয়েছি। এবার

তাই অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। ঠাকুর একবার আমায় বলেছিলেন, "তোর বাড়ির ওরা সব করতে পারে। ওদের বিশ্বাস করিস না।'"

নরেন্দ্র যখন চিঠিখানি পড়ছিলেন তখন রাখাল ফিরলেন। নরেন তাঁর হাতে সারদার চিঠিখানি দিলেন। রাখাল সেটি পড়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে, এটি-ই তার চলে যাবার কারণ। আমায় একবার বলেছিল, "মা ভাইবোনদের খবর নিতে, মোকদ্দমা করতে নরেন প্রায়ই বাড়ি যায়। আমারও ভয় হয়, পাছে তার দেখাদেখি আমারও বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে।" নরেন্দ্র চুপ করে রাখালের কথা শুনলেন। মনে হলো তিনি বুঝি লজ্জা পেয়েছেন।

খানিক পরে তীর্থে যাবার কথা উঠলো। রাখালের মত হলো, মঠের ভাইদের তীর্থধর্ম করা দরকার। কথায় কথায় রাখাল বললেন, 'এখানে থেকে আমরা কি পেলুম? কিছু না। কিছুই হলো না আমাদের।' নরেন প্রতিবাদ করলেন। 'শুধু ঘুরে বেড়িয়েই বা কি হবে? ভগবান দর্শন যেন শুধু জ্ঞান দিয়েই হয়, তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস?'

নরেনের কথা শুনে একজন ভক্ত বললে, 'আমরা তাহলে সংসার ত্যাগ করলামই বা কেন?'

ভক্তটির কথা শুনে নরেন্দ্র অবাক। তার দিকে চেয়ে বললেন, 'এসব কি বলছিস? ভগবান পেলুম না বলে ছেলেমেয়ের বাপ হবো?'

ভক্তটি চুপ করে গেল। আর একজন ভক্ত শুয়ে ছিল। এতদিনেও ঈশ্বর-দর্শন হলো না বলে যেন সে কত কাতর! হঠাৎ এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলে উঠল, 'ওরে, আমায় একটা ছুরি এনে দে রে! ঈশ্বরের অদর্শন আর যেন সইতে পারি না! উঃ! এই উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপনে কী যন্ত্রণা!' নরেন্দ্র বিরক্ত হলেও বুঝতে দিলেন না। ভক্তটির দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, 'ওই তো রয়েছে ছুরিটা! হাত বাড়িয়ে নে না!' নরেনের কথা শুনে সবাই হা হা করে হেসে উঠলো।

সারদাপ্রসন্ন যেমন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন তেমনি হঠাৎই আবার ফিরেও এলেন। তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্য সফল হয় নি। যাবার পথে একরাত্রি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে ছিলেন। সেখানে প্রতাপ হাজরার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। হাজরার এখন পরমহংস ভেক। ঠাকুর স্বর্গে গেছেন, হাজরার এখন কিসের ভয়! মানুষটা তাই পরমহংসভাব নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। নির্লজ্জের মতন সারদাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমাকে কি ঠাওরাও?' সারদা জবাব দিলেন না দেখে হাজরা তামাক চাইল। ভাবখানা, আমার সেবা করো।

সরল ভাবে হাসতে হাসতে শ্রীমকে সব কথা সারদাপ্রসন্ন বললেন। সব শুনে শ্রীম জিজ্ঞেস করলেন, 'তা তোমার সঙ্গে কি কি ছিল?' সারদা বললেন, কিছু না। এক আধ-খানা কাপড় আর ঠাকুরের একখানা ছবি।......তা সে ছবি কাউকে দেখাই নি।'

আর একদিনের কথা। আর এক গুরুভাই শশীর বাবা ছেলেকে সংসারে ফিরিয়ে নিতে মঠে এসেছেন। শশী বাপ মাকে বড় ভালবাসতেন, তাই বাপের সামনাসামনি হতে ভয় পেলেন। বাপ এসেছেন শুনে অন্য দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন, যাতে দেখা না হয়। শশীর বাবা শ্রীমকে চিনতেন। তাঁকেই ধরে বসলেন। 'কিছু একটা করুন। আমি জানি নরেনই যত নষ্টের গোড়া। বেশ তো ওরা বাড়ি ফিরে গেছলো! ওই নরেন পাণ্ডাই বাদ সাধলো।'

শ্রীম : এখানে কেউ পাণ্ডা নেই। সবাই সমান। নরেন্দ্র কি করবেন ? নিজের ইচ্ছে না হলে কি কেউ সংসার ছাড়ে ? আমরা কি কেউ একেবারে বাড়ি ছেড়ে আসতে পেরেছি ?

শশীর বাবা : তোমরাই তো ঠিক করছো, বাবা ! দু'দিক রাখছো। তোমরা যা করছো তাতেও তো ধর্ম হয় ! শশীও তাই করুক না ! আমরাও তো তাই চাই। এখানে থাকুক, সেখানেও যাক। তুমি জান না বাবা, কেঁদে কেঁদে ওর মার কি হাল হয়েছে !

শ্রীম কি বলবেন। মনে মনে শুধু দুঃখ পেলেন।

একদিন বিকাল নাগাদ রবীন্দ্র নামে একজন যুবক ভক্ত উন্মত্তের মতন এসে হাজির। খালি পা, পরনের কাপড় ছেঁড়া, পাগলের মতন চোখের দৃষ্টি। যুবকটি রামকৃষ্ণের কাছেও আসত, তাঁর স্নেহ পেয়েছিল। রামকৃষ্ণ তাকে বলেছিলেন, 'তোর কিছু দেরি হবে। এখন তোর একটু ভোগ আছে।' এতদিনে রবীন্দ্রের মোহ ভেঙেছে। জানতে পেরেছে যে তার ভালবাসার মেয়েটি বেশ্যা। বেশ্যাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করে রবীন্দ্র অর্ধবস্ত্রে মঠে এসেছে। সংসারে আর ফিরবে না, এই সংকল্প।

মঠের ভাইরা তাকে শান্ত হতে পরামর্শ দিলেন। তারপর বললেন, 'তুমি গঙ্গাস্নান করে এস ; ঠাণ্ডা হও।' তাই রবীন্দ্রকে নিয়ে একজন ভক্ত ঘাটে গেলেন। স্নান সেরে ফেরবার পথে ভক্তটি রবীন্দ্রকে ঘাটের পাশে শ্মশানে নিয়ে গেলেন। তারপর রবীন্দ্রকে সেখানে বসে ধ্যান করতে বললেন। শ্মশানে বসে ধ্যান করলে সংসার যে অনিত্য, তা বেশ বোঝা যায়।

রবীন্দ্র সে রাতটি মঠেই কাটালো। পরের দিন আবার গঙ্গাস্নানে গেল। ভেজা কাপড় পরে যখন সে ফিরে এলো, তখন তাকে দেখেই শ্রীম'র কানে কানে নরেন বললেন, 'এই তো সময় হয়েছে। এবার সন্ন্যাস দিলে বেশ হয়।' সারদাপ্রসন্ন তাকে একখানি গেরুয়া কাপড় এনে দিলেন। শ্রীমকে নরেন বললেন, 'এইবার ওকে ত্যাগীর কাপড় পরতে হবে।' শ্রীম জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ত্যাগ ?' নরেন জবাব দিলেন, 'কাম-কাঞ্চন ত্যাগ।'

অবশ্য রবীন্দ্র কখনও সন্ন্যাসী হয় নি।

ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে নরেন প্রায়ই তর্ক করতেন ; আবার যখন ভজন গাইতেন তখন তাঁর চোখ দিয়ে জল ঝরতো। তিনি আকুল হয়ে কাঁদতেন। লোকের চোখে এটি বড় বেমানান দেখাতো। কিন্তু সে কথা বললে নরেন হাসতেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীম একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সেদিন সন্ধ্যায় চৈতন্যচরিত পড়া হচ্ছে। একজন ভক্ত পাঠ করছেন। বর্ণনার এক স্থানে ভাব ও ভাষার প্রয়োগটি অক্ষম মনে হওয়ায়, ভক্ত সেটি ব্যঙ্গচ্ছলে পাঠ করলেন। ব্যস ! নরেন রীতিমত ক্ষিপ্ত। হাত থেকে বইটি কেড়ে নিয়ে বললেন, 'এমন করে ভালো জিনিষটা নষ্ট করতে আছে ?' তারপর যে অংশটি পড়তে লাগলেন সেটি হলো শ্রীচৈতন্যের প্রেম বিতরণ—আচণ্ডালে দেই কোল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল অব্দি সবার মধ্যে প্রেম বণ্টন।

শুনতে শুনতে ভক্তটি হঠাৎ বললো, 'আমি বলি কেউ কাউকে প্রেম বিলোতে পারে না।

নরেন : ঠাকুর আমায় বিলিয়েছেন।

ভক্ত : তুমি কি তা ঠিকঠিক পেয়েছ ?

নরেন : সে তুই কি বুঝবি ? তুই তো সারভেণ্ট্ ক্লাস (সেবক)। তোরা সবাই আমার পা টিপবি, সেবা করবি। ভেবেছিস বুঝি যে সব বুঝে গেছিস ! নে, তামাক সাজ !

ভক্ত : সাজবো না। সবাই হেসে উঠলেন।

শ্রীম মনে মনে চমৎকৃত। ভাবলেন, মঠের সব ভাইদের মধ্যে ঠাকুর তেজ দিয়েছেন। শুধু একা নরেনের মধ্যে নয়। এ তেজ না থাকলে কি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে লোকে সংসার ছাড়তে পারে ?

ইতিমধ্যে সারদাদেবী বৃন্দাবনে থাকাকালীন এমন ভাবে আপনাকে গড়ে নিয়েছিলেন, যাতে পরবর্তীকালে তিনি সকলের জগন্মাতা হয়ে উঠতে পারেন। ভাগ্য যেন অনিবার্যভাবেই এই পরিণতির দিকে তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। শুধু যে ভক্তির আসনটি পাকা করতেই তাঁর এই মাতৃরূপ গ্রহণ, তা নয়। রামকৃষ্ণের ভক্তেরাই শুধু নয়, তাঁর মাতৃভাবটি ছিল সকলের জন্যই অবারিত। যত দিন যেতে লাগলো, ততই যেন ভক্ত সন্তান পরিবৃত হয়ে এক মস্ত সংসারের কর্ত্রী হয়ে উঠতে লাগলেন তিনি। কে বলবে এই লাজুক মেয়েটি, লোকনয়নের আড়ালে যিনি এতকাল নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন, এমনভাবে জগন্মাতা হয়ে তিনি নিজেকে উন্মোচিত করবেন। কিন্তু এর জন্য তাঁকে কোনো ভেক নিতে হয় নি। জোর করে কারও উপর অধিকারও চাপিয়ে দিতে হয় নি। এমনও হয়েছে যখন তাঁর অতি সাধারণ বেশবাস কিংবা ব্যক্তিত্বহীন চেহারার দরুন বাইরের ভক্ত এসে ভুল করে গোলাপ মাকে গড় করেছে। সারদা দেবীর এই সরলতা নিয়ে রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে ঠাট্টা করতেন। বলতেন, 'ও হলো ছাই চাপা বেড়াল।' কিন্তু তাঁর এই সরলতার জন্যই ভক্তেরা মুগ্ধ হ'ত। নিবেদিতা লিখেছেন, তাঁর 'এই উদার ব্যবহার এবং খোলা মনটি আমার কাছে সাধিকারূপের মতোই আশ্চর্য মনে হয়েছে।'

প্রথম প্রথম গুরুপত্নী হয়ে লোকশিক্ষা দেবার ব্যাপারটি সারদাদেবী এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু বারংবার দর্শন লাভের পর রামকৃষ্ণের নির্দেশটি তাঁকে এই কাজে আগ্রহী করে তোলে। ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণের উপস্থিতি তাঁকে সজাগ করে তুলল। প্রথম যেবার তাঁকে দেখলেন তখন তিনি রেলগাড়িতে চড়ে বৃন্দাবন চলেছেন। রামকৃষ্ণ দেখা দিলেন কামরার জানলায়। বললেন, 'সোনার কবচটি হারিয়ো না।' বৃন্দাবনে পেঁছানোর পর আবার দেখা পেলেন তাঁর। দেখা দিয়ে রামকৃষ্ণ বললেন, 'এই তো আমি রয়েচি—কোথায় চলে গেচি বলে ভাবচ কেন ? আমি শুধু ঘর বদল করেচি।' সারদাদেবী বৃন্দাবনে বেশিদিন ছিলেন না। কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতেই ঠাকুর দেখা দিয়ে যোগীন্দ্রকে দীক্ষা দিতে বলেছিলেন। ঠাকুরের এই নির্দেশটি সারদার মনঃপূত হয় নি। ঠাকুর আবার দেখা দিলেন—পরপর দু'বার। মন্ত্রটি শিখিয়ে দিলেন। তখন তিনি যোগীন্দ্রকেও নিয়মিত দর্শন দিয়েছেন, আর বারবার বলেছেন যেন সারদার কাছে তিনি দীক্ষা নেন।

১৮৮৭র আগস্ট মাসে সারদা মা কলকাতায় ফিরে এলেন। ফিরে দেখলেন মঠের ভাইরা তীর্থযাত্রার জন্য মনে মনে প্রস্তুত। অর্থাৎ মাসাধিককালের জন্য মঠের ভাইরা আলাদা হয়ে যাবেন। মা'র মনে দুশ্চিন্তা দেখা দিল। তবে কি এত যত্নে তৈরি করা সন্ন্যাসীমণ্ডল ভেঙে যাবে ? কিন্তু তা হয় নি। কারণ ভ্রাতৃপ্রেমের এ বন্ধন আরও গভীর। তার উপর আছে

রাখাল ও নরেনের উদ্দীপ্ত প্রেরণা ; তাঁদের সন্ন্যাসী জীবনের আসক্তিশূন্য ভবঘুরেপনা। সবাই বাঁধা থাকে নিয়মের শাসনে। কিন্তু নিয়ম যখন অনিয়ম হয়, তখন বাঁধন ছিঁড়ে যায়। এক্ষেত্রে নিয়মভাঙার নিয়ম ছিল না। এগুলিই সন্ন্যাসীমণ্ডলকে বেঁধে রেখেছিল। এই ব্যাপারে আর একজনের দান ছিল অপরিসীম। তিনি শশী (রামকৃষ্ণানন্দ)। দিনের পর দিন রামকৃষ্ণের ব্যবহার করা স্মারকগুলি তিনি পূজা করে গেছেন—একদিনের জন্যও মঠ ছেড়ে তিনি কোথাও যান নি। শশীর এই ভক্তি বরানগরের মঠবাসীদের মনে এক উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক আবহ গড়ে তুলেছিল। তারপর কয়েক বছরের মধ্যেই আসতে লাগলেন আরও নবীন ভক্তেরা। এঁদের কেউ রামকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেন নি। অবশেষে এঁদের নিয়েই গড়ে উঠল সঙ্ঘের দ্বিতীয় দল। ১৮৯১র নভেম্বর মাসে বরানগরের মঠ স্থানান্তরিত হলো আলমবাজারের আর একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে। এখানকার ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত অনুকূল হলেও লোকের চোখে এটিও হানাবাড়ি ছিল। ফলে এ বাড়ির মাসিক ভাড়াও কম ছিল।

নরেন ও রাখাল ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিভ্রমণে বেরোলেন—কখনও একত্রে, কখনও একলা। বৃন্দাবনধাম দর্শনের সময় রাখালের তীব্র উদ্দীপন হলো। কারণ বৃন্দাবনধাম যে কৃষ্ণের বাল্যলীলাক্ষেত্র! তবুও ১৮৯৫র প্রথমদিকেই রাখাল পাকাপাকি ভাবে মঠে ফিরে এলেন। সঙ্ঘের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করাই কর্তব্য মনে করলেন তিনি। নরেন তাই প্রায়ই রাখালের কর্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসা করতেন। বলতেন, 'আর সবাই ছেড়ে যাবে, কিন্তু আমার শেষদিনটি পর্যন্ত রজা ঠিক আমার পাশটিতেই থাকবে।'

১৮৯০, জুলাই মাস। নরেন স্থির করেছেন অনির্দিষ্টকালের জন্য তীর্থভ্রমণে বার হবেন ; অর্থাৎ সংসারের সঙ্গে শেষ বন্ধনটুকুও মুছে ফেলতে চান। সারদামা'র অনুমতি আর আশীর্বাদ চাইতে গেলেন। বললেন, 'যদি মানুষের মতন মানুষ হতে পারি, তবেই ফিরবো, নইলে নয়।' সারদামাতা স্তম্ভিত ; দুঃখে ভরে উঠল মন। বললেন, 'অমন কথা বলতে নেই বাবা!' শ্রীশ্রীমার কথা শুনে নরেনের চৈতন্যোদয় হলো। তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'তাই হোক ; কথা দিচ্ছি আপনার কৃপা পেলে ফিরে আসবো।' শ্রীমা তখন নরেনকে গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরীর কাছ থেকে অনুমতি নিতে বললেন। নরেন বললেন, 'এখন তুমিই আমার মা'। এরপর সাতবছরের মধ্যে তাঁদের আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নি।

প্রথম প্রথম মঠের ভাইদের সঙ্গেই নরেন তীর্থভ্রমণ করছিলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তাঁর পথ আলাদা হয়ে গেল। যখন দিল্লী এসে পেঁছিলেন তখন একা। ইতিমধ্যেই নরেন বিখ্যাত হয়ে গেছেন। নিজের পরিচয় গোপন রাখতে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেল। ফলে অতি দ্রুত তাঁকে দিল্লী ছাড়তে হলো। সেই শুরু হলো ভারতপথিক নরেনের ভারত পরিক্রমা। ঠিক তিনটি বছর এইভাবে ঘুরে বেড়ালেন। রাজপুতানার মধ্য দিয়ে পশ্চিম ভারত ঘুরে অবশেষে দক্ষিণ ভারতে এসে পেঁছিলেন। পথে পড়ল বোম্বাই, পুণে, কোলাপুর ও বাঙ্গালোর। সেই সময় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন, কথা বলেছেন এবং একত্রে আহার করেছেন। এমনি করে ধনী-নির্ধন, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, পণ্ডিত-মূর্খ, মুসলমান জৈন, সব সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁর পরিচয়ের বৃত্তের মধ্যে এসে গিয়েছিল। কী দুঃসহ দারিদ্র্য আর আবিল পরিবেশের

মধ্যে এদেশের মানুষ বাস করে তা যেমন তিনি দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন মুষ্টিমেয় মানুষের চোখ-ধাঁধানো বৈভব। মানুষের অন্ধ সংস্কার দেখে যেমন তিনি হতাশ হতেন, তেমনি মানুষে-মানুষে প্রেম-ভালবাসা দেখেও তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠতো। মানুষকে অকর্মা, অলস ও শিশ্নোদরপরায়ণ হতে দেখলে তিনি ক্রোধে ধৈর্যহারা হয়ে উঠতেন। বলতেন, এদের ভেতরটা একেবারে ইটপাটকেলের মতন জড়, তাই ছোট ছোট ঈর্ষা আর স্বার্থ নিয়ে এদের এমন কলহ, হানাহানি। এইভাবে চোখের সামনে তিনি যেন এক মহান জাতির পতন দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু একেবারে হতাশ হয়ে পড়েন নি। তিনি জানতেন, এই জাতির মধ্যেই নিহিত হয়ে আছে এক প্রবল আত্মশক্তি। সেই আত্মশক্তি জাগ্রত হলে জাতির নব অভ্যুত্থান হবে—জাতির মরা গাঙে বান এসে তার দু'কূল ভাসিয়ে দেবে। তখন জাতির সেই নবকলেবর অতীতের সব সমারোহ, সব সৌন্দর্য অতিক্রম করে যাবে। সত্যদ্রষ্টা নরেন সেদিনই দেখে-ছিলেন যে অচিরেই ভারতবর্ষ তার ভাবরত্নটি ফিরে পাবে এবং সমগ্র জগতকে সেটি দান করবে।

নরেন মনের ভাব গোপন করে কথা বলতেন না। যা সত্য তা নির্ভয়ে বলে দিতে পারতেন। আলোয়ারের মহারাজাকে একবার তিনি কঠিন ভৎর্সনা করেছিলেন; কারণ মহারাজা তাঁর ইংরেজ বন্ধুদের নিয়ে বাঘ শিকারে এত অধিক মত্ত থাকতেন যে, দরিদ্র প্রজাদের সুখদুঃখের দিকে তিনি একটুও মন দিতেন না। একদিন মহারাজা কথা প্রসঙ্গে বলে ফেলেন যে, দেব-দেবীর মূর্তি বা ছবি দেখে তাঁর একেবারেই ভক্তি হয় না, কারণ সেগুলি মাটি, পাথর বা রঙ ছাড়া কিছু নয়। নরেন তখনই দরবার কক্ষে আলম্বিত মহারাজার পূর্ণাবয়ব আলোক চিত্রটি মাটিতে নামিয়ে তার উপর নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করতে আদেশ দেন। মহীশূরের মহা-রাজাকে নরেন অনায়াসে বলতে পেরেছিলেন যে, তিনি স্তাবকবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে ভালবাসেন। একবার কয়েকজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে কোন্ হিন্দু যুগটি গৌরবময় তা জানতে চান। নরেন শ্লেষ করে উত্তর দিয়েছিলেন, যে যুগে পাঁচজন ব্রাহ্মণ গরুর গা ধুইয়ে দিত সেই যুগটি সবচেয়ে গৌরবময়; আরও বলেছিলেন যে পশ্চিমীবাসীদের সমকক্ষ হতে গেলে নিরামিষভোজন ত্যাগ করতে হবে।

একথা ঠিক যে তাঁর নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার জন্য অনেকেই নরেনের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কিন্তু তাঁর সততা অনেক ক্ষমতাশীল মানুষকে কাছেও টেনে এনেছিল। মহীশূরের মহারাজা এবং তাঁর দেওয়ানজী নরেনের ব্যক্তিত্বের প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়ে যান যে, তাঁকে বহুমূল্য একটি উপহার নিতে অনুরোধ করেন। অনুরুদ্ধ নরেন একজনের কাছ থেকে ধূমপান করার একটি পাইপ এবং অন্যজনের কাছ থেকে একটি চুরুট নিয়ে দু'জনকেই কৃতার্থ করেন। এদিকে রামনাদ ও খেতড়ির দুই রাজা ক্রমাগত অনুরোধ করে চলেছেন, নরেন যেন ধর্মমহা-সভায় যোগ দিয়ে ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্মের মর্মবাণীটি জগতসভায় প্রচার করার দায়িত্ব নেন। এর দরুন যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁরাই নেবেন, কিন্তু ধর্মমহাসভায় হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করতে নরেনকে রাজী হতে হবে। বলা বাহুল্য, নরেন তখনও মনস্থির করতে পারেন নি, তাই নিশ্চিতভাবে কোনো জবাবও দিতে পারেন নি।

সুতরাং নরেন আবার পথে বেরিয়ে পড়লেন। এবার সারা দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করলেন পদব্রজে। পর্যটনের সময় কখনও দরিদ্রদের সঙ্গে একাসনে বসে ভোজন করেছেন, কখনও

বা দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়েছেন। এইভাবে যখন তিনি ভারতের দক্ষিণতম বিন্দু কুমারিকা অন্তরীপে এসে পৌঁছিলেন, তখন ক্ষুৎপিপাসায় তিনি প্রায় অর্ধমৃত। একদিন কন্যাকুমারীর মন্দিরে বসে ধ্যান করছেন, সহসা সুনীল জলধিবেষ্টিত সর্বশেষ শিলাখণ্ডটি তাঁর দৃষ্টিপথে জেগে উঠল। কি এক প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে নরেন পূজাস্থান থেকে উঠে পড়লেন, তারপর সাঁতার দিয়ে হাঙ্গরসংকুল জলধি পেরিয়ে শিলাখণ্ডের কাছে গিয়ে পেঁছিলেন। কিছুক্ষণ শিলাখণ্ডের উপর বসে থাকার পর, ধীরে ধীরে তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন এক মুহূর্ত আসে, যখন সে ভাবতে বসে ভাগ্য তার জন্য কি লুকিয়ে রেখেছে। তখন তার মনের গভীরে যে সঙ্কল্পটি অস্ফুট ছিল, তাকে চিনতে না পারলেও, অবচেতন মনে সেই সঙ্কল্পটিই সে মেনে নয়। নরেনের মতো অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এই উপলব্ধির মুহূর্তটিকে ঐতিহাসিক বলা যেতে পারে। উপলব্ধির এই মুহূর্তটি ঘটেছিল ১৮৯২ সালের কোনো এক শীতের অপরাহ্নে। নরেনের উত্তরজীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের উৎস ছিল বেলাশেষের সেই উপলব্ধির মুহূর্তটি। তারপর পাশ্চাত্যদেশে তিনি দু'বার পরিভ্রমণ করেছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেছেন ; সর্বত্রই এই অসাধারণ উপলব্ধির প্রেরণা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, এই উপলব্ধির পরোক্ষ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় ভারতবর্ষের পরবর্তী রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তাধারাতেও, বিশেষ গান্ধী এবং তাঁর অনুগামীদের মধ্যেও।

সেদিন শিলাখণ্ডের উপর ধ্যানমগ্ন নরেনের মন নিবিড় আবেগে অভিভূত হয়ে উঠেছিল—তাঁর ধ্যানদৃষ্টির সামনে ফুটে উঠেছিল ভারতবর্ষের অবজ্ঞাত রূপটি। তাঁর মনে হয়েছিল ভারতভূমির উত্তরণের জন্য তিনি এবং তাঁর অনুব্রতীরা এক বিশেষ ভূমিকা নিতে পারেন। তাই যে সংকল্পগুলি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলিই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পথরেখাটি সুনির্দিষ্ট করে দেয়। যথার্থ হবে যদি আবেগহীন সরল ভাষায় সংকল্পগুলি একে একে নিবেদন করি :

একথা ঠিক যে ভারতবর্ষের মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি হলো ধর্ম। কিন্তু অসহায় ভারতবর্ষের এখন যা প্রয়োজন তা ধর্ম নয়, শিক্ষা। নিজেকে গ'ড়ে তুলতেই তার শিক্ষার প্রয়োজন। তবে শিক্ষা লক্ষ্যহীন হবে যদি ভারতবর্ষের অধ্যাত্মধারাটি রামকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথে পাওয়া না যায়। বলা বাহুল্য, রামকৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত সেইসব সংসারত্যাগী আদর্শবাদীরা জড়বিজ্ঞানে জ্ঞানঋদ্ধ হয়েও, ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মটি, বিস্মৃত হন নি। এঁরা সবাই সন্ন্যাসী ; সন্ন্যাসী সঙ্ঘের নির্দেশে মানব কল্যাণের স্বার্থে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু এই মহাকার্যভার সম্পন্ন করতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। কে দেবে এত অর্থ ? নরেন তারও বিচার করেছেন। অর্থ দেবে পশ্চিমের দেশগুলি। পরিবর্তে ভারত তার অত্যন্ত মহার্ঘ ভাবরত্ন, সেই অধ্যাত্মবাদটি, অর্ঘস্বরূপ তাদের দান করবে। পশ্চিম দেবে ক্ষুধার অন্ন, আর নিরন্ন ভারত দেবে অধ্যাত্মবিকাশের মন্ত্র। তাদের বোঝাতে হবে যে, ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদের কাঠামোটি ভেঙে পড়লে সারা পৃথিবীর সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেদিন এই সত্যটি এরা বুঝবে সেদিন তাদের স্বার্থসাধনের কাজে পাশ্চাত্য দেশগুলি ভারতবর্ষকে ব্যবহার করবে না। এইভাবে মূল্যবোধের আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে একদিন সারা বিশ্ব উপকৃত হবে।

৩১শে মে, ১৮৯৩। বোম্বাই বন্দর থেকে ভংকুভরের উদ্দেশে জাহাজ ছাড়ল। পথে পড়ল সিংহল, হংকং, জাপান। ভংকুভর দ্বীপ থেকে ট্রেনযোগে কানাডার মধ্য দিয়ে চিকাগো— সেখানে ধর্মমহাসভার অধিবেশনে নরেন যোগ দিতে চলেছেন। খেতড়ির রাজা নরেনকে কমলা রঙের একটি মূল্যবান রেশমের আলখাল্লা, গেরুয়া পাগড়ি এবং জাহাজের একটি প্রথম শ্রেণীর কেবিনের টিকিট কিনে দিয়েছেন। খেতড়ির রাজা নরেনের সন্ন্যাসী নামকরণও করে দিয়েছেন। এখন থেকে নরেন হয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দ জুলাই মাসের মাঝামাঝি চিকাগো শহরে এসে পেঁছিলেন। এসেই শুনলেন যে, সেপ্টেম্বর মাসের আগে ধর্মমহাসভার অধিবেশন বসবে না। এ যেন আরেক দুর্ভাবনা! আমেরিকা ধনীর দেশ, তাই ব্যয়াধিক্য হচ্ছে। বস্টন শহরে সস্তায় বাস করা যায় শুনে, বিবেকানন্দ ট্রেনযোগে বস্টন অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে এক মার্কিন মহিলার সঙ্গে তাঁর-পরিচয় হলো। সহৃদয় মহিলাটি বিবেকানন্দকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর মাসাচুসেটস-এর খামার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এখানে থাকার দরুন বিবেকানন্দের খরচ কম হলেও, মহিলাটি ডেকে ডেকে সবাইকে এই ভারতাগত সাধক দেখাতে লাগলেন। অচিরেই বিবেকানন্দ বিখ্যাত হয়ে গেলেন। স্থানীয় গির্জা আর সমাজ-সংস্থা থেকে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ পেতেন। তাঁর তেজোদ্দীপ্ত চেহারা দেখে সবাই তাঁকে ভারতীয় রাজা মনে করতো। পথের ছেলেরা তাঁর অদ্ভুত পোশাক দেখে বিদ্রূপ করতো। সম্পাদকেরা তাঁর নামের বিকৃত বানান ও উচ্চারণ নিয়ে পরিহাস করতো। এই সময় এক মহিলাবন্ধুর সঙ্গে বিবেকানন্দের পরিচয় হয়। একটি চিঠিতে মহিলাটি লিখেছেন, 'রবিবার দিন চার্চে বক্তৃতা করতে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে আনা হলো। চার্চের কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছে বিধর্মী এবং পৌত্তলিক শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন। আমি তখন হাসতে হাসতে ঘরের এক কোণে গিয়ে বসলাম। কিন্তু হাসতে হাসতে কান্নায় আমার গলা বুজে গেল। ভাবলাম উনিও (বিবেকানন্দ) একজন শিক্ষিত! আঠারো বছর থেকে সন্ন্যাসী। ওদের সন্ন্যাসীদের যা সংকল্প আমাদেরও তাই। শুধু দারিদ্র্যই ওদের কাছে নিষ্ঠুর সত্য।...মানুষটি আশ্চর্যরকমের বুদ্ধিমান এবং কি করে যুক্তি সাজাতে হয় তা জানেন।...চট করে ওঁকে কেউ বিপাকে ফেলতে পারবে না, কিংবা যুক্তির দৌড়ে তাঁকে পিছনে ফেলে যেতে পারবে না।'

নতুন পরিবেশে বিবেকানন্দ প্রথম থেকেই চমৎকারভাবে মানিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ও কথাবার্তা শুনে শ্রোতারা কেউ অনুপ্রাণিত, কেউ মুগ্ধ, কেউ আহত বা কৌতুকবোধ করেছেন। কিন্তু কখনও আপন মনোভাব তিনি গোপন করেন নি। ইংরেজদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, 'ইংরেজরা! ওরা তো কিছুকাল আগেও বর্বর ছিল! ওদের মেয়েদের পোশাকের মধ্যে পোকামাকড় ঘুরতো।' যখন কোনো খ্রীশ্চান হিন্দুধর্মের সমালোচনা করতো, তখন তিনিও সমান তেজে খ্রীস্টধর্মের সমালোচনা করতেন। তবুও মার্কিন দেশটি সম্বন্ধে তাঁর তীব্র কৌতূহল ছিল। যেমন তাড়াতাড়ি কোনো বিষয় শিখতেন তেমনি প্রশংসাও করতেন। বস্টনের কাছে একবার তাঁকে একটি নারী কারাগার দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সব দেখে শুনে তিনি লিখলেন :

কি সহৃদয়তার সঙ্গেই না এইসব বন্দীদের দেখা হয়, তাদের সংশোধন করার চেষ্টা করা

হয়—যাতে বন্দীদশা শেষে তারা সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে নিজেদের ফিরে পেতে পারে। কি অদ্ভুত, কি সুন্দর এই শিক্ষাব্যবস্থা! না দেখলে বিশ্বাস হয় না। তারপর যখন নিজের দেশের কথা ভাবলাম, প্রাণ কেঁদে উঠল। সমাজের তলায় পড়ে থাকা এইসব মানুষ—তাদের জীবনে আশা নেই, মুক্তির পথ নেই, উঠে দাঁড়াবার কোনো উপায় নেই। প্রতিদিন তারা যেন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

উদার মনোভাবের জন্যই যে বিবেকানন্দ এমন কথা বলতেন তা নয়। আসলে মার্কিনীদের সঙ্গে তাঁর প্রকৃতিগত অনেক মিল ছিল। বিবেকানন্দ তাদের মর্মের কথাটি ঠিকমত বুঝেছিলেন। সেদিক থেকে বিচার করলে তাঁকেই যথার্থ ভারতপথিক বলা উচিত। পরবর্তীকালে কোনো এক বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন:

আমি ইয়াঙ্কি দেশ ভালবাসি—আমি সব নতুন জিনিষ দেখতে চাই। পুরোনো ধ্বংস স্তূপের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে আর হা-হুতাশ করতে আমি রাজী নই···আমার রক্তের মধ্যে টগবগ করছে উদ্যম। মার্কিন দেশটি সবদিক থেকেই নতুন। নতুন দেশ, নতুন মানুষ আর সবকিছু নতুন করে গড়বার অজস্র সুযোগ।

সেপ্টেম্বরের প্রথমদিকে গৃহকর্ত্রী বিবেকানন্দের হাতে চিকাগো যাবার ভাড়া এবং কমিটির ঠিকানা দিলেন। ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিদের দেখাশোনার ভার ছিল এই কমিটির উপর। কিন্তু পথিমধ্যে কমিটির ঠিকানা হারিয়ে ফেললেন বিবেকানন্দ। এসব ব্যাপারে তিনি চিরকালই উদাসীন। তাই রাতের আশ্রয়ের জন্য পথনির্দেশিকা থেকে হোটেলের নাম খুঁজে বার করার চেষ্টা না করে, ভারতের ভবঘুরে সন্ন্যাসীদের মতন যত্রতত্র শয়ন-ভোজন করে দিন কাটাবার কথা ভাবলেন। এক স্টেশনের কাছে মালগুদামের সামনে রাখা বড় একটি প্যাকিং বাক্সের মধ্যে সে রাতটি কাটিয়ে দিলেন। পরদিন সকালে নাকে জলের গন্ধ নিয়ে ঘুম ভাঙল। তারপর শুরু হলো পথহাঁটা। এ পথ সে পথ—এ দোর সে দোর। সর্বত্রই বিফলতা। কেউ নাকের ওপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে, কেউ অপমান করে তাড়িয়ে দিচ্ছে। শেষপর্যন্ত এসে পৌঁছলেন ডীয়ারবর্ণ এ্যাভেনিউ। তারপর শ্রান্ত দেহে শ্রীগুরুর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে রাজপথের ওপর বসে পড়লেন। সহসা সামনের বাড়ির দরজা খুলে এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। বিবেকানন্দের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মহিলাটি ইতিমধ্যেই চিকাগো শহরে বিবেকানন্দের আগমনের উদ্দেশ্যটি অনুমান করে নিয়েছিলেন। সহৃদয় মহিলাটি সসম্মানে তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে এলেন, প্রাতরাশ ও ক্ষৌরকর্মের ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর বিবেকানন্দকে সঙ্গে নিয়ে কমিটির সদর কার্যালয়ে এলেন। বিবেকানন্দ পরবর্তীকালে লিখেছেন, 'ঠাকুরের কি আশ্চর্য মহিমা, কি অদ্ভুত ভাবেই না সেদিন সব অন্তরায় কেটে গিয়েছিল!'

১১ই সেপ্টেম্বরের সকালবেলায় ধর্ম মহাসভার প্রথম অধিবেশন বসলো। মঞ্চে উপবিষ্টদের মধ্যে বিবেকানন্দও ছিলেন। অগণিত দর্শকদের সমবেত দৃষ্টি তাঁরই উপর। বলিষ্ঠ চেহারার এই মানুষটি উচ্চতায় মাঝামাঝি হলেও, সাধারণভাবে তাঁর চেহারার মধ্যে একটি বড়সড় ভাব আছে। একবার তাকালেই মনে হবে পুরুষকারসম্পন্ন মানুষটি বিক্রমে সিংহ অথবা শার্দুলতুল্য। কেউ ভাবছিলেন তাঁর চোখ দুটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে একটি তৃপ্তি। সতর্ক দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে আশ্চর্য এক উদাসীনতা। গির্জার ঘণ্টার মতো গভীর, গম্ভীর

তাঁর কণ্ঠস্বর ; তা কানে যেতেই সবাই সচকিত হয়ে উঠলেন এবং হলঘরের মধ্যে সেই ধ্বনি এমন অনুরণন সৃষ্টি করলো, যা শোনা মাত্রই শ্রোতাদের মধ্যে এক অতীন্দ্রিয় আবেগ সঞ্চারিত হলো। কিন্তু শ্রোতাদের কাছে তাঁর প্রথম ভাষণটি কেন এমন আশ্চর্যসুন্দর মনে হয়েছিল সে কারণটির যথার্থ ব্যাখ্যা তাঁর দেহসৌন্দর্য বা অনুপম কণ্ঠস্বর দিয়ে বোঝানো যাবে না।

সকালের অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতার পালা এলে বিবেকানন্দ আরও সময় চেয়ে নিলেন। (পরে বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠিতে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, মঞ্চভীতির দরুন তিনি সকালের বক্তৃতাটি বর্জন করেন।) কিন্তু অপরাহ্নের অধিবেশনের সময় তাঁর কোনো জড়তাই ছিল না। স্থির, অচঞ্চল, গম্ভীর স্বরে তিনি তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন। প্রথমেই সভাকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমার আমেরিকাবাসী ভাই ও বোনেরা'—সম্বোধনের কথাগুলি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতারা দাঁড়িয়ে উঠে দু'মিনিট ধরে করতালিধ্বনি দিয়ে বিশাল কক্ষ ভরিয়ে দিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সভার আচরণ ছিল ভদ্র এবং শিষ্টাচারমণ্ডিত। ইতিমধ্যে বক্তৃতা করে গেছেন একজন খ্রীস্টীয় ধর্মযাজক, একজন ব্রাহ্ম, একজন বৌদ্ধ। প্রত্যাশিত শিষ্টাচার দেখিয়ে সভা তাঁদের মোটা দাগের মামুলী সম্মান জানিয়েছে। কিন্তু বিবেকানন্দের বেলায় সেই বেড়াটি ভেঙে গেল। সভার অধিকাংশ শ্রোতাই সেদিন জানতেন না কেন তাঁরা এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। সাধারণ মানুষের উপলব্ধির একটি নিজস্ব ধারা আছে। কোনো অসাধারণ ও বিরল ব্যক্তিসত্তার সামনে নিজেকে উপস্থিত করে সাধারণ মানুষ যখন অনুভব করে যে সেও তুচ্ছ নয়, তখন কলরব করে সে নিজেকে প্রকাশ করে। বিবেকানন্দ যখন সভাকে, 'আমার আমেরিকাবাসী ভাই ও বোন' বলে সম্বোধন করলেন, তখন আমেরিকার প্রতিটি মানুষ নিজেকে 'ভাই' বা 'বোন' রূপে কল্পনা করেছিল। তাই শুকনো ও কৃত্রিম রীতিপালনের বদলে বিবেকানন্দের সম্বোধনটি তাদের কাছে অমন সহজ, সত্য ও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

সভা স্তব্ধ হবার পর বিবেকানন্দ আবার বক্তৃতা শুরু করলেন। অনতিদীর্ঘ ভাষণ—মত, সহিষ্ণুতা এবং সর্বধর্মসমন্বয়, এই দুটিই ছিল তাঁর বক্তৃতার প্রতিপাদ্য। বক্তৃতা শেষ হলো। বক্তার সাফল্যে আবার উত্তাল হয়ে উঠল সভা। সেদিন সভায় উপস্থিত থাকা একজন মহিলা পরবর্তীকালে বলেছেন, 'আমি দেখলাম বক্তৃতার পর দলে দলে সুন্দরী মেয়েরা তাঁর কাছাকাছি আসার জন্য হুড়োহুড়ি করছে। তখন মনে মনে সেই তরুণ বক্তাকে উদ্দেশ করে বলেছিলাম, "বাপু হে! যুবতীদের এই হামলা যদি ঠেকাতে পার, তবে বুঝবো তুমি প্রায় ভগবান।"' মহিলাটির আশঙ্কার কোনো কারণ ছিল না। কারণ, পরের দুটি বছর যখন সারা মার্কিন মুলুকে তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তখন এইরকম নারী-আক্রমণ তাঁকে প্রায় প্রতিদিনই প্রতিরোধ করতে হয়েছে। অধিবেশন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বক্তারূপে বিবেকানন্দ বিখ্যাত হয়ে যান। পশ্চিমের দেশগুলির কাছে তাঁর বাণী প্রচারের সমস্যাগুলি এইভাবে দূর হয়ে যায়। যেখানে গেছেন সেখানেই তিনি বাঞ্ছিত হয়েছেন। তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি বক্তৃতা-পরিষদ সমগ্র মার্কিন দেশে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করতে লাগলেন।

তখনকার দিনে সীমান্ত জীবনের কথা মার্কিনীরা ভুলে গেলেও, তাঁদের জীবন একেবারে

বিরল হয়ে যায় নি। শহর থেকে অধিক দূরে না গিয়েও তাঁবুর জগতের অধিবাসীদের দেখা যেত। তখন রাজনৈতিক নেতা, দার্শনিক, লেখক এমন কি সারা বার্নহার্ডের মতো বিখ্যাত অভিনেত্রীকেও যুক্তরাষ্ট্রের লোকে সার্কাসের জীব মনে করতো। হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকেও তারা সেই দৃষ্টিতে প্রকৃতির আজব সৃষ্টি মনে করেছিল। কোলাহলের মধ্যেই নরেনের জীবন কেটে যাচ্ছিল, নিভৃতি পান নি। লোকের কাছে তিনি নিষ্ঠুর কৌতূহলের বস্তু হয়ে উঠেছিলেন। প্রচার ও আতিথেয়তার আড়ম্বর ছিল ষোলআনা; কিন্তু সবটুকুই ছিল নিষ্ঠুর মাতামাতি। ফলে এই প্রায়-সার্কাস জীবনের দাপটে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন বিবেকানন্দ, তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙে যাচ্ছিল। অবশ্য প্রয়োজনের তাগিদে তখনকার মতো এত সব আড়ম্বর সমারোহ তাঁকে সইতে হতো।

তাঁর স্পষ্টবাদিতার জন্য বিবেকানন্দ অনেককে বিরূপ করতেন। মৃদু হেসে বলতেন, 'হল-ঘর ফাঁকা করে দিয়েছি।' তাই যখন তিনি 'মানুষই ঈশ্বর' এই বাণী প্রচার করলেন, তখন কট্টর সনাতনপন্থীরা তাঁর এই উক্তি ঈশ্বরনিন্দার তুল্য পাপাচার মনে করলো। সিংহের মেষ হয়ে থাকার আখ্যানটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। মেষের দলের সঙ্গে বাস করে আত্মতৃপ্ত সিংহও নিজেকে মেষ মনে করতো। কিন্তু যেদিন অন্য এক সিংহের নির্দেশে পুকুরের জলে সে তার আসল রূপ দেখলো, সেদিনই তার রূপান্তর হয়েছিল। যারা তাঁর উপদেশ শুনতে আসতো, তাদেরও তিনি সেই কথাই বলতেন। বলতেন, 'তোমরাও সিংহ, তোমাদের আত্মা পূর্ণ, শুদ্ধ, অনন্ত……গির্জায় মন্দিরে গিয়ে তোমরা যাঁকে ডাক, যাঁর জন্য কাঁদ, তিনি তোমাদের আত্মন্।' বলতেন, আত্মবিশ্বাসী হও, উদ্যমী হও, আত্মানুসন্ধান করো। সবাইকে সতর্ক করে বলতেন, যতবড় সাধকই হন, তাঁদের বাণী যেন তোমার জীবনে একমাত্র অব-লম্বন না হয়। বলতেন, 'ততদিনই শাস্ত্র মানবে যতদিন শাস্ত্রনির্দেশ ছাড়া তুমি একলা পথ চলতে পারছ না।' বলতেন, 'খ্রীস্টান দেশের প্রত্যেক মানুষের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি গির্জা এবং তার অনুশাসনগ্রন্থটি। বলছে, এটা করো, ওটা করো না! যেন যীশু, বুদ্ধ থেকে শুরু করে কাঠ, পাথর পর্যন্ত সবাই তোমার উপাস্য। আত্মচর্চা করে দেখাও যে ধর্ম শুধু শাস্ত্র মানা নয়, দল মানা নয়—ধর্ম আরও কিছু, ধর্ম হলো আত্ম উপলব্ধি। যাঁদের সেই উপলব্ধি হয়েছে, তাঁরাই প্রাণে প্রাণে আলোর বাণী পৌঁছে দিতে পারেন। তাঁরাই হতে পারেন মানবজাতির যথার্থ শিক্ষাগুরু। তাঁরাই আলো জ্বালাতে পারেন কারণ তাঁরাই যে শিখা।'

শাক্ত, বৈষ্ণব বা শৈব ইত্যাদি ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বিবেকানন্দ কখনো আলোচনা করতেন না। তবুও মাঝে মাঝে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলতেন। বলতেন যে তাঁরও নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস আছে এবং ঠাকুরকে তিনি ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমি যদি মানুষ রামকৃষ্ণকে প্রচার করতাম, তবে হয়ত অর্ধেক পৃথিবী তাঁর পায়ের তলায় এনে দিতে পারতাম। কিন্তু তেমন ধর্মান্তর বেশীদিন স্থায়ী হয় না। আমি তাই রামকৃষ্ণের নীতি ও আদর্শটিই প্রচার করেছি। মানুষ যদি তাঁর ভাব-টুকু মেনে নেয়, তবে তারা রামকৃষ্ণকেও মেনে নেবে।'

১৮৯৩ থেকে ১৮৯৫, এই দুটি বছর তাঁর অতি ব্যস্তভাবে কেটে যায়। বিশেষ করে পূর্ব ও

মধ্যাঞ্চলের শহরগুলি, যেমন চিকাগো, ডেট্রয়েট, বোস্টন এবং নিউইয়র্কে তাঁকে ঘনঘন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হতো। ১৮৯৫ সালের বসন্তকাল নাগাদ তাঁর দেহমন অবসাদে ভেঙে পড়ল। কিন্তু বিবেকানন্দ ব্যাপারটির উপর তেমন গুরুত্ব দিতেন না। এইসময় তাঁর এক ছাত্র তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন,'আপনি কি কোনো ব্যাপারেই গুরুত্ব দেন না?' কৌতুক করে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই দিই; যখন পেটে জ্বালা ধরে।' এইসময় সমগ্র মার্কিন-দেশ উৎকেন্দ্রিক আরোগ্যকারীতে ছেয়ে গিয়েছিল। মানসিক আরোগ্যকারী বলে তারা পরিচয় দিত। এইসব তথাকথিত মানসিক-নিরাময়কারীরা অকারণ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বিবেকানন্দকে তাদের দলভুক্ত করতে জিদ করত, যাতে তাঁর খ্যাতির দীপ্তিতে তারাও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দ এদের নিয়ে হাস্যপরিহাস করতেন। তাঁর তৎকালীন চিঠিপত্রে এদের সম্বন্ধে উল্লেখ থাকতো। একবার মিসেস হুইলপুল নামে এক মহিলার তৈরি এক সম্প্রদায়ের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লেখেন, 'হুইলপুল মহোদয়ার সম্প্রদায়টি কি নয়! দার্শনিক-রাসায়নিক-ভৌতিক-আধ্যাত্মিক আরও কত কি বিশেষণ!' আবার বিপরীত চিত্রও ছিল। এমন কিছু উদ্যমী মানুষ ছিল যাদের মনের উপর তিনি গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। এরা প্রধানত ছাত্র—গভীরভাবে যোগ ও বেদান্ত শিক্ষা করে এই মহৎ কর্মে আত্মনিয়োগ করার সংকল্প নিয়েছিল। ১৮৯৫ সালের জুন মাসে এইরকম ১০।১২ জন বিশিষ্ট ছাত্রছাত্রী নিয়ে বিবেকানন্দ সেণ্ট লরেন্স নদীর ধারে সহস্রদ্বীপোদ্যানে এসে পৌঁছলেন। সেখানে ৬।৭ সপ্তাহ ধরে যোগ ও বেদান্তের ক্লাস শুরু হলো। সম্ভবত আমেরিকা ভ্রমণের সেই দিনগুলিই ছিল তাঁর সব থেকে আনন্দের দিন।

আগস্ট মাসে তিনি ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের পথে যাত্রা করে আবার ডিসেম্বরের মধ্যে নিউইয়র্কে ফিরে এলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৬ এপ্রিলে বিবেকানন্দ আবার ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন এবং এখান থেকেই ভারতে ফিরে যান। বিবেকানন্দ পরে স্বীকার করেছিলেন যে, সেদিন এক মিশ্র অনুভূতি নিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা দেন। তাঁর প্রথমেই মনে হয়েছিল যে, এই সেই দেশ যা ভারতকে শোষণ করছে। কিন্তু যে ইংল্যাণ্ডকে তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছেন, সেখানকার অধ্যাত্ম পরিবেশটি একেবারে অন্যরকম। এমনকি সে দেশে তাঁর প্রথম আগমনের পরেই তিনি লেখেন, 'এ দেশের মানুষ কাজ আরম্ভ করতে সময় নেয়। কিন্তু একবার কাজে হাত দিলে সেটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। মার্কিনীরা কাজে কর্মে খুব ক্ষিপ্র, কিন্তু তারা যেন খড়ের আগুন। জ্বলে উঠেই নিভে যায়।'

ইংল্যাণ্ড থেকে বিবেকানন্দ অতি অনুগত এবং উদ্যোগী দু'জনকে সঙ্গে আনলেন। এঁদের একজন সেভিয়ার দম্পতি (ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার) এবং অন্যজন জে জে গুড্‌উইন। এই মহাপ্রাণ ইংরেজের (গুড্‌উইন) সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ হয় আমেরিকাতে। বিবেকানন্দের বাণী ও বক্তৃতাবলী তিনি সংকেতলিপিতে লিখে রাখতেন। বিবেকানন্দের পরবর্তী বিদেশী গুণগ্রাহী হলেন শ্রীমতী মার্গারেট নোব্‌ল্ (নিবেদিতা)। এঁর সঙ্গে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হয় তাঁর প্রথম লণ্ডন সফরের সময়। এইসব মহাপ্রাণ বিদেশী শিষ্যেরা তাঁদের আপন আপন পরিধির মধ্যে ভারতের শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য কাজ করে গেছেন। ইংল্যাণ্ড ছাড়ার পর ইওরোপের আরও কয়েকটি দেশ ঘুরে বিবেকানন্দের

জাহাজ যেদিন সিংহলে এসে পৌঁছল, সেদিনটি ছিল ছিল ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী। সেখান থেকে কলকাতা পর্যন্ত তাঁর যাত্রাপথটি ছিল বিজয়-অভিনন্দনে ঠাসা। দীপের আলো, সুরভিত ধূপধূম, অজস্র ফুল, মালা, বাজনাবাদ্য এবং অসংখ্য মানুষের জয়োল্লাসে বিবেকানন্দ সেদিন অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। রামনাদের রাজা নিজেই তাঁর গাড়ি টানেন এবং তাঁর সম্মানে চল্লিশ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভ নির্মাণ করান। তাছাড়া কোনো একটি স্টেশনের কাছে অগণিত অনুরাগী ভক্ত, শুধু একটিবার দর্শনলাভের জন্য রেলপথের উপর শুয়ে অবরোধ সৃষ্টি করেছিল। সেদিন হয়ত বিবেকানন্দের দেশের মানুষ ইওরোপ ও আমেরিকাতে তাঁর পার্থিব সাফল্যটুকু একটু বাড়িয়ে দেখেছিল। কিন্তু তারা ঠিকই বুঝেছিল যে বিবেকানন্দ বিদেশের হৃদয় জয় করে ফিরে এসেছেন এবং এই বিজয়গৌরব-টুকু তাঁর একান্ত প্রাপ্য। এই বিজয়গৌরবের কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল তাঁর অন্য সব সফলতা। মিশনের কাজে ব্যয় করার জন্য তিনি বিপুল অর্থ সংগ্রহ করে এনেছিলেন—এনেছিলেন অনেক বিদেশী ভক্তও। কিন্তু সবকিছু অতিক্রম করে গিয়েছিল তাঁর সাফল্য। বস্তুত, যে কোনো মানুষ দাবি করতে পারে যে, তাঁর (বিবেকানন্দ) আগে আর কেউ ওদেশের মানুষদের এমনভাবে প্রাচ্য ভাবধারায় দীক্ষিত করতে পারেন নি। সেদিন পাশ্চাত্যের মানুষ বিবেকানন্দকে অনুগত বা শত্রুরূপে নয়, প্রকৃত বন্ধুরূপে এবং বিশ্বস্ত সহযোগীরূপে পেয়েছিল। পেয়েছিল এমন একজনকে যিনি তাঁদের শিখিয়েছেন এবং নিজেও শিখেছেন ; নিয়েছেন যেমন দিয়েছেনও তেমনি।

কিন্তু সম্মানের শীর্ষে পৌঁছেও বিবেকানন্দ নিজেকে হারিয়ে ফেলেন নি ; কখনও ভুলে যান নি যে, তিনি রামকৃষ্ণের শিষ্য এবং গুরুভাইদের একজন। (গুরুভাইরা যখন সংবাদপত্রে তাঁর বক্তৃতাগুলি পড়তেন তখন ভাবতেন, এই অসাধারণ স্বামীজী বোধহয় অন্য কেউ—কারণ নরেনের নতুন সন্ন্যাসী নামটি তাঁরা জানতেন না) বিবেকানন্দ কলকাতায় এলেন এবং সন্ন্যাসীমণ্ডলের পক্ষ থেকে ব্রহ্মানন্দই তাঁর গলায় মালা পরিয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। বিবেকানন্দ তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন, 'গুরুপুত্রকে গুরুর মতোই সম্মান জানাতে হয়।' উত্তরে ব্রহ্মানন্দ বললেন, 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য।' এরপর বিবেকানন্দকে আলমবাজার মঠে নিয়ে আসা হলো। মঠে এসে ব্রহ্মানন্দের হাতে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ তুলে দিলেন তিনি। এইভাবে কপর্দকশূন্য হয়ে ব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে পায়ানির কড়ি চেয়ে নিলেন বিবেকানন্দ। তারপর গুরুভাইদের সবাইকে ডেকে দারিদ্র্য ভাগ করে নিতে বললেন।

১৮৯৭ ১লা মে তারিখে মঠের সব গুরুভাই এবং গৃহীভক্তদের জড়ো করে বিবেকানন্দ তাঁর মিশন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাটি ব্যক্ত করলেন। সেদিন তিনি যা বলেছিলেন সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

রামকৃষ্ণ তাঁর জীবনে যে সত্যগুলি প্রয়োগ করেছিলেন, মিশনের লক্ষ্য হবে সেই সকল সত্য সাধারণের মধ্যে প্রচার করা, যাতে সাধারণ মানুষ তাদের দৈহিক, মানসিক এবং পারমার্থিক জীবনগুলি সেই সত্যের আলোয় উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারে। এইভাবে আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব ক্ষেত্রে যে বিজ্ঞানবিদ্যা মানসিক মঙ্গলের অনুকূল, তারই চর্চা এবং প্রচারে সাধারণ মানুষ আগ্রহী হবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে তাই বেশ কতকগুলি সন্ন্যাসাশ্রম

তৈরি করা হবে। সন্ন্যাসশিক্ষা ছাড়া আশ্রমবাসীদের সমাজকল্যাণের শিক্ষাও দেওয়া হবে। এইভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীরা ছড়িয়ে পড়বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। ভারতের বাইরেও তাদের পাঠানো হবে, যাতে দুই দেশের মানুষের মধ্যে বোঝাবুঝির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, মিশনের লক্ষ্য হবে অধ্যাত্মবাদ এবং মানবতাবাদের প্রচার ; রাজনীতির সঙ্গে এর কোনো সংস্রব থাকবে না।

মিশন ও মঠ—বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন যে এই দুই নিয়েই গড়ে উঠুক মিশন। স্বামীজী প্রায়ই রামকৃষ্ণের বাণী উদ্ধৃত করে বলতেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' তার অর্থ এই নয় যে সন্ন্যাসীর জীবন শুধু কর্মশিক্ষা-নির্ভর হয়ে উঠুক ; আধ্যাত্মিক শিক্ষার চেয়ে বড় হয়ে উঠুক সমাজসেবা। পেট নিশ্চয়ই ভরাতে হবে ; কিন্তু উদরপূর্তির জন্য সবার আগে যা প্রয়োজন, তা হলো শিক্ষা এবং আদর্শ। বিবেকানন্দ ভালো করেই জানতেন যে, আদর্শের ভিত শক্ত এবং মজবুত না হলে সেবাকর্মের একঘেয়েমি যে কোনো জীবনেই দুঃসহ হয়ে উঠতে বাধ্য।

সুতরাং রামকৃষ্ণ মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হলো। দুটি আলাদা ভাগে বিভক্ত হলো প্রতিষ্ঠান। প্রথমটি মঠ এবং দ্বিতীয়টি মানব-হিতৈষণামূলক কেন্দ্র। দ্বিতীয় কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠল সেবামূলক অনেকগুলি বিভাগ ; যেমন হাসপাতাল, দাতব্য ঔষধালয়, কলেজ, স্কুল, কৃষিখামার, শিল্পশালা, পাঠাগার, প্রকাশনা-কেন্দ্র ইত্যাদি। বেলুড় মঠ হলো মঠ ও মিশনের সদর কার্যালয়। পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পিত হলো একই অছি সম্প্রদায়ের উপর। আইনগতভাবে অবশ্য প্রতিষ্ঠান দুটিকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেওয়া হলো—বলা বাহুল্য, পরিচালনা এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্মদ্যোগে অর্থলগ্নীর সুবিধার জন্যই এই স্বাতন্ত্র্য। সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা দুটি বিভাগের সঙ্গেই জড়িত থাকলেন ; তাঁরা যেমন জপধ্যান করতেন তেমনি পরিচালনার দায়িত্বও নিতেন। বর্তমানে মিশনের শতাধিক কেন্দ্র ছড়িয়ে আছে ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। এ ছাড়াও, পাশ্চাত্য দেশের কয়েকটি কেন্দ্র থেকে বেদান্ত শিক্ষা এবং রামকৃষ্ণ ভাবধারার প্রচার করা হয়। মার্কিন মুলুকে অবস্থিত এমন মিশন-কেন্দ্রের সংখ্যা দশটি ; এবং ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আর্জেন্টিনাতে আছে একটি করে কেন্দ্র।

সঙ্ঘকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখার যে নির্দেশটি বিবেকানন্দ দিয়েছিলেন, সঙ্ঘ তার অমর্যাদা করে নি। তাই ১৯২০ সালে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন যখন তীব্র হয়ে উঠেছে, তখনও সঙ্ঘ এই আন্দোলনকে সমর্থন করে নি। পরবর্তীকালে গান্ধী সমর্থকেরা সঙ্ঘের এই ভূমিকার নিন্দা করলেও গান্ধী কখনও তা করেন নি। তিনি বুঝেছিলেন যে, কোনো ধর্মীয় সংগঠনের পক্ষে রাজনীতির প্রভাব-পুষ্ট হয়ে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, রাজনীতির প্রশ্রয় কোনো ধর্মীয় সংগঠন, আপোষ ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। ১৯২১ সালে গান্ধী যখন বিবেকানন্দের জন্মবর্ষ উৎসবে যোগ দিতে বেলুড় মঠে আসেন তখনও সেই কথাই বলেছিলেন। দ্বিধাহীন কণ্ঠে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠ করেই তিনি আরও নিবিড়ভাবে ভারতকে ভালবাসতে শিখেছেন।

ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় থাকাকালীন বিবেকানন্দ ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্য জড়বাদের তুলনা করতেন। কিন্তু এদেশে ফেরার পর তাঁকে আমরা এদেশবাসীর শৈথিল্য

জড়তা, দলাদলির নিন্দা করতে দেখলাম। শুধু তাই নয়, তখন তিনি তুলনামূলকভাবে মার্কিনীদের যোগ্যতা এবং ইংরেজদের জাতীয়তাবোধ ও অধ্যবসায়েব প্রশংসা করতেন। ইংরেজদের প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, 'আর সব জাতের চেয়ে ওরা কম ঈর্ষাপরায়ণ, তাই সারা পৃথিবী ওরা শাসন করছে। ওরা আজ্ঞা পালন করে কিন্তু হীনভাবে অনুগত হয়ে আজ্ঞা পালন করে না। ওরা ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষপাতী কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেয় না।' ভারতীয়দের উদ্দেশে তিনি বলতেন, 'তোদের তো একটা আলপিন তৈরির যোগ্যতাও নেই; কোন্ সাহসে তোরা ওদের (ইংরেজ) সমালোচনা করিস! আহাম্মকের দল, ওদের পায়ের কাছে বসে ওদের শিল্পকলা আর কারিগরিবিদ্যা শেখ! নিজেদের যদি ঠিকমতন তৈরি না করিস, তবে কংগ্রেসের সভায় বসে চেঁচিয়ে কি হবে?' আরও বলতেন, 'এখন আমরা যা চাই তা শক্তি। সুতরাং নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ্। আমাদের যা দরকার তা মানুষ গড়ার ধর্ম। আন্দোলনমূলক জাতীয়তাবাদ আমাদের বেশি দূর নিয়ে যাবে না। স্বদেশপ্রীতিব সঙ্গে চাই অপরের প্রতি ভালবাসা, মমত্ববোধ। আমাদের ভুললে চলবে না যে, জগতকে আমাদেব অনেক কিছু দেবার আছে। সেই দানযোগ্য বস্তুটি হলো ভারতের ধর্ম, ভারতেব দর্শন।'

মামুলী সঙ্গতি-অসঙ্গতির প্রসঙ্গ নিয়ে বিবেকানন্দ মোটেই চিন্তিত হতেন না। তিনি সর্ব অবস্থাতে পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই বক্তৃতা করতেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে এবং তাগিদেই তিনি বক্তৃতা করতেন; তাই যে কোনো জিজ্ঞাসারই সঠিক উত্তর তাঁব জানা ছিল। এইরকমই ছিল তাঁর প্রকৃতি। তাই গতকাল যা বলেছেন, তার সঙ্গে তাঁর আজকের কথার মিল না থাকলেও তাঁব উদ্বেগ হ'ত না। যথার্থ জ্ঞানঋদ্ধ এই মানুষটি জানতেন যে, সত্য কখনও কথার সাজ সজ্জার মধ্যে ঢাকা থাকে না। সত্য হলো ব্যক্তি বিশেষেব অন্তর্গত উপলব্ধি। সুতরাং ব্যক্তি-পরিচয়ে যিনি সৎ তাঁর কথা অসার হলেও ক্ষতি হয় না। এই অর্থে বিবেকানন্দকে কখনও স্ববিরোধী বলা যায় না।

তবুও আশ্চর্য হই যখন দেখি যে, অনেক ক্ষেত্রেই বিবেকানন্দকে ভুল বোঝা হয়েছে। মূল বক্তৃতা থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে সেটিকে মূল বলে চালানো হয়েছে। এমনকি মিশন প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর গুরুভাইবাও সন্দেহ কবেছিলেন যে, বিবেকানন্দ হয়ত রামকৃষ্ণের আদর্শ থেকে চ্যুত হয়েছেন। আধুনিক যুগে অতি উৎসাহী কিছু মানুষ তাঁকে সোস্যালিস্ট এবং বিপ্লবীরূপে দাবি করেন। তাঁবা আন্তরিকভাবেই চান যে একজন বরেণ্য দেশহিতৈষীরূপে বিবেকানন্দ বেঁচে থাকুন। হয়ত তাঁদের বিচারে তাঁবা ঠিক। কিন্তু এঁদের হাতে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বটি কখনই পূর্ণরূপে গ্রহণ করবে না। সে মূর্তি হবে মস্তকহীন দেহকাণ্ডেব মতন—রামকৃষ্ণ ব্যতিরেকে বিবেকানন্দ।

প্রতিষ্ঠাব সঙ্গে সঙ্গেই মিশনের কাজ শুরু হয়ে গেল। দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ মহামারীতে রিলিফ পাঠানো ছাড়াও, হাসপাতাল ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাব কাজও হাতে নিল মিশন। মিশনের মূল সভাপতি হলেন বিবেকানন্দ; ব্রহ্মানন্দ হলেন কলকাতা শাখার প্রধান। বেলুড়ে গঙ্গার ধারে সদ্য কেনা জমির উপর প্রথম যে ভবনটি নির্মিত হলো, সেটিই হলো মঠ-ভবন। ১৮৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে মঠের উদ্বোধন হয়।

সেই বছরেরই জুন মাসে বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার বিদেশ-সফর শুরু হলো। এই সফরের

অনেকখানি তিনি আমেরিকাতেই কাটান। শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন এবং যেখানে তারা চাইত সেখানে একটি করে কেন্দ্র গড়ে দিয়েছেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯০০ সালেই তিনি ভারতে ফিরে আসেন। যখন ফিরে এলেন, একেবারে বিধ্বস্ত। প্রায়ই বলতেন, বেশীদিন বাঁচবেন না। কিন্তু আগের সেই উদ্দাম দিনগুলির তুলনায় অনেক স্থির, অনেক শান্ত হয়ে গেছেন তখন। সেই সংগ্রামী মনোভাবটি আর নেই। তাঁর তখনকার মনের ভাবটি একটি চিঠিতে তিনি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন—১৯০০ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর এক ভক্ত শিষ্যকে তিনি এই চিঠিটি লেখেন:

আমি ভালই আছি—মানসিক খুব ভালই। শরীরের চেয়ে মনের শান্তি-স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশী বোধ করছি। লড়াইয়ে হার-জিত দুই-ই হলো, এখন পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি।

যতই যা হোক, জো, এখন আমি সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনতো আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক-ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার ঠাকুরের সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি, সেই চিরাচরিত কণ্ঠস্বর!······যাই প্রভু, যাই!

আমি যে জন্মেছিলুম তাতে আমি খুশী। এত যে কষ্ট পেয়েছি, তাতেও খুশী। জীবনে যে বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খুশী। আমার জন্যে সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না, অথবা এমন বন্ধন আমিও কারও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি হোক অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্ত হই, সেই পুরোনো বিবেকানন্দ বলে মানুষটা কিন্তু নেই, চিরদিনের জন্য সে চলে গেছে—আর ফিরছে না!

শিক্ষাদাতা, গুরু, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!···

এর আগে আমার কর্মের ভিতর মান-যশের ভাব থাকত, আমার ভালবাসার ভিতর ব্যক্তি-বিচার আসত, আমার পবিত্রতার পিছনে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকত, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্বস্পৃহা আসত। এখন সে-সব উড়ে যাচ্ছে, আর আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হ'য়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই মা, আমি যাই···

কথিত আছে যে, ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে বিবেকানন্দের দেহত্যাগের ঘটনাটি আগে থেকেই নির্দিষ্ট ছিল। বেশ কয়েক মাস ধরেই তিনি সমস্ত কর্তব্যকর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছিলেন। সে দিনটিতেও বেশ ভালোই ছিলেন তিনি। তৃপ্তির সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ শেষ করে গুরুভাইদের নিয়ে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলাপ-সালাপ করলেন। পরে নবব্রতীদের নিয়ে ঘণ্টাতিনেক সংস্কৃতের ক্লাশ করলেন। বিকালে প্রেমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে দু-মাইল হেঁটে এলেন। ফিরে এসে নিজের ঘরে বসে ঘণ্টাখানেক ধ্যান করলেন। ধ্যান শেষ হলে, যে শিষ্যটি তাঁর দেখাশোনা করতো তাকে ডেকে ঘরের সব জানলাগুলি

খুলে দিতে বললেন। পরে বিছানায় শুয়ে শিষ্যটিকে মাথায় বাতাস করতে বললেন। হাত পাখার বাতাস করতে করতে শিষ্যটির মনে হলো বিবেকানন্দ হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন কিংবা জপ করছেন। রাত বাড়তে লাগল। নটার একটু পরে বিবেকানন্দের হাত দুটি একবার কাঁপলো, একটি গভীর নিশ্বাস পড়ল। মিনিট খানেক পরে তিনি আর একবার গভীর নিশ্বাস ফেললেন। তাঁর চোখ দুটি তখন স্থির হয়ে গেছে—সারা মুখমণ্ডল দিব্য আনন্দে উদ্ভাসিত। সেই অবস্থাতেই নাক মুখ এবং চোখের কোল বেয়ে একটু রক্ত গড়িয়ে পড়লো।

ডাক্তারেরা যখন এলেন তখনও বিবেকানন্দ স্থির। তাঁরা ভাবলেন বোধহয় সাময়িকভাবে তাঁর চৈতন্য-নাশ হয়েছে। ঘণ্টা দুই ধরে তাঁরা কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু চেতনা ফিরে এলো না। তখন প্রায় মধ্যরাত। ডাক্তারেরা বিধান দিলেন যে তাঁর দেহে প্রাণ নেই। বললেন, হয় সন্ন্যাসরোগ নয়ত হৃদরোগই এ মৃত্যুর কারণ। কিন্তু গুরুভাইরা নিশ্চিতভাবে জানতেন, তাঁদের প্রিয় নরেন (পরবর্তীকালের বিবেকানন্দ) তাঁর আসল পরিচয় জেনেছিলেন বলেই চলে গেলেন। রামকৃষ্ণও তো এই কথা বলেই তাঁদের একদিন সাবধান করে দেন!

বিবেকানন্দের উত্তরসাধকের নির্বাচনের প্রশ্নে গুরুভাইদের মনে কদাপি সংশয় ছিল না। তেমন প্রশ্ন উঠলে রামকৃষ্ণের মানসপুত্র 'রাজা'কে মনোনয়ন করতে তাঁরা একটুও ইতস্তত করতেন না। কিন্তু তেমন প্রশ্নই উঠলো না। দেহত্যাগের আগে বিবেকানন্দ এমন কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যেগুলিকে তাঁর বিদায় গ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতি বলা যায়। এইরকম একটি সিদ্ধান্ত হলো মিশনের সভাপতির পদ থেকে স্বেচ্ছায় সরে আসা। মৃত্যুর একবছর আগেই তিনি এই কর্মত্যাগ করেছিলেন, এবং ব্রহ্মানন্দই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সেই থেকে একটানা একুশ বছর মঠ ও মিশনের সভাপতির পদে ব্রহ্মানন্দ আসীন ছিলেন।

কেমনভাবে সারদাদেবী শান্ত, লজ্জাশীলা বালিকাবধূ থেকে জগন্মাতায় পরিণত হয়েছিলেন সারদাদেবী। সে কাহিনী নিবেদন করেছি। তেমনি আর একটি মহান উত্তরণের কাহিনী রাখালের মধ্যেও দেখ। বালক স্বভাবের সেই শান্ত ও অনুগত রাখালই পরবর্তীকালের পরাক্রান্ত ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়েছিলেন। মঠ ও মিশন সম্পর্কে বিবেকানন্দের পরিকল্পনাগুলি প্রধানত তাঁরই হাতে যথার্থ রূপ পায়। এক অর্থে ব্রহ্মানন্দই হলেন এর প্রকৃত রূপকার।

ব্রহ্মানন্দ ছিলেন অতি দক্ষ প্রশাসক। মিশনের প্রশাসনের দিকটি তিনি সুচারুরূপে করতেন। কিন্তু এটিই যে একমাত্র কর্ম নয়, সেকথা শিষ্য এবং কর্মীদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাদের বলতেন, 'জীবনের প্রথম লক্ষ্য হলো আধ্যাত্মিকতার বিকাশ, তারপর সমাজসেবা।' আরও বলতেন, 'জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরলাভ। তার জন্য জ্ঞান আহরণ করো, ধর্মনিষ্ঠ হও এবং মানব সেবা করো। তবেই ঈশ্বরলাভের পথ প্রশস্ত হবে। কর্মই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। যে কর্মে ফলাকাঙ্ক্ষা নেই, সেই কর্মেই মন নিবিষ্ট করো। সেই মনের তিনভাগ জুড়ে থাকবেন ঈশ্বর এবং একভাগে থাকবে মানবসেবা।'

মিশনের কাজে অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে ব্রহ্মানন্দ কখনও আদর্শ-

চ্যুত হন নি। দাতার মনোভাব বিচার করতেন—লক্ষ্যহীন দান গ্রহণ করতেন না। একবার এক কোটিপতি ধনকুবের সংসার ত্যাগের বাসনা প্রকাশ করে তাঁর যাবতীয় অর্থ মিশনের ভাণ্ডারে দান করতে আগ্রহী হয়। অনাবশ্যক বিবেচনায় ব্রহ্মানন্দ সে দান গ্রহণ করেন নি। তিনি জানতেন যে ধনকুবেরের এই সংসার-বৈরাগ্য সাময়িক।

শিষ্যদের ব্যবহারিক কর্মকুশলতার চেয়ে তাদের নৈতিক এবং পারমার্থিক উন্নতি বিধানের দিকেই ব্রহ্মানন্দের অধিক মনোযোগ ছিল। একবার এক প্রবীণ সন্ন্যাসীকে তিনি তিরস্কার করে বলেছিলেন, 'ছেলেটিকে কি কেরানী করতে তোমার কাছে পাঠিয়েছি?' তিনি মনে করতেন যে, সঙ্ঘের যথার্থ বিকাশ সভ্যদের অধ্যাত্মচর্চার উপর নির্ভর করে। সমাজ-সেবামূলক কর্মোদ্যোগের উপর সঙ্ঘের সাফল্য নির্ভর করে না।

সঙ্ঘের প্রধানরূপে দোষী সন্ন্যাসীর দণ্ডাদেশ দেবার অধিকার তাঁর ছিল। সঙ্ঘ থেকে তাকে বহিষ্কারও করতে পারতেন। কিন্তু তেমন চরম সিদ্ধান্ত তিনি কখনও নেন নি। সরাসরি শাসন করার চেষ্টা না করে, অপরাধীকে তাঁর সামনে বসে ধ্যান করতে নির্দেশ দিতেন, যাতে তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাবটি অপরাধীর মনে সঞ্চারিত হয় এবং তার মন কলুষমুক্ত হয়। সবার প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অপার; বস্তুত এই ভালবাসা এক অর্থে অলৌকিক ছিল, কারণ সঙ্ঘের সকলের সঙ্গেই তিনি মনের যোগ রাখতেন। সবার মনের কথা জানতেন, সকলের সমস্যাগুলিও তিনি অনুভব করতেন। তিনি জানতেন যে দূরে থেকেও প্রতিটি সন্ন্যাসীর মনের আলো তিনি জ্বালিয়ে দিতে পারেন; তাই সর্ব অবস্থাতেই তাঁকে আশ্চর্য রকমের শান্ত ও উদ্বেগশূন্য থাকতে দেখা যেত।

অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে তিনি সবাইকে অনুগ্রহ করতেন। প্রয়োজনে তিনি কঠোরও হয়েছেন। যাদের যোগ্য মনে করতেন তাদের সামান্য শৈথিল্য ও অবহেলাও সইতে পারতেন না। সকলের সাক্ষাতেই তাকে ভর্ৎসনা করতেন। অনেক সময় অপরাধের কারণ লঘু হলেও লোকশিক্ষার জন্য তাঁকে কঠোর হতে হ'ত। একবার দীপাধারের একটি প্রদীপ জ্বালাতে একজন নবব্রতী তিনটি দিয়াশলাই কাঠি অপব্যয় করে। অমনোযোগিতার জন্য সকলের সাক্ষাতেই তিনি সেই নবব্রতীকে কঠিন তিরস্কার করেন। সবাই বুঝেছিলেন যে শিক্ষার্থীর হীন কর্মনাশের জন্যই ব্রহ্মানন্দ তাকে কঠোর ভর্ৎসনা করেছেন। এই ঘটনাটির উল্লেখ করে একজন শিক্ষার্থী লেখেন, 'ভালবাসা না দিয়ে মহারাজা কাউকে শাস্তি দিতেন না। হয়ত প্রথম প্রথম তাঁর কঠিন বাক্যগুলি আমাদের মনোবেদনার কারণ হ'ত; কিন্তু পরে এগুলিই আমাদের মনে মধুর স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকত। এমনও হয়েছে যখন মহারাজার তিরস্কার আমাদের মন আনন্দধারায় ভরিয়ে দিয়েছে। তাঁর উদাসীনতা ছাড়া আর কিছুই আমাদের অসহনীয় মনে হ'ত না। কিন্তু কখনও তিনি এমন নিষ্ঠুর হন নি। আমরা তাঁর সন্তানতুল্য বলেই তো এমন ভাবে তিনি আমাদের শাসন করতেন!'

ব্রহ্মানন্দের নির্ভীকতা তাঁর সঙ্গীদেরও সাহসী ক'রে তুলতো। একবার দু'জন ভক্ত সমভি-ব্যাহারে ভুবনেশ্বরের বনপথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন। হঠাৎ একটি চিতাবাঘ তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়াল। ব্রহ্মানন্দ স্থির হয়ে চিতাবাঘটির চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। খানিক পরে চিতাবাঘ পিছু হটে গেল। আর একবারের কথা; মাদ্রাজ শহরের এক সরু গলিপথ দিয়ে হাঁটছেন। সেদিনও সঙ্গী ছিলেন দু'জন সন্ন্যাসী। সহসা এক উন্মাদ ষাঁড় শিং উঁচিয়ে

তাঁদের দিকে তেড়ে এলো। সন্ন্যাসী দু'জন তাঁকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। কিন্তু অমিত বিক্রমে সঙ্গী দু'জনকে সরিয়ে ষাঁড়টির চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ব্রহ্মানন্দ। তেড়ে আসা ষাঁড়টি মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর চলে গেল।

দীর্ঘদেহী ব্রহ্মানন্দের দেহটি ছিল যথেষ্ট সুগঠিত। যখন তাকাতেন, দৃষ্টিতে ফুটে উঠত অন্তর্ভেদী অনুসন্ধান, কখনও সে দৃষ্টিতে ভেসে উঠত আশ্চর্য নির্মোহ—যেন অন্য কোনো জগতের ছায়া পড়েছে সেখানে। হাত পায়ের গড়নটি ছিল চমৎকার। পিছন থেকে তাকালে তাঁকে বিস্ময়করভাবে রামকৃষ্ণের অনুরূপ মনে হ'ত। একবার, বেলুড় মঠের বাগানে ভ্রমণরত ব্রহ্মানন্দকে পিছন থেকে দেখে তুরীয়ানন্দের চকিতে মনে হয়েছিল, যেন ঠাকুরের দর্শন পেয়েছেন। আর একবারের ঘটনা বলি। কোনো এক যাত্রীবহুল রেল স্টেশনে ব্রহ্মানন্দের এক সঙ্গী দু'জন আলাপরত যাত্রীর কথোপকথন শুনতে পেলেন। ব্রহ্মানন্দকে দেখে তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিলেন। একজন বললেন যে, ব্রহ্মানন্দকে দেখে ভারতীয় বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় যাত্রীটি সে কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'কিন্তু ভারতীয় মনে না হলেও তিনি যে ঈশ্বরের আপনজন তা বোঝা যায়।'

একথা ঠিক যে বিবেকানন্দের বাগ্মিতা ব্রহ্মানন্দের ছিল না। কিন্তু মৌন বাণী যে মুখরতাকেও হার মানায় সে কথা তাঁর অনুপ্রাণিত শিষ্যদের দেখলেই বোঝা যেত। শোনা যায় যে একঘর বাচাল, গল্পপ্রিয় মানুষকে নিঃশব্দ ইঙ্গিতে ধ্যানমগ্ন হবার প্রেরণা দিয়ে তিনি ঘরের পরিবেশটি অনায়াসে বদলে দিতে পারতেন। শিষ্যদের উদ্দেশে তাঁর উপদেশগুলি তিনি খুব সহজ করে বোঝাতেন। বলতেন, 'ধর্ম কোনো কাল্পনিক বিষয় নয়। এর একটি স্থূল ব্যবহারিক দিক আছে। কেউ মানুক না মানুক কিছু যায় আসে না তাতে। ধর্ম হলো বিজ্ঞানের মতো অস্তিত্বময়। যদি কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মাচরণ করে তাহলে ফল সে পাবেই। এমনকি অভ্যাসবশেও যদি কেউ ধর্মাচরণ করে, তাহলে ফল পেতে সে বাধ্য।......ভগবানের দিকে যদি কেউ এক ধাপ এগিয়ে যায়, তবে ভগবান একশ' ধাপ তাঁর দিকে নেমে আসেন। ......ঈশ্বর কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন? কারণ, তিনি চান আমরা তাঁকে ভালবাসি।' একবার একজন শিষ্য কৃচ্ছ্রতা পালনের জন্য তাঁর অনুমতি চেয়েছিলেন। ব্রহ্মানন্দ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কেন অকারণ শরীরপীড়ন করতে চাইছ? তোমাদের জন্য যা করা দরকার সে তো আমরাই করে দিয়েছি।' রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে তিনি উচ্চ আধার মনে করতেন, কারণ যে পরিবারে ঠাকুর জন্ম নিয়েছেন, সেই পরিবারের রক্ত রামলালের দেহেও বইছে। তাই নবব্রতীদের তিনি নির্দেশ দিতেন তাঁরা যেন রামলালকে যথোচিত মর্যাদা দেন। কিন্তু রামলাল আপত্তি করতেন; তিনি স্বীকার করেছিলেন যে ব্রহ্মানন্দই তাঁর দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন, নইলে পিতৃব্য রামকৃষ্ণের মহত্ত্ব তিনি বুঝতে পারতেন না। গানের আসরে একবার একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ভজন পরিবেশন করেন নি বলে একজন ভক্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সে কথা জানতে পেরে ব্রহ্মানন্দ বিস্মিত হয়ে বলেন, 'শব্দই যে ব্রহ্ম তা কি তুমি জান না?'

ব্রহ্মানন্দ বলতেন, 'প্রতিদিন হালকা হাসিঠাট্টা করা ভালো। এতে শরীর মনের জড়তা কেটে যায়।' রঙ্গতামাসার প্রতি ব্রহ্মানন্দের অনুরাগের অনেক কাহিনী আছে। একটি ঘটনার কথা বলি। সারগাছির মিশনকেন্দ্রে ফিরে যাবার জন্য অখণ্ডানন্দ খুব ব্যস্ত হয়েছেন। পরদিন

ভোরেই ট্রেন। ব্রহ্মানন্দ চাইছিলেন যে অখণ্ডানন্দ তাঁর সঙ্গে আরও কটা দিন থাকুন। কিন্তু অখণ্ডানন্দ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরদিন ফিরবেনই। ব্রহ্মানন্দের মিশনকেন্দ্র থেকে রেল স্টেশনের দূরত্ব বেশ কয়েক মাইল। সুতরাং শিবিকার ব্যবস্থা করা হলো। ভোর রাত্রেই যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে, নইলে সময়মতো পেঁছানো যাবে না। মহারাজের (ব্রহ্মানন্দ) কাছে বিদায় নিয়ে অখণ্ডানন্দ শিবিকায় উঠে পরদা টেনে দিলেন। এদিকে তাঁর অলক্ষ্যে শিবিকাবাহকদের চুপি চুপি যে নির্দেশগুলি মহারাজ দিলেন, অখণ্ডানন্দ তা জানতে পারেন নি। যাহোক, শেষ রাতে যাত্রা শুরু হলো। অখণ্ডানন্দের চোখে তখনও আলগা ঘুম লেগে আছে ; তাই তন্দ্রাচ্ছন্ন অখণ্ডানন্দ শিবিকার মধ্যেই মাঝে মাঝে ঢুলে পড়ছেন। আবার যখন জেগে উঠছেন তখন হেঁকে জানতে চাইছেন স্টেশন কত দূর। এদিকে অন্ধকারের মধ্যে শিবিকা চলেছে তো চলেইছে। পথ যেন আর ফুরোয় না। শুধু মাঝেমাঝে উদ্বিগ্ন অখণ্ডানন্দকে বাহকেরা নিশ্চিন্ত করছিল। এমন অবস্থায় হঠাৎ এক জায়গায় শিবিকা থামিয়েবাহকেরা অখণ্ডানন্দকে নামতে বললো। কিন্তু শিবিকা থেকে নেমেই বিস্মিত অখণ্ডানন্দ দেখলেন সামনেই ব্রহ্মানন্দ, যেন তাঁরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। পরে জানা গেল যে যাত্রা থেকে শুরু করে এতখানি পথ বাহকেরা তাঁকে একই জায়গায় ঘুরিয়েছে। রহস্যটি ফাঁস করে ব্রহ্মানন্দ জড়িয়ে ধরলেন অখণ্ডানন্দকে, তারপর দু'জনেই শিশুর মতন হেসে উঠলেন।

সঙ্ঘের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকলেও সবাই শ্রীশ্রীমাকেই সঙ্ঘের প্রধান মনে করতেন। তাই ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর গুরুভাইরা মায়ের কোনো ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখতেন না। তাঁরা জানতেন যে, শ্রীমা ও জগন্মাতা, এক ও অভিন্ন এবং রামকৃষ্ণের মতো শুদ্ধসত্ত্ব। বস্তুত, সারদাও মাঝে মাঝে নিজের মধ্যে অপ্রত্যক্ষভাবে জগন্মাতার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতেন। একটি ঘটনা থেকেই এর প্রমাণ মিলবে। সারদার এক আত্মীয়া ছিল। ভাগ্যহীনা এই নারীর মাথার দোষ ছিল। একদিন সে ক্রোধবশে সারদাকে গালাগালি দিয়ে বললো, 'তোর মরণ হয় না!' সারদা সে কথা শুনে শান্তভাবে মন্তব্য করেছিলেন 'আমি যে অমর তা ও জানে না!'

শেষ জীবনে সারদামা জ্বরবিকারে খুব কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তাই স্থির হলো জয়রামবাটী থেকে তাঁকে তাঁর কলকাতার সদ্য সমাপ্ত বাসভবনে নিয়ে আসা হবে। তখন তাঁর একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থা। শয্যাত্যাগও করতে পারেন না। সবাই বুঝেছিলেন যে সংসারের উপর থেকে ধীরে ধীরে তাঁর আসক্তি কমে আসছে। সবাইকে যিনি সন্তানতুল্য দেখতেন—এই সেদিনও বীজনরতা এক আত্মীয়াকে বাতাস করতে নিষেধ করে যিনি বলেছিলেন 'থাক্ মা ; তোর হাতে ব্যথা হবে, আমি ঘুমোতে পারব না,' —ভায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে সেই মানুষটিই একফোঁটা চোখের জলও ফেললেন না।

একদিন বললেন, 'আমার এই দেহটি দিয়ে ঠাকুর যা করাতে চেয়েছেন তা করেছি। এবার যাবার পালা। এখন আমার মন শুধু তাঁর কাছে যেতে চাইছে।' একে একে সব আত্মীয়াকে ছেড়ে দিলেন—সবাইকে জয়রামবাটীতে ফিরে যেতে বললেন, যাতে আসন্ন বিয়োগ ব্যথায় তারা কাতর না হয়। একজন ভক্ত কেঁদে ফেললেন, 'আমাদের কি হবে, মা?' তিনি বললেন, 'ভয় কি? তোমরা তো ঠাকুরকে দেখেছ!' সেদিন মধ্যরাতের কিছু পরেই শ্রীশ্রীমা'র মহাসমাধি লাভ হলো। সেটি ১৯২০ সালের ২১শে জুলাই।

ব্রহ্মানন্দের শেষের দিনগুলি ছিল উঁচু ভাবের সুরে বাঁধা। শুধু লোকশিক্ষার জন্যই মাঝে মাঝে তাঁর মন সংসার ভূমিতে নেমে আসতো। তখন প্রায় প্রতিদিনই রামকৃষ্ণকে দর্শন করতেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। অথচ আগন্তুকেরা মিশন পরিদর্শনে এলে তাঁদের সঙ্গে নানা ঐহিক বিষয় নিয়েও আলোচনা করতেন। সংসারের কোনো বিষয়েই তাঁর অনাগ্রহ ছিল না; তবুও অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা বুঝেছিলেন কেমনভাবে সমস্ত আসক্তি থেকে যেন তিনি মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন।

১৯২২; মাত্র কয়েকদিন আগেই রামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়েছে। হঠাৎ উদরাময়ের মৃদু লক্ষণ দেখা দিল—সঙ্গে বহুমূত্র। ব্রহ্মানন্দ বেশ কিছুদিন রোগভোগ করলেন। কিন্তু দেহ কাহিল হলেও, মনটি থাকত মধুময়। কারণ নিত্য রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের দর্শনানন্দ লাভ করতেন তিনি। প্রায়ই কৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনতে পেতেন—মনে হ'ত কৃষ্ণ বুঝি তাঁকে ডাকছেন। তখন আবেগে চেঁচিয়ে উঠতেন; বলতেন, 'ওরে, আমার পায়ে মল পরিয়ে দে —আমি যে কৃষ্ণের সঙ্গে নাচতে যাব!'

বহুমূত্র রোগের লক্ষণানুযায়ী অন্তিম সময়েও তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন না। পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ চেতনা ছিল। তাঁর চোখ দুটি ছিল উজ্জ্বল। আশ্চর্য রকমের শান্ত ছিল তাঁর মন। ভক্তদের কাছে তাঁর শেষ বাণী ছিল, 'শোক ক'রো না, আমি সর্বক্ষণই তোমাদের পাশে থাকবো।' ১০ই এপ্রিল ১৯২২—সমাধিস্থ অবস্থায় ব্রহ্মানন্দ দেহত্যাগ করলেন।

ব্রহ্মানন্দ বেঁচে থাকতেই রামকৃষ্ণানন্দ বলেছিলেন, 'মহারাজের মনটি রামকৃষ্ণর মনের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে।' ব্রহ্মানন্দের এক শিষ্যের সঙ্গে (শিষ্যটি তখন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো এক কেন্দ্রের প্রধান স্বামীজীরূপে যোগ দিতে চলেছেন) আলাপকালে শিবানন্দ আরও দৃঢ়ভাবে এই ভাবটি ব্যক্ত করেন। শিবানন্দ বলেছিলেন, 'তোমরা যে ঈশ্বরের পুত্রকে সাক্ষাৎ করেছ সে কথা কখনও ভুলো না।' অনেক বছর পরে সেই শিষ্যটিই লেখেন, 'তিনি (ব্রহ্মানন্দ) ছিলেন আমাদের পিতা মাতা এবং সর্বস্ব। তাঁর প্রয়াণের পর আমি একটুও শূন্যতা বোধ করি নি। মহারাজ যতদিন দেহধারী ছিলেন ততদিনই যেন বাধা ছিল। তিনি গেলেন, বাধাও চলে গেল। আমি জানি মহারাজ এখনও আছেন, আমাদের মধ্যেই আছেন এবং সবাইকে সাহায্য করছেন।'

'বাউলের দল হঠাৎ এলো, তারা নাচলে, গান গাইলে আবার হঠাৎ চলেও গেল।' স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের এ কাহিনী এখানে এসে শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু যে কাহিনীর শেষ নেই, তা হলো বর্ধিষ্ণু এক প্রতিষ্ঠানের কাহিনী—ভক্ত নারী-পুরুষের কাহিনী, যাঁরা রামকৃষ্ণ এবং তাঁর বাণীগুলি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছেন। এই গ্রন্থ বিস্ময়-পুরুষ রামকৃষ্ণকে নিয়ে রচিত। আমাদের চোখে তিনি অপার রহস্যময়; এবং যা রহস্যময় যা বিস্ময়কর তার সঙ্গে পরিণতির কোনো সম্পর্ক নেই। সত্যই ঈশ্বর যদি মানবদেহাশ্রয়ে মাঝে মাঝে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হন, তখন কি চার্চের ছোট-বড় আকার কিংবা ভক্তশিষ্যের সংখ্যা দিয়ে তাঁর মহিমা যাচাই হবে?

একজন সাধারণ 'গ্রেট ম্যানের' জীবনীকার তাঁর নায়কের কর্মসাফল্যের মান নির্ধারণ করে গ্রন্থ শেষ করেন। যাঁরা একই কর্মক্ষেত্রে বিশিষ্ট, সেইসব সমকালীন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তুলনা করে, ইতিহাসে নায়কের যোগ্য স্থানটি তিনি নির্ণয় করে দেন। আমার মনে হয় এ ক্ষেত্রে তেমন প্রয়াস অর্থহীন।

আমার সাধ্যানুযায়ী এই অপার বিস্ময় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। প্রশ্ন হলো, পাঠক এই ব্যাখ্যাটি কি ভাবে নেবেন? কেমন তাঁর প্রতিক্রিয়া হবে? আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে না বলেই কি সমস্ত ব্যাপারটি হাস্যকর বা অপ্রাসঙ্গিক? না কি জীবন ও মননের পালাবদলের সূত্রপাতরূপে পাঠক এই কাহিনী মেনে নেবেন?

সারদানন্দ, শ্রীম এবং রামকৃষ্ণের অন্য কথাকারেরা প্রশ্নগুলি যেভাবে আমার সামনে রেখেছেন, আমিও সেইভাবেই পাঠকের সামনে সেগুলি তুলে ধরলাম।

—০—